তফসীরে
মা'আরেফুল
কোরআন
দ্বিতীয় খণ্ড

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

[সূরা আলে-ইমরান থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (দ্বিতীয় খণ্ড)
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত

ইফা প্রকাশনা : ৬৮৬/১০
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0128-8

প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর ১৯৮০

একাদশ সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০১০
অগ্রহায়ণ ১৪১৭
জিলহজ ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৬০.০০ টাকা

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN Vol-2 : Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 December 2010

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundaton.org.bd

Price : Tk 260.00 ; US Dollar : 7.50

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্‌সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্‌সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস্ আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ উসমান গণী (ফারূক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রথম সংস্করণে অনুবাদকের আরয

بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

আল্লাহ্ তা'আলার হাজার শোকর যে অতি অল্প দিনের ব্যবধানেই তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন-এর দ্বিতীয় খণ্ড আগ্রহী পাঠকগণের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হলো। আল্লাহ্র রহমতে আট খণ্ডে সমাপ্ত এ বিরাট তফসীর গ্রন্থখানির অনুবাদ অতি দ্রুত পাঠকদের খেদমতে পেশ করার তওফীক হয়।

এ যুগের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং সর্ববৃহৎ তফসীরগ্রন্থ মা'আরেফুল কোরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটা উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সচিব জনাব মোঃ সাদেক উদ্দিন, প্রশাসক জনাব মেজর এরফানউদ্দিন প্রমুখের আগ্রহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা কাজটি দ্রুত সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হচ্ছে। এঁদের এবং অন্যান্য যাঁরা বিভিন্নভাবে এ মহান গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ লাভের জন্য সকলের প্রতি দোয়ার আবেদন রইল।

২য় খণ্ড তরজমার ব্যাপারে আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন জনাব মাওলানা মু. আ. আযীয, জনাব মাওলানা আবদুল লতিফ মাহমুদী, জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ও জনাব মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, এ মহান তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা মুদ্রণের ক্ষেত্রে কোথাও যদি কোন অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয়, তবে তা অনুবাদককে অবহিত করে পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করতে সকলের প্রতি বিনীত আরয রইল।

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সূচিপত্র

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ

সূরা আলে-ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ, ২০০ আয়াত, ২০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الٓمٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ۝٣ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٥ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (৩) তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে ; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। নাযিল করেছেন তওরাত ও ইন্‌জীল, (৪) এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হিদায়েতের জন্য এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। (৬) তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য অংশটুকু কোরআনের তৃতীয় সূরা আলে-ইমরানের প্রথম রুকূর। সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সূরা ফাতিহার শেষভাগে আল্লাহ্‌র নিকট সরল পথ প্রার্থনা করা

হয়েছিল। এরপর সূরা বাকারায় الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ বলে শুরু করে যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহার প্রার্থিত সরল পথের প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা মঞ্জুর করে এ কোরআন পাঠিয়েছেন। এ কোরআন সরল পথ প্রদর্শন করে। অতঃপর সূরা বাকারায় শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন জায়গায় কাফিরদের বিরোধিতা ও তাদের সাথে মোকাবিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (অর্থাৎ কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর)। এরূপ দোয়া দ্বারা সূরা শেষ করা হয়েছে। সেই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে সূরা আলে-ইমরানে সাধারণভাবে কাফিরদের সাথে কাজ-কারবার এবং তাদের বিরুদ্ধে হাতে ও মুখে জিহাদ করার কথা বর্ণিত হচ্ছে। এটা যেন وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ বাক্যেরই ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে মহান লক্ষ্যের জন্য মানবজাতিকে কুফর ও ইসলাম তথা কাফির ও মুমিন এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তা-ই সূরা আলে-ইমরানের প্রথম পাঁচ আয়াতে উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ মহান লক্ষ্যটি হচ্ছে আল্লাহ্র তওহীদ বা একত্ববাদ। যারা তওহীদে বিশ্বাস করে তারা মু'মিন এবং যারা বিশ্বাস করে না, তারা কাফির বা অ-মুসলিম। এ রুকূর প্রথম আয়াতে তওহীদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ এবং দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ الٓمّٓ ۚ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ এতে الم শব্দটি কোরআনের বিশেষ রহস্যপূর্ণ আয়াতসমূহের অন্যতম। এটি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর মধ্যকার একটি গোপন রহস্য। এ রুকূর শেষ আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে। এরপর اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যে তওহীদের বিষয়বস্তুকে একটি দাবির আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্র সত্তা এমন যে, তাঁকে ছাড়া উপাসনা করার যোগ্য কেউ নেই।

অতঃপর اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ—বলে তওহীদের যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারও সামনে আপন সত্তাকে চূড়ান্ত ও হীনরূপে উপস্থাপন করার নাম ইবাদত। বলা বাহুল্য ইবাদতের যোগ্য সত্তাকে অসীম শক্তিধর ও চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী এবং সবদিক দিয়ে চরম পরাকাষ্ঠার অধিকারী হতে হবে। পক্ষান্তরে যে বস্তু আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অক্ষম কিংবা অপরের মুখাপেক্ষী, তার শক্তি ও সম্মান যে নিতান্তই নগণ্য তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে, জগতে যেসব বস্তু আপন সত্তার মালিক নয় এবং আপন সত্তাকে কায়েম রাখতে অক্ষম তা প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিই হোক অথবা পানি ও বৃক্ষই হোক অথবা ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরই হোক তারা কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। একমাত্র সেই পরম সত্তাই ইবাদতের যোগ্য হতে পারেন, যিনি চিরঞ্জীব ও চির অস্তিত্বশীল। বলা বাহুল্য, সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সত্তা। তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই।

এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ٠ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ٠

এর সারমর্ম এই যে, কোরআন-বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তুটি কোরআন অথবা এই পয়গম্বর (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এর পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তওরাত, ইন্জীল এবং অনেক পয়গম্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সবাই এ তওহীদের অনুসারী এবং প্রচারক ছিলেন। কোরআন এসে তাঁদের সবার সত্যায়ন করেছে, কোন নতুন দাবি উপস্থাপন করেনি, যা হৃদয়ঙ্গম করতে অথবা মেনে নিতে মানুষ জটিলতার সম্মুখীন হবে।

সর্বশেষ দু'আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি অনন্য গুণ ইল্‌ম (জ্ঞান) ও কুদরত (শক্তি-সামর্থ্য) দ্বারা তওহীদের প্রমাণ সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ যে সত্তা সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধিকারী এবং যাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছে, একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা সীমিত শক্তির অধিকারী কোন সত্তা এ স্তরে উপনীত হতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর এরূপ ঃ

আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ জানেন)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন যে, তিনি ছাড়া ইবাদত করার যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর নিয়ামক। তিনি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন সত্যতা সহকারে। এ কোরআন ঐসব (খোদায়ী) গ্রন্থের সত্যায়ন করে, যা ইতিপূর্বে ছিল। (এমনিভাবে) তিনি তওরাত ও ইনজীল প্রেরণ করেছিলেন ইতিপূর্বেকার লোকদের হিদায়েতের জন্য (এতে কোরআন যে হিদায়েত, সে কথাও স্বাভাবিকভাবেই সপ্রমাণিত হয়। কারণ হিদায়েতের সত্যায়নকারীও হিদায়েত।) আল্লাহ্ তা'আলা (পয়গম্বরগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য) মু'জিযা প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয়ই যারা (একত্ববাদ প্রমাণকারী) নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য রাখেন)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কিছু গোপন নয় ; পৃথিবীতেও (না) এবং নভোমণ্ডলেও (না)। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ। তিনি এমন (পবিত্র) সত্তা যে, যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের (আকৃতি) গঠন করেন। (কারও আকার এক রকম, কারও আকার অন্য রকম। সুতরাং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও পরিপূর্ণ। জীবন নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি প্রধান বৈশিষ্ট্য এককভাবে তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে,) তাঁর (পবিত্র) সত্তা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি শক্তিধর, (তওহীদ অস্বীকারকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু) পরম বিজ্ঞ (ও। তাই বিশেষ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার জীবনে কর্মের প্রতিফল না দিয়ে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সর্বকালের সব পয়গম্বরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন

দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যে-ই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন এবং সবাই একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরণত আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর তওহীদের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম-সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পর হযরত নূহ (আ) আগমন করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ঐসব তত্ত্বের প্রতিই দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের প্রতি আদম আলাইহিস্ সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্ সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এরপর মূসা ও হারুন আলাইহিমুস্ সালাম এবং তাঁদের বংশের পয়গম্বরগণ আগমন করেন। তাঁরা সবাই সে একই কলেমায়ে-তওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কলেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এর পরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত ঈসা (আ) সেই একই আহ্বান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) একই তওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাঁদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক পয়গম্বর অন্য পয়গম্বরের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। বরং সচরাচর তাঁদের একজন অন্যজন থেকে বহু শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোন অবস্থা তাঁদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তাঁরা পূর্বসূরিগণের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই তাঁদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে, সরলভাবে চিন্তা করে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে একই সত্যের কথা বর্ণনা করলে তা মিথ্যা হতে পারে কি ? তবে এতটুকু চিন্তাই তার পক্ষে তওহীদের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই করারও প্রয়োজন থাকে না। বরং বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী এত বিপুল সংখ্যক লোকের এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির

সত্যতা নিরূপণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পয়গম্বরগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারও পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাঁদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাঁদের দাওয়াতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত।

প্রথমদিকের দুই আয়াতে বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক খৃস্টান একবার হুযূর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে তাদের সামনে তওহীদের দু-একটি প্রমাণ উপস্থিত করলে খৃস্টানরা নিরুত্তর হয়ে যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও তওহীদের বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে যে, এ জ্ঞান থেকে কোন জাহানের কোন কিছু গোপন নয়।

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণবিন্যাস এমন শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবি এই যে, ইবাদত একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।

এভাবে তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রধান চারটি 'সিফাত' চারটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার সিফাত এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বিক শক্তি-সামর্থ্যের সিফাত বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ চারটি গুণেই যে সত্তা গুণান্বিত, একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য।

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ
مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا
اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ
وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٧﴾

---

(৭) তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী চার আয়াতে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছিল। এ আয়াতে তওহীদের বিপক্ষে কতিপয় আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নাজরানের কিছুসংখ্যক খৃস্টান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দীন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি বিস্তারিতভাবে খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণ করেন। তিনি স্বীয় দাবির সমর্থনে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, আল্লাহ্ পরিপূর্ণ শক্তিধর, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ইত্যাদি গুণবাচক বাক্য উপস্থাপন করেন। খৃস্টানরা এসব বাক্যের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এভাবে একত্ববাদ প্রমাণিত হয়ে গেলে ত্রিত্ববাদের অসারতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর খৃস্টানরা কোরআনে ব্যবহৃত কিছু শব্দ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে যে, কোরআনে হযরত ঈসা (আ)-কে 'রূহুল্লাহ্' (আল্লাহ্র আত্মা) এবং 'কালেমাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্র বাক্য) বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র অংশীদার।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খৃস্টানদের এসব মন্তব্যের মূলোৎপাটন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের এসব বাক্য 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ রূপক। এসব বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর মধ্যকার একটা গোপন রহস্য। এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবগত হতে পারে না, বরং এসব শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সর্বসাধারণের বৈধ নয়। এগুলো সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী যে, এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার যা উদ্দেশ্য, তা সত্য। এর অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করার অনুমতি নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এর এক অংশ এমন সব আয়াত, যা উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত (অর্থাৎ এসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট)। এ আয়াতগুলো (এ) গ্রন্থের (কোরআনের) আসল ভিত্তি। (অর্থাৎ এসব আয়াত দ্বারা অস্পষ্ট আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট করা হয়।) অপর অংশ এমন সব আয়াত, যেগুলোর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। (অর্থাৎ এসব আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট—তা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণেই হোক অথবা সুস্পষ্ট আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যহীন হওয়ার কারণেই হোক।) অতএব, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা ঐ অংশের পেছনে পড়ে, যার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট (দীনের ব্যাপারে), গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর (অস্পষ্ট আয়াতে ভ্রান্ত) অর্থ অন্বেষণের দুরভিসন্ধিতে (যাতে স্বীয় ভ্রান্ত

বিশ্বাসে এর সাহায্য নেওয়া যায়)। অথচ এসব আয়াতের অভ্রান্ত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না (অথবা তিনি যদি নিজে কোরআন কিংবা হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কার কিংবা ইঙ্গিতে বলে দেন। যেমন, صلوة শব্দের উদ্দেশ্য পরিষ্কার জানা হয়ে গেছে এবং اسْتَوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ। [আরশের ওপর সোজা হয়ে উপবেশন] ইত্যাদির যথার্থ মর্ম খুবই স্পষ্ট। সুতরাং "আল্লাহ্ তা'আলা আরশে সমাসীন" এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার শান মোতাবেকই হবে—এ তথ্য মোটামুটি সবারই জানার কথা। কিন্তু আরশে সমাসীন হওয়ার প্রকৃতি কিরূপ, তা সাধারণের জানার কথা নয়। তেমনি কোরআনের একক বর্ণসমূহ—যথা আলিফ, লাম, মীম ইত্যাদির অর্থ কেউ জানতে পারেনি। যেমন জানতে পারা যায়নি اسْتَوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ। এর প্রকৃত তাৎপর্য।) এবং (এ কারণেই) যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে পরিপক্ব (এবং সমঝদার), তারা (এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে) বলে ঃ আমরা (সংক্ষেপে) বিশ্বাস রাখি যে, সবই (অর্থাৎ সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট সব আয়াত) আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আগত। সুতরাং বাস্তবে এগুলোর যে অর্থ ও উদ্দেশ্য, তা সত্য)। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান। (অর্থাৎ বুদ্ধির দাবিও এই যে, উপকারপ্রদ ও জরুরী বিষয়ে মনোনিবেশ করা দরকার এবং অপকারী ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পেছনে লেগে থাকা অনুচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বা রূপক আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ মূলনীতিটিও বুঝে নেওয়ার পর অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ ঃ কোরআন মজীদে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মুহ্কামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা হয়।

আরবী ভাষার নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সেসব আয়াতকে মুহ্কামাত বলে এবং এরূপ ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম না হয়, সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে।—(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'উম্মুল-কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতা থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখতে হবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এ ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা কোন ব্যাখ্যা অথবা কদর্থ নেওয়া শুদ্ধ হবে না। উদাহরণত হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ ঃ اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ। (সে আমার নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়)। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।

এসব আয়াত এবং এই প্রকার অন্যান্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দা এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য', 'তিনি আল্লাহ্র পুত্র'—খৃস্টানদের এসব দাবি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এখন যদি কেউ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু 'আল্লাহ্র বাক্য' এবং 'আল্লাহ্র আত্মা' ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল করে হঠকারিতা শুরু করে দেয় এবং এগুলোর এমন অর্থ নেয়, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও পরম্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তবে একে তার বক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায় ? কারণ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনিই কৃপা ও অনুগ্রহবশত যাকে যতটুকু ইচ্ছা জানিয়ে দেন। সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত থেকে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিয়ে স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বের করা শুদ্ধ হবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ —এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ-স্বভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশি তথ্যানুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাঁটি করে না, বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হিকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের তথ্যানুসন্ধানে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে এদের কথাই উল্লেখ করেছেন।—(বুখারী, ২য় খণ্ড)

অপর এক হাদীসে বলেন ঃ আমি উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে শংকিত। প্রথম, অধিক অর্থপ্রাপ্তির ফলে তারা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়, আল্লাহ্র গ্রন্থ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে প্রত্যেক সাধারণ ও মূর্খ ব্যক্তিও কোরআন বোঝার দাবিদার হয়ে যাবে)। এতে যেসব বিষয় বোঝার যোগ্য নয় অর্থাৎ অস্পষ্ট আয়াত, মানুষ সে সবের অর্থ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হবে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত এগুলোর সঠিক অর্থ কেউ জানে না। তৃতীয়, মুসলমানগণ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ত্বরিত উন্নতি লাভ করার পর পুনরায় তার অবনতি ঘটবে। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হবে। ফলে ইল্ম ধীরে ধীরে ক্ষয় পাবে। (ইবনে কাসীর)

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ — 'জ্ঞানে গভীরতার অধিকারী' কারা ? এ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, এরা হলেন আহ্লুস্ সুন্নাতে-ওয়াল-জামা'আত। তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ্র সে ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা সাহাবায়ে-কিরাম, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কোরআনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের যেসব অর্থ তাঁদের বোধগম্য নয়, নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করে সেগুলোকে তাঁরা আল্লাহ্র নিকটই সোপর্দ করেন। তারা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত নন, বরং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও অন্তর্দৃষ্টি কামনা করতে থাকেন। তাঁদের মন-মস্তিষ্ক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নয়। তাঁরা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ তাঁদের বিশ্বাস এই যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে আগত। তবে এক প্রকার অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্য উপকারী ও জরুরী ছিল, এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন নি, বরং খোলাখুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে বর্ণনা করেন নি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। সংক্ষেপে এরূপ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট। (মাযহারী)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

(৮) হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ-প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সবকিছুর দাতা। (৯) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে সত্যপন্থীদের একটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তারা শিক্ষাগত পূর্ণতা অর্জন সত্ত্বেও উদ্ধত নয় ; বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরো ঈমানী দৃঢ়তার জন্য দোয়া করেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আরো একটি নিষ্ঠাপূর্ণ গুণের কথা বর্ণনা করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমাদের পালনকর্তা! (সত্যের দিকে) আমাদের পথ-প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং নিজের কাছ থেকে আমাদের (বিশেষ) রহমত প্রদান করুন। নিশ্চয়ই

আপনি মহান দাতা। (বিশেষ রহমত এই যে, আমরা যেন সোজাপথে কায়েম থাকি)। হে আমাদের পালনকর্তা! (আমরা বক্রতা থেকে আত্মরক্ষার এবং সৎপথে কায়েম থাকার এই দোয়া জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করি না, বরং পরকালের মুক্তির জন্য করি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস এই যে,) নিশ্চিতই আপনি মানবমণ্ডলীকে (হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন ঐ দিনে, যাতে (অর্থাৎ যার আগমন সম্পর্কে) বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে। সন্দেহ না থাকার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিনের আগমনের ওয়াদা করেছেন। আর) নিশ্চিতই আল্লাহ্ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (তাই কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী। আমরা তজ্জন্য চিন্তিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমে আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সোজাপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

রাসূল (সা) বলেন ঃ এমন কোন অন্তর নেই, যা আল্লাহ্ তা'আলার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথে কায়েম রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

তিনি যথেচ্ছ ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা তাই করেন। কাজেই যারা ধর্মের পথে কায়েম থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহ্র নিকট অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্য দোয়া করে। হুযূর (সা) সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিম্নরূপ একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك অর্থাৎ হে অন্তর আবর্তনকারী। আমাদের অন্তরকে তোমার দীনের ওপর দৃঢ় রাখ। (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

(১০) যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন। (১১) ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহ্র আযাব

অতি কঠিন। (১২) কাফিরদেরকে বলে দাও, খুব শিগ্‌গিরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে—সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই যারা কুফ্‌রী করে, আল্লাহ্‌র সামনে তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বিন্দু পরিমাণেও কাজে আসবে না। এরূপ লোকেরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। (তাদের ব্যাপারটি এরূপ,) যেরূপ ব্যাপার ছিল ফেরাউন গোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববর্তী (কাফিরদের) (সে ব্যাপার ছিল এই যে) তারা আমার নিদর্শনাবলীকে (অর্থাৎ সংবাদ ও বিধি-বিধানকে) মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপের কারণে তাদের পাকড়াও করেন। (আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও বড় কঠোর। কারণ তাঁর অবস্থা এই যে) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। (যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরও তেমনি শাস্তি হবে)। আপনি কাফিরদের (আরও) বলে দিন ঃ (তোমরা মনে করবে না যে, শুধু পরকালেই এ পাকড়াও হবে। বরং ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই হবে। সেমতে ইহকালে) অতি সত্বর তোমাদের (মুসলমানদের হাতে) পরাজিত করা হবে এবং (পরকালে) জাহান্নামের দিকে একত্র করে নেওয়া হবে। জাহান্নাম খুবই মন্দ ঠিকানা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ —এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফিরকে পরাভূত দেখি না, এর কারণ কি ? উত্তর এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফির বোঝানো হয় নি, বরং তখনকার মুশরিক ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

(১৩) নিশ্চয়ই দুটি দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফিরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের দ্বারা শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রমাণ হিসেবে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় তোমাদের (প্রমাণের) জন্য বড় নমুনা রয়েছে দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে, যারা পরস্পর (বদর যুদ্ধে) একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছিল। একদল (অর্থাৎ মুসলমান) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছিল এবং অন্য দল ছিল কাফির। (কাফিরদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে,) কাফিররা নিজ (দল)-কে মুসলমানদের চেয়ে কয়েক গুণ (বেশি) দেখছিল। (দেখাও ধারণা-কল্পনায় দেখা নয়, বরং) চাক্ষুষ দেখা (যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কাফিরদের সংখ্যা এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জয়ী করেন। আসলে জয়-পরাজয় আল্লাহ্‌র হাতেই)। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তিদান করেন। (অতএব) নিঃসন্দেহে এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়) চক্ষুষ্মানদের জন্য বড় সাবধানবাণী (ও দৃষ্টান্ত) রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাতশত উট ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশি। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দু'টি অশ্ব, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারি ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, 'প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফিরদের অন্তর উপর্যুপরি শংকিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ (যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)-এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফিরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার হওয়ার আশংকা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। সূরা আনফালে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে।

মোটকথা, মক্কায় প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক ও নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। (ফাওয়ায়েদে আল্লামা উসমানী)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ
بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَ
نْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ
بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَ
الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

(১৪) মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদিপশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্‌র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো ? যারা পরহিযগার, আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশ্‌ত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত—তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (১৭) তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলাম ও ঈমানের বিরোধিতাই যে যাবতীয় অসৎ কর্মের মূল কারণ, তাই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর উৎস হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। কেউ যশ ও অর্থের লোভে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, কেউ কুপ্রবৃত্তির কারণে এবং কেউ পৈতৃক প্রথার প্রতি অন্ধ আবেগ পোষণের কারণে সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এসবের সারমর্ম হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রিয় বস্তুর ভালবাসা (অনেক) মানুষের মনে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে। (উদাহরণত) রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য, চিহ্নযুক্ত অশ্ব, (অথবা অন্যান্য পালিত) পশু ও শস্যক্ষেত্র।

(কিন্তু) এগুলো সব পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বস্তু। পরিণামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সুন্দর বস্তু) তো আল্লাহ্র কাছেই আছে (যা মৃত্যুর পর কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে)। আপনি (তাদের) বলে দিন, আমি কি তোমাদের এমন জিনিস বলে দেব, যা (বহুগুণে) উত্তম (উল্লিখিত) এসব বস্তু থেকে ? (তবে শোন,) যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, তাদের জন্য তাদের (প্রকৃত) প্রভুর কাছে এমন বাগান (অর্থাৎ বেহেশত) রয়েছে, যার তলদেশে ঝরনা প্রবাহিত হয়। এতে (বেহেশতে) তারা চিরকাল বসবাস করবে, আর (তাদের জন্য) এমন সঙ্গিনী রয়েছে, যারা (সর্বপ্রকারে) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর (তাদের জন্য) রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ তা'আলা ভালোভাবে দেখেন বান্দাকে (অর্থাৎ বান্দার অবস্থাকে। তাই যারা ভয় করে, তাদের এসব নিয়ামত দেবেন। পরবর্তী আয়াতে তাদের কিছু গুণ উল্লেখ করা হচ্ছে। তারা এমন লোক) যারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, আমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। (তারা) ধৈর্যশীল, সত্যপরায়ণ, বিনম্র, (সৎকাজে) অর্থ ব্যয়কারী এবং শেষরাতে (জাগ্রত হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার মহব্বত ঃ হাদীসে বলা হয়েছে حب الدنيا رأس كل خطيئة (দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল)। প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্য বস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে,—মানুষের দৃষ্টিতে এ সবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্যস্থল। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রমণী ও পরে সন্তান-সন্তুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্তুতির প্রয়োজনে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বস্তু।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা মজুরি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব-স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক যোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে

গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে—যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিকে গ্রাহক অনেক কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাজারে পৌঁছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এসব প্রিয়বস্তুর ভালবাসাই সবাইকে আপন আপন গৃহ থেকে বের করে আনে এবং এ ভালবাসাই দুনিয়াজোড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিচালন-ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নিয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নিয়ামতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হতো না। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না।

এখানে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি অর্থাৎ এসব বস্তুর ভালবাসা স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মশগুল হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এ সবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে এ রহস্যটিই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَ هُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

অর্থাৎ আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে পৃথিবীর সৌন্দর্যরূপে সৃষ্টি করেছি—যাতে মানুষের পরীক্ষা নিতে পারি যে, কে তাদের মধ্যে উত্তম কর্ম সম্পাদন করে।

এ আয়াত দ্বারা জানা গেল-যে, জগতের মোহনীয় বস্তুগুলোকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেওয়াও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। এর রহস্য অনেক। কিন্তু কোন কোন আয়াতে সুশোভিত করে দেওয়া শয়তানের কাজ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ।—অর্থাৎ শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছে। এসব আয়াতের অর্থ এমন বস্তুকে সুশোভিত করা, যা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে মন্দ অথবা সীমাতিরিক্ত লোভনীয় করার কারণে মন্দ। নতুবা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে সুশোভিত করা মন্দ নয়, বরং এতে অনেক উপকারও নিহিত আছে। এ কারণেই কোন কোন আয়াতে এই সুশোভিত করাকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্র কাজ বলা হয়েছে।

মোট কথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কৃপাবশত মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেওয়া। বাহ্যিক কাম্য-বস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মশগুল হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর মা'রেফত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও উপকৃত হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের কাঁটা

হওয়ার পরিবর্তে তার পথপ্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে, পরকালে তাঁর সম্মুখে উপস্থিতিকে এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনন্তকাল শাস্তি ভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল। এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ আপনি কাফিরদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হবেন না। কারণ অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়াতে এসব অবাধ্যদের কোন উপকার হয়নি। বরং এসব অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আখিরাতে তো তাদের শাস্তির কারণ হবেই, দুনিয়াতেও দিবা-রাত্রির চিন্তা ও ব্যস্ততার কারণে এগুলো এক ধরনের শাস্তি বৈ আর কিছু নয়।

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও সেগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। মওলানা রূমী এ বিষয়টির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

آب اندر زیر کشتی پستی است - آب در کشتی هلاك کشتی است

অর্থাৎ "দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম পানির মত এবং এতে মানুষের অন্তর একটি নৌকার মত। পানি যতক্ষণ নৌকার নিচে ও আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ তা নৌকার জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে পানি যদি নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে তাই নৌকাডুবি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।"

এমনিভাবে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার না করে, ততক্ষণ তা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ যদি মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবেই তার অন্তরের মৃত্যু ঘটে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

অর্থাৎ এসব বস্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য ; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ যেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নিয়ামত ধ্বংস হবে না ; হ্রাসও পাবে না।

পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَؤُ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ.

এতে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর নিয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত, তারাই এ নিয়ামত পাবে। সে নিয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের নিয়ামতরাজির মধ্যে বাহ্যত তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম—জান্নাতের সবুজ বাগ-বাগিচা ; দ্বিতীয়—পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং তৃতীয়—আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। অবশিষ্টগুলির মধ্যে সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। প্রথমত, সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং মৃত্যুও নেই যে, কোন অভিভাবক অথবা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে যার সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, প্রথমত জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ্ তাকে তাও দান করবেন। তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন জান্নাতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্রত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা যাবে।

এমনিভাবে জান্নাতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, দুনিয়াতে সোনা-রূপার বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু এর মাধ্যমেই যোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জান্নাতে সোনা-রূপার কোন অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোন কোন প্রাসাদের এক ইট সোনার ও এক ইট রূপার হবে। মোটকথা, পরকালের হিসাবে সোনা-রূপাকে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই মনে করা হয়নি।

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করা। জান্নাতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জান্নাতীদের আরোহণের জন্য উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে সওয়ার হয়ে জান্নাতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে।

মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই। এমনিভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ধ দান করে। জান্নাতে দুগ্ধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আলাহ্ তা'আলা দান করবেন।

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রূপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে সকল প্রকার শস্য আপনা-আপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই নেই। তবুও যদি কেউ কৃষিকাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে এক ব্যক্তি কৃষিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপণ, পাকা ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও জান্নাতের হুরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ জান্নাতীদের জন্য কোরআনে এ ওয়াদা রয়েছে যে, ولهم ما يشتهون অর্থাৎ "তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে।" এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি ? তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া ছাড়াই পাবে অর্থাৎ জান্নাতের সবুজ বাগ-বাগিচা, অপরূপ সুন্দরী রমণীকুল। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ এর কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ সন্তুষ্টি। এরপর অসন্তুষ্টির কোন আশঙ্কা থাকবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে পৌঁছে আনন্দিত ও নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ এখন তোমরা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই তো ? জান্নাতিগণ আরয করবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এত নিয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোন নিয়ামতের প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আলাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এখন আমি তোমাদের সব নিয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নিয়ামত দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তুষ্টি লাভ করেছ। এখন অসন্তুষ্টির আর কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই জান্নাতের নিয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেওয়ার অথবা হ্রাস করে দেওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হুযূর (সা) বলেছেন ঃ

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ما ابتغى به وجه الله وفى رواية
الا ذكر الله وما والاه اوعالماً اومتعلماً.

দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত। তবে ঐসব বস্তু নয়, যদ্দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়। এক রেওয়ায়েতে আছে—তবে আল্লাহ্র যিকির এবং আল্লাহ্র পছন্দনীয় বস্তু অথবা আলিম কিংবা তালেবে ইল্ম এ অভিশাপের আওতামুক্ত।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

(১৮) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই ; ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও, মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধু পরস্পর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই। যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফ্রী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতেও একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তওহীদের বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত তওহীদের ওপর তিনটি সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক—স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য, দুই—ফেরেশতাগণের সাক্ষ্য ; এবং তিন—বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য রূপক অর্থে বুঝতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী এবং সমুদয় সৃষ্টি একত্ববাদের উজ্জ্বল নিদর্শন।

هر گیا هے که از زمین روید - وحده لاشریك له گوید

—মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন প্রতিটি তৃণও একত্ববাদ উচ্চারণ করে।

এছাড়া তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল ও গ্রন্থাবলীও একত্ববাদের সাক্ষ্যদাতা। এসব বস্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত। কাজেই স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই যেন সাক্ষ্য দেন যে, তাঁকে ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে ফেরেশতাগণের। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত এবং তাঁর সৃষ্টিগত সকল ক্রিয়াকর্মের কর্মী বাহিনী। তাঁরা সব কিছু জেনেশুনে এবং চাক্ষুষ দেখে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই।

তৃতীয় সাক্ষ্য বিশেষ জ্ঞানীদের। এ বিশেষ জ্ঞানী বলতে সব পয়গম্বর এবং মুসলমান আলিম শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই ইমাম গায্যালী এবং আল্লামা ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এ আয়াতে আলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাক্ষ্যকে নিজের এবং ফেরেশতাগণের সাথে উল্লেখ করেছেন। এখানে বিশেষ জ্ঞানী বলতে সম্ভবত ঐসব

মনীষীকেও বোঝানো হয়েছে, যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অথবা সৃষ্ট জগত সম্পর্কে গভীর গবেষণার ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হন যে, এ সৃষ্ট জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই রয়েছেন এবং তিনি একক, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন সত্তা নেই। যদি তাঁরা অন্যান্য শর্ত মাফিক আলিম শ্রেণীভুক্ত নাও হন, তাতেও কিছু যায় আসে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং এ ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয় বর্ণনা করে একত্ববাদের বিষয়বস্তুকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। যারা এ বিষয়ের সাথে একমত নয়, তাদের অশুভ পরিণতির কথাও দ্বিতীয় আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ (খোদায়ী গ্রন্থসমূহে) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর (পবিত্র) সত্তা ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। আর ফেরেশতাগণ (স্বীয় যিক্‌র ও প্রশংসা কীর্তনে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। কারণ তাদের যিক্‌র একত্ববাদের বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ)। আর (অন্য) বিদ্বানগণ (স্বীয় বক্তৃতা ও রচনাবলীতে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন)। ইলাহ্ও এমন যে, (প্রত্যেক বস্তুর) পরিমিত ব্যবস্থাপনা কায়েম রেখেছেন। (এরপর বলা হয় যে,) তিনি ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। নিশ্চিতই (সত্য ও গ্রহণযোগ্য) ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ইসলাম। (এ ধর্ম সত্য হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে) আহলে-কিতাবরা যে মতবিরোধ করেছে (যে, ইসলামকে তারা অসত্য ধর্ম বলেছে), তা তাদের কছে (ইসলামের) সত্যতার প্রমাণ পৌঁছে যাবার পর পরস্পর বিদ্বেষ এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার কারণে করেছে। (অর্থাৎ ইসলাম সত্যধর্ম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন কারণ নেই। বরং তাদের মধ্যে একে অন্যকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার প্রবণতা আছে। ইসলাম গ্রহণ করলে, জনগণের উপর তাদের সরদারী নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং উল্টা ইসলামকে অসত্য আখ্যা দিয়েছে।) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধিবিধান অস্বীকার করে (যেমন তারা করেছে), নিশ্চিতই আল্লাহ্ অতিসত্বর তার হিসাব নেবেন (এরূপ ব্যক্তির হিসাবের পরিণাম শাস্তিই হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَهِدَ اللّٰهُ ..... **আয়াতের ফযীলত :** এই আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দুইজন বিশিষ্ট ইহুদী আলিম একবার মদীনায় আগমন করেন। মদীনার লোকালয় তথা আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যেরূপ লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এটা ঠিক সেরূপ লোকালয় বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তাঁরা হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাঁদের

চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁরা বললেন ঃ আপনি কি মুহাম্মদ ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহ্‌মদ। তাঁরা আরও বললেন ঃ আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো। হযরত নবী করীম (সা) বললেন ঃ প্রশ্ন করুন। তাঁরা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোন্‌টি ? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সা) আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাঁদের শুনিয়ে দিলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান।

মসনদে-আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন ঃ

وانا على ذلك من الشاهدين يا رب —অর্থাৎ পরওয়ারদিগার ! আমিও এর সাক্ষ্যদাতা। (ইবনে কাসীর)

ইমাম আ'মাশের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াত পাঠ করার পর যে ব্যক্তি انا على ذلك من الشاهدين —বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের বলবেন ঃ আমার এ বান্দা একটি অঙ্গীকার করেছে। আমি সবচাইতে বেশি অঙ্গীকার পূর্ণ করি। তাই আমার বান্দাকে জান্নাতে স্থান দাও।

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে হযরত নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী شهد الله আয়াত এবং قل اللهم مالك الملك থেকে بغير حساب পর্যন্ত পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন। এ ছাড়া তিনি তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাবেন। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হবে মাগফিরাত। (রূহুল মা'আনী)

'দীন' ও 'ইসলাম' শব্দের ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় دين শব্দের একাধিক অর্থ বর্তমান। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় دين ঐসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয়, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। 'শরীয়ত' অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। 'মাযহাব' শব্দটি দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোরআন বলে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ঐ দীনই জারি করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ্ ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেওয়া হয়েছিল।

এতে বোঝা যায় যে, সব পয়গম্বরের দীনই এক ও অভিন্ন ছিল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি করা, কিয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোযখের প্রতি

অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি করা, আল্লাহ্র প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা।

'ইসলাম' শব্দের আসল অর্থ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ) বলেন ঃ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। —(সূরা ইউনুস)। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল ঃ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ —সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম! (আলে-ইমরান ঃ ৫২)

সাধারণত ঐ দীন ও শরীয়তকেই 'ইসলাম' বলা হয়, যা নিয়ে সবার শেষে হযরত মুহাম্মদ (সা) আগমন করেছেন এবং যা বিগত সব শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে দীন ও শরীয়ত কায়েম থাকবে। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইসলাম' শব্দটি দীনে মুহাম্মদী ও উম্মতে-মুহাম্মদিয়ার এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়। সব হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসে-জিবরাঈলে হযরত নবী করীম (সা) ইসলামের এ বিশেষ অর্থটিই বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতের 'ইসলাম' শব্দেও উপরোক্ত উভয় অর্থই নেওয়া যেতে পারে। প্রথম অর্থ নিলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম ধর্ম অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহ্র অনুগত করা, প্রত্যেক যুগে আগত রাসূল ও তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা পালন করা। এতে যদিও দীনে মুহাম্মদীর কোন বিশেষত্ব নেই, তথাপি সাধারণ নীতি অনুযায়ী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর তাঁর প্রতি ও তাঁর আনীত বিধি-বিধানের প্রতি ঈমান আনা ও তা পালন করাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর সারমর্ম এই হবে যে, নূহ (আ)-এর আমলে তাঁর আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম (আ)-এর আমলে তাঁর আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য। মূসা (আ)-এর আমলে তওরাতের পাতা ও তার শিক্ষার আকারে যা এসেছিল, তাই ছিল গ্রহণযোগ্য ইসলাম। ঈসা (আ)-এর আমলে গ্রহণযোগ্য ইসলাম ইনজীল ও খৃস্টীয় বাণীর রঙে রঞ্জিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত ধর্মবিধানই হবে গ্রহণযোগ্য ইসলাম।

মোট কথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দীনে-মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয় অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত ধর্ম, তবে আয়াতের অর্থ

হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব, উভয় অবস্থাতে আয়াতের সার অর্থ একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম ঐ ইসলাম, যা সেই পয়গম্বরের ওহী ও শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটা ছাড়া অন্য কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়—যদিও তা বিগত কালের রহিত ধর্মও হয়ে থাকে। পরবর্তী কালের জন্য তা আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য থাকে না। ইবরাহীম (আ)-এর কালে তাঁর ধর্ম ছিল ইসলাম, মূসা (আ)-এর যমানায় সেই ধর্মের যেসব বিধান রহিত হয়ে যায়, তা ইসলাম নয়। তেমনিভাবে ঈসা (আ)-এর আমলে মূসা (আ)-এর শরীয়তের কোন বিধান রহিত হয়ে থাকলে তা তখন ইসলাম ছিল না। ঠিক এমনিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান রহিত রয়েছে, তা এখন ইসলাম নয়। তাই কোরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেওয়া হোক, সারমর্ম হবে এই যে, রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবের পর কোরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য—অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে। এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করে, তা তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। এ ধর্মের অধীনে যেসব ক্রিয়াকর্ম করা হবে, তাও বরবাদ হবে।

ইসলামেই মুক্তি নিহিত ঃ আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফ্র ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যেকোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে। সে ইহুদী হোক, খৃস্টান হোক অথবা মূর্তিপূজারীই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, যা কুফ্রের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শত্রু ; প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর দৃষ্টিগোচর হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোন কর্ম ধর্তব্য নয়। কোরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল ওজন করব না।

আলোচ্য আয়াতে ও তৎপূর্ববর্তী আয়াতসমূহে গ্রন্থধারীদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাই তাদের নির্বুদ্ধিতা ও কুকর্ম এভাবে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ـ

অর্থাৎ গ্রন্থধারীরা যে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও ইসলাম সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, এর কারণ এই নয় যে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ আছে ; তওরাত, ইনজীল ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও ধনৈশ্বর্যের মোহ তাদেরকে বিরোধে লিপ্ত করেছে।

পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ— অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ্ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমত কবর তথা বরযখ-জগতে পরকালের পথে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কিয়ামতে। এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও আরম্ভ হয়ে যাবে।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

(২০) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, 'আমি এবং আমার অনুসরণকারিগণ আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।' আর আহ্লে-কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।

যোগসূত্র ঃ সূরার প্রারম্ভে একত্ববাদ প্রমাণিত ও ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিক ও অবিশ্বাসী গ্রন্থধারীদের বাদানুবাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ইসলাম সত্য ধর্ম) এর পরও যদি তারা আপনার সাথে (অনর্থক) বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ (তোমরা স্বীকার কর বা না-ই কর) আমি আপন মুখমণ্ডল বিশেষভাবে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছি যারা আমার অনুসারী, তারাও (স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছে। অর্থাৎ আমরা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেছি। ইসলামে বিশ্বাসের দিক দিয়ে অন্তর আল্লাহ্র দিকেই নিবিষ্ট থাকে। কারণ

অন্যান্য ধর্মে কিছু কিছু শির্‌ক দেখা দিয়েছিল। এ উত্তরের পর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) গ্রন্থধারী ও মুশরিকদের বলুন ঃ তোমরাও ইসলামে দীক্ষিত হবে কি ? যদি তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে তারাও (সৎ) পথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (এ থেকে যথারীতি) মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে (আপনি এ জন্যও চিন্তিত হবেন না। কারণ) আপনার দায়িত্ব শুধু (আল্লাহ্‌র বিধান) পৌঁছিয়ে দেওয়া। (পরে) আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের দেখে (ও বুঝে) নেবেন (আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

(২১) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক, যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

যোগসূত্র ঃ সূরার প্রারম্ভে অধিকাংশই খৃস্টানদের সম্বোধন করা হয়েছিল। এরপর পূর্ববর্তী الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ আয়াতে খৃস্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই শামিল ছিল। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইহুদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে। ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা) বলেন ঃ বনী-ইসরাঈল একই সময়ে ৪৩ জন পয়গম্বরকে হত্যা করেছিল। এরপর এ দুষ্কর্মের জন্য ১৭০ জন ধার্মিক ব্যক্তি তাদের উপদেশ দিতে উদ্যোগী হলে তারা তাঁদেরও হত্যা করে। (বয়ানুল কোরআন, রূহুল মা'আনী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (যেমন ইহুদীরা ইনজীল ও কোরআন অস্বীকার করে) এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে (আর এ হত্যা তাদের ধারণায়ও) অন্যায়ভাবে আর এমন লোকদেরও হত্যা করে, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) মিতাচার শিক্ষা দেয়, এরূপ লোকদের কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। তারাই ঐ লোক, যাদের (উপরোক্ত অপকর্মের কারণে)

সব (সৎ) কর্ম বরবাদ হয়ে গেছে দুনিয়াতে (ও) এবং (পরকালেও)। (শাস্তি দেওয়ার সময়) তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

(২৩) আপনি কি তাদের দেখেন নি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে— আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এ জন্য যে, তারা বলে থাকে ঃ দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না ; তবে সামান্য হাতেগোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারাই তারা ধোঁকা খেয়েছে। (২৫) কিন্তু তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত করবো—যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে—তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ [সা]!) আপনি কি তাদের দেখেন নি, যাদের (খোদায়ী) গ্রন্থের (অর্থাৎ তওরাতের) একটি (যথেষ্ট) অংশ দেওয়া হয়েছিল (হিদায়েত কামনা করলে এ অংশই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো)। এ গ্রন্থের দিকে তাদের আহ্বানও করা হয়, যাতে এটি তাদের (ধর্মীয় মতবিরোধের) মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের একদল অমনোযোগী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর (অর্থাৎ অমনোযোগিতার) কারণ এই যে, তারা বলে ঃ (এবং তাদের বিশ্বাসও তাই যে,) আমরা গোণাগুনতির অল্প কয়েক দিন মাত্র দোযখে থাকবো। (এরপর মাগফিরাত হয়ে যাবে। এ) মনগড়া বিশ্বাসই তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। যেমন এ বিশ্বাস তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে যে, তারা পয়গম্বরগণের বংশধর। এ বংশগত মাহাত্ম্যের কারণে তাদের মাগফিরাত অবশ্যই হয়ে যাবে। এর ফলে তারা আল্লাহ্‌র গ্রন্থের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করতে থাকে। অতএব (এসব কুফ্‌রী কাজকর্ম ও কথাবার্তার কারণে) তাদের অবস্থা খুবই মন্দ

হবে, যখন আমি তাদের ঐ দিন একত্র করবো যাতে (অর্থাৎ যার আগমনে) কোন সন্দেহ নেই। (ঐ দিন) প্রত্যেকেই পুরোপুরি প্রতিদান পাবে—কারও প্রতি অন্যায় করা হবে না (অর্থাৎ বিনাদোষে অথবা দোষের চাইতে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে না)।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

(২৬) বলুন, 'ইয়া আল্লাহ্! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। (২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি দোয়া ও মুনাজাত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর ভেতরেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আয়াতের 'শানে-নযুল' থেকে তাই বোঝা যায়। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে সংবাদ দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানগণের করতলগত হবে। এতে মুনাফিক ও ইহুদীরা বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে থাকলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (রূহুল মা'আনী)

(হে মুহাম্মদ ! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে) বলুন ঃ হে আল্লাহ্! সাম্রাজ্যের মালিক আপনি। সাম্রাজ্য (অর্থাৎ সাম্রাজ্যের যতটুকু অংশ) যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যার (অধিকার) থেকে চান সাম্রাজ্য (অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অংশ) ছিনিয়ে নেন। যাকে আপনি চান জয়ী করে দেন এবং যাকে চান পরাজিত করে দেন। আপনার হাতেই সব মঙ্গল নিহিত। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর সামর্থ্যবান। আপনি (কোন ঋতুতে) রাতকে (অর্থাৎ রাতের অংশকে) দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন (ফলে দিন বড় হতে থাকে)। এবং (কোন কোন ঋতুতে) দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে)

রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন (ফলে রাত বড় হতে থাকে)। আপনি প্রাণীকে প্রাণহীন বস্তুর ভেতর থেকে বের করেন (যেমন ডিম থেকে বাচ্চা) এবং প্রাণহীন বস্তু প্রাণী থেকে বের করেন (যেমন পাখি থেকে ডিম)। আপনি যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শানে-নযূল ঃ মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুশরিক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই সকলে মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব ব্যবহার করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। অবশেষে দেশময় গভীর ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক, ইহুদী ও খৃস্টানদের একটি সম্মিলিত শক্তিজোট গড়ে উঠলো। তারা সবাই মিলে মদীনার উপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো। সাথে সাথে তাদের অগণিত সৈন্য দুনিয়ার বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে মদীনার চারদিক অবরোধ করে বসলো। কুরআনে এ যুদ্ধ 'গযওয়ায়ে আহ্যাব' অর্থাৎ সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ এবং ইতিহাসে 'গযওয়ায়ে খন্দক' নামে উল্লিখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করেছিলেন যে, শত্রু-সৈন্যের আগমন পথে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করা হবে।

বায়হাকী, আবূ নাঈম ও ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, প্রতি চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদ সাহাবীর ওপর সোপর্দ করা হয়। পরিকল্পনা ছিল—কয়েক মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করতে হবে, যা শত্রু-সৈন্যরা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাও দরকার ছিল। তাই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণ কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকার্যে মশগুল ছিলেন। পেশাব-পায়খানা, পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনেও কাজ বন্ধ রাখা দুরূহ ছিল। তাই উপর্যুপরি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। বাস্তবেও কাজটি এমন ছিল যে, আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত বাহিনীর পক্ষেও এত অল্প সময়ে এ কাজ সমাধা করা সহজ হতো না। কিন্তু এখানে ঈমানী শক্তি কার্যকর ছিল। তাই অতি সহজেই কাজ সমাধা হয়ে গেলো।

হযরত নবী করীম (সা)-ও একজন সৈনিক হিসাবে খননকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরিখার এক অংশে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বের হলো। এ অংশে নিয়োজিত সাহাবীগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও প্রস্তরখণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা মূল পরিকল্পনাকারী হযরত সালমান ফারসী (রা)-কে হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে সংবাদ দিয়ে পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং লোহার কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতেই তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো এবং একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হলো। এ স্ফুলিঙ্গের আলোকচ্ছটা বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। হযরত নবী করীম (সা) বললেন ঃ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার আঘাত করতেই আরেকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হলো। তিনি বললেন ঃ এ

আলোকচ্ছটায় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও দালান-কোঠা দেখানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই আবার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ 'এতে আমাকে সান্‌আ ইয়ামনের সুউচ্চ রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে।' তিনি আরও বললেন ঃ "আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেছেন যে, আমার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশ জয় করবে।"

এ সংবাদে মদীনার মুনাফিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটা সুযোগ পেয়ে বসলো। তারা বলতে লাগলো ঃ দেখ, প্রাণ বাঁচানোই যাদের পক্ষে দায়, যারা শত্রুর ভয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র পরিখা খননে ব্যস্ত, তারাই কিনা পারস্য, রোম ও ইয়ামন জয় করার দিবাস্বপ্ন দেখছে! আল্লাহ্ তা'আলা এসব নাদান জালিমদের উত্তরে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

এতে মুনাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে জাতিসমূহের উত্থান, পতন ও সাম্রাজ্যের পটপরিবর্তনে আল্লাহ্ তা'আলার অপ্রতিহত শক্তি-সামর্থ্য বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম সামাজ্য বিজয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ্, আদ, সামূদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতির ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও মূর্খ শত্রুদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা করে। এরা জানে না যে, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার করায়ত্ত। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ-সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের আগামীকাল সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামন সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

ذرہ ذرہ دھر کا پابستہ تقدیر ہے
زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے

ভাল ও মন্দের নিরিখ ঃ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে بيدك الخير—অর্থাৎ তোমারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেওয়া এবং সম্মান ও অপমান—উভয় দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানেও بيدك الخير والشر বলা স্থানোপযোগী ছিল। অর্থাৎ তোমারই হাতে কল্যাণ এবং অকল্যাণ নিহিত; কিন্তু আয়াতে শুধু خير (কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে করে, তা

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা হয়ত মন্দ নয়। জাতিসমূহের উত্থান-পতন এবং বিপদ-পরবর্তী সাফল্য লাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরবীর প্রসিদ্ধ কবি মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত কাব্যপংক্তিটি একটি জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিভাত হয় مصائب قوم عند قوم فوائد অর্থাৎ এক জাতির জন্য যা বিপদ, অন্য জাতির জন্য তা-ই সাক্ষাৎ রহমত।

জগতে যেসব বস্তুকে খারাপ ও মন্দ মনে করা হয়, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ হতে পারে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে যদি একটি দেহ মনে করে নেওয়া হয়, তবে মন্দ বস্তুগুলো এর মুখমণ্ডলের চামড়া ও চুল বৈ নয়। চামড়া ও চুলকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা নিঃসন্দেহে বিশ্রী ও কদাকার। কিন্তু একটি সুন্দর মুখমণ্ডলের অংশ হিসাবে তা সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক।

মোট কথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ নয়—আংশিক মন্দ। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তু মন্দ নয়। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں

এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে শুধু خير শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বস্রষ্টার রহস্য ও সমগ্র উপযোগিতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বস্তুই خير তথা কল্যাণ। অকল্যাণ কিছুই নেই।

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত সম্পর্কে আলোচনা শেষ হলো। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উপাদান-জগতের যাবতীয় শক্তি এবং সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার আয়ত্তাধীন।

দ্বিতীয় আয়াতে নভোমণ্ডলেও আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ—আপনি ইচ্ছা করলেই রাত্রির অংশ দিনে প্রবেশ করিয়ে দিনকে বড় করে দেন এবং দিনের অংশ রাত্রিতে প্রবেশ করিয়ে রাত্রিকে বড় করে দেন।

সবাই জানেন যে, দিবারাত্রির ছোট-বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নভোমণ্ডল, তৎসংশ্লিষ্ট সর্ব বৃহৎ উপগ্রহ সূর্য এবং সর্বখ্যাত উপগ্রহ চন্দ্র—সবই আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান জগত ও অন্যান্য শক্তিও যে আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

অর্থাৎ আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে মানব সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষান্তরে আপনি মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যেমন পশু-পক্ষী থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ।

জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে বিদ্বান ও মূর্খ, পূর্ণ ও অপূর্ণ এবং মু'মিন ও কাফির সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র আত্মিক জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের উপর সুস্পষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেই কাফিরের ঔরসে মু'মিন অথবা মূর্খের ঔরসে বিদ্বান পয়দা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলেই মুমিনের ঔরসে কাফির এবং বিদ্বানের ঔরসে মূর্খ পয়দা করতে পারেন। তাঁরই ইচ্ছায় আযরের গৃহে খলীলুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন এবং নূহ্ (আ)-এর গৃহে তাঁর ঔরসজাত পুত্র কাফির থেকে যায়, আলিমের সন্তান জাহিল থেকে যায় এবং জাহিলের সন্তান আলিম হয়ে যায়।

আয়াতে সমগ্র সৃষ্ট জগতের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা কিরূপ প্রাঞ্জল ও মনোরম ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে, উপরোক্ত বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়। প্রথমে উপাদান জগত এবং তার শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নভোমণ্ডল ও তার শক্তিসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমগ্র বিশ্বশক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি।

সবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ — অর্থাৎ আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন। কোন সৃষ্ট জীব তা জানতে পারে না—যদিও স্রষ্টার খাতায় তা কড়ায়-গণ্ডায় লিখিত থাকে।

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ ফযীলত ঃ ইমাম বগভীর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল-কুরসী, সূরা আলে-ইমরানের شهد الله আয়াত শেষ পর্যন্ত এবং قل اللهم আয়াত بغير حساب পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাব, শত্রুর কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ
تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ
كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ۛ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ

بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

(২৮) মু'মিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ্ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৩০) সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও ; ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে দূরের ব্যবধান হতো ! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, এরূপ লোকদের আল্লাহ্‌র সাথে কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না। কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব সর্বাবস্থায় হারাম। লেনদেনের স্তরে বাহ্যিক বন্ধুত্ব জায়েয হলেও বিনা প্রয়োজনে তাও পছন্দনীয় নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুসলমানদের উচিত (বাহ্যিক ও আন্তরিক কোনভাবেই) কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা, মুসলমানদের বাদ দিয়ে। (এ বাদ দেওয়া দুই প্রকারে হতে পারে—প্রথম মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব না রেখে, দ্বিতীয় মুসলমান ও কাফির উভয়ের সাথে বন্ধুত্ব রেখে—উভয় প্রকার বাদ দেয়া নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত)। যে ব্যক্তি এরূপ (কাজ) করবে, সে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কোন স্তরেই নয়। (কেননা পরস্পরে শত্রু—এমন দু'জনের মধ্য থেকে একজনের সাথে বন্ধুত্ব করার পর অপর জনের সাথেও বন্ধুত্বের দাবি করা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না)। কিন্তু এমতাবস্থায় (বাহ্যিক বন্ধুত্বের অনুমতি আছে,) যখন তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ (বিপদের) আশংকা কর। (এরূপ ক্ষেত্রে বিপদাংশকা দূর করা প্রয়োজন) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (মহান সত্তা) থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন। (অর্থাৎ তাঁর সত্তাকে ভয় করে বিধি-বিধান লংঘন করো না!) আল্লাহ্‌র কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (তখনকার শাস্তিকে ভয় করা অত্যাবশ্যক।) আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ যদি তোমরা মনের মধ্যে গোপন রাখ অথবা (মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা) প্রকাশ করে দাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা (সর্বাবস্থায়) তা জানেন। (আর

এরই কি বিশেষত্ব) তিনি তো সবকিছুই জানেন, যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে। (কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়।) এবং (জানার সাথে সাথে) আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতাও রাখেন। (সুতরাং তোমরা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোন কুকর্ম করলে তিনি তোমাদের শাস্তি দিতে পারেন। সে দিন (এমন হবে যে,) প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব সৎকর্মকে সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে এবং মন্দ কর্মকে (-ও দেখতে পাবে, সেদিন) কামনা করবে যে, তার মধ্যে ও এ দিনের মধ্যে অনেক দূরবর্তী ব্যবধান থাকলেই ভাল হতো (যাতে নিজ চোখে নিজের কুকর্ম দেখতে হতো না) এবং (তোমাদের পুনর্বার বলা হচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (মহান) সত্তা থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করছেন। (এ ভয় প্রদর্শনের কারণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত দয়ালু বান্দাদের (অবস্থার) প্রতি। (এ দয়ার কারণে তিনি চান যে, বান্দা আখিরাতের শাস্তি থেকে বেঁচে থাক। শাস্তি থেকে বাঁচার পন্থা হলো, কুকর্ম ত্যাগ করা। ভয় প্রদর্শন ব্যতীত অশোভন কর্ম ত্যাগ করা অভ্যাসগতভাবে হয় না। তাই তিনি ভয় প্রদর্শন করেন। সুতরাং এ ভয় প্রদর্শন সাক্ষাৎ স্নেহ ও দয়া)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অ-মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত কোরআনে এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ.

—"হে মু'মিনগণ! আমার ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের কাছে তোমরা বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে।" উক্ত সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ. — যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ.

"হে মু'মিনগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। কারণ তারা পরস্পরে একে অন্যের বন্ধু (মুসলমানদের সাথে তাদের কোন বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি নেই)। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।"

সূরা মুজাদালায় বলা হয়েছে ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ.

অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ ও বিচার দিবসে বিশ্বাসী লোকদের পাবেন না যে, তারা আল্লাহ্ ও

রাসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করে যদিও বিরোধীরা তাদের পিতা হয়, পুত্র হয়, ভাই অথবা পরিবারের লোকজন হয়।

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত ঃ এ বিষয়বস্তুটি কোরআনে বহু আয়াতে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখেশুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই, পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কোরআনের অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীর আচরণ থেকে অ-মুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমন এমন ঘটনাবলীও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থুল বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানও এক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলীতে পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কোরআনী শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কোরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্র করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অ-মুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে যে, এদের মধ্যে কোন্ স্তরটি জায়েয এবং কোন্টি না-জায়েয। যে স্তরটি জায়েয তার কারণ কি কি?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়।

দ্বিতীয়, সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত অ-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলমানের সাথেই স্থাপন করা জায়েয।

সূরা মুমতাহিনার অষ্টম আয়াতে এ সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ "যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না।"

তৃতীয়, সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা করা অথবা তাদের

অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অ-মুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে إلا أن تتقوا منهم تقاة বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করতে চাও, তাহলে জায়েয। সৌজন্যভাবও বন্ধুত্বের আকারে হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

চতুর্থ, লেনদেনের স্তর অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অ-মুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকহ্‌বিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফিরদের হাতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধু স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যেরই অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকরি প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা সবই জায়েয।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাফিরের সাথে কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফির ছাড়া সবার বেলায়ই জায়েয। এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার সবার সাথেই জায়েয রয়েছে ; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আথিতেয়তা অথবা অ-মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'রাহ্‌মাতুল্লিল-আলামীন' হয়ে জগতে আগমন করেন। তিনি অমুসলমানদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নযীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে সব শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, لا تثريب عليكم اليوم অর্থাৎ আজ তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনরূপ ভর্ৎসনাও করা হবে না। অমুসলিম যুদ্ধবন্দী হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফিররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল কিন্তু তাঁর হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কখনও উত্থিত হয়নি। মুখে বদ-দোয়াও তিনি করেন নি। অমুসলিম বনু-সাকীফের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি মসজিদে-নববীতে তাদের অবস্থান করতে দেন—যা ছিল মুসলমানদের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান।

ফারূকে-আযম রাদিআল্লাহু আনহু মুসলমানদের মত অমুসলমান দরিদ্র যিম্মীদেরও সরকারী ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। খোলাফায়ে-রাশেদীন ও সাহাবায়ে-কিরামের কাজ-কর্মের মধ্যে এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল সহানুভূতি, সৌজন্য ও লেনদেনমূলক ব্যবহার—নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব নয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অ-মুসলিমদের জন্য কতটুকু উদারতা ও

সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে বন্ধুত্ব বর্জনের আয়াত থেকে সৃষ্ট বাহ্যিক পরস্পর বিরোধিতাও দূর হয়ে গেলো!

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআন কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন ? কোন অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না রাখার রহস্য কি ? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জীব-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষ লতাপাতার মত নয় যে, জন্মলাভ করবে, বড় হবে, এরপর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমন কি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যের চারপাশে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণ তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ। মওলানা রূমী চমৎকার বলেছেন ঃ

زندگی از بهر ذکر وبندگی ست
بے عبادت زندگی شرمندگی ست

যে মানুষ এ উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে পড়ে, মওলানা রূমী ও তত্ত্বজ্ঞানিগণের মতে সে মানুষ নয়।

انچه می بینی خلاف ادم اند ـ نیستند ادم غلاف ادم اند

কোরআন মানুষের কাছ থেকে এ উদ্দেশ্যের স্বীকারোক্তি এভাবে নিয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

"বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য।"

আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই মানব-জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজ-কারবার, রাজ্য শাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্রু। এ শত্রুতায় শয়তান সবার অগ্রে। তাই কোরআন বলে ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

—অর্থাৎ "শয়তান তোমাদের শত্রু। তার শত্রুতা সব সময় স্মরণ রাখবে।"

এমনিভাবে যারা শয়তানী কুমন্ত্রণার অনুসারী এবং পয়গম্বরগণের আনীত আল্লাহ্র বিধানের বিরোধী, তাদের সাথে সে ব্যক্তির আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি কিছুতেই সম্ভব নয়, যার জীবন উদ্দেশ্যমূলক এবং যার বন্ধুত্ব, শত্রুতা, একাত্মতা, বিরোধিতা সবই এ উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ من احب الله وابغض الله فقد استكمل ايمانه—অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।' এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালবাসা,

বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব, মু'মিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহ্‌র অনুগত। এ কারণে কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ স্বীয় মহান সত্তা থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফিরদের আন্তরিক বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করবে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং বাস্তবে কেউ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে। এ কারণে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল। অস্বীকৃতি ও অপকৌশল তাঁর সামনে অচল।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

---

(৩১) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমার পথে চল, যাতে আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের সকল পাপ মার্জনা করে দেন। আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৩২) বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফিরদের ভালবাসেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ ওয়াজিব হওয়ার বিষয় এবং কুফরের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালাত ও রাসূলের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে, যাতে বোঝা যায় যে, তওহীদ অস্বীকার করার ন্যায় রিসালাত অস্বীকার করাও কুফর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (লোকদের) বলে দিন ঃ যদি তোমরা (নিজেদের দাবিতে) আল্লাহ্‌র সাথে ভালবাসা রাখ এবং সে ভালবাসার কারণে আল্লাহ্‌র ভালবাসাও পেতে চাও তবে তোমরা এ উদ্দেশ্য হাসিলের প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে আমার অনুসরণ কর। (কারণ আমি বিশেষভাবে এ শিক্ষার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। যদি এরূপ কর,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভালবাসতে শুরু করবেন এবং তোমাদের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন ; (কেননা আমি এ ক্ষমার পদ্ধতিও শিক্ষা দেই। এ পদ্ধতি অনুশীলন করলে অবশ্যই ওয়াদা অনুযায়ী গোনাহ মাফ হবে। উদাহরণত তওবা করা,

আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করে থাকলে তা আদায় করা এবং বান্দার হক আদায় করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া।) আল্লাহ্ তা'আলা খুবই ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। আপনি (আরও) বলে দিন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর (কারণ আসল উদ্দেশ্য তাই) এবং রাসূলের (আনুগত্য কর। অর্থাৎ এদিক দিয়ে আমার আনুগত্য করা জরুরী যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার মাধ্যমে তিনি স্বীয় আনুগত্যের পন্থা বর্ণনা করেছেন।) অতঃপর (এতেও) যদি তারা (আপনার আনুগত্য অর্থাৎ কমপক্ষে রিসালাতের বিশ্বাস থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তারা শুনে নিক যে,) আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ভালবাসেন না। (এমতাবস্থায় তারা হবে কাফির। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবি অথবা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিছক অর্থহীন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারও প্রতি কারও ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশি আছে তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হলো অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেওয়া। যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবিদার এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ জগতে যদি কেউ পরম প্রভুর ভালবাসার দাবি করে, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবি যতটুকু সত্য হবে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে এবং তাঁর শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবি দুর্বল হবে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সেই পরিমাণে পরিলক্ষিত হবে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করে, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করে এবং যে তাঁর অবাধ্যতা করে, সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করে। —(তফসীরে-মাযহারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

(৩৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদম (আ), নূহ্ (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর পরিবার এবং ইমরানের খানদানকে নির্বাচিত করেছেন। (৩৪) তারা বংশধর ছিল পরস্পরের। আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনা ঃ হযরত নবী করীম (সা)-এর রিসালাতে সন্দেহ পোষণ করার কারণে যেসব লোক তাঁর আনুগত্য করতো না আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ

প্রদর্শনের জন্য পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কিছু নযীর বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনায় হযরত আদম, নূহ্, আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে হযরত ইসা (আ)-এর আলোচনাই আসল উদ্দেশ্য। এর আগে তাঁর মাতা ও মাতামহীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর রহস্য ও উপযোগিতা পরে বর্ণিত হবে। মোট কথা এই যে, শেষ যমানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। এ কারণে তাঁর পরিচয় ও লক্ষণাদির বর্ণনায় কোরআন অন্যান্য পয়গম্বরের তুলনায় অধিক যত্নবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (নবুয়তের জন্য) মনোনীত করেছেন (হযরত) আদম (আ)-কে, (হযরত) নূহ (আ)-কে, (হযরত) ইবরাহীমের বংশধর (থেকে কিছুসংখ্যক)-কে [যেমন, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব এবং বনী ইসরাঈলের সব পয়গম্বর—যাঁরা হযরত ইয়াকুবের বংশধর ছিলেন। আমাদের রাসূল (সা) হযরত ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন]। এবং ইমরানের বংশধর (থেকে কিছুসংখ্যক)-কে। (এই ইমরান হযরত মূসার পিতা হলে বংশধরের অর্থ হবে হযরত মূসা ও হারুন [আ]। আর যদি ইনি মারইয়ামের পিতা ইমরান হন, তবে বংশধরের অর্থ হবে হযরত ঈসা-ইবনে মারইয়াম। মোট কথা, নবুয়তের জন্য তাঁদেরকে) বিশ্ববাসীর ওপর মনোনীত করেছেন। তাঁরা একে অপরের সন্তান। (যেমন, সবাই হযরত আদমের সন্তান এবং সবাই হযরত নূহের সন্তান। ইমরানের বংশধরও ইবরাহীমের সন্তান)। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সবার কথা শোনেন, সবার অবস্থা জানেন। যার কথা ও কাজ নবুয়তের উপযুক্ত দেখেছেন, তাঁকে নবী করেছেন)।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

(৩৫) ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সকল কিছু থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। (৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো—বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুত কি সে

প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভালই জানেন! সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই! আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে, তার সন্তান-সন্ততিকে তোমার আশ্রয়ে দিলাম—অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর) যখন ইমরান (মারইয়ামের পিতা)-এর স্ত্রী গর্ভাবস্থায় (আল্লাহ্ তা'আলাকে) বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার (ইবাদতের) জন্য এই সন্তানের মানত করছি, যে আমার গর্ভে আছে সে (আল্লাহ্র ঘরের সেবার উদ্দেশ্যে) মুক্ত থাকবে। (এবং আমি তাকে নিজের কাজে আবদ্ধ রাখব না।) অতএব, আপনি (একে) আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (আমার প্রার্থনা শুনছেন এবং আমার নিয়ত জানেন)। অতঃপর যখন সে কন্যা প্রসব করল (তখন এই ভেবে দুঃখিত হলো যে, এ তো বায়তুল-মুকাদ্দাসের সেবায় উপযুক্ত নয়, এ কাজটি যে পুরুষদের। তাই আক্ষেপ করে) বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি তো কন্যা প্রসব করলাম। (আল্লাহ্ বলেন, সে নিজ ধারণা অনুযায়ী আক্ষেপ করছিল) অথচ আল্লাহ্ (এ কন্যার অবস্থা) বেশি জানেন—যা সে প্রসব করেছিল। এবং (কোনরূপেই) পুত্র (যা সে চেয়েছিল) কন্যার সমান নয়; (বরং কন্যাই শ্রেষ্ঠ। কারণ সে অসাধারণ মহিমা ও কল্যাণের অধিকারিণী ছিল। এ পর্যন্ত মাঝখানে আল্লাহ্র উক্তি ছিল। এখন আবার ইমরান-পত্নীর উক্তি বর্ণিত হচ্ছে)। আমি এ কন্যার নাম রেখেছি মারইয়াম। আমি তাকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে (কোন সময় হলে) আপনার আশ্রয়ে (ও হেফাযত) অর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজ ছিল। সন্তানদের মধ্য থেকে কোন একটিকে আল্লাহ্র কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো এবং তাকে কোন পার্থিব কাজে নিযুক্ত করা হতো না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী মারইয়ামের জননী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোন জাগতিক কাজে নিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু যখন তিনি কন্যা প্রসব করলেন, তখন এই ভেবে আক্ষেপ করতে লাগলেন যে, কন্যা দ্বারা তো এ কাজ সম্ভবপর নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আন্তরিকতার বরকতে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন এবং সারা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন।

এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের ব্যাপারে জননীর বিশেষ অধিকার রয়েছে ? এরূপ না হলে মারইয়ামের জননী মানত করতে পারতেন না। এতে আরও বোঝা যায় যে, সন্তানের নাম নিজে প্রস্তাব করার অধিকার জননীরও রয়েছে।—(জাস্সাস)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّأَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

(৩৭) অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন—অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন—'মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো ?' তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোট কথা এই যে, মারইয়াম-জননী মারইয়াম [আ]-কে নিয়ে মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদে ইবাদতকারীদের বললেন ঃ আমি এ শিশু কন্যাকে আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করেছি। তাই আমি একে নিজের কাছে রাখতে পারি না। আপনারা এর দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। মসজিদে ইবাদতকারীদের মধ্যে হযরত যাকারিয়া [আ]-ও ছিলেন। মসজিদের ইমাম ছিলেন হযরত ইমরান। কিন্তু তিনি স্ত্রীর গর্ভাবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। নতুবা কন্যার দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরই ছিল অগ্রাধিকার। কারণ তিনি ছিলেন একাধারে কন্যার পিতা ও মসজিদের ইমাম। এ কারণে বায়তুল-মুকাদ্দাসের ইবাদতকারীদের প্রত্যেকেই কন্যাকে লালন-পালন করতে আগ্রহী ছিলেন। হযরত যাকারিয়া [আ] স্বীয় অগ্রাধিকারের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ আমার গৃহে কন্যার খালা রয়েছে। খালা মায়ের মতই। কাজেই মায়ের পরে কন্যাকে রাখার ব্যাপারে খালার অধিকার বেশি। কিন্তু অন্যরা এ অগ্রাধিকার মেনে নিতে স্বীকৃত হলো না। লটারির মাধ্যমে ব্যাপারটি মীমাংসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। লটারির যে পদ্ধতি স্থির করা হলো, তাও ছিল অভিনব। পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে। লটারিতেও হযরত যাকারিয়া [আ] জিতে গেলেন।

তিনি হযরত মারইয়ামকে পেয়ে গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করে মারইয়ামকে দুধ পান করালেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তাঁকে দুধ পান করানোর প্রয়োজনই দেখা দেয়নি। মোট কথা, হযরত মারইয়াম লালিত-পালিত হতে লাগলেন। মসজিদ-সংলগ্ন একটি উত্তম কক্ষে তাঁকে রাখা হলো। কোথাও যেতে হলে হযরত যাকারিয়া কক্ষে তালা লাগিয়ে যেতেন। আবার ফিরে এসে তালা খুলে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে সংক্ষেপে এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে)।

অতএব, তাঁকে (মারইয়ামকে) তাঁর পালনকর্তা উত্তম পন্থায় কবুল করে নিলেন এবং উত্তম বর্ধনে তাকে বর্ধিত করলেন। এবং (হযরত) যাকারিয়া (আ) তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। যখনই (হযরত) যাকারিয়া (আ) তাঁর কাছে (সেই উত্তম কক্ষে—যেখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল) আগমন করতেন, তখন তাঁর কাছে কিছু পানাহারের বস্তু দেখতে পেতেন! তিনি বলতেন ঃ হে মারইয়াম, এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো ? (অথচ কক্ষ তালাবদ্ধ। বাইরে থেকে কারও আসা-যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মারইয়াম) বলতেন ঃ আল্লাহ্র কাছ থেকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে যে অদৃশ্য ধনভাণ্ডার রয়েছে, তা থেকে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অকল্পনীয় রিযিক দান করেন (যেমন এ ক্ষেত্রে শুধু অনুগ্রহবশত বিনাশ্রমে দান করলেন)।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর—নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হযরত যাকারিয়া [আ] হযরত মারইয়ামের লালন-পালনে অসাধারণ খোদায়ী নিদর্শন দেখে নিজের জন্যও দোয়া করলেন)।

এ ক্ষেত্রে (হযরত) যাকারিয়া [আ] স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا—হযরত যাকারিয়া (আ) তখন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। সময়ও ছিল বার্ধক্যের—যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইতিপূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই এ যাবত সাহস করে দোয়া করেন নি। কিন্তু এ সময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মারইয়ামকে ফল দান করছেন, তখনই তাঁর মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো এবং তিনি দোয়া করার সাহস পেলেন। যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মওসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন।

قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً —এতে বোঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্য দোয়া করা পয়গম্বর ও সজ্জনদের সুন্নত।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

অর্থাৎ—হযরত নবী করীম (সা)-কে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নিয়ামত পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও দেওয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং পয়গম্বরের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নত থেকেও বঞ্চিত হয়। হযরত নবী করীম (সা) বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ ও সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেন নি। তিনি বলেন ঃ

النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى وتزوجوا فانى مكاثر بكم الامم–

অর্থাৎ "বিবাহ আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি এ সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।"

যারা স্ত্রী ও সন্তান লাভ এবং তাদের সৎ হওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে, এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ–

অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগত বান্দারা এরূপ দোয়া করে ঃ হে পালনকর্তা! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর, যাদের দেখে চক্ষু শীতল হয়—অন্তর প্রফুল্ল হয়।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এখানে চক্ষু শীতল হওয়ার অর্থ স্ত্রী ও সন্তানের আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে মশগুল দেখা।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার উম্মে সুলায়ম (আনাস-জননী) হযরত নবী করীম (সা)-কে অনুরোধ করে বললেন ঃ আপনি আনাসের জন্য কোন দোয়া করুন। হযরত (সা) নিম্নোক্ত দোয়া করলেন ঃ اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته —অর্থাৎ "আল্লাহ, তার (আনাসের) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি কর এবং তাকে প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে বরকত দান কর।"

এ দোয়ার প্রভাবেই হযরত আনাসের সন্তানদের সংখ্যা একশতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রচুর আর্থিক সচ্ছলতাও দান করেছিলেন।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, ফেরেশতারা তখন তাকে ডেকে বললেন—আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার (অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া নামে পুত্র হওয়ার) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার অবস্থা হবে এই যে, তিনি 'কলেমাতুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র বাণীর (অর্থাৎ হযরত ঈসা [আ]-এর নবুয়তের) সত্যায়নকারী হবেন, (দ্বিতীয়ত) অনুসৃত (অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে) হবেন, (তৃতীয়ত) কাম বাসনামুক্ত হবেন, (চতুর্থত) পয়গম্বর এবং (পঞ্চমত) সৎকর্মশীল হবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كلمة الله—(আল্লাহ্র বাণী)—হযরত ঈসা (আ)-কে 'কলেমাতুল্লাহ্' বলার কারণ এই যে, তিনি শুধু আল্লাহ্র নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

حصورا—এটা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর তৃতীয় গুণ। এর অর্থ যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। উদাহরণত উত্তম পানাহার, উত্তম পোশাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যত মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারও অবস্থা হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর মত হয় অর্থাৎ অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবসর না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যেসব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, من استطاع منكم الباءة। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম—নতুবা নয়। —(বয়ানুল-কোরআন)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ

كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

(৪০) তিনি বললেন, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র-সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা।' তিনি বললেন, আল্লাহ্ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (৪১) তিনি বলেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিনদিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিত করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হযরত যাকারিয়া [আ] আল্লাহ্ সকাশে) আরয করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র কিভাবে হবে, অথচ আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং আমার স্ত্রীও (বার্ধক্যের কারণে) সন্তান প্রসবের যোগ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা (উত্তরে) বললেন ঃ এমতাবস্থায়ই পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন। তিনি আরয করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (তাহলে) আমার জন্য কোন নিদর্শন ঠিক করে দিন (যাতে বোঝা যায় যে, এখন গর্ভ সঞ্চার হয়েছে)। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তখন তুমি তিনদিন পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না (হাত অথবা মাথায়) ইঙ্গিত ছাড়া। (এই নিদর্শন দেখেই বুঝে নিবে যে, এখন স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। মানুষের সাথে কথা বলার শক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার সময়ও তুমি আল্লাহ্র যিকির করতে সক্ষম হবে। সুতরাং) আল্লাহ্কে (মনে মনে) খুব স্মরণ করবে এবং (মুখেও) আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করবে সন্ধ্যাকালে এবং সকালে (কেননা তখনও আল্লাহ্র যিকিরের শক্তি পুরোপুরি বহাল থাকবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর দোয়া ও তার রহস্য ঃ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ —হযরত যাকারিয়া (আ) খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করে নিজে দোয়াও করেছিলেন। এ ছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও 'কিভাবে আমার পুত্র হবে' বলার মানে কি ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ জিজ্ঞাসা আল্লাহ্র শক্তি-সামর্থ্যে সন্দেহের কারণে ছিল না। বরং তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে

জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে যে বার্ধক্য অবস্থায় আছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে ? আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না, তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। সুতরাং আয়াতের অর্থে কোনরূপ জটিলতা নেই। —(বয়ানুল কোরআন)

قَالَ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا

প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে হযরত যাকারিয়া (আ) নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিনদিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না।

এ নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিদর্শন দিলেন যে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া হযরত যাকারিয়া অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত নিদর্শনও পাওয়া গেলো এবং উদ্দেশ্যও পুরোপুরি অর্জিত হলো। এ যেন একই সঙ্গে দুই উপকার লাভ। —(বয়ানুল কোরআন)

اِلاَّ رَمْزًا—এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সা) এক বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ اَيْنَ اللهُ (আল্লাহ্ কোথায়) ? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলো। হযরত (সা) বললেন ঃ এ বাঁদী মুসলমান। (কুরতুবী)

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

(৪২) আর যখন ফেরেশতারা বলল, "হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব-নারী সমাজের ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার ইবাদত কর এবং রুকূকারীদের সাথে সিজদা ও রুকূ কর।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য), যখন ফেরেশতারা (হযরত মারইয়াম [আ]-কে) বললোঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মনোনীত (অর্থাৎ মকবুল) করেছেন এবং (সকল

অপছন্দনীয় কর্ম ও আচরণ থেকে) পবিত্র করেছেন। এবং (এ মকবুল করাও দুই-একজন নারীর দিক দিয়ে নয় ; বরং তৎকালীন) সারা বিশ্বের নারীদের মোকাবিলায় তোমাকে মনোনীত করেছেন। (ফেরেশতারা আরও বলল ঃ হে মারইয়াম, তোমার পালনকর্তার আনুগত্য করতে থাক, সিজদা (অর্থাৎ নামায আদায়) কর এবং নামাযে রুকূকারীদের সাথে রুকূও কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعَالَمِيْنَ — এর অর্থ তৎকালীন সারা বিশ্বের নারী সমাজ। কাজেই سيدة نساء اهل الجنة فاطمة —(জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী হবেন ফাতিমা)—এ হাদীসটি উক্ত আয়াতের পরিপন্থী নয়।

وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ এখানে اركعى এর সাথে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে ; কিন্তু وَاسْجُدِيْ -এর সঙ্গে مع الساجدين যুক্ত করা হয়নি। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুকূ করার ব্যাপারে মানুষ সাধারণত বেশি যত্নবান নয় ; বরং সামান্য একটু ঝুঁকেই সোজা হয়ে যায়। এ ধরনের রুকূ কিয়ামের (অর্থাৎ দণ্ডায়মান অবস্থার) অধিক নিকটবর্তী। এ কারণে বাহ্যত মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা الراكعين যুক্ত করে নমুনা করে দিয়েছেন যে, তোমার রুকূ পুরোপুরি রুকূকারীদের মত হওয়া দরকার।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বর্ণিত) এ কাহিনী (জানার বাহ্যিক কোন উপায় না থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর দিক দিয়ে) অন্যতম অদৃশ্য সংবাদ, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি [এ উপায়ে আপনি এ সংবাদ জেনে অন্যদের বলেন। যারা হযরত মারইয়াম (আ)-কে রাখার ব্যাপারে মতবিরোধ করছিল, যার মীমাংসা শেষ পর্যন্ত লটারিযোগে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল]। আপনি তাদের কাছে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা (লটারিতে) আপন আপন কলম (পানিতে) নিক্ষেপ করছিল (লটারির উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ের মীমাংসা করা) যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মারইয়াম (আ)-এর লালন-পালন করবে ? (আপনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না) এবং আপনি তাদের কাছে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা (লটারির পূর্বে এ

ব্যাপারে) পরস্পর মতবিরোধ করছিল (যা দূর করার জন্য লটারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব সংবাদ জানার জন্য অন্য কোন মাধ্যমও যে নেই, তাও তো নিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং এমতাবস্থায় এ অদৃশ্য সংবাদগুলো আপনার নবুয়তের প্রমাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামী শরীয়তে লটারির নির্দেশ এই যে, হানাফী মযহাব মতে যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সে সব হকের মীমাংসা লটারিযোগে করা না-জায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারিযোগে করা এবং লটারিতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেওয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারিযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের উপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারিযোগে করা জায়েয, যথা কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে লটারির মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেওয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারি ছাড়াই উভয় পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হতো।—(বয়ানুল কোরআন) অর্থাৎ যেক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্য নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লটারি জায়েয।

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾

(৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ্-মারইয়াম-তনয় ঈসা ; দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৬) যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং যখন পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর), যখন ফেরেশতারা (হযরত মারইয়াম [আ]-কে আরও) বলল ঃ হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দেন, যা তাঁর পক্ষ থেকে হবে (অর্থাৎ একটি

শিশুর সুসংবাদ দেন, যা পিতার মাধ্যমে না হওয়ার কারণে 'কলেমাতুল্লাহ্' আল্লাহ্র বাণী বলে কথিত হবে)। তাঁর নাম (ও উপাধি) মসীহ্ ঈসা ইবনে মারইয়াম হবে। (তাঁর অবস্থা হবে এই যে,) তিনি ইহকালে, (আল্লাহ্র কাছে) মর্যাদাবান হবেন (অর্থাৎ নবুয়ত লাভ করবেন) এবং পরকালে (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের মু'মিনদের ব্যাপারে শাফা'আতের অধিকারী হবেন)। এছাড়া (নবুয়ত ও শাফা'আতের অধিকারসহ—যার সম্পর্ক অন্যের সাথেও—ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠারও অধিকারী হবেন। অর্থাৎ) আল্লাহ্র নৈকট্যশীলগণের অন্যতম হবেন। তিনি (মু'জিযারও অধিকারী হবেন) মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবেন দোলনাতে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ শৈশবাবস্থায়ও) এবং পরিণত বয়সেও (উভয় অবস্থাতে একই রূপ)। (উভয় কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য হবে না) এবং (তিনি) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সৎকর্মশীলদের অন্যতম হবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের একটি প্রমাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোন শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখন দোলনায়ও কথা বলবেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর যখন ইহুদীরা মারইয়ামের প্রতি অপবাদ প্রদানপূর্বক ভর্ৎসনা করতে থাকে, তখন সদ্যোজাত শিশু ঈসা (আ) বলে ওঠেন ঃ আমি আল্লাহ্র বান্দা। এতদসঙ্গে আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সের হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার—যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। মু'মিন, কাফির, পণ্ডিত, মূর্খ—সবাই এ বয়সে কথা বলে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসাবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি ?

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল-কোরআনের সার-ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়েছে যে, 'শৈশবাবস্থায় কথা বলা' বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে 'প্রৌঢ় বয়সের কথা' উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তাও শিশুসুলভ হবে না ; বরং প্রৌঢ় লোকদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধাবীসুলভ, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে প্রৌঢ় বয়সের কথাবার্তার উল্লেখ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ করা হয়েছে। তা এই যে, ইসলামী ও কোরআনী বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আকাশে উত্তোলন করার সময় তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি ছিল। অর্থাৎ তিনি যৌবনের প্রারম্ভিক কালে উত্তোলিত হয়েছেন। অতএব প্রৌঢ় বয়স—যাকে আরবীতে 'কহল' বলা হয়—তিনি এ জগতে সে বয়স পান নি। কাজেই প্রৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আবার এ জগতে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ কারণেই তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা বলা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার, তেমনি প্রৌঢ় বয়সে দুনিয়ায় ফিরে এসে কথাবার্তা বলাও হবে একটা অলৌকিক ব্যাপার।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾

(৪৭) তিনি বললেন, 'পরওয়ারদিগার ! কেমন করে আমার সন্তান হবে ; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি !' বললেন, 'এভাবেই'। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন—তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও'। অমনি তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হযরত মারইয়াম (আ) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা ! কিভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ কোন (পুরুষ) মানুষ (সহবাসছলে) আমাকে স্পর্শ করেনি ! (বৈধ পন্থায় পুরুষ ব্যতীত সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে না। অতএব আমি বুঝতে পারি না যে, শুধু আল্লাহ্র কুদরতে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, না আমাকে বিবাহের আদেশ দেওয়া হবে ?) আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদের মাধ্যমে উত্তরে) বললেন ঃ (পুরুষ ছাড়া) এমনিভাবেই হবে। (কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ কোন কিছু সৃষ্টির জন্য তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট—কোন মাধ্যম অথবা বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন তাঁর হয় না। তাঁর ইচ্ছার পন্থা এই যে) যখন কোন বস্তু পয়দা করতে চান, তখন তাকেবলেনঃ সৃষ্টি হয়ে যাও। এতেই (সে বস্তু অস্তিত্ব প্রাপ্ত) হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْۤ
اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ
كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ
وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ
فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

(৪৮) আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইনজীল। (৪৯) আর বনী ইসরাঈলদের জন্য রাসূল হিসাবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বলবেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়—আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই—যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৫০) আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা—তাঁর ইবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মারইয়াম! এ ভাগ্যবান সন্তানের ফযীলত হবে এই যে,) আল্লাহ্ তাকে (খোদায়ী) গ্রন্থ, গূঢ়তত্ত্ব এবং (বিশেষভাবে) তওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দেবেন, তাকে (সমগ্র) বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করে (এ বিষয়বস্তু দিয়ে) পাঠাবেন যে, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণসহ আগমন করেছি। তা এই যে, আমি তোমাদের (বিশ্বাস করার) জন্য কাদামাটি থেকে পাখির আকৃতির মত আকৃতি গঠন করি। অতঃপর এ (কৃত্রিম আকৃতির মধ্যে) ফুৎকার দেই। এতে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে (সত্যি সত্যি জীবিত) পাখি হয়ে যায়। (আরও মু'জিযা এই যে,) আমি জন্মান্ধ ও শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। (এগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় মু'জিযা।) তোমরা যা ভক্ষণ কর (অর্থাৎ ভক্ষণ করে আস) এবং স্বীয় গৃহে সংগ্রহ করে আস, আমি তা বলে দেই। (এটা চতুর্থ মু'জিযা) নিশ্চয় এগুলোর (উল্লেখিত মু'জিযাসমূহের) মধ্যে তোমাদের জন্য, (আমার নবী হওয়ার) যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যদি তোমরা ঈমান আনতে চাও। আর আমি ঐ গ্রন্থের সত্যায়ন করি, যা আমার পূর্বে (অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন তওরাতের। আমি এজন্য এসেছি, যাতে এমন কতিপয় বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করি, যা মূসা [আ]-এর শরীয়তে) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। (আমার শরীয়তে এগুলোর অবৈধতা রহিত হবে।) (আমার এ দাবি বিনা

প্রমাণে নয়; বরং আমি প্রমাণ করছি যে,) আমি তোমাদের কাছে (নবুয়তের) প্রমাণ নিয়ে এসেছি। (রহিতকরণের দাবিতে নবীর উক্তিই একটি প্রমাণ)। মোট কথা এই যে, (আমার নবী হওয়া যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন আমার শিক্ষা অনুযায়ী) তোমরা আল্লাহ্কে (নির্দেশ লংঘনের ব্যাপারে) ভয় কর এবং (ধর্মের ব্যাপারে) আমার অনুগত হও। (আমার ধর্মীয় শিক্ষার সারমর্ম এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা (এটা বিশ্বাসগত সার-নির্দেশ)। অতত্রব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। (এটা কর্মগত সার-নির্দেশ) এটাই সরল পথ। (এতে বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের সমাবেশ হয়েছে। এর দ্বারাই মুক্তি ও আল্লাহ্ প্রাপ্তি সম্ভব)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পাখির আকৃতি গঠন করা তথা চিত্রাঙ্কন করা হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়তে বৈধ ছিল। আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَا
رِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾
رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

(৫২) অতঃপর ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের কুফ্রী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন ঃ কারা আছে আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্য করবে ? সঙ্গী-সাথীরা বলল, আমরা রয়েছি আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। (৫৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত সুসংবাদের পর হযরত ঈসা (আ) তেমনিভাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং বনী ইসরাঈলের সাথে উল্লিখিত বিষয়বস্তু নিয়ে কথাবার্তা হয় এবং তিনি অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল তাঁর নবুয়ত অস্বীকার করে। অনন্তর যখন ঈসা (আ) তাদের মধ্যে অবিশ্বাস লক্ষ্য করলেন (এবং অবিশ্বাসের সাথে সাথে উপর্যুপরি নির্যাতনও ভোগ করলেন। তখন ঘটনাক্রমে কিছু লোক তাঁর মতাবলম্বী হয়ে যায়। তাঁরাই 'হাওয়ারী' নামে অভিহিত ছিল) তখন (হাওয়ারীদের) বললেন ঃ এমন কেউ আছে কি, যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে

(সত্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিপক্ষে) আমার সাহায্যকারী হবে (যাতে ধর্মের কাজে তারা আমার ওপর নির্যাতন চালাতে না পারে)? হাওয়ারীগণ বললো ঃ আমরাই আল্লাহ্‌র (ধর্মের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি (আপনার আহ্বান অনুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনি (এ বিষয়ের) সাক্ষী হোন যে, আমরা (আল্লাহ্ তা'আলার ও আপনার) অনুগত। (এরপর তারা অঙ্গীকারকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য মুনাজাতও করল যে,) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঐ সব বিষয়ের (অর্থাৎ বিধি-বিধানের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা আপনি অবতীর্ণ করেছেন এবং আমরা এ পয়গম্বরের অনুসরণ করি। তাই (আমাদের ঈমান কবুল করুন এবং) তাদের তালিকায় আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করুন, যারা উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সাক্ষী দেয় (অর্থাৎ পুরোপুরি মু'মিনের তালিকায়) আমাদের গণ্য করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ - حواری শব্দ حور ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অভিধানে এর অর্থ দেয়ালে চুনকাম করার চুন। পরিভাষায় হযরত ঈসা (আ)-এর খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী—তাঁদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তাঁরা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এ জন্য তাঁদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হতো; যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভক্ত ও সহচরগণের উপাধি ছিল সাহাবী।

কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে, আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র। (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের খোঁজ নিলেন এবং مَنْ اَنْصَارِىْ বললেন। এর আগে তিনি একা একাই নবুয়তের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি সূচনা থেকেই কোন সাহায্যকারী দল গঠন করার চিন্তা করেন নি। প্রয়োজন দেখা দিতেই দল গঠিত হয়ে যায়। বস্তুত জগতের সব কাজই এমনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতা চায়।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

(৫৪) এবং কাফিররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহ্ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী। (৫৫) আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেবো—কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (অর্থাৎ যারা তাঁর নবুয়ত অস্বীকার করেছিল, তাঁকে হত্যা ও নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে) গোপন কৌশল অবলম্বন করলো (সেমতে ষড়যন্ত্র ও কৌশলে তাঁকে গ্রেফতার করে শূলীতে চড়াতে উদ্যত হলো) এবং আল্লাহ্ তা'আলাও (তাঁকে নিরাপদ রাখার জন্য) গোপন কৌশল অবলম্বন করলেন। (তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলো না। কারণ আল্লাহ্ বিরোধীদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে হযরত ঈসা [আ]-এর আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিলেন এবং ঈসা [আ]-কে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। এতে তিনি বিপদমুক্ত হয়ে যান এবং রূপান্তরিত ইহুদীকে শূলে চড়ানো হয়। ইহুদীরা আজ পর্যন্ত এ গোপন কৌশলের কথা জানতেই পারেনি, প্রতিরোধের সামর্থ্য হওয়া তো দূরের কথা) আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (কারণ অন্যদের কৌশল দুর্বল ও মন্দ এবং অস্থানেও প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র কৌশল মজবুত, উত্তম ও হেকমত অনুযায়ী হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ কৌশল তখন অবলম্বন করলেন,) যখন তিনি (গ্রেফতারের সময় ঈসা [আ]-কে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখে) বললেনঃ হে ঈসা (চিন্তা করো না), নিশ্চয় আমি তোমাকে (প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায়) মৃত্যুদান করব (সুতরাং স্বাভাবিক মৃত্যুই যখন তোমার বিধিলিপি, তখন নিশ্চিতই শত্রুর হাতে শূলে নিহত হওয়া থেকে তুমি নিরাপদ থাকবে। আপাতত) আমি তোমাকে (ঊর্ধ্বলোকের দিকে) উঠিয়ে নেব, তোমাকে অবিশ্বাসীদের অপবাদ থেকে পবিত্র করব এবং যারা তোমাদের অনুসরণ করবে, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপরে জয়ী রাখব। (যদিও বর্তমানে অবিশ্বাসীরাই প্রবল ও শক্তিশালী।) অতঃপর (যখন কিয়ামত আসবে,) তখন (দুনিয়া ও বরযখ থেকে) আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। আমি (তখন) তোমাদের (সবার) মধ্যে (কার্যত) ঐ সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেব, যাতে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করতে (তন্মধ্যে ঈসার ব্যাপারটি অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন ফিরকার লোকেরা আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃতি সাধন করে হযরত ঈসা (আ)-এর হায়াত এবং আখেরী যমানায় তাঁর পুনরাগমন সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ভুল প্রমাণে সচেষ্ট রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দাবলীর পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ —আরবী ভাষায় 'মকর' শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে 'মকর' ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে পারে। এ কারণেই ولايحيق المكر السيئ আয়াতে مكر শব্দের সাথে سيئ (মন্দ) যোগ করা হয়েছে। উর্দু ভাষার বাচনভঙ্গিতে 'মকর' শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্‌কে 'শ্রেষ্ঠতম কৌশলী' خير الماكرين বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্‌র কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাহদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।-(তফসীরে-উসমানী)

إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ - متوفى শব্দের ধাতু توفى এবং মূল ধাতু وفى অভিধানে এর আসল অর্থ পুরোপুরি লওয়া। وفاء - ايفاء ও استيفاء এসব শব্দেরও আসল অর্থ পুরোপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান-গ্রন্থ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে নেয় এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণে রূপক শব্দটি মৃত্যুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কোরআনে এ অর্থেও توفى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে-

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا

—আল্লাহ্‌ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু এখনও আসেনি, তাদের নিদ্রার সময় প্রাণ নিয়ে নেন।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া 'আল-জওয়াবুস সহীহ্‌' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

التوفى فى لغة العرب معناه القبض والاستيفاء وذلك ثلثة انواع احدها التوفى فى النوم و الثانى توفى الموت والثالث توفى الروح والبدن جميعًا-

কুল্লিয়্যাত আবুল বাকায় বলা হয়েছে ঃ

التوفى الاماتة وقبض الروح وعليه استعمال العامّة اوالاستيفاء واخذا لحق وعليه استعمال البلغاء-

এসব কারণে আয়াতে তফসীরবিদগণ متوفى শব্দের অনুবাদ করেছেন পুরোপুরি লওয়া। তরজমা শায়খুল হিন্দে তাই করা হয়েছে। এ অনুবাদের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে এই যে, আমি আপনাকে ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দেবো না; বরং আমি নিজেই নিয়ে নেবো। অর্থাৎ আকাশে উঠিয়ে নেবো।

কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মৃত্যুদান করা। বয়ানুল-কোরআনের সার-ব্যাখ্যা তাই উল্লিখিত হয়েছে। এ অর্থ সুপ্রসিদ্ধ তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বর্ণিত আছে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ ইহুদীরা যখন ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্য দু'টি কথা বলেন ঃ প্রথম, আপনার মৃত্যু তাদের হাতে হত্যার আকারে হবে না ; বরং স্বাভাবিক মৃত্যুর আকারে হবে। দ্বিতীয়, আপাতত তাদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেবো। এটিই হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর।

দুর্‌রে-মনসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اخرج اسحاق بن بشرو ابن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى انى متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك فى اخرالزمان- (درمنثور-ص٣٦ج٢)

অর্থাৎ হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন متوفيك ورافعك -এর অর্থ, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যমানায় স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব।

এ তফসীরের সারমর্ম এই যে, توفى শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দে رافعك প্রথমে ও متوفيك পরে হবে। এখানে متوفيك -কে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে উঠিয়ে নেওয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জিযা, ঈসা (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্ব লাভ এবং খৃস্টানদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা (আ) অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ্ তা'আলার মতই চিরঞ্জীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে متوفيك বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যিকথা এই যে, কাফির ও মুশরিকরা চিরকালই পয়গম্বরগণের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলারও চিরাচরিত নীতি ছিল এই যে, যখন কোন জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জিযা দেখার পরও অস্বীকার ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী আযাব পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, যেমন আদ, সামুদ এবং সালেহ্ ও লূত পয়গম্বরের কওমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা পয়গম্বরকেই কাফিরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত মূসা (আ) মিসর থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরত ছিল—তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জয়লাভ করবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো কেন ? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতই। অর্থাৎ আদম (আ) যেমন সাধারণ সৃষ্ট জীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি ঈসা (আ)-এর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বছর পর জগতে পুনরাগমনের পরে হবে। সুতরাং তাঁর হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্ময়কর পন্থায় হয়, তবে তাতে আশ্চর্য কি ?

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খৃস্টানরা ভ্রান্ত বিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মধ্যেই তাঁর বন্দেগী, খোদায়ী নির্দেশের আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কোরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আকাশে উত্থিত করার ফলে তাদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেতো। তাই متوفيك শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদীদের মতের খণ্ডন। কারণ তারা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে ও শূলে চড়াতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন। কিন্তু শব্দ আগেপিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খৃস্টানদের বিশ্বাসও খণ্ডন হয়ে গেছে যে, ঈসা (আ) খোদা নন যে, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। এক সময় তাঁরও মৃত্যু হবে।

ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে বলেন ঃ কোরআন মজীদে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগেপিছে করার ভূরি ভূরি নজির বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অগ্রে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে।–(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃ.)

وَرَافِعُكَ اِلَيَّ—এতে বাহ্যত ঈসা (আ)-কেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয় ; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বোঝা একেবারেই ভ্রান্তি। তবে একথা ঠিক যে, رفع শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- رَفَعَ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ এবং فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এটা জানা কথা যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে رفع শব্দটির ব্যবহার একটি রূপক ব্যবহার । উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বোঝার কোন কারণ নেই।

এ ছাড়া আয়াতে رفع শব্দের সাথে الى ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা

সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে رَافِعُكَ اِلَيَّ এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদীরা নিশ্চিতই হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। 'নিজের কাছে তুলে নেওয়া' সশরীরে তুলে নেওয়াকেই বলা হয়।

ঈসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্র পাঁচটি অঙ্গীকার ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন।

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁর মৃত্যু ইহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না, বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কিয়ামতের নিকটতম যমানায় আসবে। তখন ঈসা (আ) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আ)-কে আপাতত উর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়। সূরা নিসার আয়াতে এ অঙ্গীকার পূরণের সংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ নিশ্চিতই ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে। وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী (সা) আগমন করে ইহুদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণত পিতা ব্যতিরেকে জন্মগহণ করার কারণে ইহুদীরা ঈসা (আ)-এর জন্ম বিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। কোরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ আরো বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইহুদীরা ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবি করার অভিযোগও এনেছিল। কোরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা (আ)-এর বন্দেগী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্গীকার وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খৃস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মুসলমানরাও ঈসা (আ)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা (আ)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার ওপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হযরত ঈসা (আ)-এর অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খৃস্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখিরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার

শুধু হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়তের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের বিপক্ষে খৃস্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এই অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির বিপক্ষে খৃস্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র ঃ ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ প্রথমত এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খৃস্টানদের একটি সামরিক ছাউনি ছাড়া কিছুই নয়। তারা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত। এ কারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইহুদী-ইসরাঈলের এ রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ধরেও নেওয়া হয়, তবুও খৃস্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি অপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্য ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ স্বয়ং ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহেই দেওয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামী রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না।

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কিয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

হযরত ঈসা (আ)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন ঃ জগতে একমাত্র ইহুদীরাই একথা বলে যে, ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। কোরআনে সূরা নিসার আয়াতে তাদের এ ধারণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-এর শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যেসব ইহুদী তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গৃহে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসা (আ)-এর ন্যায় করে দেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ —তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

সূরা নিসায় এ ঘটনার আরও বিবরণ আসবে। খৃস্টানদের বক্তব্য এই যে, ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে গেছেন; কিন্তু পুনর্বার তাঁকে জীবিত করে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাও খণ্ডন করে বলে যে, নিজের লোকদেরকে হত্যা করে ইহুদীদের আনন্দ উল্লাস করতে দেখে খৃস্টানরাও ধোঁকা খেয়ে যায় যে, নিহত ব্যক্তি ঈসা (আ)-ই। অতএব ইহুদীদের ন্যায় তারাও شُبِّهَ لَهُمْ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলীতে চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান আছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন; অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

এ বিশ্বাসের ওপর মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হজর 'তালখীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

হাফেয ইবনে-কাসীর সূরা আহযাবের وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ আয়াতের তফসীরে লিখেন ঃ

وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا...

অর্থাৎ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসসমূহ 'মুতাওয়াতির' যে, তিনি কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা হিসাবে অবতরণের সংবাদ দিয়েছেন।

এখানে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ বিষয়ে চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা এই যে, সূরা আলে-ইমরানের একাদশতম রুকূতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, নূহ্, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুকূ ও বাইশ আয়াতে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কোরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হযরত ঈসা (আ)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তাঁর নাম, তাঁর লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা (আ)-এর জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা (আ)-এর বাকশক্তি প্রাপ্ত হওয়া, যৌবনে পদার্পণ করা, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদীদের ষড়যন্ত্রজাল, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়া ইত্যাদি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তাঁর আরও গুণাবলী, আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআন ও হাদীসে কোন পয়গম্বরের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়েই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন এবং কোন্ রহস্যের কারণে করা হয়েছে?

সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম (সা) হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আগমন করবেন না। এ কারণে তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই

একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমেও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাদের অনুসরণ করতে জোর তাকীদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতি সাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদেরও পরিচয় বলেছেন।

পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে মসীহ্— দাজ্জাল। তার ফিত্নাই হবে অধিকতর বিভ্রান্তিকর। হযরত নবী করীম (সা) তার এত বেশি হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের ফিত্নার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল-হত্যার জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। এ কারণে তাঁর জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁর অবতরণের সময় তাঁকে চিনে নেওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তাঁর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন ?

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আ) সে সময় নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না ; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুয়তের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন ঐ প্রাদেশিক শাসকের মত, যিনি নিজ প্রদেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজনবশত অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসাবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোট কথা এই যে, হযরত ঈসা (আ) তখনও নবুয়ত ও রিসালাতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে অস্বীকার করা পূর্বে যেরূপ কুফর ছিল, তখনও কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায়—যারা কোরআনী নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী—যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না পারে তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাই তাঁর গুণাবলী ও লক্ষণাদি অধিক পরিমাণে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়, ঈসা (আ)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপ দাবি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্ ঈসা ইবনে মারইয়াম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। উদাহরণত হিন্দুস্থানে এক সময় মির্যা কাদিয়ানী দাবি করে বসে যে সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনালেখ্য ও গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা কিয়ামতের পূর্বক্ষণে স্বয়ং তাঁর অবতরণ ও পুনর্বার জগতে আগমনের সংবাদ দিচ্ছে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

(৫৬) অতএব যারা কাফির হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখিরাতে—তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (৫৮) আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই এ সমস্ত আয়াত এবং নিশ্চিত বর্ণনা।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ আমি কিয়ামতের দিন মতবিরোধকারীদের মধ্যে কার্যত মীমাংসা করে দেবো। আলোচ্য আয়াতে এ মীমাংসাই বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মীমাংসার) বিবরণ এই যে, (এসব মতবিরোধকারীর মধ্যে) যারা কাফির ছিল, তাদের (কুফরের কারণে) কঠোর শাস্তি দেব (উভয় জাহানে) দুনিয়াতেও (যা হয়ে গেছে) এবং পরকালেও (যা হবে)। তাদের কোন সাহায্যকারী (পক্ষ গ্রহণকারী) হবে না। আর যারা ঈমানদার ছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (ঈমান ও সৎকর্মের) পুরস্কার দিবেন। (কাফিরদের শাস্তিদানের কারণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা এমন অত্যাচারীদের ভালবাসেন না (যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পয়গম্বরগণের প্রতি অবিশ্বাসী। অর্থাৎ অবিশ্বাস করা একটি বিরাট অত্যাচার—যা ক্ষমার অযোগ্য। তাই কোপে পতিত হয়ে শাস্তি লাভ করবে)। এ বিষয়টি (বর্ণিত কাহিনী) আমি আপনাকে (ওহীর সাহায্যে) পাঠ করে করে শোনাই—যা (আপনার নবুয়তের নিদর্শনাবলীর) অন্যতম নিদর্শন এবং অন্যতম রহস্যের বিষয়বস্তু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিপদাপদ মু'মিনদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঃ فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ —এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তা এই যে, কিয়ামতের

মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব ? কারণ তখন তো ইহকালের শাস্তি হবেই না।

এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তির মতই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত হয়ে মোট দুই বছর সাজা হবে।

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ বোঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে অর্থাৎ ইহকালের সাজা পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের ওপর কোন বিপদাপদ এলে গোনাহ্ মাফ হয় এবং পরকালের দণ্ড লঘু অথবা রহিত হয়। সে কারণেই لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহ্‌র প্রিয়। প্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাফিররা কুফরের কারণে আল্লাহ্‌র ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না।-(বয়ানুল কোরআন)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن
فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ
فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ
إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

(৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলেছিলেন—হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। (৬০) যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। (৬১) অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাবার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল ঃ "এসো, আমরা ডেকে নিই

আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত করি, যারা মিথ্যাবাদী।" (৬২) নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ। আর এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আর আল্লাহ্; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ। (৬৩) তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ্ জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ)-এর বিস্ময়কর অবস্থা আল্লাহ্র কাছে (অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে) হযরত আদম (আ)-এর (বিস্ময়কর অবস্থার) অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। এবং তাকে (অর্থাৎ আদমের কাঠামোকে) আদেশ করেছেন ঃ (প্রাণী) হয়ে যা। এতে সে (প্রাণী) হয়ে গেল। এ বাস্তব ঘটনা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (বর্ণিত হয়েছে)। অতএব, আপনি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। অনন্তর আপনার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও ঈসা (আ) সম্পর্কে কেউ আপনার সাথে বাদানুবাদ করলে আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ (আচ্ছা, যদি যুক্তি-প্রমাণে কাজ না হয়, তবে) এস আমরা (ও তোমরা) ডেকে নিই আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং স্বয়ং আমাদের ও তোমাদের। অতঃপর আমরা (সবাই মিলে মনেপ্রাণে) প্রার্থনা করি যে, (এ আলোচনায়) যারা অসত্যপন্থী, তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত হোক। নিশ্চয় এটাই (অর্থাৎ যা বর্ণিত হয়েছে) সত্য বিবরণ। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই (এটা সত্তাগত তওহীদ)। আল্লাহ্ তা'আলাই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ (এটা গুণগত তওহীদ)। অতঃপর (এ সব প্রমাণের পরেও) যদি (সত্য গ্রহণে) তারা বিমুখ হয়, তবে (আপনি তাদের বিষয়টি আল্লাহ্র দরবারে সমর্পণ করুন। কেননা,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়াসের প্রামাণ্যতা ঃ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরীয়তসম্মত প্রমাণ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ ঈসা (আ)-এর জন্ম আদমের জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ আদম (আ)-কে যেমন জনক (ও জননী) ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা (আ)-কেও তদ্রূপ জনক ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-এর সৃষ্টিকে আদম (আ)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।—(মাযহারী)

মুবাহালার সংজ্ঞা ঃ......فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সংজ্ঞা এই ঃ যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্র

কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়ার মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সে সময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্র করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্র করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

মুবাহালার ঘটনা ঃ এর পটভূমিকা এই যে, মহানবী (সা) নাজরানের খৃস্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ (১) ইসলাম কবূল কর, (২) অথবা জিযিয়া কর দাও, (৩) অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। খৃস্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহ্বিল, আবদুল্লাহ্ ইবনে শোরাহ্বিল ও জিবার ইবনে ফয়েযকে হুযূর (সা)-এর কাছে প্রেরণ করে। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রাসূলে করীম (সা) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার প্রতি আহ্বান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আলী (রা) এবং ইমাম হাসান (রা) ও হোসাইন (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবিল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকে ঃ তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহ্র নবী। আল্লাহ্র নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল ঃ তোমার মতে মুক্তির উপায় কি ? সে বলল ঃ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী (সা) তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। —(ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড)

আলোচ্য আয়াতে اَبْنَاءَنَا শব্দের অর্থ শুধু ঔরসজাত সন্তানই নয়, বরং ঔরসজাত সন্তান এবং সন্তানের সন্তানও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ সাধারণ পরিভাষায় এদের সবাইকে সন্তানই বলা হয়। সেমতে اَبْنَاءَنَا শব্দের মধ্যেই মহানবী (সা)-এর প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয় ইমাম হাসান (রা) ও হোসাইন (রা) এবং হযরত আলী (রা) অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত হযরত আলী (রা)-কে اَبْنَاءَنَا-এর অন্তর্ভুক্ত করা এ কারণেও শুদ্ধ যে, তিনি হযরত (সা)-এর কোলেই লালিত-পালিত হয়েছেন। তিনি সন্তানের মতই তাঁকে লালন-পালন করেন। এরূপ পালিত শিশুকেও সাধারণ পরিভাষায় সন্তান বলা হয়।

এ বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে, হযরত আলী (রা) আওলাদ তথা সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাফেযী সম্প্রদায় তাঁকে ابناءنا থেকে বহিষ্কার করে انفسنا-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং এর দ্বারা হযরত (সা)-এর পরেই তাঁর খিলাফত প্রমাণ করে। উপরোক্ত বর্ণনাদৃষ্টে রাফেযীদের এ যুক্তি শুদ্ধ নয়।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) বলুন ঃ "হে আহ্‌লে-কিতাবগণ ! একটি বিষয়ের দিকে আস—যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কেউ কাউকে পালনকর্তা বানাব না।" তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক, আমরা তো অনুগত !'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ [সা]) আপনি বলে দিন ঃ হে আহ্‌লে কিতাবগণ ! তোমরা এমন একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান (ভাবে স্বীকৃত)। তা এই যে, আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কারও ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবে না। অতঃপর যদি (এর পরেও) তারা (সত্য থেকে) বিমুখ হয়, তবে তোমরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) বলে দাও ঃ তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (এ বিষয়ের) অনুগত (তোমরা অনুগত না হলে তোমরা জান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তবলীগের মূলনীতি ঃ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এ আয়াত থেকে তবলীগ ও ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্নমতাবলম্বী কোন দলকে ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথম তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহ্বান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি। আমন্ত্রণ লিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى-اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم اليريسيين - يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان

لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله - (البخارى)

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি—যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাই। মুসলমান হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন তবে আপনার প্রজা-সাধারণের গোনাহ্ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহলে-কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে অংশীদার করবো না এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে একে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না।

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ—এ আয়াতে 'সাক্ষী থাক' বলে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যুক্তি-প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পরেও সত্যকে স্বীকার না করলে স্বীয় মতাদর্শ প্রকাশ করে বিতর্কে ইতি টানা উচিত—অধিক আলোচনা ও কথা কাটাকাটি সমীচীন নয়।

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ
إِلَّا مِنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ
فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ
وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا
وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ
وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

(৬৫) হে আহলে কিতাবগণ ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তওরাত ও ইন্‌জীল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না ? (৬৬) শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ ? আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং

তোমরা জ্ঞাত নও। (৬৭) ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম—আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মু'মিনদের বন্ধু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহলে কিতাবগণ ! (হযরত) ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে কেন বাদানুবাদ কর (যে, তিনি ইহুদী মতাবলম্বী ছিলেন অথবা খৃস্টীয় মতাবলম্বী ছিলেন) ? অথচ তওরাত ও ইনজীল তাঁর (আমলের) পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। [এ উভয় ধর্মমত এ দুটি ধর্মগ্রন্থ অবতরণের পর থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্ব থেকে এদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীম (আ) এ দুই ধর্মমতের যেকোন একটি কিরূপে অবলম্বন করতে পারেন ? এমন যে নির্বোধ কথাবার্তা বল,] তোমরা কি কিছুই বুঝ না ? তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে বাদানুবাদ করেছ (যদিও তাতে একটি ভ্রান্ত উক্তি সংযোজন করে তার মধ্য থেকে ভ্রান্ত ফলাফল বের করেছিলে। অর্থাৎ তোমরা ঈসা [আ]-এর অলৌকিক কার্যাবলী সম্পর্কে দাবি করতে যে, এগুলো বাস্তবের অনুরূপ। কিন্তু এর সাথে একটি ভ্রান্ত বাক্যও সংযোজিত করে বলতে যে, এরূপ অলৌকিক কার্যাবলীর অধিকারী ব্যক্তি উপাস্য হবে কিংবা উপাস্যের পুত্র হবে। এতে একটি সন্দেহযুক্ত বাক্য থাকার কারণে একে অসম্পূর্ণ জ্ঞান বলাই যথার্থ হবে ; এতে যখন তোমাদের ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে,) অতএব যে বিষয়ে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন বাদানুবাদ করছ ? (কেননা, এরূপ দাবি করার পক্ষে সন্দেহের উদ্রেক করে, এমন কোন উপকরণও তোমাদের কাছে নেই। কারণ তোমাদের মধ্যেও ইবরাহীম [আ]-এর শরীয়তে প্রচলিত বিধি-বিধানের কোনরূপ মিল নেই)। আল্লাহ্ তা'আলা (ইবরাহীম [আ]-এর ধর্মমত) জানেন, তোমরা জান না। (এখন আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর ধর্মমত শুনে নাও যে,) ইবরাহীম (আ) ইহুদী ছিলেন না এবং খৃস্টানও ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন অভ্রান্ত সরল পথের অনুসারী (অর্থাৎ) মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (অতএব, ধর্মমতের দিক দিয়ে তাঁর সাথে ইহুদী ও খৃস্টানদের কোনই সম্পর্ক নেই ; তবে) নিশ্চয় ইবরাহীম (আ)-এর সাথে অধিক সম্পর্কশীল তারা, যারা সে সময়ে তাঁর অনুসরণ করেছিল, অতঃপর এ নবী (মুহাম্মদ [সা] ও মু'মিনগণ যারা মুহাম্মদ [সা]-এর উম্মত)। আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক (অর্থাৎ তাদের ঈমানের প্রতিদান দেবেন)।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا

يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ

تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

(৬৯) কোন কোন আহলে-কিতাবের আকাঙ্ক্ষা, যাতে তোমাদের গোমরাহ্ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ্ করে না। অথচ তারা বুঝতে পারে না। (৭০) হে আহলে-কিতাবগণ ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তাঁর প্রবক্তা ? (৭১) হে আহলে-কিতাবগণ ! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আহলে-কিতাবদের মধ্যে একদল লোক মনেপ্রাণে কামনা করে যাতে (সত্য ধর্ম থেকে) তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে। তারা পথভ্রষ্ট করতে তো পারবেই না ; বরঞ্চ নিজকেই (পথভ্রষ্ট করার দুর্ভাগ্যে জড়িত করছে) ; কিন্তু তারা বুঝছে না। হে আহলে-কিতাবগণ ! তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলার (ঐ) নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ, (যা তওরাত ও ইন্‌জীলে মুহাম্মদ [সা]-এর নবুয়ত প্রমাণ করে। কেননা তাঁর নবুয়ত স্বীকার না করার অর্থ এ সব নিদর্শনকে মিথ্যা বলা। এটাই কুফরী তথা অবিশ্বাস করা)। অথচ তোমরা (নিজ মুখে) স্বীকারোক্তি করে থাক যে, সেসব নিদর্শন সত্য। (পরবর্তী আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে ভর্ৎসনা করে বলেন) ঃ হে আহলে-কিতাবগণ ! তোমরা কেন সত্য (বিষয়কে অর্থাৎ মুহাম্মদ [সা]-এর নবুয়তকে) মিথ্যার সাথে (অর্থাৎ বিকৃত বাক্যাবলী অথবা ভ্রান্ত ব্যাখ্যার সাথে) সংমিশ্রিত করছ এবং (কেন) সত্যকে গোপন করছ ? অথচ তোমরা জান (যে, প্রকৃত সত্য তোমরা গোপন করে চলেছ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ও اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, তারা সত্যের স্বীকারোক্তি না করলে অথবা তাদের জানা না থাকলে অবিশ্বাস করা বৈধ হবে। কারণ এই যে, কুফরী তথা অবিশ্বাস এমনিতেই একটি মন্দ কাজ। এটা সর্বাবস্থায় অবৈধ। তবে জানা স্বীকারোক্তির পর কুফর করলে তা অধিকতর তিরস্কার ও ধিক্কারের যোগ্য।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْۤا اِلَّا لِمَنْ

تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰۤى اَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۴﴾

(৭২) আর আহলে কিতাবগণের একদল বললো, মুসলমানগণের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (৭৩) যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন, নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ্ করেন। আর এ সব কিছু এ জন্য যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের ওপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আহ্লে-কিতাবদের কিছু লোক (পারস্পরিক পরামর্শক্রমে) বললো ঃ (মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার একটি কৌশল আছে ; তা হলো এই যে, রাসূল [সা]-এর মাধ্যমে) মুসলমানদের প্রতি যে গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি দিনের শুরুতে (অর্থাৎ সকাল বেলায়) বিশ্বাস স্থাপন কর এবং দিনের শেষে (অর্থাৎ অপরাহ্নে) অবিশ্বাস করে বস। হতে পারে (এ কৌশলের ফলে কোরআন ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে এবং) তারা (স্বীয় ধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে। (তারা মনে করবে যে, এরা বিদ্বান—তদুপরি বিদ্বেষমুক্ত, নতুবা ইসলাম গ্রহণ করতো না—তা সত্ত্বেও তারা যখন ইসলাম ত্যাগ করেছে, তখন নিশ্চয়ই কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই করেছে। এখন তারা ইসলামে কোন দোষ দেখেই তা ত্যাগ করেছে। আহলে-কিতাবগণ পরস্পর আরও বললো ঃ তোমরা মুসলমানদের দেখানোর উদ্দেশ্যে শুধু বাহ্যিক বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আন্তরিকতার সাথে) কারও সামনে (এ ধর্মের) স্বীকারোক্তি করবে না। তবে যে ব্যক্তি তোমাদের ধর্মের অনুসারী হয়, (তার সামনে আন্তরিকভাবে নিজেদের ধর্মের স্বীকারোক্তি করা দরকার। কিন্তু মুসলমানদের সামনে মৌখিক স্বীকারোক্তি করে নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কৌশলের ব্যর্থতা প্রকাশ করে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ!) বলে দিন, (এ সব চালাকিতে কিছুই হবে না। কারণ) নিশ্চয় (বান্দাদের যে) হেদায়েত, (তা)

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়েত (হয়ে থাকে)। সুতরাং হেদায়েত যখন আল্লাহ্‌র করায়ত্ত, (তখন তিনি যাকে হেদায়েতের ওপর কায়েম রাখতে চাইবেন, তাকে কেউ কৌশলে বিচ্যুত করতে পারবে না। পরবর্তী আয়াতে তাদের এ পরামর্শ ও কৌশলের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হে আহলে-কিতাবগণ ! তোমরা এ কারণে এসব কথাবার্তা বলছ যে,) অন্য কেউ এমন বস্তু লাভ করছে, যা তোমরা লাভ করেছিলে (অর্থাৎ খোদায়ী গ্রন্থ ও খোদায়ী ধর্ম। অথবা সে তোমাদের পালনকর্তার সম্মুখে তোমাদের বিপক্ষে জয়ী হয়ে যাবে। সার কথা এই যে, মুসলমানরা খোদায়ী গ্রন্থ লাভ করেছে–এ জন্য তোমরা তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ অথবা তারা ধর্মীয় বিতর্কে তোমাদের বিপক্ষে কেন জয়ী হয়ে যায়, এ হিংসার কারণে তোমরা ইসলাম ও মুসলমানদের অবনতির জন্য সচেষ্ট থাকছ। পরবর্তী আয়াতে এ হিংসা খণ্ডন করা হয়েছে। হে মুহাম্মদ !) বলে দিন ঃ গৌরব আল্লাহ্ তা'আলারই করায়ত্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ্ খুবই প্রাচুর্যময়, (তাঁর কাছে গৌরবের অভাব নেই,) অত্যন্ত জ্ঞানী (কখন কাকে দিতে হবে, তা জানেন)। তিনি স্বীয় করুণার (ও গৌরবের) সাথে যাকে ইচ্ছা তা নির্দিষ্ট করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা মহান গৌরবশালী। (এখন অভিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় করুণা ও গৌরব মুসলমানদের দান করেছেন। এতে হিংসা করা অনর্থক)।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

---

(৭৫) কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে! এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনেশুনেই মিথ্যা বলে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করা, সত্য ও মিথ্যাকে সংমিশ্রিত করা, সত্য গোপন করা এবং মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার কৌশল উদ্ভাবন করা।

আলোচ্য আয়াতে তাদের অর্থ-সম্পদে বিশ্বাসঘাতকতার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক আমানতদারও ছিল। এ কারণে তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আহলে-কিতাবদের কেউ কেউ এমন যে, যদি তুমি তার কাছে রাশি রাশি ধনও গচ্ছিত রাখ, তবে সে (চাওয়া মাত্র) তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে। আবার তাদের কেউ কেউ এমন যে, যদি তুমি তার কাছে একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ, তবে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে না (বরং আমানত রাখার কথাই স্বীকার করবে না)—যে পর্যন্ত তুমি (আমানত রেখে) তার মাথার ওপর (সব সময়) দণ্ডায়মান না থাক। (দণ্ডয়মান থাকা পর্যন্ত অস্বীকার বরবে না, কিন্তু একটু সরে গেলেই প্রত্যর্পণ করা তো দূরের কথা, আমানতই অস্বীকার করে বসবে)। এটা (গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করা) এ কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের ওপর আহলে-কিতাবভুক্তদের ছাড়া অন্যদের (অর্থ) সম্পদ (গোপনে) গ্রহণ করলে (ধর্মত) কোন অভিযোগ নেই (অর্থাৎ কিতাবী ধর্ম-বহির্ভূত—যেমন কুরায়শদের অর্থ-সম্পদ চুরি করা অথবা ছিনিয়ে নেওয়া সবই বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে তাদের এ দাবিকে মিথ্যা বলছেন) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (যে, এ কাজটি হালাল)। অথচ মনে মনে তারাও জানে (যে, আল্লাহ্ এ কাজকে হালাল করেন নি ; বরং এটা তাদের মনগড়া দাবি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অমুসলমানের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করা বৈধ ঃ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ আয়াতে কিছুসংখ্যক লোকের আমানতে বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে "কিছুসংখ্যক লোক" বলে যদি ঐসব আহলে-কিতাবকে বোঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহলে-কিতাব বোঝানো হয়ে থাকে, যারা অমুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফিরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি ?

উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বোঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফিরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে এবং আখিরাতে শাস্তি হ্রাসের আকারে পাবে।

এই বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদ্‌গুণাবলীরও প্রশংসা করে।

اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا—এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রমাণ করেছেন যে, ঋণদাতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার পিছু লেগে থাকার অধিকার তার রয়েছে। —(কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

(৭৬) হ্যাঁ, যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহিযগার হবে, তাহলে আল্লাহ্ পরহিযগারদেরকে ভালবাসেন। (৭৭) যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

যোগসূত্র ঃ পূর্বের আয়াতে ويقـولون থেকে আহ্লে-কিতাবদের দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে একেই জোরদার করা হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অঙ্গীকার পালনের ফযীলত বর্ণনা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে) অভিযোগ কেন হবে না; (অবশ্যই হবে। কেননা তাদের সম্পর্কে আমার দু'টি আইন রয়েছে। এক ঃ) যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার (আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হোক কিংবা তাঁর সৃষ্টির সাথে হোক) পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ (এমন) আল্লাহভীরুদের পছন্দ করেন। (দুই) নিশ্চয় যারা ঐ অঙ্গীকারের বিনিময়ে মূল্য (জাগতিক উপকার) গ্রহণ করে, যা (তারা) আল্লাহ্র সাথে করেছে। (উদাহরণত পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা) এবং স্বীয় শপথের বিনিময়ে (উদাহরণত বান্দার হক ও লেনদেনের ব্যাপারে শপথ করা) পরকালে তাদের কোন অংশ (সেখানকার নিয়ামতের মধ্যে) নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে (অনুকম্পাসূচক) কথাবার্তা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) দেখবেন না এবং কিয়ামতের দিন (পাপ থেকে) তাদের মুক্ত করবেন না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ঃ উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্য জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত।

কোরআন ও সুন্নাহ্য় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত ৭৭তম আয়াতেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

১. জান্নাতের নিয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের অধিকার নষ্ট করে, সে নিজের জন্য দোযখের শাস্তিকে অপরিহার্য করে নেয়। বর্ণনাকারী আরয করলেন ঃ যদি বিষয়টি সামান্য হয় তবুও কি দোযখ অপরিহার্য হবে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তা গাছের একটা তাজা ডালই হোক না কেন।—(মুসলিম)

২. আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না।

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।

৪. আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ মার্জনা করেন না।

৫. তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبّٰنِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

(৭৮) আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করেছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহ্র তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটা

আল্লাহ্‌রই কথা, অথচ তা আল্লাহ্‌র কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্‌রই প্রতি মিথ্যারোপ করে। (৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'—এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শেখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।' (৮০) তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় তাদের মধ্যে আছে, যারা স্বীয় জিহ্‌বাকে বাঁকিয়ে গ্রন্থ পাঠ করে (অর্থাৎ এতে কোন শব্দ অথবা ভ্রান্ত তফসীর যুক্ত করে দেয়। সাধারণত ভুল পাঠকারীকে বক্রভাষী বলা হয়)—যাতে তোমরা (যারা শোন) একেও (অর্থাৎ যা সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকেও) গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ তা গ্রন্থের অংশ নয় এবং (শুধু ধোঁকা দেওয়ার জন্য এ পন্থাকেই যথেষ্ট মনে করে না। বরং মুখেও) বলে যে, এটা (শব্দ অথবা তফসীর) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (যে শব্দ ও নিয়ম-কানুন অবতীর্ণ হয়েছে, তা দ্বারা প্রমাণিত)। অথচ তা (কোনরূপেই) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। (সুতরাং তা মিথ্যা। পরবর্তী আয়াতে আরও জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে), তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তারা (যে মিথ্যাবাদী, তা তারাও মনে মনে) জানে। কোন মানবের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ (তো) তাকে গ্রন্থ, (ধর্মের) জ্ঞান এবং নবুয়ত দান করবেন, (এদের প্রত্যেকটির দাবি হচ্ছে কুফর ও শিরককে বাধা দান) আর সে মানুষকে বলবে ঃ আমার বান্দা (অর্থাৎ ইবাদতকারী) হয়ে যাও আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ তাঁর একত্ববাদকে) ছেড়ে। (অর্থাৎ নবুয়ত ও শিরকের প্রতি প্ররোচনা দানে একত্রিত হওয়া অসম্ভব)। কিন্তু (সেই নবী একথা বলবেন যে) তোমরা আল্লাহ্-ভক্ত হয়ে যাও (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর)। কারণ, তোমরা খোদায়ী গ্রন্থ (অন্যকেও) শিক্ষা দাও এবং (নিজেরাও) পাঠ কর (এতে একত্ববাদের শিক্ষা রয়েছে)। আর সেই নবুয়তের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি একথা আদেশ করবেন না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে ও পয়গম্বরগণকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমরা (এ বিশেষ বিশ্বাসে বাস্তবে অথবা স্বীয় দাবিতে) মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদের কুফরী করার কথা বলতে পারে ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার একটি যুক্তি ঃ مَا كَانَ لِبَشَرٍ নাজরানের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী ও খৃস্টান বলেছিল ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার তেমনি উপাসনা করি, যেমন খৃস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের উপাসনা করে ? হযরত (সা) বলেছিলেন ঃ (মাআযাল্লাহ্) এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করি অথবা অপরকে এর প্রতি আহবান জানাই ? আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ

উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন নি। এ কথোপকথনের পরই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মানবকে কিতাব, হিকমত ও পয়গম্বরের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে সরিয়ে স্বয়ং নিজের অথবা অন্য সৃষ্ট জীবের দাসে পরিণত করার চেষ্টা পয়গম্বরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এর অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ যাকে যে পদের যোগ্য মনে করে প্রেরণ করেন, সে বাস্তবে সেই কাজের যোগ্য নয়। জগতের কোন সরকার কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করার পূর্বে দুটি বিষয় চিন্তা করে নেয় ঃ

(১) লোকটি সরকারের নীতি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে কি না ?

(২) সরকারী আদেশ পালন ও জনগণকে সরকারের আনুগত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তার কাছ থেকে কতটুকু দায়িত্ববোধ আশা করা যায় ? যার সম্পর্কে বিদ্রোহ অথবা সরকারী নীতি লংঘনের সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তাকে কোন সরকারই প্রতিনিধি বা দূত নিযুক্ত করতে পারে না। তবে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের সঠিক পরিমাপ করা জাগতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বেলায় এরূপ সম্ভাবনা নেই। যদি কোন মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্র এরূপ জ্ঞান থাকে যে, সে খোদায়ী আনুগত্যের সীমা চুল পরিমাণও লংঘন করবে না,তবে পরে এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। নতুবা আল্লাহ্র জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে যাবে (নাউযুবিল্লাহ্)। এখান থেকেই পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, পয়গম্বরগণ যখন সামান্যতম অবাধ্যতা থেকেও পবিত্র, তখন শিরক তথা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কোথায় অবশিষ্ট থাকে ?

খৃস্টানরা বলে যে, ঈসা ইবনে মারইয়ামের উপাস্য হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং ঈসা (আ) তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ দাবি অসার প্রমাণিত হয়। কোন কোন মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করেছিল ঃ আমরা সালামের পরিবর্তে আপনাকে সিজদা করলে ক্ষতি কি ? আয়াতে তাদের ভ্রান্তিও ফুটে উঠলো। এ ছাড়া আয়াতে আহ্লে-কিতাবদের ভ্রান্তির প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ হয়েছে, যারা পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের আল্লাহ্র স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ্)।—(ফাওয়ায়েদে-উসমান)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط

قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ط قَالُوا أَقْرَرْنَا ط قَالَ

فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾
قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ
وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

(৮১) আর আল্লাহ্ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, 'আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেওয়ার জন্য, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি অঙ্গীকার করছ এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ ?' তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করছি।' তিনি বললেন, 'তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম!' (৮২) অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই হলো নাফরমান। (৮৩) তারা কি আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন তালাশ করছে ? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (৮৪) বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমার উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্য সমস্ত নবী-রাসূল তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁর অনুগত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন যে, আমি তোমাদের যা কিছু গ্রন্থ ও (শরীয়তের) জ্ঞান দান করি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে, তার সত্যায়নকারী (অন্য) পয়গম্বর আগমন করেন, (অর্থাৎ শরীয়তের) নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তাঁর রিসালাত প্রমাণিত হয়, তখন আপনারা অবশ্য তাঁর (রিসালাতের) প্রতি (আন্তরিক) বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং (বাস্তব ক্ষেত্রে) তাঁর সাহায্যও করবেন। (এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর) তিনি বলেন ঃ আপনারা কি এতে স্বীকৃত হলেন এবং আমার শর্ত গ্রহণ করলেন ? তাঁরা বললেন ঃ আমরা স্বীকার করলাম। (আল্লাহ্) বললেন ঃ তবে আপনারা (এ স্বীকৃতির ওপর) সাক্ষী থাকুন। (কেননা, সাক্ষ্যের বিপরীত করাকে সবাই সর্বাবস্থায় খারাপ

মনে করে। কিন্তু স্বীকারোক্তির বিপরীত করা তেমন অকল্পনীয় নয়। কারণ, স্বীকারোক্তিকারী স্বার্থ প্রণোদিতও হতে পারে। সেমতে আপনারা শুধু স্বীকারোক্তিকারী হিসাবে নয় ; সাক্ষী হিসাবে এতে অটল থাকবেন)। আমিও আপনাদের সাথে অন্যতম সাক্ষী (অর্থাৎ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত) রইলাম। অতএব, (উম্মতদের মধ্যে) যে ব্যক্তি (এ অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই (পুরোপুরি) অবাধ্য (অর্থাৎ) কাফির। যে ইসলামের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, তা থেকে মুখ (ফিরিয়ে) তারা কি আল্লাহ্‌র ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে ? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার (নির্দেশের) সামনে মাথা নত করেছে (কেউ) ইচ্ছায় (কেউ) অনিচ্ছায়। (এ মাহাত্ম্যের দিকে লক্ষ্য করে তাঁর অঙ্গীকারের বিরোধিতা করা উচিত নয়। বিশেষ করে যখন ভবিষ্যতে শাস্তিরও আশংকা রয়েছে। সে মতে সবাই আল্লাহ্‌র দিকে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন বিরুদ্ধাচরণকারীদের শাস্তি দেওয়া হবে। (হে মুহাম্মদ! আপনি ইসলাম ধর্ম প্রকাশের সারমর্ম হিসাবে একথা) বলে দিন ঃ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি, ঐ নির্দেশের প্রতি, যা আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে, ঐ নির্দেশের প্রতি যা (হযরত) ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব (আ) ও তৎবংশীয় (নবী)-গণের প্রতি প্রেরিত হয়েছে। এবং ঐ নির্দেশ ও মু'জিযার প্রতি, যা (হযরত) মূসা ও ঈসা (আ) এবং অন্যান্য পয়গম্বরকে দান করা হয়েছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (বিশ্বাসও এমন যে) আমরা তাদের মধ্য থেকে (কোন একজনের ব্যাপারেও) বিশ্বাসের কোন পার্থক্য করি না (যে, একজনকে বিশ্বাস করবো আরেকজনকে বিশ্বাস করবো না) আমরা আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগত, (তিনিই আমাদের ধর্ম বলে দিয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করেছি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ তা'আলার তিনটি অঙ্গীকার ঃ আলাহ্ তা'আলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সূরা আ'রাফের اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে। কেননা, ধর্মের গোটা প্রাচীর এ ভিত্তির ওপরই নির্মিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিবেক ও চিন্তার পথ প্রদর্শন কোন উপকারেই আসে না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব আলিমদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না করে।

তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য আয়াত وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ-এ উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ পরে আসবে। —(তফসীরে আহমদী)

مِيْثَاق —এর অর্থ কি এবং তা কোথায় নেওয়া হয়েছে ঃ এ অঙ্গীকার আত্মার জগতে অথবা পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। —(বয়ানুল কোরআন)

কি অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তা কোরআনেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি সম্পর্কে নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত আলী (রা) ও হযরত

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা স্বয়ং যদি তাঁর আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁর সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান।

হযরত তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্ প্রমুখ মনীষী বলেন ঃ পয়গম্বরগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। –(তফসীরে ইবনে-কাসীর)

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা শেষোক্ত উক্তির সমর্থন হতে পারে—

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا. (الاحزاب)

কেননা, এ অঙ্গীকার একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য নেওয়া হয়েছিল।

—(তফসীরে-আহ্মদী)

উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে। —(ইবনে কাসীর)

পয়গম্বরগণকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলার উপকারিতা ঃ এখানে বাহ্যত প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। তিনি ভালরূপেই জানেন যে, মুহাম্মদ (সা) অন্য কোন নবীর উপস্থিতিতে পৃথিবীতে আগমন করবেন না। এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি পয়গম্বরগণের বিশ্বাস স্থাপনের উপকারিতা কি ? একটু চিন্তা করলেই সুস্পষ্ট উপকারিতা বোঝা যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী যখন তাঁরা হযরত (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সংকল্প করবেন, তখন থেকেই সওয়াব পেতে থাকবেন। —(সাভী)

মহানবী (সা)-এর বিশ্বজনীন নবুয়ত وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন পয়গম্বরের পর যখন অন্য পয়গম্বর আগমন করেন—যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও খোদায়ী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্য জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কোরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। আল্লামা সুবকী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-তা'জীম ওয়াল মেন্না'তে لتؤمنون به ولتنصرنه -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ আয়াতে রাসূল বলে মুহাম্মদ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে এবং এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হন নি, যাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। এমনিভাবে এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হন নি, যিনি স্বীয় উম্মতকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য সমর্থন করতে নির্দেশ দেননি। যদি মহানবী (সা) সে সব পয়গম্বরের আমলেই আবির্ভূত হতেন, তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও

নবী। এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ "আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না।"

অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ যখন ঈসা (আ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও কোরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি-বিধান পালন করবেন। —(তফসীরে ইবনে-কাসীর)

এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা)-এর নবুয়ত বিশ্বজনীন। তাঁর শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً (আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।) হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থও ফুটে উঠেছে। মহানবী (সা)-এর নবুয়ত তাঁর আমল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য—হাদীসের এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। বরং তাঁর নবুয়তের যমানা এত বিস্তৃত যে, হযরত আদম (আ)-এর নবুয়তেরও আগে থেকে এর আরম্ভ। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ كنت نبيا وادم بين الروح والجسد—(আদমের দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম)। হাশরের ময়দানে শাফা'আতের জন্য অগ্রসর হওয়া, তাঁর পতাকাতলে সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হওয়া এবং মি'রাজ-রজনীতে বায়তুল-মুকাদ্দাসে সব পয়গম্বরের ইমামতি করা তাঁর বিশ্বজনীন নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষণ।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

---

(৮৫) যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা (সে ধর্ম) কখনও (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) গৃহীত হবে না এবং সে (ব্যক্তি) পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ মুক্তি পাবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামই মুক্তির পথ ঃ 'ইসলাম' শব্দের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। কেননা, সব পয়গম্বরের শরীয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর 'ইসলাম' শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও শুধু সর্বশেষ শরীয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ

উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' বলেছেন—একথাও কোরআন থেকে প্রমাণিত রয়েছে। শেষ নবী (সা)-এর উম্মতকে বিশেষভাবে মুসলিম বলেও কোরআনে উল্লিখিত রয়েছে। هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا।

মোটকথা, যে কোন পয়গম্বর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই 'ইসলাম' বলা হয় এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসাবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা কোন্ অর্থটি বোঝানো হয়েছে।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোন অর্থই বোঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে তাতে কোন পার্থক্য হয় না, কেননা, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের 'ইসলাম' একটি সীমিত শ্রেণীর জন্য এবং বিশেষ যমানার জন্য ছিল। ঐ শ্রেণীর উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্য তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সেই ইসলামও বিদায় নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে যে ইসলাম দেওয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বেকার ইসলাম আর ইসলাম নয়। বরং হুযূর (সা)-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ আজ যদি হযরত মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ) যখন অবতরণ করবেন, তখন নবুয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন।

এতএব, এ আয়াতে ইসলামের যে কোন অর্থই নেওয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। অর্থাৎ শেষ নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্বাসীর মুক্তির উপায়। আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্র কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ
حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰٓئِكَ
جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ
تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۫ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾ اِنَّ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

(৮৬) কেমন করে আল্লাহ্ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফির হয়েছে। আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত (৮৮) সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। (৮৯) কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৯০) যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবূল করা হবে না—আর তারা হলো গোমরাহ। (৯১) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেওয়া হয় তবুও যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবূল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ! পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে এসব ধর্মত্যাগীর কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা কুফরীতে কায়েম থেকে কুফরকে হেদায়েত মনে করছিল। তাদের বিশ্বাস অথবা দাবি ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখন তাদের হেদায়েত করেছেন। এ কারণে তাদের নিন্দায় এ বিষয়টি খণ্ডন করে বলেন) ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ সম্প্রদায়কে কিরূপে হেদায়েত দান করবেন, যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর কাফির হয়ে গেছে ? তারা (মুখে) সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, রাসূল [(সা) রিসালাতের দাবিতে সত্যবাদী] এবং তাদের কাছে (ইসলামের সত্যতার) প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (এর অর্থ এই নয় যে, এমন লোকদের কখনও ইসলামের তওফীক দেন না ; বরং তাদের উল্লিখিত দাবি নাকচ করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। তারা বলতো, আল্লাহ্ আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। তাই আমরা ইসলাম ত্যাগ করে এ পথ অবলম্বন করেছি। মোট কথা, যারা কুফরের গোমরাহ পথ অবলম্বন করে, তারা আল্লাহ্‌র হেদায়েতের অনুসারী নয়। কাজেই তারা একথা বলতে পারে না যে, আল্লাহ্ হেদায়েত

দিয়েছেন। কারণ এটা হেদায়েতের পথ নয় ; বরং তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট)। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানবজাতির অভিসম্পাত। তারা চিরকাল এতে (অর্থাৎ অভিসম্পাতে) থাকবে। (এ অভিসম্পাতের পরিণাম ফল হলো জাহান্নাম। কাজেই অর্থ এই যে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তাদের শাস্তি প্রশমিত করা হবে না এবং তাতে বিরাম দেওয়া হবে না। অতঃপর তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা পুনর্বার মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।) কিন্তু অতঃপর (অর্থাৎ কুফরের পরে) যারা তওবা করেছে (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে) এবং সংশোধিত হয়েছে (অর্থাৎ মুনাফিকের মত শুধু মুখে তওবা করাই যথেষ্ট নয়) নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল ও করুণাময়। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাসে বর্ধিত হয়েছে (অর্থাৎ অবিশ্বাসেই রয়ে গেছে —বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাদের তওবা (তা অন্য গোনাহর জন্য করলেও) কখনও গৃহীত হবে না (কারণ, তওবা গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান)। তারাই (এ তওবার পরেও যথারীতি) পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণও করেছে, তাদের কারও কাছ থেকে (কাফ্ফারা হিসাবে) পৃথিবী-ভর্তি স্বর্ণও নেওয়া হবে না—যদিও সে মুক্তির বিনিময়ে তা দিতেও চায় (আর দিতে না চাইলেই বা কে জিজ্ঞেস করে)। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি সন্দেহের অপনোদন ঃ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ এ আয়াত থেকে বাহ্যত সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা, অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরও ঈমান এনে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোন বিচারক নিজ হাতে কোন দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। দুষ্কৃতকারী বলতে লাগলো ঃ বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে বিচারক বললেন ঃ এমন দুরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাবো ? অর্থাৎ এটা মর্যাদাদানের ব্যাপারই নয়। অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা অবলম্বন করার পরেও মর্যাদাপ্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। (বয়ানুল-কোরআন)

(৯২) কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা জানেন।

ব্যাখ্যাসহ পূর্বাপর যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফির ও মুশরিকদের সদকা ও খয়রাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্যে গ্রহণীয় সদকা ও তার রীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে بِرٌّ শব্দের অর্থ ও স্বরূপ জানা আবশ্যক।

بِرٌّ এর শাব্দিক অর্থ অন্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করা। অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহারের অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। بار এবং بر সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজ দায়িত্বে আরোপিত যাবতীয় হক পুরোপুরি আদায় করে। কোরআনে بَرًّا بِوَالِدَيْهِ এবং بَرًّا بِوَالِدَتِيْ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি, যে পিতামাতার হক পুরোপুরি আদায় করে।

بَرٌّ শব্দের বহুবচন اَبْرَارٌ কোরআনে এর ব্যবহার বিস্তর। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ আরও এক আয়াতে আছে ঃ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ এই শেষ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, بر এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে فجور

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ 'সিদক' তথা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে থাক। কেননা, সিদক بر এর সঙ্গী। এরা উভয়েই জান্নাতে থাকবে এবং মিথ্যাবাদিতা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা, মিথ্যাবাদিতা فجور তথা পাপাচারের সঙ্গী। এরা উভয়েই জাহান্নামে থাকবে। (আদাবুল-মুফরাদ, ইবনে মাজাহ, মসনদে আহমদ)

সূরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔

এ আয়াতে সৎকর্মের একটি তালিকা দিয়ে সবগুলোকে بر আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, সৎকর্মসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। বলা হয়েছে, সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা بر অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার হক পুরোপুরি আদায় হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। পরন্তু ابرار-এর কাতারভুক্ত হওয়াও এরই উপর নির্ভরশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানগণ !) তোমরা পূর্ণ (অর্থাৎ বিরাট কল্যাণ) কখনও অর্জন করতে পারবে না, সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত। তোমরা যাই ব্যয় কর (অপ্রিয় বস্তু হলেও) আল্লাহ তা'আলা তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন। (তিনি এতেও সওয়াব দেবেন, কিন্তু পূর্ণ সওয়াব পেতে হলে তার পন্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপ্রেরণা ঃ সাহাবায়ে-কিরাম ছিলেন কোরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কোরআনী নির্দেশ পালনের জন্য তাঁরা ছিলেন চাতক-সম। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায়-সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোন্‌টি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করার জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবূ তাল্‌হা (রা)। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি বাগানে 'বীরহা' নামে একটি কূপ ছিল। বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে-মজীদীর সামনে 'আস্তফা-মনযিল' নামে একটি দালান অবস্থিত রয়েছে ! এতে মদীনা যিয়ারতকারী হাজীগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর-পূর্ব কোণে 'বীরহা' কূপটি অদ্যাবধি স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি তিনি পছন্দও করতেন। আবূ তালহা (রা)-এর এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি একে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, একে খরচ করুন। হুযূর (সা) বললেন ঃ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দিন। হযরত আবূ তালহা (রা) এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। −(বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না−স্বীয় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরয করেন ঃ আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী (সা) তাঁর ঘোড়াটি গ্রহণ করে তাঁরই পুত্র উসমানকে দান করলেন। দান করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু মহানবী (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ তোমার দান গৃহীত হয়েছে। −(তফসীরে-মাযহারী, ইবনে জারীর, তাবারী)

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর একটি বাঁদী ছিল সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি তাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত করে দেন।

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি মাস'আলা প্রণিধানযোগ্য।

সব ফরয ও নফল দান আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ঃ (এক) কোন কোন আলিমের মতে আলোচ্য আয়াতে ফরয দান-খয়রাত, যথা যাকাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার কারো মতে আয়াতে নফল দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞ আলিম সমাজের মতে আয়াতের অর্থে ফরয ও নফল উভয় প্রকার দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত

রয়েছে। (সাহাবায়ে-কিরামের উল্লিখিত ঘটনাবলী এ মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, তাঁদের দান-খয়রাত নফল শ্রেণীভুক্ত ছিল)।

কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ফরয-নফল ইত্যাদি যে কোন দান-খয়রাত কর, তাতে পূর্ণ সওয়াব ও কল্যাণ পেতে হলে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু দান করতে হবে। দান-খয়রাতকে জরিমানা মনে করে গা এড়ানোর জন্য উদ্বৃত্ত অকেজো অথবা খারাপ বস্তু দান করা উচিত নয়। কোরআনের অপর একটি আয়াতে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ ! নিজেদের উপার্জন থেকে এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, আল্লাহ্‌র পথে তা থেকে উত্তম বস্তু ব্যয় কর এবং ব্যয় করার জন্য এমন বাজে জিনিসের নিয়ত করবে না, যা প্রাপ্য হিসাবে তোমাদের দিলে তোমরাও কখনও গ্রহণ করবে না। তবে কোন কারণবশত চক্ষু বন্ধ করে গ্রহণ করলে তা ভিন্ন কথা।

সারকথা এই যে, বেছে খারাপ ও অকেজো বস্তু দান করলে তা গৃহীত হবে না। বরং প্রিয়বস্তু দান করলেই গৃহীত হবে এবং তার পুরোপুরি সওয়াব পাওয়া যাবে।

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ঃ (দুই)—আয়াতে مما শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রিয় বস্তু নিঃশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য এই যে, যতটুকুই ব্যয় করবে, তার মধ্যে ভাল ও প্রিয় বস্তু দেখে ব্যয় করবে। তবেই পুরোপুরি সওয়াবের অধিকারী হতে পারবে।

(তিন)—প্রিয় বস্তু ব্যয় করার অর্থ শুধু অধিক মূল্যবান বস্তু ব্যয় করা নয় ; বরং স্বল্প এবং মূল্যের দিক দিয়ে নগণ্য—এমন কোন বস্তুও কারও দৃষ্টিতে প্রিয় হলে, তা দান করলেও পুরোপুরি সওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি মনে যা দান করা হয়, তা একটি খেজুরের দানা হলেও তাতে দাতা আয়াতের বর্ণনা মতে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।

(চার)—আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যারা গরীব নিঃসম্বল এবং দান করার মত অর্থ-কড়ির মালিক নয়, তারা আয়াতে বর্ণিত কল্যাণ ও বিরাট পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রিয় বস্তু ব্যয় করা ব্যতীত এ পুণ্য অর্জিত হবে না। গরীব-মিসকীনদের হাতে এমন কোন আকর্ষণীয় বস্তু নেই যে, তা ব্যয় করে তারা এ পুণ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়াতের অর্থ এরূপ নয় যে, প্রিয় অর্থ-কড়ি ব্যয় করা ব্যতীত এ লক্ষ্য অর্জিত হবে না ; বরং এ পুণ্য ইবাদত, যিকর, তিলাওয়াত, অধিক নফল ইবাদত ইত্যাদি উপায়েও অর্জন করা যায়। কোন কোন হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রিয় বস্তুর অর্থ ঃ (পাঁচ)—প্রিয় বস্তু বলে কি বোঝানো হয়েছে ? কোরআনের অন্য আয়াত থেকে জানা যায়, যে বস্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজে লাগছে, যা ব্যতীত সে তার অভাব বোধ করে

এবং যা উদ্বৃত্ত ও অকেজো নয়, তাই প্রিয় বস্তু। কোরআন বলে ঃ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ ... ... مِسْكِيْنًا —অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার খাদ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্তদের খাদ্য দান করে। এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ —অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা স্বয়ং অভাবগ্রস্ত।

প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যয় করাও সওয়াবমুক্ত নয় ঃ (ছয়)—আয়াতে বলা হয়েছে, প্রিয় বস্তু দান করার উপর বিরাট পুণ্য অর্জন ও পুণ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নির্ভরশীল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করলে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ — অর্থাৎ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। আয়াতের এ অংশের উদ্দেশ্য এই যে, কোন দান-খয়রাতই সাধারণ সওয়াব থেকে মুক্ত হবে না, প্রিয় বস্তুর দান-খয়রাত হোক কিংবা অতিরিক্ত বস্তুর। তবে যখনই ব্যয় করতে হয়, তখনই যেন বেছে বেছে অকেজো বস্তু ব্যয় করা হয়—এমন রীতি অবলম্বন করা মাক্রূহ ও নিষিদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তুও ব্যয় করে এবং মাঝে মাঝে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু যেমন উদ্বৃত্ত খাদ্য, পুরাতন পোশাক, দোষযুক্ত পাত্র এবং ব্যবহারের বস্তুও দান করে দেয়, সে এতে গোনাহ্গার হবে না ; বরং এ জন্যও সে সওয়াবের অধিকারী হবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথা বলা হয় যে, মানুষ যা ব্যয় করে, তার আসল স্বরূপ আল্লাহ্র অজানা নয়। প্রিয় কি অপ্রিয়, খাঁটি মনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছে, না লোক দেখানো ও সুখ্যাতির জন্য ব্যয় করছে ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র জানা। আমি প্রিয় বস্তু আল্লাহ্র জন্য ব্যয় করছি—মুখে এরূপ দাবি করলেই শুধু হবে না ; বরং যে আল্লাহ্ অন্তরের গোপন ভেদ জানেন, তিনিই দেখছেন এ দান কোন্ পর্যায়ের দান।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۚ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

(৯৩) তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকূব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল।

তুমি বলে দাও, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর।' (৯৪) অতঃপর আল্লাহ্র প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই জালিম—সীমা লংঘনকারী। (৯৫) বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে (সব খাদ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা, সে), সব খাদ্য বস্তু (হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে কখনও হারাম ছিল না, বরং এসব খাদ্যবস্তু) তওরাত অবতরণের পূর্বে (হযরত) ইয়াকুব (আ) (বিশেষ কারণে) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন (অর্থাৎ উটের মাংস। এ মাংস তাঁর সন্তানের জন্যও হারাম ছিল)। তাছাড়া (অবশিষ্ট) সব খাদ্যবস্তু বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। (এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে এগুলো হারাম হওয়ার দাবি কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? তওরাত অবতরণের পূর্বে বলার কারণ এই যে, তওরাত অবতরণের পর উল্লিখিত হালাল বস্তুসমূহের মধ্য থেকেও অনেকগুলো হারাম হয়ে গিয়েছিল। এর বিবরণ সূরা আন্'আমের এ আয়াতে রয়েছে ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ... ... এখনও যদি ইহুদীরা প্রাচীনকাল থেকে হারাম হওয়ার দাবি পরিত্যাগ না করে, তবে হে মুহাম্মদ! (তাদের) বলে দিন ঃ তবে তওরাত উপস্থিত কর। অতঃপর তা পাঠ কর—যদি তোমরা (স্বীয় দাবিতে) সত্যবাদী হও। (তওরাত থেকে এ বিষয়ের কোন আয়াত বের করে দেখাও। কেননা, বর্ণিত বিষয় আয়াত ছাড়া প্রমাণিত হয় না। অন্য কোন আয়াত অবশ্যই নেই। কাজেই তওরাতের আয়াতই দেখাও। দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তাই বলেন ঃ) অতএব, যারা এর পরেও (অর্থাৎ মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরেও) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে (যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে উটের গোশত হারাম করেছেন), তারা বড়ই অত্যাচারী। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন। সুতরাং (এখন) তোমরা (কোরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) ইবরাহীমের ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) অনুসরণ কর—যাতে সামান্যতম বক্রতাও নেই। তিনি (ইবরাহীম) মুশরিক ছিলেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সাথে বিতর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে- কোথাও ইহুদীদের সাথে এবং কোথাও খৃস্টানদের সাথে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে কলবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে এবং অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। এ কথা শুনে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলল ঃ আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো হযরত

ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি হারাম ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন ঃ ভুল কথা, এগুলো তাঁর প্রতি হালাল ছিল। ইহুদীরা বলল ঃ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, তা সবই হযরত নূহ (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণবশত হযরত ইয়াকুব (আ) নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর বংশধরের জন্যও তা হারাম ছিল।

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আ) 'ইরকুন্নাসা' রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকেম, তিরমিযী, রূহুল-মা'আনী) মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা ওহীর নির্দেশে বনী ইসরাঈলের জন্য পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেতো। আমাদের শরীয়তে মানতের কারণে জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ —(তফসীরে কবীর)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

---

(৯৬) নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় (ইবাদতালয়সমূহের মধ্যে) যে গৃহ সর্বপ্রথম মানবজাতির (ইবাদতের) জন্য (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্কা শহরে অবস্থিত (অর্থাৎ মক্কার কাবাগৃহ)। তার অবস্থা এই যে, তা বরকতময় (কেননা, তাতে ধর্মীয় কল্যাণ অর্থাৎ সওয়াব রয়েছে)। এবং (বিশেষ ইবাদত, যথা নামাযের দিকনির্দেশে) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক। (উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় এবং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে নামাযের সওয়াব অনেক বেশি হয়। এগুলো ধর্মীয় কল্যাণ। আর যারা সেখানে উপস্থিত নয়, এ গৃহের মাধ্যমে তারা নামাযের দিক জানতে পারে, এটাও পথপ্রদর্শন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে সারা বিশ্বের গৃহ, এমন কি, মসজিদ ও ইবাদতালয়সমূহের মুকাবিলায় কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ একাধিক ঃ

কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মাণ ইতিহাস ঃ প্রথমত, এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম ইবাদতালয়।

দ্বিতীয়ত, এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার।

তৃতীয়ত, এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্কায় (মক্কার অপর নাম ছিল বাক্কা) অবস্থিত। অতএব কা'বাগৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ ইবাদতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন ইবাদতগৃহও ছিল না এবং বাসগৃহও ছিল না। হযরত আদম (আ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর পক্ষে এমনটি অকল্পনীয় নয় যে, পৃথিবীতে আগমনের পর তিনি নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের আগেই আল্লাহ্র ঘর অর্থাৎ ইবাদতের গৃহ নির্মাণ করেন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু ইবাদতের জন্য কা'বাগৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি হযরত আলী (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীস—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁদের কা'বাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তা প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করার আদেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ—যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। –(ইবনে কাসীর)

কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত আদম (আ) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বাগৃহ নূহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন পর্যন্তও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাচীন ভিত্তির ওপর এ গৃহ পুনর্নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনর্নির্মাণ করেন। এভাবে কয়েকবার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কুরায়শরা এ গৃহ নির্মাণ করেন। এতে মহানবী (সা)-ও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরায়শদের এ নির্মাণের ফলে ইবরাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমত, কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দুইটি—একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরায়শরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়ত, তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে –যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, কা'বাগৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে

ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বাগৃহ ভেঙে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেওয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বাগৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব বেশিদিন টেকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই সে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা)-এর এ চিরস্মরণীয় কীর্তিটি মুছে ফেলতে মনস্থ করে! সেমতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আবদুলাহ্ ইবনে যুবায়র (রা)-এর এ কাজ ঠিক হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বাগৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কা'বাগৃহকে আবার ভেঙে জাহিলিয়াত আমলের কুরায়শরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন বাদশাহ্ উল্লিখিত হাদীসদৃষ্টে কা'বাগৃহকে ভেঙে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বাগৃহের ভাঙাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহদের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বাগৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সেই অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া উচিত। বিশ্বের মুসলিম সমাজ তাঁর এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট ভাঙাগড়ার কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে-কা'বা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। কোরআনে যেখানে আল্লাহ্র আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বাগৃহ নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁরা কা'বাগৃহের প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেন নি, বরং সাবেক ভিত্তির ওপরই নির্মাণ করেন। আয়াত وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ থেকেও বোঝা যায় যে, কা'বাগৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সূরা হজ্জের এক আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অর্থাৎ যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম। এতেও বোঝা যায় যে, কা'বাগৃহের স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হলে ফেরেশতার মাধ্যমে বালুকার টিলার নিচে লুক্কায়িত সাবেক ভিত্তি চিহ্নিত করে দেওয়া হয়।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বাগৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে

জগতের সর্বপ্রথম গৃহ অথবা সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত আবূ যর (রা) হুযূর (সা)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্ব প্রথম মসজিদ কোন্‌টি? উত্তর হলো ঃ মসজিদে-হারাম। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ এরপর কোন্‌টি ? উত্তর হলো ঃ মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুটি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিন ব্যবধান ছিল ? উত্তর হলো ঃ চল্লিশ বছর।

এ হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে কা'বা গৃহের পুনর্নির্মাণের দিক দিয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পর সম্পন্ন হয়। এরপর হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়।

আদিকাল থেকেই কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে وضع للناس শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আয়াতে উল্লিখিত 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্কা'।

কা'বাগৃহের বরকত ঃ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে কা'বাগৃহকে 'মুবারক' (বরকতময়) বলা হয়েছে। 'মুবারক' শব্দটি বরকত থেকে উদ্ভূত। 'বরকত' শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কোন বস্তু দুইভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এক. প্রকাশ্যত বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। দুই. তদ্দ্বারা এত বেশি কাজ হওয়া, যা তদপেক্ষা বেশি বস্তু দ্বারা সাধারণত সম্ভব হয় না। একেও অর্থগত দিক দিয়ে 'বৃদ্ধি পাওয়া' বলা যেতে পারে।

কা'বাগৃহের বরকতময় হওয়া বাহ্যিক এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই রয়েছে। বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা শুষ্ক বালুকাময় অনুর্বর মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও এতে সব সময়, সব ঋতুতে সব রকম ফলমূল, তরি-তরকারি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল পরিমাণ মজুত থাকে, যা শুধু মক্কাবাসীদের জন্যই নয়— বহিরাগতদের জন্যও যথেষ্ট। বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে। বিশেষত হজ্জের মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়। তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসীদের চার-পাঁচ গুণ বেশি হয়ে থাকে। এ বিরাট জনসমাবেশ সেখানে দু-চার দিন নয়—কয়েক মাস অবস্থান করে। হজ্জের মওসুম ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন সেখানে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের ভিড় না থাকে। বিশেষত হজ্জের মওসুমে যখন সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়, তখনও এমন কথা শোনা যায়নি যে, বাজারে জরুরী পণ্যসামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌঁছে কোন কোন হাজী শত শত ভেড়া-দুম্বাও কুরবানী করেন। গড়ে জনপ্রতি একটি কুরবানী তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বাইরে থেকে আমদানি করার ব্যবস্থা করতে হয় না।

এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা—যা উদ্দিষ্ট নয়। অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত যে কি পরিমাণ, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কতিপয় প্রধান ইবাদত বিশেষ করে কা'বাগৃহেই করা যায়। এসব ইবাদতে যে বিরাট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, তা কা'বাগৃহের কারণেই হয়ে থাকে। উদাহরণত হজ্জ ও ওমরাহ্। আরও কিছু ইবাদত আছে, যা মসজিদে-হারামে করলে সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, বাসগৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাঁচশ নামাযের, মসজিদে-আকসায় পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের এবং মসজিদে-হারামে পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। —(ইবনে মাজাহ, তাহাভী)

হজ্জের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধভাবে হজ্জব্রত পালনকারী মুসলমান বিগত গুনাহ্ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এগুলো কা'বাগৃহেরই অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত। আয়াতের শেষাংশে هدى বলে এসব বরকতই ব্যক্ত করা হয়েছে।

فِيهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

(৯৭) এতে রয়েছে 'মকামে-ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য ; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না—আল্লাহ্ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে (শ্রেষ্ঠত্বের কিছু আইনগত ও কিছু সৃষ্টিগত) প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ (মজুদ) রয়েছে। (আইনগত নিদর্শনসমূহের মধ্যে বরকতময় ও পথপ্রদর্শক হওয়ার বিষয় তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু মাকামে-ইবরাহীমের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ—এতে প্রবেশকারীর পক্ষে নিরাপদ হওয়া এবং শর্তসহ এর হজ্জ ফরয হওয়া। এ চারটি নিদর্শন এখানে আইনগত। এখন মাঝখানে সৃষ্টিগত নিদর্শন উল্লেখ করা হচ্ছে। এই নিদর্শনসমূহের) একটি হচ্ছে মাকামে-ইবরাহীম। (আরেকটি আইনগত নিদর্শন এই যে,) যে ব্যক্তি এর (নির্ধারিত সীমার) মধ্যে প্রবেশ করে, সে (আইনত) নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (আরেকটি আইনগত নিদর্শন এই যে,)

আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য মানুষের ওপর এ গৃহের হজ্জ করা ফরয। (তবে সবার ওপর নয়, বরং ঐ ব্যক্তির ওপর) যে এ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য সামর্থ্যবান। আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) অস্বীকার করে, (তাতে আল্লাহ্‌র কি ক্ষতি ? কেননা) আল্লাহ্ বিশ্বজগত থেকে বে-পরওয়া (কারও অস্বীকারে তাঁর কিছুই আসে যায় না; বরং স্বয়ং অস্বীকারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কা'বাগৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ আলোচ্য আয়াতে কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, এতে আল্লাহ্‌র কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মাকামে-ইবরাহীম। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়। কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। তৃতীয়ত, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজ্জব্রত পালন করা ফরয যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কাবাগৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্ তা'আলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ আবরাহা বিরাট হস্তিবাহিনীসহ কা'বাগৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হেরেমে প্রবেশকারী মানুষ এমনকি, জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বাগৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে পার্শ্বস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত নামক স্থানে প্রত্যেকেই প্রতিটি নিদর্শন লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিনদিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। যদি এসব কংকর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বছরেই কংকরের স্তূপের নিচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেতো এবং কয়েক বছরে সেখানে কঙ্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠতো। অথচ হজ্জের তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কংকর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ প্রসঙ্গে হুযূর (সা) বলেন ঃ ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কোন কারণে কবূল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কংকর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো কবূল করা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন। জামরাতের আশেপাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই; জনগণের পক্ষ থেকেও নেই।

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) খাসায়েসে-কুবরা গ্রন্থে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতক মু'জিযা তাঁর ওফাতের পরও দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনের। সমগ্র বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল,

তেমনি আজও রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ কোরআনের সূরার মত একটি সূরা তৈরি কর দেখি! এমনিভাবে জামরাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কংকর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কবূল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের কংকরই থেকে যায়। তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অক্ষয় মু'জিযা এবং কা'বা গৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট নিদর্শন।

মাকামে ইবরাহীম ঃ মাকামে ইবরাহীম কা'বাগৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কোরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর ওপর দাঁড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বাগৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে প্রস্তরটিও আপনা-আপনি উঁচু হয়ে যেতো এবং নিচে অবতরণের সময় নিচু হয়ে যেতো। এ প্রস্তরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। একটি অচেতন ও জড় প্রস্তরের প্রয়োজনানুসারে উঁচু ও নীচু হওয়া এবং মোমের মত নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা—এসবই আল্লাহ্র অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ প্রস্তরটি কা'বাগৃহের নিচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কোরআনে মাকামে-ইবরাহীমে নামায পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে প্রস্তরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা'বাগৃহের সামান্য দূরে যম যম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকআত নামায এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মাকামে-ইবরাহীমকে একটি কাচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ প্রস্তরটিকেই মাকামে-ইবরাহীম বলা হয়। তওয়াফ পরবর্তী নামায এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মাকামে-ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে-হারামকেও বোঝায়। এ কারণেই ফিকহ্বিদগণ বলেন ঃ মসজিদে-হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ-পরবর্তী নামায পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কা'বাগৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা ঃ কা'বাগৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেত শরীয়তের আইন হিসাবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোন অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না, বরং তাকে হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেবে। এভাবে হেরেমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরীয়তের আইনানুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সবাই এ বিশ্বাসে এক মত যে, কা'বাগৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যত বড়

অপরাধী ও শত্রুই হোক, কা'বাগৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না; হেরেম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহিলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বাগৃহের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেঁট করে চলে যেতো; কিছুই বলতো না।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেরেমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বাগৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর হুযূর (সা) ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বাগৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টার জন্যই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্য হেরেমে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন ঃ আমার পূর্বে কারো জন্য হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্য হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান, হত্যা ও লুটতরাজ করেছিল। এতে কা'বাগৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে হাজ্জাজের এ কাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্য তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা'বাগৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থীও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে-ও একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করতো। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

মোট কথা একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানবমণ্ডলী কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তারা হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবিকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য।

কা'বাগৃহে হজ্জ ফরয হওয়া ঃ আয়াতে কা'বাগৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা'বাগৃহে হজ্জ ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্দারা সে কা'বাগৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত-পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়িঘরে চলাফেরা করাই দুষ্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে ?

মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়তমতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজ্জে থাকবে। নিজ খরচে করুক

অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বাগৃহে পৌছার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জানমালের ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে, তবে হজ্জের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে।

'হজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ্জ বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কোরআন প্রদত্ত। হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রাসূলুল্লাহ (সা) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর বলা হয়েছে ঃ ومن كفر فان الله غني عن العلمين—অর্থাৎ যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব থেকে বেপরওয়া।

সে ব্যক্তিই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যে পরিষ্কারভাবে হজ্জকে ফরয মনে করে না। সে যে ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত, তা সবারই জানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হজ্জকে ফরয বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, সে-ও একদিক দিয়ে অবিশ্বাসী। আয়াতে শাসনের ভঙ্গিতে তার সম্পর্কে 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, সে কাফিরদের মত কাজেই লিপ্ত। অবিশ্বাসী কাফির যেমন হজ্জের গুরুত্ব অনুভব করে না, সেও তদ্রূপ। এ কারণেই ফিকহ্-শাস্ত্রবিদগণ বলেন ঃ যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। কারণ সে কাফিরদেরই মত হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ্)।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾
قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن
تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن
يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

(৯৮) বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্র কিতাব অমান্য করছ, অথচ তোমরা যা কিছু কর, তা আল্লাহ্র সামনেই রয়েছে। (৯৯) বলুন, হে আহলে কিতাবগণ ! কেন তোমরা আল্লাহ্র পথে ঈমানদারদের বাধা দান কর—তোমরা তাদের দীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের

সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন। (১০০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে-কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদের কাফিরে পরিণত করে দেবে। (১০১) আর তোমরা কেমন করে কাফির হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল আর যারা আল্লাহ্র কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তাদের সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মাঝখানে কা'বাগৃহ ও হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পুনরায় আহ্‌লে-কিতাবদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তবে এই সম্বোধনের বিষয়টি একটি বিশেষ ঘটনার সাথে জড়িত। ঘটনাটি এই যে, সাম্মাস ইবনে কায়স নামক জনৈক ইহুদী মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল। সে একবার এক মজলিসে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজনকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো এবং তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির ফন্দি আঁটলো। ইসলাম—পূর্বকালে এ দুই গোত্রের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। এ যুদ্ধ সম্পর্কে উভয় পক্ষের রচিত বীরত্বপূর্ণ গৌরবগাথা তখনো পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সাম্মাস জনৈক ব্যক্তিকে বললো ঃ তাদের মজলিসে পৌঁছে সে সব গৌরবগাথা আবৃত্তি কর। পরিকল্পনা মোতাবেক কবিতা পাঠ করার সাথে সাথে যেন আগুন জ্বলে উঠলো এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে যুদ্ধের দিন-তারিখও সাব্যস্ত হয়ে গেল। সংবাদ পেয়ে হুযূর আকরাম (সা) তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে বললেন ঃ একি মূর্খতা ! আমার জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে পরস্পর বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়ার পর তোমরা এ কি করছ ? তোমরা কি এ অবস্থায়ই কুফরের দিকে ফিরে যেতে চাও ? এতে উভয় পক্ষের চৈতন্য ফিরে এলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা। এরপর সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করলো এবং তওবা করলো। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। —(রূহুল মা'আনী)।

কয়েক আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রথমে ঘটনার সাথে জড়িত আহ্‌লে-কিতাবদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এতে চমৎকার ভাষালঙ্কারের সাথে সংশ্লিষ্ট অপকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করার পূর্বে তাদের কুফরীর জন্যও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায়, যে ক্ষেত্রে তাদের স্বয়ং মুসলমান হওয়া উচিত ছিল, তা না করে তারা অপরকে পথভ্রষ্ট করার ফিকিরে লেগে থাকে। অতঃপর মুসলমানদের প্রতি সম্বোধন ও আদেশ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মুহাম্মদ! আপনি (এসব আহলে-কিতাবকে) বলে দিন ঃ হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, তোমরা (ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত হওয়ার পর) কেন আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ ?

(মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সমস্ত নীতিমালাই এর অন্তর্ভুক্ত)। অথচ আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে অবগত। (তোমাদের কি ভয় হয় না ? হে মুহাম্মদ, তাদের আরও) বলে দিন যে, হে আহ্লে-কিতাবগণ, তোমরা কেন সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছ আল্লাহ্র পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম) থেকে এমন ব্যক্তিকে, যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ? তোমরা এ পথে বক্রতা সৃষ্টিতে তৎপর। (যেমন, উপরোক্ত ঘটনায় তারা মিল্লাতের সুদৃঢ় বাঁধনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে ঐক্যের শক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং এসব ঝামেলায় ফেলে তাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রয়াসী ছিল)। অথচ তোমরা স্বয়ং অবগত (রয়েছ যে, এ কাজটি মন্দ)। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন। (যথাসময়ে এর সময়োচিত শাস্তি দেবেন)। হে মুসলমানগণ! যাদের গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান), যদি তোমরা তাদের কোন এক দলের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন করার পর তোমাদের (বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত) অবিশ্বাসীতে পরিণত করে দেবে। তোমরা অবিশ্বাস কিরূপে করতে পার (অর্থাৎ অবিশ্বাস করা তোমাদের জন্য বৈধ হতে পারে না)। অথচ (অবিশ্বাসবিরোধী কারণ সবই উপস্থিত রয়েছে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী তোমাদের (কোরআনে) পাঠ করে শোনানো হয়। (এ ছাড়া) তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল বিদ্যমান রয়েছেন। (বিশ্বাসে কায়েম থাকার জন্য এ দুইটি শক্তিশালী উপকরণ রয়েছে। এ দুই উপায়ের শিক্ষা অনুযায়ী তোমাদের বিশ্বাসে কায়েম থাকা দরকার। মনে রেখো,) যে কেউ আল্লাহ্কে দৃঢ়রূপে ধারণ করে (অর্থাৎ বিশ্বাসে পুরোপুরি কায়েম থাকে) নিশ্চয়ই এরূপ ব্যক্তি সরল পথ প্রদর্শিত হয়। (অর্থাৎ সে সরল পথে থাকে। সরল পথে থাকাই যাবতীয় সাফল্যের মূল। সুতরাং এ আয়াতে এরূপ ব্যক্তিকে যাবতীয় সাফল্যের সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

(১০২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যিই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর ; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে

নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল যে, খৃস্টান, ইহুদী ও অন্যান্য লোক তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। তোমরা সজ্ঞানে তাদের এ পথভ্রষ্টতা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও। আলোচ্য দুটি আয়াতে মুসলমানদের দলগত শক্তিকে অজেয় করে তোলার দু'টি প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথমত, আল্লাহ্-ভীতি (তাকওয়া), দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক ঐক্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথার্থভাবে ভয় কর। (যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ এই যে, তোমরা শিরক ও কুফর থেকে যেমন আত্মরক্ষা করেছ, তেমনি গোনাহ্র কাজ থেকেও আত্মরক্ষা কর। শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত ঝগড়া-বিবাদ করা গোনাহ্র কাজ। এ থেকেও আত্মরক্ষা করা ফরয)। এবং (পূর্ণ) ইসলাম (এর অর্থও তাই, যা 'যথার্থ ভয় করা'র অর্থ ছিল) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (অর্থাৎ পূর্ণ আল্লাহ্-ভীতি ও পূর্ণ ইসলামের ওপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কায়েম থেকো)। তোমরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র ধর্মকে মৌলিক ও আনুষঙ্গিক নীতিমালা সহযোগে) আঁকড়ে থাক এবং পরস্পর অনৈক্য সৃষ্টি করো না (এ ধর্মেই এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে)। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র (যে) অনুগ্রহ (হয়েছে তা) স্মরণ কর—যখন তোমরা (পরস্পরে) শত্রু ছিলে, (অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব কালে, তখন আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হচ্ছিল। সাধারণভাবে অধিকাংশ আরববাসীর অবস্থাও তাই ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্ (এখন) তোমাদের অন্তরে (একে অন্যের প্রতি) সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র (এ) অনুগ্রহে (এখন) পরস্পর ভাই ভাই (-এর মত) হয়ে গেছ। বস্তুত (এ অনুগ্রহের ওপরও একটি মূল অনুগ্রহের বর্ণনা করে বলেন ঃ) তোমরা (একেবারে) জাহান্নামের গর্তের কিনারায় (দণ্ডায়মান) ছিলে (অর্থাৎ কাফির হওয়ার কারণে জাহান্নামের এত নিকটে ছিলে যে, মৃত্যুই শুধু ব্যবধান ছিল), অনন্তর আল্লাহ্ তা থেকে (অর্থাৎ সে গর্ত থেকে) তোমাদের রক্ষা করেছেন। (অর্থাৎ ইসলামের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অতএব, এখন তোমরা এসব অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের গোনাহ্ দ্বারা এসব অনুগ্রহকে নস্যাৎ করে দিও না। কেননা, পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে প্রথম অনুগ্রহ অর্থাৎ পারস্পরিক সম্প্রীতি আপনা-আপনি বিনষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অনুগ্রহ অর্থাৎ ইসলামও এতে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব

নির্দেশ যেমন খোলাখুলি বর্ণনা করেন,) তেমনি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (অন্যান্য) নির্দেশ (ও) বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের জাতিগত শক্তির ভিত্তি ঃ আলোচ্য দু'টি আয়াতের মধ্যে প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা অর্থাৎ তাঁর অপছন্দনীয় কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

'তাকওয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ 'ভয়-করা'ও করা হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। কারণ তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'মুত্তাকী' (আল্লাহ্ভীরু) বলা যায়—যদিও সে গোনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্যও কোরআনে অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর—যা আসলে কাম্য—তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কোরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফযীলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 'তাকওয়ার' ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া আলায়হিস্সালাম, ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে اتقوا الله বলার পর حق تقاته বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক।

তাকওয়ার হক কি ঃ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ (রাসূলুল্লাহ [সা] থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে) ঃ

حق تقاته هو ان يطاع يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر – (بحر محيط)

—তাকওয়ার হক এই যে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্কে সর্বদা স্মরণে রাখা—কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা—অকৃতজ্ঞ না হওয়া। —(বাহ্রে মুহীত)

তফসীরবিদগণ এ উদ্দেশ্যকেই বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণত কেউ বলেছেন ঃ তাকওয়ার হক হলো আল্লাহ্র কাজে কারো ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের তোয়াক্কা না করা এবং সর্বদা ন্যায়নীতিতে অটল থাকা, যদিও ন্যায়াবলম্বন করতে গেলে নিজের অথবা সন্তান-সন্ততির অথবা পিতামাতার ক্ষতি হয়। কেউ কেউ বলেছেন ঃ রসনা সংযত না করা পর্যন্ত কেউ তাকওয়ার হক আদায় করতে পারে না।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে— اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ —সাধ্যমত আল্লাহ্‌কে ভয় কর। হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস (রা) বলেন ঃ এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোন ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণশক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা তাকওয়া হকের পরিপন্থী হবে না।

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ —এতে বোঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলাম প্রকৃত পক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকাই হলো তাকওয়া। একেই বলা হয় ইসলাম।

আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মৃত্যু ইসলামের ওপরই হতে হবে—ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যু আসা উচিত নয়।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মৃত্যু কারও ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। যে কোন সময়, যে কোন অবস্থায় মৃত্যু আসতে পারে। কাজেই আয়াতের নির্দেশের অর্থ কি ? উত্তর এই যে, হাদীসে আছে كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون অর্থাৎ তোমরা যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, সে অবস্থায়ই মৃত্যু আসবে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু আসবে সেই অবস্থায়ই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামসম্মত পন্থায় জীবন অতিবাহিত করতে কৃতসংকল্প থাকে এবং সাধ্যমত ইসলামের আদেশ-নিষেধ অনুসারে কাজ করে, ইনশাআল্লাহ্ তার মৃত্যু ইসলামের ওপরই হবে। তবে কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক সৎ কর্মের মধ্যেই সারা জীবন অতিবাহিত করবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমন কাজ করে বসবে যে, তার সমগ্র সৎকর্মকেই বরবাদ করে দেবে—এ কথা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার কর্মে পূর্বেই আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা থাকে না। والله اعلم।

মুসলমানদের জাতিগত শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে জগতের জাতি-ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। সম্ভবত জগতের কোথাও এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর দলের ভেতরে উপদল এবং সংগঠনের ভেতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা

অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

চিন্তা করলে এর কারণ বোঝা যায় যে, প্রত্যেকেই জনগণকে স্ব স্ব পরিকল্পনা মাফিক একতাবদ্ধ করতে চায়। যদি অন্যদের কাছেও অনুরূপ পরিকল্পনা থাকে, তবে তারা তার সাথে একমত হওয়ার পরিবর্তে নিজের তৈরি করা পরিকল্পনার সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। ফলে ঐক্যের প্রত্যেকটি আহবানের ফলস্বরূপ একই দলে ভাঙ্গন ও বিভেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং মতবিরোধের পঙ্কে নিমজ্জিত মানবতার অবস্থা দাঁড়ায় এরূপ ঃ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی (যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হলো, ব্যাধি ততই বেড়ে গেল)।

এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্য একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে। যা স্বীকার করে নিতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই যে, কোন মানুষের মস্তিষ্কনিসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে—বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক; একথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটিমাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কোন্‌টি ? ইহুদীরা তওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খৃস্টানরা ইনজীলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবি করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবি করে থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণার উর্ধ্বে উঠে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে, তবে তার সামনে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, শেষ নবী (সা) কর্তৃক আনীত আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ পয়গাম কোরআনের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলা যায় যে, আপাতত সম্বোধনের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমান জাতি। তাঁরা বিশ্বাস করে যে, আজ কোরআন পাকই এমন একটি জীবন-ব্যবস্থা, যা নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এতে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধনের আশংকা নেই। তাই আপাতত আমি অমুসলিম দলসমূহের আলোচনা বাদ দিয়ে কোরআনে বিশ্বাসী মুসলমানদের বলছি যে, তাদের জন্য এটাই একমাত্র কর্মপদ্ধতি। মুসলমানের বিভিন্ন দল-উপদল কোরআন পাকের ব্যবস্থায় একমত হয়ে গেলে হাজারো দলগত, বর্ণগত ও অঞ্চলগত বিরোধ এক নিমেষে শেষ হয়ে যেতে পারে, যা মানবতার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। এরপর মুসলমানদের

মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকলে তা হবে শুধু কোরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে। এরূপ মতভেদ সীমার ভিতরে থাকলে তা নিন্দনীয় ও সমাজ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়; বরং জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। একে বশে রাখা ও সীমা অতিক্রম করতে না দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যকার দল-উপদলগুলো যদি কোরআনী ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে পরস্পর লড়াই করতে থাকে, তখন মতবিরোধ ও কলহ-বিবাদের কোন প্রতিকার থাকবে না। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কোরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে এ কোরআনী মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে। আলোচ্য আয়াতে এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এখানে আল্লাহ্‌র রজ্জু বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে হুযুর (সা) বলেন ঃ كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض। অর্থাৎ কোরআন আল্লাহ্ তা'আলার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত। —(ইবনে কাসীর)

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ حبل الله هو القران অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র রজ্জু হচ্ছে কোরআন।' —(ইবনে কাসীর)

আরবী বাচন-পদ্ধতিতে 'হাবল'-এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে কোন বস্তুকেই বলা হয়, যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কোরআন অথবা দীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে দুনিয়াবাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

মোট কথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতিই বিধৃত হয়েছে। কেননা প্রথমত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা কোরআনকে কাজেকর্মে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, সব মুসলমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়ন করবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণত একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যায়। কোরআন পাক অপর এক আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার রূপে ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا.

অর্থাৎ "যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা অতি অবশ্যই তাদের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও ভালবাসা পয়দা করে দেবেন।"

এছাড়া আয়াতে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা যখন আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সবাই মিলে কোরআনকে শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় মুসলিম

জাতির শক্তি সুদৃঢ় ও অজেয় হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত হয় এবং মরণোন্মুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোরআন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না।

ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব ঃ ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে ; কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণত আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কুরায়শকে এক জাতি ও বনু-তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত, ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্র মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা এক জাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম—প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্ন জাতি। উদাহরণত ভারতের হিন্দু ও আর্য সমাজ।

কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাবলুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি—যারা আল্লাহ্র রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফিররা ভিন্ন জাতি—যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়। خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ (তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন—অতঃপর তোমাদের একদল অবিশ্বাসী ও একদল বিশ্বাসী।) আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। ভৌগোলিক সীমারেখার ঐক্য কিছুতেই জাতীয় ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, এ ঐক্য সাধারণত মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এটা নিজস্ব চেষ্টায় অর্জন করা যায় না। যে কৃষ্ণাঙ্গ, সে ইচ্ছা করে শ্বেতাঙ্গ হতে পারে না। যে কুরায়শ বংশীয়, সে তামীম বংশীয় হতে পারে না। যে হিন্দু, সে আরবী হতে পারে না। কাজেই ঐক্যের এ সব বন্ধন সীমিত অঞ্চলেই সম্ভবপর হতে পারে। এদের গণ্ডি কখনও সমগ্র মানব জাতিকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বিশ্বজোড়া ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবি করতে পারে না। এ কারণেই কোরআন পাক 'হাবলুল্লাহ্' অর্থাৎ কোরআন তথা আল্লাহ্ প্রেরিত জীবন ব্যবস্থাকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করেছে—যা অবলম্বন করা একটি ইচ্ছাধীন কাজ। প্রাচ্যের অধিবাসী হোক অথবা পাশ্চাত্যের, শ্বেতাঙ্গ হোক অথবা কৃষ্ণাঙ্গ, আরবী ভাষা বলুক অথবা হিন্দী—ইংরেজি, যে কোন গোত্রের এবং যে কোন বংশের মানুষ হোক এ যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল কেন্দ্রবিন্দু অবলম্বন করতে পারে। এবং বিশ্বের সব মানুষ এ কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে ভাই ভাই হতে পারে, যদি তারা পৈতৃক নিয়ম-প্রথার ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করে, তবে এ ছাড়া কোন যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল পথই পাবে না। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তরূপে ধারণ করা ছাড়া তাদের গতি নেই। এর ফলে একদিন সমগ্র মানব জাতিই একটি শক্ত ও অনড় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে যাবে, অপরদিকে এ ঐক্যের ফলে প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী

স্বীয় কর্ম ও চরিত্র সংশোধন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে।

এ বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি নিয়ে প্রতিটি মুসলমান বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, এটিই সঠিক ও নির্ভুল পথ ; এদিকে এস। এ মূলনীতির জন্য মুসলমান যতই গর্ব করুক, অনুপযোগী হবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইসলামী ঐক্যকে শতধাবিভক্ত করার জন্য ইউরোপীয়রা বহু শতাব্দী যাবত ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছে, তা স্বয়ং মুসলমান পরিচয় দানকারীদের মধ্যেও বিপুল সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। বর্তমানে মুসলমানদের ঐক্য আরবী, মিসরী, হিন্দী, সিন্ধীতে বিভক্ত হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত সর্বকালে, সর্বস্থানে তাদের সবাইকে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাচ্ছে ঃ এসব মূর্খতাসুলভ স্বাতন্ত্র্যবোধই প্রকৃতপক্ষে অনৈক্যের উদ্‌গাতা এবং এসবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য কোন যুক্তিসঙ্গত ঐক্যই নয়। তাই আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ করার ভিত্তিতে ঐক্যের সঠিক পথ অবলম্বন কর। এ ঐক্য ইতিপূর্বেও তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর জয়ী, প্রবল ও উচ্চাসনে আসীন করেছিল এবং পুনর্বার যদি তোমাদের ভাগ্যলিপিতে কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা এ পথেই অর্জিত হতে পারে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়ত একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর, যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলার পর বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَفَرَّقُوْا পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি এই যে, যেখানে ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলা হয়, সেখানেই ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করে বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া থেকে বারণ করা হয়। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ.

এ আয়াতেও সরল পথে কায়েম থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং রিপুর তাড়নায় উদ্ভাসিত পথে চলতে নিষেধ করা হয়েছে। অনৈক্য যে কোন জাতির ধ্বংসের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কারণ। এ কারণেই কোরআন পাক বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে অনৈক্যের বীজ বপন করতে নিষেধ করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْءٍ.

অর্থাৎ যারা ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

এ ছাড়া কোরআন বিভিন্ন পয়গম্বরের উম্মতদের ঘটনাবলী বর্ণনা করে দেখিয়েছে যে, তারা

কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে।

হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় জিনিসগুলো এই ঃ এক. তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। দুই. আল্লাহ্র কিতাব কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে। তিন. শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে।

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই ঃ এক. অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্কানুষ্ঠান, দুই. বিনা প্রয়োজনে কারও কাছে ভিক্ষা চাওয়া এবং তিন. সম্পদ বিনষ্ট করা। —(ইবনে কাসীর)

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের কোন দিকই কি অনিন্দনীয় নেই ? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদে প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে-কিরাম, তাবেয়ীন এবং ফিকহ্বিদ আলিমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনি ধরনের। এমন মতভেদকেই রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদি এসব শাখা বিষয়কেই দীনের মূল সাব্যস্ত করা হয় এবং এসব বিষয়ে মতভেদকে লড়াই-ঝগড়া ও বচসার কারণ বলে গণ্য করা হয়, তবে তাও নিন্দনীয়।

পারস্পরিক ঐক্যের উভয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম-পূর্বকালে আরবরা লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ খুন-খারাবি ইত্যাদি কারণে গোটা আরব নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামরূপে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতই তাদেরকে এহেন অশান্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا.

অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তখন তিনিই তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই-ভাইয়ে পরিণত হয়েছ। তোমরা জাহান্নামের গহবরের কিনারায় দণ্ডায়মান ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।

অর্থাৎ শতাব্দীর শত্রুতা ও প্রতিহিংসার অনল থেকে বের করে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)-এর বরকতে তোমাদের ভাই ভাই করে দিয়েছেন। এতে ইহকাল ও পরকাল সঠিক পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে এবং তোমাদের মধ্যে এমন অভাবিত বন্ধুত্ব কায়েম হয়ে যায়, যা দেখে শত্রুরা ভীত হয়ে পড়ে। এটা এমনই অনুগ্রহ, যা ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র ধন-ভাণ্ডার ব্যয় করেও লাভ করা যেত না।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, দুষ্ট লোকেরা আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বিগত যুদ্ধের স্মৃতি জাগরিত করে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এর পরিপূর্ণ প্রতিকার হয়ে গেছে।

মুসলমানদের ঐক্য আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ঃ কোরআন পাকের এ উক্তি থেকে আরও একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অন্তরের মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। সম্প্রীতি ও ঘৃণা সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ। কোন দলের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগ্রহের দান। আর একথা সবারই জানা যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অবাধ্যতা ও গোনাহ্ দ্বারা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূরপরাহত।

এর ফল এই যে, মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেওয়া। এদিকে ইশারা করার জন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ —অর্থাৎ এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা বিশুদ্ধ পথে থাক।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

(১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে—আর, তারাই হলো সফলকাম। (১০৫) আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে—তাদের জন্যও রয়েছে বিরাট আযাব।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের সমষ্টিগত কল্যাণের দু'টি মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে স্বীয় অবস্থা সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্-ভীতি ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র রজ্জু ইসলামকে শক্ত রূপে ধারণ করে। এভাবে ব্যক্তিগত সংশোধনের সাথে সাথে সমষ্টিগত শক্তিও আপনা-আপনিই অর্জিত হয়ে যাবে। আলোচ্য দুই আয়াতে এ কল্যাণ-ব্যবস্থারই উপসংহারে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা শুধু নিজ কার্যধারাকে সংশোধন করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং অন্য

ভাইদের সংশোধনের চিন্তাও সাথে সাথে করবে। এভাবেই গোটা জাতির সংশোধন হবে এবং ঐক্যও স্থিতিশীল হবে।

তসফীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়া জরুরী, যারা (অন্য লোকদেরও) কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং মন্দকাজে নিষেধ করবে। তারাই (পরকালে সওয়াব লাভে) পূর্ণ সফলকাম হবে। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকাশ্য নির্দেশাবলী পৌছার পরও (ধর্মে) বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং (রিপুর তাড়নায়) পরস্পর মতবিরোধ করেছে। (কিয়ামতের দিন) তাদের কঠোর শাস্তি হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ প্রথমে আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়ত প্রচার বা তবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন। আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিজেও স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্র আল্লাহ্ প্রেরিত আইন অনুযায়ী সংশোধন কর এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম সংশোধন করারও চিন্তা কর। এ বিষয়বস্তুটিই সূরা 'ওয়াল-আসর'-এ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থাৎ পরকালের ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরাও ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের নির্দেশ দেয়।

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। পূর্ববর্তী আয়াতে "আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর" বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে এ ঐক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার জন্য দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অপর ভাইদেরকেও কোরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য মনে করবে—যাতে আল্লাহ্র রজ্জু তার হাত থেকে ফস্কে না যায়। ওস্তাদ মরহুম শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী বলতেন ঃ আল্লাহ্র এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। হ্যাঁ, হাত থেকে ফস্কে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফস্কে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমন নিজে সৎকর্ম করা ও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করবে, তেমনি অপরকেও সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে। এর ফল হবে এই যে, সবাই মিলে আল্লাহ্র সুদৃঢ় রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করে থাকবে এবং পরিণামে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ তাদের করায়ত্ত থাকবে। প্রত্যেক মুসলমানের কাঁধে অপরকে সংশোধন করার এ দায়িত্ব

অর্পণের জন্য কোরআন মজীদে অনেক সুস্পষ্ট আদেশ বর্ণিত হয়েছে। সূরা আলে-ইমরানের এক জায়াগায় বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

"তোমরা সর্বোত্তম সম্প্রদায়, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।"

এতেও গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর, 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এবং একেই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু নির্দেশও বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী ও ইবনে-মাজাহ্র রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ

والذى نَفسى بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر اوليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتد عنه فلا يستجيب لكم۔

অর্থাৎ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম—তোমরা অবশ্যই 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক। নতুবা সত্বরই আল্লাহ্ পাপীদের সাথে সাথে তোমাদের সবার জন্যই শাস্তি প্রেরণ করতে পারেন। তখন তোমরা দোয়া করলেও কবূল হবে না।' অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان ۔

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মন্দ কাজ হতে দেখে, তবে হাত ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। এতে সক্ষম না হলে, মুখে বাধা দেবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তত মনে মনে কাজটিকে ঘৃণা করবে। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

উপরোক্ত আয়াত ও রেওয়ায়েত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, 'সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ' করা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য। তবে শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের মত এতেও প্রত্যেক ব্যক্তির সাধ্য ও সামর্থ্য বিবেচনা করা হবে। যার যতটুকু সামর্থ্য এ দায়িত্ব তার প্রতি ততটুকুই আরোপিত হবে। উপরোক্ত হাদীসে সামর্থ্যের ওপরই এ দায়িত্ব নির্ভরশীল রাখা হয়েছে।

প্রত্যেক কাজের সাধ্য ও সামর্থ্য ভিন্ন হয়ে থাকে। সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সামর্থ্য সর্বপ্রথম যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে সৎ ও অসতের বিশুদ্ধ জ্ঞান। যে ব্যক্তি নিজেই সৎ ও অসতের পরিচয় জানে না অথবা এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নয়, সে অপরকে 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ' করতে শুরু করলে হিতে বিপরীত না হয়ে পারে না। সে অজ্ঞতার কারণে হয়তো কোন সৎ কাজে নিষেধ এবং

কোন অসৎ কাজে আদেশ করে ফেলতে পারে। এ কারণে সৎ ও অসৎ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, তাদের প্রথম কর্তব্য হবে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। অতঃপর তদনুযায়ী 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' সংক্রান্ত কর্তব্য পালনে অগ্রসর হওয়া।

কিন্তু জ্ঞানলাভের পূর্বে এ কাজে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়। আজকাল অনেক মূর্খ লোক ওয়ায করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। অনেক সাধারণ লোকও শোনা কথাকে সম্বল করে অপরের সাথে তর্ক জুড়ে দেয়। এহেন প্রবণতা সমাজকে সংশোধন করার পরিবর্তে অধিকতর ধ্বংস ও কলহ-বিবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর সামর্থ্যের মধ্যে অসহনীয় ক্ষতির আশঙ্কা না থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, পাপ কাজ হাত ও শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য না থাকলে মুখে বাধা দেবে এবং মুখে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে অন্তর দ্বারাই ঘৃণা করবে। এখানে জানা কথা যে, মুখে বাধা দেয়ার সামর্থ্য না থাকার অর্থ বাকশক্তি রহিত হয়ে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ হলো সত্য কথা বলতে গেলে প্রাণ নাশের আশংকা থাকা অথবা অন্য কোন মারাত্মক ক্ষতির আশংকা থাকা। এমতাবস্থায় 'সামর্থ্য নেই' বলা হবে এবং 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর কর্তব্য পালন না করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গোনাহ্‌গার মনে করা হবে না। তবে আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় জানমালের পরওয়া না করলে এবং ক্ষতি স্বীকার করে নিলে তা ভিন্ন কথা। এরূপ ঘটনা অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও মুসলিম মনীষীর কার্যাবলীতে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে এহেন দুঃসাহসিকতার কারণেই তাঁরা ইহকাল ও পরকালে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। কিন্তু এরূপ করা তাঁদের উপর ফরয বা ওয়াজিব কিছুই ছিল না।

সূরা 'ওয়াল-আসর'-এর আয়াত, আলোচ্য আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা মুসলিম জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সামর্থ্যানুযায়ী 'সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধাদান'কে ওয়াজিব করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিশদ বর্ণনা এই যে, ওয়াজিব কাজের বেলায় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব কাজের ক্ষেত্রে তা মুস্তাহাব। উদাহরণত পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয। সুতরাং বেনামাযীকে নামাযের আদেশ করা প্রত্যেকের উপর ফরয। নফল নামায মুস্তাহাব; এর জন্য উপদেশ দেওয়াও মুস্তাহাব। এছাড়া আরেকটি জরুরী শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হলো এই যে, মুস্তাহাব কাজের বেলায় সর্বাবস্থায় নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে এবং ওয়াজিব কাজের বেলায় প্রথমে নম্রতার সাথে এবং প্রয়োজনে কঠোর হওয়ারও অবকাশ আছে। অথচ আজকাল মুস্তাহাব ও মুবাহ্ কাজের বেলায় বেশ কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ওয়াজিব ও ফরয পালন না করলে কেউ টু শব্দটিও করে না।

এছাড়া 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ' করণের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তখনই আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখবে। উদাহরণত কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা চুরি করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু

চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে, তা ওয়াজিব নয় ; বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে তাকে শাস্তি দেবে।

নবী করীম (সা)-এর من راى منكم উক্তিতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে, এতে 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসৎ কাজ হতে দেখে' বলা হয়েছে।

'সৎ কাজে আদেশ'-এর দ্বিতীয় পর্যায় হলো মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি দল বিশেষভাবে তবলীগের কাজেই নিয়োজিত থাকবে। তাদের দায়িত্ব হবে নিজেদের কথা ও কর্ম দ্বারা মানুষকে কোরআন ও সুন্নাহ্র দিকে আহ্বান করা এবং মানুষকে সৎ কাজে উদাসীন ও অসৎ কাজে আগ্রহী দেখলে সাধ্যানুযায়ী সৎ কাজের দিকে উৎসাহিত করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' করার দায়িত্ব ও কর্তব্যটি পুরোপুরি পালন করার জন্য মাসআলা-মাসায়েলের পূর্ণ জ্ঞান এবং সুন্নাহ অনুযায়ী তার নিয়ম-নীতি জানা পূর্বশর্ত। তাই এ কর্তব্যটি পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য মুসলমানদের একটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন সম্প্রদায়কে এ কাজে আদিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রকাশ করে বলা হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় থাকা জরুরী, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজে আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ বলেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরূপ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব খুবই জরুরী। যদি কোন সরকার এ কর্তব্য সম্পাদন না করে, তবে এরূপ সম্প্রদায় গঠন করা মুসলমান জনগণের ওপরই ফরয। কারণ, যতদিন এ সম্প্রদায় কায়েম থাকবে ততদিনই তাদের জাতীয় জীবন নিরাপদ থাকবে। অতঃপর এ সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রধান গুণ ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ। অর্থাৎ এ সম্প্রদায়ের প্রথম বৈশিষ্ট্যমূলক স্বাতন্ত্র্য হতে হবে এই যে, তারা خير বা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং এটাই হবে তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। 'খায়র' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الخير هو اتباع القران وسنتى। অর্থাৎ 'খায়র'-এর অর্থ হলো কোরআন এবং আমার সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। —(ইবনে কাসীর)

'খায়র' শব্দের এর চাইতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দ্বিতীয়টি হতে পারে না। সমগ্র শরীয়ত এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর يدعون -কে مضارع ক্রিয়াপদে ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, কল্যাণের প্রতি আহ্বানের অব্যাহত প্রচেষ্টাই হবে এ সম্প্রদায়ের কর্তব্য।

'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' বাক্যের দ্বারা এরূপ বোঝার সম্ভাবনা ছিল যে, এ প্রয়োজন হয়তো বিশেষ বিশেষ স্থানেই হবে। অর্থাৎ যখন চোখের সামনে অসৎ কাজ হতে দেখা যায়। কিন্তু يدعون الى الخير বলে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা ; তখন অসৎ কাজ হতে দেখা যাক বা না যাক অথবা কোন ফরয আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণত সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে

ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী। অথবা রোযার সময় আসেনি। রমযান মাস এখনও দূরে। কিন্তু এ সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হবে না; বরং পূর্ব থেকেই মানুষকে বলতে থাকবে যে, রমযান মাস এলে রোযা রাখা ফরয। মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করতে থাকা।

কল্যাণের প্রতি আহ্বানেরও দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর অ-মুসলমানদেরকে 'খায়র' তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান করা। প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লিখিত সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে জগতের সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে। মুখেও এবং কর্মের মাধ্যমেও। সে মতে জিহাদের আয়াতে সাচ্চা মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থাৎ তারা সাচ্চা মুসলমান, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা রাজত্ব দান করলে তারা প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে—যার একটি প্রতীক হচ্ছে নামায। তারা স্বীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আজকাল মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহ্বান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তবে বিজাতির অনুকরণের ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে গেলে তাদের অনৈক্য দূর হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আল্লাহ্র আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তখন সমগ্র জাতি একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের সাফল্যের চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ولتكن منكم আয়াত তিলাওয়াত করে বলেছিলেন ঃ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের দল।—(ইবনে জারীর) কেননা তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্য দায়ী মনে করতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকে আহ্বান করা। অর্থাৎ সব মুসলমান (সাধারণভাবে) এবং উল্লিখিত সম্প্রদায় (বিশেষভাবে) মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবে। এ আহ্বানও দুই প্রকার। একটি ব্যাপক আহ্বান, অর্থাৎ সব মুসলমানকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ আহ্বান। অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। অপর একটি আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ٥

—"প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে একটি দল কেন দীনী ইল্‌মে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য বের হয়ে আসে না, যেন তারা ফিরে এসে স্ব স্ব সম্প্রদায়কে সাবধান করতে পারে এবং এভাবেই তারা হয়তো সাবধানী জীবন অবলম্বন করতে সমর্থ হবে।"

পরবর্তী আয়াতে এ আহ্‌বানকারী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এরূপ বলা হয়েছে ঃ

يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ٥

—অর্থাৎ তারা সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লিখিত 'মারূফ'-এর (সৎ কর্মের) অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব সৎ কর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লিখিত 'মুনকার'-এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজেবাত' (জরুরী করণীয় কাজ) ও 'মাআসী' (গোনাহ্‌র কাজ)-এর পরিবর্তে 'মারূফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। ইজতিহাদী মাসআলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয়। পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার প্রতি ইদানীং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয়। আজকাল ইজতিহাদী মাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্ববৃহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গোনাহ্‌র কাজে বাধা দানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় না। আয়াতের শেষাংশে এ আহ্‌বানকারী দলের প্রশংসনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ —অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সৌভাগ্য তাদেরই প্রাপ্য।

আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম প্রতীক ছিলেন সাহাবায়ে-কিরামের দল। তাঁরা কল্যাণের প্রতি আহ্‌বান এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ-এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন ; রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য পদানত করেন ; বিশ্বকে নৈতিকতা ও পবিত্রতার শিক্ষা দেন এবং পুণ্য ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

কল্যাণের প্রতি আহ্‌বানকারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ–

অর্থাৎ তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পরে মতবিরোধ করেছে।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত হয়ো না। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মাধ্যমে আযাবে পতিত হয়েছে। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا আয়াতের পরিশিষ্ট। প্রথম আয়াতে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তহাতে ধারণ করার প্রতি আহবান করা হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ঐক্যবদ্ধতা সমগ্র জাতিকে একক সত্তায় পরিণত করে দেয়। এরপর কল্যাণের প্রতি আহ্বান এবং 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' দ্বারা এ ঐক্যবদ্ধতাকে শক্তিশালী এবং লালন করা হয়েছে। এরপর وَلَا تَفَرَّقُوْا এবং وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ করতে দিও না।

আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে সমস্ত মতবিরোধ যা দীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে শাখা-প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে "উজ্জ্বল নির্দেশাবলী আসার পর" বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, দীনের মূলনীতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। কিছু শাখা-প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে স্বার্থপরতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু যেসব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোন আয়াত ও হাদীস না থাকার কারণে অথবা আয়াতে ও হাদীসে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকার কারণে যদি ইজতিহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আয়াতে উল্লিখিত নিন্দার আওতায় পড়বে না। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীসে এ ধরনের মতবিরোধের সমর্থন এবং অনুমতি পাওয়া যায়। হাদীসটি এই ঃ যদি কেউ ইজতিহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি ইজতিহাদে ভুল করে তবু একটি সওয়াব পাবে।

এতে বোঝা যায় যে, ইজতিহাদ সম্পর্কিত মতবিরোধ ভুল হলেও যখন এক সওয়াব পাওয়া যায়, তখন তা নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব ইজতিহাদী মতবিরোধ হয়েছে, সে সবগুলোই কোন না কোন পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতের সাথে কোন সম্পর্ক নাই। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ মুসলমানদের জন্য রহমত ও মুক্তির কারণস্বরূপ। —(রূহুল-মাআনী)

ইজতিহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েয নয় ঃ এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়তসম্মত ইজতিহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপর পক্ষ সঠিক

হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতিহাদকারী আলিমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতিহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি সওয়াব দান করবেন। ইজতিহাদী মতবিরোধে কারও এ কথা বলার অধিকার নাই যে, নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহ্র অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক ; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার আশংকাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত; কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতি কথাটি ইমাম ও ফিক্হবিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইজতিহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। আজকাল অনেক আলিমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালিগালাজ করতেও কুণ্ঠিত হন না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইজতিহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতিহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আলোচ্য وَلَا تَفَرَّقُوا আয়াতের পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে ? আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককেই দীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া, মারামারি ও গালিগালাজ পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ কর্মপন্থা অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থী। পূর্ববর্তী মনীষিগণের মধ্যে ইজতিহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনও শোনা যায় নাই। উদাহরণত ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন মুজতাহিদের মতে জামাতের নামায ইমামের পেছনে মুক্তাদিগণও নিজে নিজে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার নামাযই হবে না। এর বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফীগণ ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের কোথাও দেখা যায় না যে, শাফেয়ী মাযহাবের মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের মুসলমানগণকে বেনামাযী বলেছেন বা শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলী আখ্যায়িত করে তাদের এ মতবাদকে নাকচ করে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে আবদুল বার 'জামেউল-ইল্ম' গ্রন্থে এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মপন্থা বর্ণনা করেন ঃ

عن يحيى بن سعيد قال مابرح اهل الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلايرى المحرم ان المحل هلك لتحليله ولايرى المحل ان المحرم هلك لتحريمه-

অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ বলেন ঃ ফতোয়াদাতা আলিমগণ বরাবর ফতোয়া দিয়ে

আসছেন। একজন হয়তো ইজতিহাদের মাধ্যমে এক বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন এবং অন্যজন হয়তো সেটা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু হারাম ফতোয়াদাতা এরূপ মনে করেন না যে, যিনি হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন এবং হালাল ফতোয়াদাতাও এরূপ মনে করেন না যে, যিনি হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন।

একটি জরুরী হুঁশিয়ারি ঃ এ প্রসঙ্গে ইজতিহাদের নীতিমালা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। ইজতিহাদের প্রথম শর্ত এই যে, যেসব মাসআলা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন মীমাংসা পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও তা এমন অস্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে অথবা একাধিক আয়াত ও হাদীস থেকে পরস্পর-বিরোধী বিষয় বোঝা যায়, শুধু এ জাতীয় মাসআলা সম্পর্কেই ইজতিহাদ করা যেতে পারে।

যে কেউ ইজতিহাদ করতে পারে না ; বরং এ জন্যও কয়েকটি শর্ত রয়েছে। উদাহরণত কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে পুরোপুরি দক্ষ হওয়া, আরবী ভাষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া, সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণের উক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া ইত্যাদি। অতএব, যে মাসআলা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে মীমাংসা রয়েছে, সে মাসআলায় কেউ নিজস্ব মত প্রকাশ করলে তা ইজতিহাদী মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং নিন্দনীয় হবে।

এমনিভাবে ইজতিহাদের শর্ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করার যোগ্য নয়, তার মতবিরোধকে ইজতিহাদী মতবিরোধ বলা হয় না। সংশ্লিষ্ট মাসআলায় তার উক্তির কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। ইসলামের ইজতিহাদও একটি স্বীকৃত মূলনীতি—এ কথা শুনে আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক এমন বিষয়েও মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে, যে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে মীমাংসা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব মুজতাহিদ ইমামেরও কথা বলার অধিকার নেই। —(নাউযুবিল্লাহ্)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

(১০৬) সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো—বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে,—তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে

গিয়েছিলে ? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। (১০৭) আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশ যা তোমাদেরকে যথাযথ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর আল্লাহ্ বিশ্ব জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না। (১০৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ঐ দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) কতক মুখ শুভ্র (ও উজ্জ্বল) হবে এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কালো (ও অন্ধকারময়)। যাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হবে তাদের বলা হবে ঃ তোমরা কি বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছিলে ? অতএব (এখন) শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাসী হয়েছিলে। আর যাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহ্র রহমতে (অর্থাৎ জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। এগুলো (যা উল্লিখিত হলো) আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন—যা আমি বিশুদ্ধরূপে আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাই। (এতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতাই বোঝা যাচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না। (কাজেই যার জন্য যে পুরস্কার ও শাস্তি ঘোষণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। এতে পুরস্কার ও শাস্তির ন্যায়ভিত্তিক হওয়াই প্রতিফলিত হয়েছে)। যা কিছু নভোমণ্ডলে রয়েছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে সবই আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। (সুতরাং যখন তাঁরই মালিকানাধীন, তখন তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল। এতে সবার গোলাম হওয়া ও আনুগত্য ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হলো)। আল্লাহ্র দিকেই সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কেউ ক্ষমতাসীন হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার অর্থ ঃ মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কথা কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণত ঃ

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ–

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ দেখতে পাবেন। —(সূরা যুমার)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَّ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ۔

অর্থাৎ বহু চেহারা সেদিন হাস্যোজ্জ্বল হবে; হাস্য ও আনন্দে ভরপুর। আর কতই না চেহারা সেদিন ধুলিমলিন হয়ে পড়বে। —(আবাসা)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔

অর্থাৎ সেদিন তো অনেক চেহারাই উজ্জ্বল হবে—তারা নিজেদের পালনকর্তার দিকেই চেয়ে থাকবে। —(সূরা কিয়ামাহ্)

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা দ্বারা ঈমানের নূরের শুভ্রতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে উজ্জ্বল, আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা কুফরের কালো বর্ণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের মুখমণ্ডল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরও অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা ? ঃ এরা কারা—এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে। হযরত আতা (রা) বলেন ঃ মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের মুখমণ্ডল কালো হবে।—(কুরতুবী)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ উমামা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে।

فقال ابو امامة كلاب النار شرقتلى تحت اديم السّماء وخير قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

আবূ উমামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন ? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন ঃ হাদীসটি যদি অন্তত সাত বার তাঁর কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না। —(তিরমিযী)

হযরত ইকরামা (রা) বলেন ঃ আহ্‌লে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ যারা হুযূর (সা)-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো, কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। —(কুরতুবী)

এছাড়া আরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোর মর্মার্থই এক। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ একমাত্র খাঁটি মু'মিনদের মুখমণ্ডলই সাদা হবে। যারা ধর্মে পরিবর্তন সাধন করে, এরপর কাফির হয়ে যায় কিংবা অন্তরে কপটতা রাখে, তাদের মুখমণ্ডল কালো হবে।

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। এক. আল্লাহ্ তা'আলা يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ বাক্যে প্রথমে উজ্জ্বলতার উল্লেখ করে পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ — বাক্যে বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এখানেও শুভ্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবত সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শাস্তি দেওয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা বর্ণনা করেছেন। কারণ এরাই আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও সওয়াব লাভের যোগ্য ; অতঃপর মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ

করেছেন। কারণ এরা আল্লাহ্র শাস্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ বলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানব জাতিকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি ; বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুই. শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে আল্লাহ্র অনুকম্পা বলে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদতই করুক, আল্লাহ্র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ ইবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয় ; বরং আল্লাহ্প্রদত্ত সামর্থ্যের বলেই মানুষ ইবাদত করে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না; বরং আল্লাহ্র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। —(তফসীরে-কবীর)

তিন. আল্লাহ্ তা'আলা فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ বাক্যাংশের পর هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্যে সাময়িক হবে না—বরং সর্বকালীন হবে। এ নিয়ামত কখনো বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমণ্ডল বিশিষ্টদের জন্য একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে।

মানুষ নিজের গোনাহের শাস্তিই লাভ করে ঃ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ —আয়াতে বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয় ; বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জান্নাত ও দোযখের বিপদ ও নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই আয়াতের শেষাংশে আরও বলেছেন ঃ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেওয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার দাবি হিসেবেই দেওয়া হয়।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

(১১০) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে

এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে। আর আহ্লে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদের বিশ্বাসে অটল থাকতে এবং 'সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ' করার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশটিকে অধিকতর জোরদার করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সম্প্রদায়কে জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। এর প্রধান কারণই হচ্ছে তাদের উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ!] তোমরাই মানবমণ্ডলীর (হেদায়েতের উপকারের) জন্যে সমুত্থিত শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়। (উপকার করাই এ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এই উপকারের ধরন এই যে,) তোমরা (শরীয়তানুযায়ী অধিক যত্নসহকারে) সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আর (নিজেরাও) আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (অর্থাৎ বিশ্বাসে অটল থাকবে। এখানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণিত যাবতীয় আকীদা ও আমল 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস'-এর অন্তর্ভুক্ত)। যদি আহলে কিতাবগণ (—যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে, তারা যদি তোমাদের ন্যায়) বিশ্বাস স্থাপন করতো, তবে তাদের জন্য অধিক মঙ্গল হতো। (অর্থাৎ তারাও সত্যপন্থীদের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তারা সবাই মুসলমান হয়নি, বরং) তাদের কেউ বিশ্বাসী, (যারা রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে) এবং অধিকাংশই অবিশ্বাসী (রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ ঃ মুসলিম সম্প্রদায়কে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কোরআন পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا আয়াতটি। সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। —(মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড)

আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থেই সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎ কাজে আদেশ দান এবং

অসৎ কাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণতালাভ করেছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের দায়িত্বেও ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে'র কর্তব্য পালন করতে পারতো। মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জিহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর 'ন্যায়' সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে মহানবী (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে—যারা 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে।

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ—বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গম্বর ও উম্মতেরও অভিন্ন গুণ। একে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে কিরূপে আখ্যা দেওয়া হলো ? উত্তর এই যে, আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

আয়াতের শেষাংশে আহ্লে-কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ মু'মিন। বলা বাহুল্য, এঁরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। এঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾

(১১১) যৎসামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণের সাথে আহ্লে-কিতাবগণের শত্রুতা এবং মুসলমানগণের ধর্মীয় ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের পার্থিব ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (অর্থাৎ আহ্লে-কিতাবগণ) তোমাদের (মৌখিক ভালমন্দ বলে অন্তরে) সামান্য দুঃখ প্রদান ব্যতীত কখনও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা (এর বেশি ক্ষতি করার দুঃসাহস করে এবং) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে পিঠটান দিয়ে পালিয়ে যাবে। অতঃপর (আরও বিপদ হবে এই যে,) কোন দিক থেকে তাদের সাহায্য করা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্য সাহাবায়ে-কিরামের সাথে নবুয়তের যমানায় কোন ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদীরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী গোত্রগুলো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

(১১২) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহ্‌র গযব। তাদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ তারা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা যেখানেই থাকুক, তাদের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু (দুই উপায়ে তারা এ লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। [এক] এমন উপায়ে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং [দুই] এমন উপায়ে,) যা মানুষের পক্ষ থেকে। (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপায় এই যে, কোন আহ্‌লে-কিতাব অমুসলিম যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে এবং নিজ ধর্মমতে ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, তবে জিহাদে মুসলমানরা তাকে হত্যা করবে না—যদিও তার কাফিরসুলভ সে ইবাদত পরকালে কোন উপকারে আসবে না। এমনিভাবে কোন আহ্‌লে-কিতাব নাবালেগ অথবা স্ত্রীলোক হলে ইসলামী শরীয়তের আইন তাকেও জিহাদে হত্যা করার অনুমতি নেই। মানুষের পক্ষ থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, আহ্‌লে-কিতাবরা যদি মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে, তবে শরীয়তের আইন অনুযায়ী তারা নিরাপদ হয়ে যাবে—তাদের হত্যা করা জায়েয নয়)। তারা আল্লাহ্‌র কোপের যোগ্য হয়ে গেছে। তাদের জন্য দারিদ্র অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তারা সাহসিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

এ ছাড়া জিযিয়া ও খেরাজ দিয়ে বসবাস করাও দারিদ্র্য, গলগ্রহতা এবং অধঃপতনেরই লক্ষণ)। এগুলো (অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও কোপ) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী অস্বীকার করেছে এবং পয়গম্বরগণকে (তাদের জ্ঞান মতেও) অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। (এই লাঞ্ছনা ও কোপ) এই কারণে (ও) যে, তারা আনুগত্য করেনি, বরং আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের প্রতি গযব ও লাঞ্ছনার অর্থ ঃ সূরা বাকারার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতের إلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ -এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে—(মা'আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড) এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশ্‌শাফ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে। এক. আল্লাহ্র অঙ্গীকার। উদাহরণত নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহ্র নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। দুই بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ অন্যের সাথে সন্ধিচুক্তির কারণে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না। بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফির উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোন অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে। বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যা কিছু শক্তিমদমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায়। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর ওপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। (والله اعلم)

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللهِ اٰنَاءَ

الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ

يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۗ

وَأُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ

وَاللهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ

أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَٰذِهِ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

(১১৩) তারা সবাই সমান নয়। আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা অবিচলভাবে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সিজদা করে। (১১৪) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ে নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল। (১১৫) তারা যেসব সৎ কাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ্ পরহিযগারদের বিষয়ে অবগত। (১১৬) নিশ্চয় যারা কাফির হয়, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো দোযখের আগুনের অধিবাসী—তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে। (১১৭) এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেতে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের উপর কোন অন্যায় করেন নি—কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আহ্লে-কিতাবদের কিছু সংখ্যক মুসলমান এবং বেশির ভাগ কাফির। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ বিষয়বস্তুরই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (আহ্লে-কিতাবরা) সব সমান নয়। (বরং) আহ্লে-কিতাবদের মধ্যেই এক দল রয়েছে, যারা (সত্যধর্মে) প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কোরআন) রাত্রিবেলায় পাঠ করে এবং নামাযও পড়ে। তারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি (পুরোপুরি) বিশ্বাস রাখে এবং (অপরকে) সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং পুণ্য কাজে তৎপরতা প্রদর্শন করে। এরা আল্লাহ্‌র কাছে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যেসব সৎ কর্ম করবে তা থেকে (অর্থাৎ তার সওয়াব থেকে) তাদের বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা পরহিযগারদের সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত রয়েছেন। (তারা যেহেতু পরহিযগার, তাই ওয়াদা অনুযায়ী পুরস্কারের

যোগ্য)। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র (শাস্তির) মোকাবিলায় বিন্দুমাত্রও ফলপ্রদ হবে না। তারা দোযখের অধিবাসী—তাতে তারা সর্বদা অবস্থান করবে (কখনও মুক্তি পাবে না)। তারা (কাফিররা) পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত (নিষ্ফল ও বরবাদ হওয়ার ব্যাপারে) ঐ বাতাসের অনুরূপ, যাতে প্রবল শৈত্য (অর্থাৎ তুষার) থাকে, বাতাসটি ঐসব লোকের শস্যক্ষেতে লাগে যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে। অতঃপর তা (বাতাসটি) একে (অর্থাৎ শস্যক্ষেতকে) ধ্বংস করে দেয়। (এমনিভাবে তাদের ব্যয়ও পরকালে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংস করার ব্যাপারে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি (কোন) অন্যায় করেন নি; বরং তারা স্বয়ং (কুফর করে—যা কবূল হতে দেয় না) নিজেদের ক্ষতি করছিল। (তারা কুফর না করলে তাদের ব্যয় নিষ্ফল হতো না)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ صلے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ
وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ج وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا صلے وَإِذَا
خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ط إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَإِن
تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ط وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ
كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ ع

(১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না ; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না—তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেক গুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (১১৯) দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে

মিশে, বলে—'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের ওপর রোষবশত আঙুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশেই মরতে থাক। আল্লাহ্ মনের কথা ভালই জানেন। (১২০) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই—তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহ্র আয়ত্তে রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের (লোক) ব্যতীত (অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে) কাউকে (মিত্রসুলভ আচরণে) ঘনিষ্ঠ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। (কেননা,) তারা তোমাদের সাথে অঘটন ঘটাতে কোন ত্রুটি করবে না। তারা (মনেপ্রাণেও) তোমাদের (পার্থিব ও ধর্মীয়) ক্ষতি কামনা করে। (তোমাদের প্রতি শত্রুতায়) তাদের মন এতই ভরপুর যে, (মাঝে মাঝে) তাদের মুখ থেকেও (অনিচ্ছাকৃত কথাবার্তায়) শত্রুতা বের হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে, তা আরও গুরুতর। আমি (তাদের শত্রুতার) লক্ষণাদি তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছি। যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক (তবে এসব নিশ্চিত লক্ষণ দ্বারা বুঝে নাও)। শোন, তোমরা তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও ভালবাসা রাখে না (অন্তরেও না এবং বাহ্যিক ব্যবহারেও না)। আর তোমরা সব (খোদায়ী) গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখ। (তাদের গ্রন্থও এ সবেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তোমাদের এ বিশ্বাস সত্ত্বেও তারা তোমাদের প্রতি ভালবাসা রাখে না, অথচ তোমরা তাদের এ বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের প্রতি ভালবাসা রাখ। তাদের বাহ্যিক দাবি শুনে তোমরা মনে করো না যে, তারা তোমাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখে। কেননা,) তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন (শুধু তোমাদের দেখাবার জন্য কপটতার সাথে) বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন (তোমাদের কাছ থেকে) পৃথক হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙুল কামড়াতে থাকে (এটা তীব্র ক্রোধের পরিচায়ক)। আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ তোমরা স্বীয় আক্রোশে মরে যাও (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মরে গেলেও তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথা গভীরভাবে অবগত আছেন। (এ কারণেই তাদের মনের দুঃখ, হিংসা ও শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করে দিয়েছেন। তাদের অবস্থা এই যে, যদি তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হও, (উদাহরণত তোমরা যদি পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও, শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ কর ইত্যাদি) তবে তারা অসন্তুষ্ট হয় (তীব্র হিংসাই এর কারণ)। আর যদি তোমরা অমঙ্গলজনক অবস্থার সম্মুখীন হও, তবে তারা (খুব) আনন্দিত হয়। (তাদের অবস্থা যখন এরূপ, তখন তারা বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের যোগ্য কি করে হবে? তাদের উল্লিখিত অবস্থাদৃষ্টে এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক ছিল না যে, মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনে তারা কোন ত্রুটি করবে না। তাই পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্য বলেন ঃ) যদি

তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। (তোমরা নিশ্চিন্ত থাকলে দুনিয়াতে তারা অকৃতকার্য হবে এবং পরকালে দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কর্মকাণ্ডকে (জানার দিক দিয়ে) বেষ্টন করে আছেন। (তাদের কোন কাজ আল্লাহ্র অজানা নয়। কাজেই পরকালে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবার কোনই উপায় নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযুল ঃ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদীদের সাথে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত ও গোত্রগত—উভয় পর্যায়েই তারা একে অন্যের প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মুসলমান হওয়ার পরও ইহুদীদের সাথে পুরাতন সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাদের লোকেরা ইহুদী বন্ধুদের সাথে ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখে। কিন্তু ইহুদীদের মনে ছিল মহানবী (সা) ও তাঁর দীনের প্রতি শত্রুতা। তাই তারা এমন কোন ব্যক্তিকে আন্তরিকতার সাথে ভালবাসতে সম্মত ছিল না, যে এ ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কাজেই তারা আউস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে বাহ্যত পূর্ব সম্পর্ক বহাল রাখলেও এ সময় মনে মনে তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যিক বন্ধুত্বের আড়ালে তারা মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিসংবাদ সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতে এবং তাদের দলগত গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করতো। আলোচ্য আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা আহ্লে-কিতাবদের এহেন দুরভিসন্ধি থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করেছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ—অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بطانة শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بطانة বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। এ শব্দটি بطن শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর বিপরীত শব্দ ظهر কোন বস্তুর বাহ্যিক দিককে ظهر এবং অভ্যন্তরীণ দিককে بطن বলা হয়। এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে ظِهَارَةٌ এবং ভেতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে তাকে بطانة বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি ঃ সে তার জামা-চাদর। অর্থাৎ সে তার খুব প্রিয়। এমনিভাবে بطانة বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ 'লিসানুল-আরাব'-এ بطانة শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে ঃ

بطانة الرجل صاحب سره ودا خلة امره الذى يشاوره فى احواله •

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بطانة বলা হয়। আল্লামা ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআন গ্রন্থে এবং কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এ অর্থই লিখেছেন। এর সারমর্ম এই যে, যাকে বিশ্বস্ত, অভিভাবক

ও বন্ধু মনে করা হয় এবং নিজ কাজ-কারবারে যাকে উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করা হয়, তাকেই بطانة বলা হয়।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না।

ইসলাম বিশ্বব্যাপী স্বীয় করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয় ; বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেওয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি—উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশংকা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি—উভয়েরই হিফাযত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من اذى ذمياً فا نا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة.

—যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো। আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ অবধারিত।

অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ

منعنى ربى ان اظلم معاهدا ولاغيره—অর্থাৎ কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য কারও প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন। আর এক হাদীসে বলেন ঃ

الامن ظلم معاهداً اوانتقصه اوكلفه فوق طاقته اواخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة.

অর্থাৎ সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও জাতিসত্তার হিফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করো না।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ফারূক (রা)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। হযরত উমর ফারূক (রা) উত্তরে বলেন ঃ

قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنين—অর্থাৎ এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী।

ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

قد انقلبت الاحوال فى هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة وامناء وتسودوا بذلك عند جهلة الاغنياء من الولاة والامراء

অর্থাৎ আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে তারা মূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসছে।

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়—এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করা হয় না।

রাশিয়া ও চীনে কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না–এমন কোন ব্যক্তিকে কোন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা হয় না। এমন কাউকে রাষ্ট্রের উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পতনের কাহিনী পাঠ করলে পতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও দেখা যাবে যে, মুসলমানরা নিজস্ব কাজকর্মে অমুসলিমদের বিশ্বস্ত আমলা, উপদেষ্টা এবং অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের মূলেও এ কারণটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত নির্দেশের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খৃস্টান কপট বিশ্বাসী মুনাফিক হোক কিংবা মুশরিক কেউ তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন-না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুকায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু-মিত্রের

পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ—বাক্যটি কাফিরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন অমুসলিম কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে ... هَاَنْتُمْ اُولَاۤءِ تُحِبُّوْنَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের ভালবাসে না। এছাড়া তোমরা সব ঐশী গ্রন্থেই বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে ঃ আমরা মুসলমান। কিন্তু যখন একান্তে গমন করে, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙুল কামড়াতে থাকে। বলে দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও! নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ এটা কেমন বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়। বরং মূলোৎপাটনকারী শত্রু। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী ; তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন, কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না। এমন কি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নেই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে তাদের অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো।

এ কাফিরসুলভ মনোভাবের আরও ব্যাখ্যা এই যে, اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ অর্থাৎ তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে।

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একটি সহজলভ্য ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হচ্ছে ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا - اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ.

অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহিযগারী অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না।

ধৈর্য ও পরহিযগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য ঃ যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য কোরআন ধৈর্য ও তাকওয়া-পরহিযগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসাবে বর্ণনা করেছে। আলোচ্য রুকূর পরবর্তী রুকূতে বলা হয়েছে ঃ

بَلٰۤى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

—"হ্যাঁ যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, পরহিযগার হও এবং শত্রুসৈন্য তোমাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা

তোমাদের সাহায্য করবেন।" এখানে ধৈর্য ও তাকওয়ার উপরই অদৃশ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে ঃ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ এখানেও ধৈর্য ও পরহিযগারীর সাথে সাফল্যকে জড়িত করা হয়েছে। আলোচ্য সূরার শেষভাগে এভাবে ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ঃ

يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ–হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর, সহিষ্ণু ও সুসংগঠিত হও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর—যাতে তোমরা সফলকাম হও। এতে ধৈর্য ও খোদাভীতির ওপর সাফল্যকে নির্ভরশীল বলা হয়েছে।

ধৈর্য ও তাকওয়া দুটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম! কিন্তু এর মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি বিভাগ এবং সাধারণ ও সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলার একটি চমৎকার নীতি পূর্ণাঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাদীসে আছে ঃ

عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لاعلم اية لواخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجًا الاية.

অর্থাৎ—আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি মানুষ একে অবলম্বন করে তবে ইহকাল ও পরকালের জন্য যথেষ্ট। আয়াতটি এই ঃ ومن يتق الله يجعل له مخرجًا — যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

---

(১২১) আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে—মু'মিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই শুনেন এবং জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো অথচ আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করা মু'মিনদের উচিত। (১২৩) বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, মুসলমানরা ধৈর্য ও তাকওয়ার পথে অটল থাকলে কোন শক্তিই তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা যে সাময়িক পরাজয় ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, তা কিছু সংখ্যক লোকের সাময়িক বিচ্যুতির কারণেই হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা ও বদর যুদ্ধের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আপনি (যুদ্ধের দিনের পূর্বে) মুসলমানদেরকে (কাফিরদের সাথে) যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য সকাল বেলায় ঘর থেকে বের হয়েছিলেন (অতঃপর সবাইকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করে দিয়েছিলেন)। আল্লাহ্ তা'আলা (তখনকার কথাবার্তা) শুনছিলেন (এবং তখনকার) সব অবস্থা জানছিলেন। (এর সাথে এ ঘটনাটিও ঘটে যে) তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকে দুটি দল (বনী সালমা ও বনী হারেসা গোত্রদ্বয়) ভীরুতা প্রদর্শনের সংকল্প করে (যে আমরাও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিকের মত নিজ গৃহে ফিরে যাবো)। আল্লাহ্ তা'আলা এ দুই দলের সাহায্যকারী ছিলেন। (তাই তাদেরকে ভীরুতা প্রদর্শন করতে দেন নি। তিনিই তাদেরকে এ সংকল্প কার্যে পরিণত করা থেকে বিরত রাখেন। ভবিষ্যতের জন্যও আমি সবাইকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা যখন মুসলমান, তখন) মুসলমানদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই উচিত (এবং এমন কাপুরুষতা প্রদর্শন করা উচিত নয়)। এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন। অথচ তোমরা (তখন একেবারেই) দুর্বল ছিলে। (কেননা, কাফিরদের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা কম ছিল। তারা ছিল এক হাজার আর মুসলমানরা ছিল মাত্র তিনশত তেরো। অস্ত্রশস্ত্রও ছিল অনেক কম)। অতএব (ধৈর্য ও খোদাভীতির বদৌলতেই যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়েছিলেন, তখন ভবিষ্যতের জন্য) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর—যাতে তোমরা (এ অনুগ্রহের জন্য) কৃতজ্ঞ হও। (কেননা, শুধু মুখেই কৃতজ্ঞতা হয় না। বরং মুখ ও অন্তর উভয়টির সমন্বয়েই কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হয়। তৎসঙ্গে যথারীতি ইবাদতও হওয়া দরকার। এ অনুগ্রহ লাভে ইবাদতের প্রভাবও প্রমাণিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহুদ যুদ্ধের পটভূমিকা ঃ আলোচ্য আয়াতের তফসীরের পূর্বে ওহুদ যুদ্ধের পটভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে কুরায়শ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কুরায়শদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয় এবং সমসংখ্যক কুরায়শ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এ মারাত্মক ও অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী আযাবের প্রথম কিস্তি। এতে কুরায়শদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করলো, আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব না। তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ

নিয়ে এসেছে, তা সবই এ অভিযানে ব্যয় করা হোক—যাতে আমরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কুরায়শদের সাথে অন্যান্য আরব গোত্রও মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এমনকি, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করলো—যাতে প্রয়োজনবোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন-চার মাইল দূরে ওহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদীনার ভেতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রুশক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বাহ্যত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মত তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুযূর (সা)-এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন জেদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রু-সৈন্যের মোকাবিলা করা উচিত। নতুবা শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন ঃ একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্র ধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ পয়গম্বর কখনও দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যও বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মহানবী (সা) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার সাহাবী। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রায় তিনশ লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শমত যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছু সংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল।

অবশেষে হুযূরে আকরাম (সা) সর্বমোট সাতশ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য স্থাপন করলেন যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকলো পেছনের দিকে। তিনি হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র (রা)-এর হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম (রা)-কে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযা (রা)-এর হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনভার অর্পণ করলেন। পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশজন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন

যে, তাঁরা যেন পশ্চাদ্দিকে টিলার ওপর থেকে হিফাযতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন অবস্থাতেই তাঁরা স্থানচ্যুত হবেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কুরায়শরা বদর যুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করলো।

বিজাতির দৃষ্টিতে মহানবী (সা)-এর সামরিক প্রজ্ঞা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে, একজন কামেল পথ-প্রদর্শক ও পূত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসাবেও তাঁর তুলনা নেই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমরবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের সমরকুশলীরাও মহানবী (সা) প্রদর্শিত রণ-নৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খৃস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ "একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, শুধু সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ (সা) শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাতাড়ি যুদ্ধের মোকাবিলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।" এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যান্ডারসনের। ('লাইফ অফ মোহাম্মদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধের সূচনা ঃ অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। শত্রুসৈন্য ইতস্তত পলায়ন করতে লাগলো। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিকে হুযূর কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল ঃ হুযূরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফির বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ, যিনি তখনও মুসলমান হননি, পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রু সৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক সাহাবী অমিততেজে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারোজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান। হুযূর স্বয়ং আহত। পরাজয়-পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই বাকি ছিল না। এমনি সময়ে

সাহাবীগণ জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিতই রয়েছেন। তখন তাঁরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের ফল। কোরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে।

এ যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে—যা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

ওহুদের ঘটনার কয়েকটি শিক্ষা

১. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুরায়শরা এ যুদ্ধে পুরুষদের পশ্চাদপসরণ রোধ করার জন্য নারীদেরও সঙ্গে এনেছিল। নবী করীম (সা) দেখলেন, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে মহিলারা কবিতা আবৃত্তি করে পুরুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছে ঃ

ان تقبلوا نعانق : ونفرش النمارق
اوتدبروا نفارق : فراق وامق

অর্থাৎ যুদ্ধে অনড় থাকলে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করবো এবং নরম শয্যা বিছিয়ে দেবো। আর যদি পশ্চাদপসরণ কর, তবে আমরা সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবো।

এ সময় নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখে এ দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

اللهم بك اصول وفيك اقاتل حسبى الله ونعم الوكيل.

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি সঞ্চয় করি, তোমার নামেই আক্রমণ পরিচালনা করি এবং তোমার দীনের জন্যই লড়াই করি। আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট—তিনি উত্তম অভিভাবক।" এ দোয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে এবং মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহকেও অন্যান্য জাতির যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে।

২. দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর স্থাপন করেন, যার নযীর ইতিহাসে দুর্লভ। হযরত আবূ দাজানা (রা) নিজ দেহ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঢালের ন্যায় আড়াল করে রেখেছিলেন। শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হচ্ছিল। হযরত তালহা (রা)-ও এমনিভাবে নিজ দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিলেন; কিন্তু প্রিয়তম নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। হযরত আনাস (রা)-এর চাচা আনাস ইবনে নসর (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে অনুতপ্ত ছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং কাফির বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হলো, তখন তিনি তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। ঘটনাক্রমে হযরত সা'দ (রা)-কে পলায়নপর মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে

বললেন ঃ সা'দ কোথায় যাচ্ছ ? আমি ওহুদের পাদদেশে বেহেশতের সুগন্ধ অনুভব করছি। একথা বলে এগিয়ে গেলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদত বরণ করলেন। –(ইবনে কাসীর)

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মাত্র এগারজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত তালহা (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কুরায়শ সৈন্যরা তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কে এদের প্রতিরোধ করবে ? হযরত তালহা (রা) বলে উঠলেন ঃ আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অন্য একজন আনসার সাহাবী বললেন ঃ আমি হাযির আছি। মহানবী (সা) আনসারকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষের আরেকটি দলকে অগ্রসর হতে দেখে তিনি আবার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। এবারও হযরত তালহা (রা) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি নির্দেশ পেলেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন; কিন্তু মহানবী (সা) এবারও অন্য একজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে হযরত তালহা (রা)-এর বাসনা পূর্ণ হলো না। এভাবে সাতবার প্রশ্ন হলো এবং হযরত তালহা (রা) প্রত্যেকবার নির্দেশ লাভে ব্যর্থ হলেন। অন্যান্য সাহাবীকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং তাঁরা শহীদ হয়ে যেতেন।

বদর যুদ্ধে সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও মুসলমানরা জয়লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে বদরের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তবুও পরাজয় বরণ করতে হলো। এতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা এই যে, সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্যের উপরই ভরসা করা উচিত নয় বরং এরূপ মনে করা দরকার যে, বিজয় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। ফলে তাঁর সাথেই সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে।

ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় রণাঙ্গন থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা ও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কথা ব্যক্ত করে লেখা একটি পত্র খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর হস্তগত হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে লিখেছিলেন ঃ

قد جاءني كتابكم تستمدونني واني ادلكم على من هو اعز نصراً واحصن جنداً الله عزوجل فاستنصروه - فان محمداً صلى الله عليه وسلم قد نصر في يوم بدر في اقل من عدتكم فاذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا ترجعوني.

—"তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আমি তোমাদের এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি, যাঁর সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং যাঁর সৈন্যবল অজেয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন! তোমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহাম্মদ (সা) বদর যুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। আমার এ পত্র পৌঁছা মাত্রই তোমরা শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।"

এ ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ পত্র পেয়ে আমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে অগণিত কাফির বাহিনীর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং শত্রুরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল।

হযরত ফারুকে আযম জানতেন, মুসলমানের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও তাঁর সাহায্যের দ্বারাই এর মীমাংসা হয়। হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন পাক এ সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا.

অর্থাৎ হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারেই আসেনি।

এবার আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ—অর্থাৎ আপনি যখন সকাল বেলায় বের হয়ে যুদ্ধার্থ মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যূহে সংস্থাপিত করছিলেন।

ঘটনা বর্ণনায় কোরআন পাকের একটি বিশেষ অলৌকিক পদ্ধতি এই যে, এতে কোন ঘটনা খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয় না। তবে ঘটনায় যেসব বিশেষ নির্দেশ নিহিত থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, উদাহরণত কখন গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন, তা غَدَوْتَ শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়ালের সকাল বেলা।

এরপর বলা হয়েছে, এ সফর কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছিল। مِنْ اَهْلِكَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সময় তিনি পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁদের সেখানে রেখেই তিনি বের হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আক্রমণটি মদীনার উপরই হওয়ার কথা ছিল। এসব খুঁটিনাটি ঘটনায় এ নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেলে তা পালন করতে পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতা অন্তরায় না হওয়াই উচিত। এরপর গৃহ থেকে বের হয়ে রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছার খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ দিয়ে রণাঙ্গনের প্রথম কাজ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

অর্থাৎ আপনি যুদ্ধার্থ মুসলমানদের উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করছিলেন। অতঃপর আয়াতটি এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। এ দুটি গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তখন শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে যা বলাবলি করছিল, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার জানা হয়ে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তার কোনটিই তাঁর অজানা নয়। এমনিভাবে এ যুদ্ধের পরিণামও তাঁর অজ্ঞাত নয়।

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا—অর্থাৎ তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এ বিষয়টি যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا বাক্যটি তাদের ঈমানের পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের কোন কোন বুযুর্গ বলতেন ঃ

আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا বাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে।

এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জামের ওপর ভরসা করা মুসলমানদের উচিত নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার পর ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ওপরেই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই বনী হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার।

'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যমত শ্রেষ্ঠ গুণ। সূফী বুযুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বোঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায়াদির জন্য গর্ব না করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রণাঙ্গনে পৌঁছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরি করা, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা করে সাহাবায়ে-কিরামকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী (সা) স্বহস্তে এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপায়াদিও আল্লাহ্ তা'আলার অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি- সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই করে। পক্ষান্তরে অ-মুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামী যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

অতঃপর ঐ যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হচ্ছে—যাতে মুসলমানরা পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ—অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য।

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান ঃ মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম বদর। তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। এখানেই তওহীদ ও শিরকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান মোতাবেক ৬২৪ খৃস্টাব্দের ১১ মার্চ শুক্রবার। এটি বাহ্যত একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই

কোরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

আমেরিকার প্রফেসর হিট্টি 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন— এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়।

وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ —অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে নগণ্য ছিলে। সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের সঙ্গে অশ্ব ছিল মাত্র ২টি এবং উট ৭০টি। সৈন্যরা পালাক্রমে এগুলোর ওপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ —অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় কর—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

কোরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধৈর্য ও খোদাভীতিকে প্রতিকার হিসাবে বর্ণনা করেছে। বলা বাহুল্য, এ দুটি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্র প্রতি ভয় এই দুই বিষয়ের উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্র প্রতি ভয়-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ, তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلٰٓى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ
هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ
اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ
فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

(১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মু'মিনগণকে—'তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন ! (১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (১২৬) বস্তুত এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আনতে পারে। আর সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে, (১২৭) যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফিরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন—যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। (১২৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সে সবই আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওহুদ যুদ্ধের বর্ণনায় প্রসঙ্গক্রমে বদরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অদৃশ্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই কিছু বিবরণ ও ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ থেকে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত। বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য তখন হয়েছিল যখন আপনি (হে মুহাম্মদ) মুসলমানদের বলছিলেন ঃ তোমাদের (মনোবল দৃঢ় করার) পক্ষে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের পালনকর্তা তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন—যাদের (এ কারণেই আকাশ থেকে) নাযিল করা হবে। (এতে বোঝা যায় যে, তাঁরা উচ্চস্তরের ফেরেশতা হবেন। নতুবা পৃথিবীস্থিত ফেরেশতাদেরও এ কাজে লাগানো যেতো। [রূহুল-মা'আনী] অতঃপর এ প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেন ঃ) হ্যাঁ, (কেন যথেষ্ট হবে না। অতঃপর সাহায্য আরও বাড়িয়ে দেওয়ার ওয়াদা করে বলা হয়েছে সংঘর্ষের সময়) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং খোদাভীতিতে অটল থাক (অর্থাৎ আনুগত্য বিরোধী কাজে লিপ্ত না হও,) এবং তারা আকস্মিক তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, (যাতে স্বভাবতই কোন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পৌঁছা কঠিন। তবে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার বিশেষ চিহ্নিত ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। সাধারণ যুদ্ধে নিজ নিজ সেনাদলের পরিচয়ের জন্য যেমন বিশেষ চিহ্ন ও পোশাক থাকে। অতঃপর এ সাহায্যের রহস্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে) আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাদের দ্বারা) উপরোক্ত সাহায্য শুধু এজন্য করেছেন, যাতে তোমাদের (বিজয়ের) সুসংবাদ হয় এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তর সুস্থির হয়। সাহায্য (ও প্রাধান্য) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে—যিনি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। (পরাক্রান্ত হওয়ার কারণে এমনিতেও জয়ী করতে পারেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী

হওয়ার কারণে জ্ঞানের দাবি মোতাবেক বাহ্যিক উপায়াদি সরবরাহ করেন। এ পর্যন্ত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার রহস্য বর্ণিত হলো। অতঃপর মুসলমানদেরকে এ বিজয় কেন দেওয়া হলো, তার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে) যাতে তিনি কাফিরদের একটি দলকে নাস্তানাবুদ করে দেন। (এ কারণেই সত্তরজন কাফির সরদার নিহত হয়েছিল) অথবা তাদেরকে (অর্থাৎ কিছু সংখ্যককে) লাঞ্ছিত করে দেন অতঃপর তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়। (অর্থাৎ এতদুভয়ের একটি হবে। উভয়টি হলে আরও উত্তম। কার্যক্ষেত্রে উভয়টি হয়েছিল। সত্তরজন কাফির সরদার নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিল। অবশিষ্টরা অকৃতকার্য অবস্থায় পলায়ন করেছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য ঃ এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহরণত কওমে-লূতের বস্তি একা জিবরাঈল (আ)-ই উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফিরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কুরআন পাক وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى আয়াতে দিয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া। আয়াতের শব্দ اِلاَّ بُشْرٰى এবং لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ—অস্থির হতে দিয়ো না। অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সূফীবাদী সাধকগণের নিয়মমাফিক 'তাসাররুফ' তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেওয়া।

আরেকটি পন্থা, কোন না কোন উপায়ে মুসলমানদের সামনে এ কথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এ সব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ—আয়াতের এক তফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে আছে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের ওপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। (হাকেম)

কোন কোন সাহাবী জিবরাঈল (আ)-এর আওয়াজও শুনেছেন যে, তিনি اقدم حيزوم বলেছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেশতাকে দেখেছেনও। —(মুসলিম)

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেওয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো কখনো উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফিরদের রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদত ও গোনাহ্ মিশ্রভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্য হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি ? উত্তর এই যে, সূরা আনফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ (যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের) শত্রু সংখ্যা এক হাজার দেখে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয় অর্থাৎ শত্রু সংখ্যা যত, তত সংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ.

—যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো।

এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে—মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটি এই ঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ.

সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবত এই যে, বদরে মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরায়শদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে। (রূহুল মা'আনী)

পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলমানদের তিন গুণ বেশি ছিল। এ সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়—যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বেশি হয়ে যায়।

অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেওয়া হয়। শর্ত ছিল দুইটি ঃ (এক) মুসলমানগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতির উচ্চস্তরে পৌঁছলে, (দুই) শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমণ না

হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ —এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নিচের চারটি দাঁতের মধ্য থেকে নিচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ যারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে ? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাফিরের জন্য বদদোয়াও করেছিলেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ থেকে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ —পর্যন্ত। হে মুহাম্মদ ! কারও মুসলমান হওয়া ও কাফির থাকার ব্যাপারে আপনার নিজের কোন দখল নেই (জানার দখল হোক অথবা সামর্থ্যের)। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও অধিকারের আওতাভুক্ত। আপনার উচিত ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি হয় (অনুগ্রহের) দৃষ্টি দান করবেন (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার তওফীক দেবেন। তখন আপনার ধৈর্য আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে) না হয় তাদেরকে (দুনিয়াতে) কোন শাস্তি দেবেন। (তখন ধৈর্য মনের শান্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে শাস্তি দান মাত্রও অন্যায় নয়।) কারণ, তারা বড়ই জুলুম করছে। (এখানে জুলুমের অর্থ কুফর ও শিরক। যেমন ان الشرك لظلم عظيم আয়াতে শিরককে বড় জুলুম বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরও জোরদার করা হয়েছে।) যা কিছু নভোমণ্ডলে ও যা কিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেন। এতে সে ক্ষমার অধিকারী হয়)। এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সামর্থ্য হয় না। ফলে সে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করে)। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (কাজেই ক্ষমা করা আশ্চর্য নয়। কেননা, তাঁর দয়াই প্রবল)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا
اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

(১৩০) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার। (১৩১) এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা সুদ খেয়ো না (অর্থাৎ গ্রহণ করো না, মূলধন থেকে) কয়েক গুণ বেশি (করে)। আল্লাহ্কে ভয় কর—আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (অর্থাৎ জান্নাত ভাগ্যে জুটবে এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাবে) এবং সেই আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা (প্রকৃতপক্ষে) কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে (সুদ ইত্যাদি হারাম কার্য থেকে বেঁচে থাকাই আগুন থেকে বেঁচে থাকার উপায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً কয়েক গুণ বেশি, অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারের সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে—যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ

مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

(১৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। (১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহিযগারদের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (সানন্দে) আল্লাহ্ ও (তাঁর) রাসূলের আনুগত্য কর, আশা করা যায়, তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতে) তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে ধাবিত হও ; (উদ্দেশ্য এই যে, এমন সৎকর্ম অবলম্বন কর, যার কারণে পালনকর্তা তোমাদের ক্ষমা করেন এবং তোমরা জান্নাত লাভ কর। জান্নাতটি এমন যে,) যার বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও

ভূমণ্ডলের মত (তা অবশ্য বেশিও হতে পারে। বাস্তবে বেশি বলেই প্রমাণিত)। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে পরহিযগারদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক. প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলের আনুগত্য যদি হুবহু আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র কিতাব কোরআনের আনুগত্য হয়ে থাকে, তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি ? পক্ষান্তরে যদি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবে তা কি ?

দুই. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহিযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবিকে বলা হয় না ; বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়।

রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার রহস্য ঃ প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রথম আয়াত ঃ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্র করুণা লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কোরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রাসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআনের আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু বলেন, সবই আল্লাহ্র নির্দেশে বলেন—নিজের পক্ষ থেকে বলেন না। এক আয়াতে আছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না; বরং তাঁর সব কথাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। সারমর্ম এই যে, রাসূলের আনুগত্য হুবহু আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য—এ থেকে পৃথক কিছু নয়। সূরা নিসার ৭৯তম আয়াতে এ কথাই সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে ঃ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ অর্থাৎ যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করে।

অতএব প্রশ্ন হয় যে, তাই যদি হবে, তাহলে এ দুটি আনুগত্যকে সমগ্র কোরআনে চিরাচরিত রীতি হিসাবে পৃথক পৃথক বর্ণনা করার উপকারিতা কি ?

এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জগতের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি গ্রন্থ এবং একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। কোরআন পাকের আয়াতসমূহ যেভাবে এবং যে ভঙ্গিতে

নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি রাসূলের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষকে বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন।

তৃতীয়ত, তিনি কোরআনের বিষয়বস্তু মানুষকে শিক্ষা দেবেন এবং এর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করবেন। এ ছাড়া মানুষকে হিকমতের শিক্ষা দেবেন। এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

এতে বোঝা যায় যে, শুধু কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই রাসূলের কর্তব্য নয় ; বরং কোরআন শিক্ষা দেওয়া এবং তার বিশ্লেষণ করাও তাঁরই দায়িত্ব। আর একথাও জানা যায় যে, তাঁর সম্বোধিত ব্যক্তিগণ ছিলেন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী আরব। তাদেরকে কোরআন শিক্ষা দানের অর্থ শুধু শব্দের আভিধানিক অর্থ বলে দেওয়া কিছুতেই নয়। কেননা, আভিধানিক অর্থ তাদের অজানা ছিল না। বরং এ শিক্ষাদান ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, কোরআন পাক যেসব নির্দেশ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, তিনি তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এমন ওহীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, যা কোরআনের ভাষায় নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে জাগ্রত করবেন। اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণত কোরআন পাক অসংখ্য জায়গায় শুধু اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও) বলে বক্তব্য শেষ করেছে। নামাযের কিয়াম, রুকূ ও সিজদা কোন কোন জায়গায় উল্লেখ করলেও তা অস্পষ্ট। এগুলোর ধরন উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) স্বয়ং এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এসব আরকান বিস্তারিতভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

যাকাতের বিভিন্ন নেসাব, প্রত্যেক নেসাবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ, কোন্ মালে যাকাত ওয়াজিব, কোন্ মালে ওয়াজিব নয়, নেসাবের পরিমাণে কতটুকু অংশ যাকাতমুক্ত— এসব বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে দান করেছেন এবং ফরমান আকারে লিপিবদ্ধ করিয়ে সাহাবায়ে কিরামের হাতে সোপর্দ করেছেন।

কোরআন পাক এক আয়াতে নির্দেশ দিয়েছে ঃ

لاَتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ—তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।

এখন প্রচলিত কাজ-কারবার কেনা-বেচা ও ইজারার মধ্যে কোনটি অন্যায় ও অবিচারমূলক এবং কোনটিতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়—এসব বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) খোদায়ী নির্দেশে উম্মতকে বলে দিয়েছেন। শরীয়তের অন্য সব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত এসব বিবরণ কোরআনে উল্লিখিত নেই। এমতাবস্থায় কোন অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কোন ধোঁকা খাওয়া অবাস্তব নয় যে, এসব বিবরণ যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত নয়, তাই আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে এগুলো পালন করা জরুরী নয়। এ সম্ভাবনার ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র কোরআনে বারবার স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্যকেও অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করেছেন। রাসূলের আনুগত্য বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য হলেও বাহ্যিক আকার ও বিশদ বিবরণের দিক দিয়ে কিছুটা স্বতন্ত্রও। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বারবার জোরের সাথে বলে দিয়েছেন যে, রাসূল তোমাদের যা নির্দেশ দেন, তাও আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মনে করে পালন কর—কোরআনে তা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত থাকুক বা না থাকুক। এ প্রশ্নটি শুধু অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ধোঁকার কারণই নয় ; বরং ইসলামের শত্রুদের জন্যও একটি হাতিয়ার ছিল। তারা এর দ্বারা ইসলামের মূলনীতিতে অনর্থ সৃষ্টি করে মুসলমানদের ইসলামের বিশুদ্ধ পথ বিচ্যুত করতে পারতো। এ কারণে কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি শুধু 'রাসূলের আনুগত্য' শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত করেনি ; বরং বিভিন্ন ভঙ্গিতে উম্মতের সামনে তুলে ধরেছে। উদাহরণত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তব্যকর্মের মধ্যে গ্রন্থ শিক্ষাদানের সাথে হিকমত শিক্ষাদান যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গ্রন্থ ছাড়া আরও কিছু বিষয় তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তাও মুসলমানদের অবশ্য পালনীয়। 'হিকমত' শব্দ দ্বারা তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ— অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে—তিনি অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মর্ম, লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করবেন।

কোথাও ইরশাদ হয়েছে ঃ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا— অর্থাৎ রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। এসব ব্যবস্থা এ জন্য করা হয়েছে, যাতে আগামীকাল কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা শুধু কোরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট হয়েছি। যা কোরআনে নেই, তা পালন করতে আমরা আদিষ্ট নই। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভবত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝে নিয়েছিলেন যে, কোন এক যুগে এমন লোকও পয়দা হবে যারা রাসূলের শিক্ষা থেকে গা বাঁচানোর জন্য দাবি করে বসবে যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাব কোরআনই যথেষ্ট। তাই এক হাদীসে তিনি পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لاالفين احدكم مُتكئا على اريكته ياتيه الامر من امرى ممّا امرت به اونهيت عنه فيقول لا ادرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه-

অর্থাৎ আমি যেন তোমাদের কাউকে না পাই যে, সে আরাম কেদারায় পা এলিয়ে বসে আমার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে এ কথা বলে বসে যে, আমরা এসব জানি না; আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে যা পাওয়া যায় আমরা তা-ই পালন করবো। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ)

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন জায়গায় বারবার রাসূলের আনুগত্যের উল্লেখ, বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূল প্রদত্ত বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ এগুলো সব একটিমাত্র

আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। তা এই যে, যাতে কেউ হাদীসের ভাণ্ডারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণিত বিস্তারিত বিধি-বিধানকে কোরআন থেকে পৃথক এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য থেকে ভিন্ন মনে করে অস্বীকার করে না বসে। প্রকৃতপক্ষে তা কোরআন থেকে পৃথক নয়।

گفته او گفته الله بود - گرچه از حلقوم عبد الله بود

তাঁর উক্তি আল্লাহ্রই উক্তি—যদিও তা আল্লাহ্র বান্দার মুখ থেকে নিসৃত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন ; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন', হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিজরত', আনাস ইবনে মালেক 'নামাযের প্রথম তকবীর', সায়ীদ ইবনে জুবায়ের 'ইবাদত পালন', যাহ্হাক 'জিহাদ' এবং ইকরামা 'তওবা' বলেছেন। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক. এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ যে কাজের দৌলতে আল্লাহ্ একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তা অর্জন করার বাসনা করো না ; বলে অন্যের অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধও করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণত শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া, বুযুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। (দুই) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হিকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নেই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ, সে যদি শ্বেতাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি ? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন, সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা শুধু এক আয়াতে নয়, বহু আয়াতে এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ পুণ্যার্জনে একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি কারও মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ত্রুটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয়

কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা, সে যদি নিজ ত্রুটির জন্য অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্য হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل احد الجنة عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته-

—"সততা ও সত্য অবলম্বন কর। মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললো ঃ আপনাকেও নয় কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তর হলো ঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।"

মোট কথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎ কর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব, সৎ কর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিত নয়। আল্লাহ্র ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণ হেতু এর প্রতি গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে একে এককভাবে উল্লেখ না করে مغفرة من ربكم বলা হয়েছে। 'প্রতিপালকত্ব' বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে আরও কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রশস্ততাকে বোঝাবার জন্য এদের সাথে তুলনা করে যেন বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ মালুম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেওয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় 'মূল্য' তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়— এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও।

তফসীরে কবীরে বলা হয়েছে ঃ

قال ابو مسلم ان العرض هنا ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع اى ثمنها لو بيعت كثمن السماوات والارض والمراد بذالك عظم مقدارها وجلالة خطرها وانها لايساويها شيئ وان عظم.

—"আবূ মুসলিম বলেন ঃ আয়াতে عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবিলায় মূল্য হিসাবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয়, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।"

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে ঃ اعدت للمتقين। অর্থাৎ জান্নাত মুত্তাকিগণের জন্য নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার যমীন।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۠ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

---

(১৩৪) যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে হজম করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। (১৩৫) তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের জন্য কোন মন্দ কাজ করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন ? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তাই করতে থাকে না। (১৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান! (১৩৭) তোমাদের অতীত হয়েছে অনেক বিধানাবলী। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে, তাদের জন্য উপদেশবাণী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে (সর্বাবস্থায় সৎ কাজে) ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে (ভুলত্রুটিতে) ক্ষমা করে, আল্লাহ্ এমন সৎকর্মশীলদের (যাদের মধ্যে এসব গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তাদেরকে) ভালবাসেন। (উল্লিখিতদের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্তরের মুসলমান এমনও আছে) যারা (অন্যের প্রতি জুলুম হয়, এমন কোন) অশ্লীল কাজ করলে অথবা (কোন গোনাহ্ করে ফেললে বিশেষভাবে) নিজের ক্ষতি করলে (তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তাঁর মহত্ত্ব ও আযাবকে) স্মরণ করে, অতঃপর স্বীয় গোনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (অর্থাৎ ক্ষমার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করে। অন্যের ওপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকেও ক্ষমা নেয়। বিশেষভাবে নিজের সম্পর্কে গোনাহ্ হলে, এতে এর প্রয়োজন নেই। তবে উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্র কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে)। আর আল্লাহ্ ছাড়া কে আছে যে গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করবে? (হকদারদের ক্ষমা করা প্রকৃত ক্ষমা নয়। কারণ তারা শাস্তি থেকে বাঁচাবার অধিকার রাখে না। প্রকৃত ক্ষমা একেই বলা হয়) এবং তারা স্বীয় কর্মের জন্য হঠকারিতা করে না এবং তারা (এ সব বিষয়) জানেও (যে, আমরা অমুক গোনাহ্ করেছি, আমাদের অবশ্যই তওবা করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা কর্মসমূহও সংশোধন করে নেয় এবং বিশ্বাসও ঠিক রাখে)। তাদের পুরস্কার পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং (বেহেশতের) এমন উদ্যানসমূহ, যাদের (বৃক্ষ ও গৃহের) তলদেশ দিয়ে ঝরনা প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এ ক্ষমা ও জান্নাত অর্জনের নির্দেশ ছিল। মাঝখানে এর উপায় বর্ণিত হয়েছে এবং পরিশেষে তা দান করার ওয়াদা করা হয়েছে। এটা) কি চমৎকার প্রতিদান এসব কর্মীর! (কর্ম হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা ও সুবিশ্বাস। ক্ষমা প্রার্থনার ফলশ্রুতি আনুগত্য)। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা (পন্থার লোক) অতিক্রান্ত হয়েছে, (তাদের মধ্যে মুসলমান ও কাফির সবাই ছিল এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পরিণামে কাফিররাই ধ্বংস হয়েছে। তোমরা যদি তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে চাও, তবে) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অতঃপর দেখে নাও যে, মিথ্যারোপকারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) পরিণাম কিরূপ হয়েছে? (অর্থাৎ তারা ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ - وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً وَانَّهُمَا لَبِامَامٍ مُّبِيْنٍ ইত্যাদি। এটা (উল্লিখিত বিষয়বস্তু) মানুষের জন্য যথেষ্ট বর্ণনা (এতে চিন্তা করলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে) এবং মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ [অর্থাৎ তারাই হেদায়েত ও উপদেশ গ্রহণ করে। (বস্তুত) অনুরূপ আমল করাই হেদায়েত]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসী মুত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণত কোরআন পাক স্থানে স্থানে সৎ লোকদের সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর

দিয়েছে। কোথাও صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে দীনের সরল বিশুদ্ধ পথে যাঁরা চলেছেন তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ বলে তাদের সংসর্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ—উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মুত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলীর বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মুত্তাকীদের গুণাবলী ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের উচ্চ স্তর বিধৃত করে সৎ লোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলীকে 'হুকূকুল ইবাদ' (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলীকে 'হুকূকুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র হক) বলা যেতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে এবং আল্লাহ্‌র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহ্‌র অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নেই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নেই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে। তাঁর ইবাদত দ্বারা স্বয়ং ইবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতাও বটে। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ত্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে, তখনই তাঁর দয়া ও দানের দরবার থেকে এক নিমেষের মধ্যে তওবাকারীর সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে। হুকূকুল ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেওয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজে সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ত্রুটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যোগাযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধও শান্তি-সখ্যতায় পরিবর্তিত

হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ—অর্থাৎ মুত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। সচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশি হলে বেশি এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে-না। কেননা, হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা, আল্লাহ্র কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপর দিকে আয়াতে নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবত এর বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে—তা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনও অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব, প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হলো এই যে বিশ্বাসী, আল্লাহ্ভীরু এবং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন ; তাঁরা সচ্ছলই হোন কিংবা অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার মাত্র একটি আঙুরের দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া কিছুই ছিল না। বর্ণিত আছে যে, জনৈক মনীষী একবার একটি পিয়াজ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اتقوا النار ولو بشق تمرة - وردوا السائل ولو بظلف شاة

অর্থাৎ খেজুরের একটি টুকরা দিয়ে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর এবং ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না, একটি ছাগলের খুর হলেও তাকে দান কর।

তফসীরে কবীরে ইমাম রাযী একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ভাষণ প্রসঙ্গে মুসলমানদের সদকা দানে উৎসাহ দান করলে যাদের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল, তারা তা-ই দিয়ে দিল। জনৈক ব্যক্তি খেজুরের ছাল নিয়ে এল এবং বলল ঃ আমার কাছে আর খিছু নেই। অতঃপর তাই দান করা হলো। অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কাছে দান করার মত কিছুই নেই। তবে আমি স্বীয় সম্মানই দান করলাম। ভবিষ্যতে কেউ আমাকে হাজার মন্দ বললেও আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যাবলী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় শুধু ধনী ও বিত্তশালীদের ভূমিকা নয়—দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও এ গুণে

গুণান্বিত হতে পারে। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করে দরিদ্ররাও এ মহান গুণ অর্জন করতে চাইলে তাতে কোন বাধা নেই।

আল্লাহ্‌র পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয় ঃ আয়াতে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন يُنْفِقُوْنَ বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ-সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত কেউ যদি তার সময় কিংবা শ্রম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তফসীরে কবীর বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য ঃ এ দু' অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্‌র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না। এ অর্থে কবি জাফর শাহ্ দেহলভীর নিম্নোক্ত পংক্তিটি চমৎকার বটে ঃ

ظفر آدمی اسکونہ جانیےگا خواہ ہو کتناہی صاحب فہم وذکا جسے
عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا ۔

অতঃপর আল্লাহ্-ভীরুদের দ্বিতীয় বিশেষ গুণ ও লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কেউ তাদের কষ্ট দিলে তারা তার প্রতি ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয় না এবং ক্রোধবশে প্রতিশোধও গ্রহণ করে না। শুধু তাই নয়, অতঃপর তারা মনেপ্রাণে ক্ষমাও করে দেয় এবং ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হয় না—কষ্টদাতার প্রতি অনুগ্রহও করে। এ যেন এক গুণের ভেতরে তিন গুণ ঃ স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করা, কষ্টদাতাকে ক্ষমা করা, অতঃপর তার প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা। আয়াতে এ তিনটি গুণই উল্লিখিত হয়েছে।

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থাৎ যারা ক্রোধ সংবরণ করে, অপরের ত্রুটি মার্জনা করে বস্তুত আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।

ইমাম বায়হাকী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আলী ইবনে হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহুর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী ইবনে হুসাইনের এক বাঁদী একদিন তাঁকে ওযূ করানোর সময় হঠাৎ পানির পাত্র হাত থেকে ফসকে গিয়ে হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা)-এর উপর পড়ে যায়। এতে তাঁর সব কাপড়-চোপড় ভিজে যায়। এমতাবস্থায় রাগান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। বাঁদী বিপদের আশংকা করে তৎক্ষণাৎ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ আয়াতটি পাঠ করল। আয়াতটি শোনামাত্রই নবীবংশের বুযুর্গ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা)-এর ক্রোধানল একেবারে নিভে গেল। তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর বাঁদী দ্বিতীয় বাক্য وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ পাঠ করল। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোকে মাফ করে দিলাম। বাঁদীটি

ছিল অত্যন্ত চতুর। সে অতঃপর তৃতীয় বাক্যটিও শুনিয়ে দিল ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ যাতে প্রকারান্তরে অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। এ বাক্যটি শুনে হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা) বললেন ঃ যাও আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম। (রূহুল মা'আনী)

অপরের দোষক্রটি মার্জনা করা মানব চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। আখিরাতে এর প্রতিদানও অনেক বড়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হবে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কারও কোন পাওনা থাকলে দাঁড়িয়ে যাও। তখন ঐসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা দুনিয়াতে অপরের অত্যাচার-উৎপীড়ন ক্ষমা করেছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ سَرَّه ان يُّشْرَفَ له البنيان وتُرْفَع له الدرجات فَلْيَعْفُ عن من ظلمه ويُعْطِ مَنْ حَرَمَهٗ وَيَصِلُ من قطعهٗ-

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জান্নাতে তার সুউচ্চ প্রাসাদ এবং মর্যাদা কামনা করবে, তার উচিত যে অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা করা, যে তাকে কখনও কিছু দেয় না, তাকে বখশিশ ও উপঢৌকন দেয়া এবং যে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে মেলামেশা করে।"

কোরআন পাক অন্য এক আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় অন্যায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করার মহান চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে এবং বলেছে যে, এর বদৌলতে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়। বলা হয়েছে ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

অর্থাৎ "মন্দকে অনুগ্রহের দ্বারা প্রতিরোধ কর। এরূপ করলে যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমনি উচ্চ পর্যায়ের চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল ঃ

صِلْ من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك

অর্থাৎ "যে আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, আপনি তার সাথে মেলামেশা রাখুন। যে আপনার প্রতি জুলুম করে, আপনি তাকে ক্ষমা করুন। যে আপনার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শান তো অনেক উর্ধ্বে। তাঁর শিক্ষার বরকতে আল্লাহ্ তাঁর অনুসারী ভক্তদের মধ্যেও এ চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সাহাবী, তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী মনীষিগণের ইতিহাস এ জাতীয় ঘটনায় ভরপুর।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-কে জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালিগালাজ করে। তিনি ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং তাকে কিছুই বললেন না। ঘরে ফিরে আসার পর একটি খাঞ্চায় যথেষ্ট পরিমাণ রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা রেখে তিনি সে ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। দরজার কড়া নাড়তেই লোকটি বের হয়ে এলো। তিনি স্বর্ণমুদ্রার খাঞ্চাটি তার সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন ঃ আজ আপনি আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। স্বীয় পুণ্য সব আমাকে দান

করেছেন। এ অনুগ্রহের প্রতিদানে এ উপঢৌকন পেশ করছি, গ্রহণ করুন। লোকটির অন্তরে ইমাম সাহেবের এ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে চিরতরে তওবা করে ইমাম সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। এরপর সে ইমাম সাহেবের সংসর্গে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগল এবং পরিশেষে তার শিষ্যদের মধ্যে একজন বড় আলিমের মর্যাদা লাভ করল।

অতঃপর আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে, কখনও মানবিক দুর্বলতাবশত তাদের দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার কঠোর সংকল্প করে। বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

এতে এক নির্দেশ এই যে, গোনাহে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার কারণ। এ কারণে গোনাহ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করা এবং যিকিরে মশগুল হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, পাপ মার্জনার জন্য দুটি বিষয় জরুরী। এক. বিগত পাপের জন্য অনুতাপ করা এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করা। দুই. ভবিষ্যতে এ পাপের ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কোরআন-নির্দেশিত মহান চরিত্র দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন !!

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِنْ
يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۪ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

(১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে থাক তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান—কারা ঈমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (১৪১) আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান। (১৪২) তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে পুনরায় ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, পরিণামে কাফিররাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি। যদিও তোমরা এখন নিজ দোষে পরাজিত হয়েছ ; কিন্তু ঈমানের দাবি মোতাবেক তাকওয়া-পরহিযগারীতে অটল থাকলে পরিশেষে কাফিররাই পরাজিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (এখন পরাজিত হয়েছ, তাতে কি?) সাহস হারিয়ো না এবং দুঃখ করো না। অবশেষে তোমরাই জয়ী হবে—যদি তোমরা পুরোপুরি বিশ্বাসী হও (অর্থাৎ বিশ্বাসের দাবিতে অটল থাক)। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে (যেমন ওহুদে লেগেছে,) তবে (তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এতে কতিপয় রহস্য রয়েছে। একটি এই যে,) সেই সম্প্রদায়েরও (অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদেরও) তদ্রূপ আঘাত লেগেছে। (বিগত বদর যুদ্ধে তারাও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আর আমার নীতি হলো এই যে,) আমি এ দিবসগুলোকে (অর্থাৎ জয়-পরাজয়ের দিনগুলোকে) মানুষের মধ্যে পরিক্রমণ করাই। (অর্থাৎ কখনও এক সম্প্রদায়কে বিজয়ী ও অপর সম্প্রদায়কে পরাজিত করে দেই এবং কখনও এর বিপরীত করে দেই। এ নীতি অনুযায়ীই তারা গত বছর পরাজিত হয়েছিল এবং এবার তোমরা পরাজিত হয়েছ। দ্বিতীয় রহস্য এই যে,) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন; (কেননা, বিপদের মধ্য দিয়েই খাঁটি লোকদের পরীক্ষা হয়। তৃতীয় রহস্য এই যে,) যাতে তোমাদের কিছু সংখ্যককে শহীদ করে নেন। (অবশিষ্ট রহস্যগুলো পরে বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে 'প্রাসঙ্গিক বাক্য' হিসাবে বলা হচ্ছে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা জুলুম (কুফর ও শিরক)-কারীদের ভালবাসেন না। (কাজেই মনে করো না যে, ভালবাসার পাত্র হওয়ার কারণে তাদের জয়ী করা হয়েছে। কখনই নয়। চতুর্থ রহস্য এই যে,) যাতে বিশ্বাসকারীদেরকে (গোনাহ্র) ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন (কেননা, বিপদাপদ দ্বারা চরিত্র ও কাজকর্ম বিধৌত হয়ে যায়। পঞ্চম রহস্য এই যে,) যাতে কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। (কেননা, জয়লাভে সাহসী হয়ে তারা পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নের কারণে

আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে)। শোন, তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে (বিশেষভাবে) প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এখনও (প্রকাশ্যভাবে) তাদের দেখেন নি, যারা তোমাদের মধ্য থেকে (যথেষ্টভাবে) জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে ধৈর্য ধারণ করে ? তোমরা তো মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (শহীদ হয়ে) মরে যাবার (খুব) বাসনা করতে। অনন্তর (বাসনা অনুযায়ী) একে (অর্থাৎ মৃত্যুর কারণসমূহকে) খোলা চোখে দেখে নিয়েছ। (এখন মৃত্যুকে দেখে কেন পলায়ন করতে লাগলে ? মৃত্যু কামনা কেন ভুলে গেলে ?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। এক. রাসূলুল্লাহ্ (সা) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়নি। কেউ বলতো ঃ আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল, এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। দুই. খোদ নবী করীম (সা)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তিন. মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও হতভাগ্যরা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক. অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। দুই. এ আশংকা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অংকুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য কোরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না। এবং অতীতের জন্যও বিমর্ষ ও বিষণ্ন হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল (সা)-এর আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

কোরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সাহাবায়ে কিরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্য তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি, প্রভাব ও সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ ঈমান ও তার দাবিসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

এ আয়াতের পর ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ওহুদে তোমাদের সত্তরজন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে। এক বছর পূর্বে তাদেরও সত্তরজন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল। স্বয়ং এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল। তাই কোরআন বলে ঃ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ-

অর্থাৎ—"তোমাদের গায়ে ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতিপূর্বে এমনি ক্ষত লেগেছে ; আমি এ দিনগুলোকে পালাক্রমে পরিক্রমণ করাই। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে।"

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে কোন মিথ্যা শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপন্থীদের হতোদ্যম হয়ে পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিণামে সত্যপন্থীরাই জয়যুক্ত হবে।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ

اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ

اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৪) আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে ? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্র কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাদের সওয়াব দান করবেন। (১৪৫) আর আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না—সে জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুহাম্মদ (সা) রাসূল বৈ তো নন (আল্লাহ্ তো নন যে, তাঁর নিহত হওয়া অথবা মৃত্যুবরণ সম্ভবপর নয়)। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। (এমনিভাবে তিনিও একদিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবেন)। অতএব যদি তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় অথবা তিনি শহীদ হয়ে যান, তবে তোমরা কি (জিহাদ অথবা ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে ? (যেমন, এ যুদ্ধে কোন কোন মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল এবং মুনাফিকরা ধর্মত্যাগে উৎসাহিত করেছিল ?) যে কেউ (জিহাদ অথবা ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার কোনই ক্ষতি করবে না (বরং নিজের কপালেই কুঠারাঘাত করবে)। আল্লাহ্ সত্বরই কৃতজ্ঞদের (উত্তম) প্রতিদান দেবেন। (যারা সংকট মুহূর্তে আল্লাহ্র নিয়ামতরাজি স্মরণে রেখে আনুগত্যে অটল থাকে। কিয়ামতে সত্বরই সাক্ষাৎ হবে। কেননা, কিয়ামত রোজই নিকটবর্তী হচ্ছে। এছাড়া কারও মৃত্যুতে এতটুকু অস্থির হওয়াও অর্থহীন। কেননা, প্রথমত) আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্ভবপর নয় (স্বভাবগতভাবে হোক অথবা যুদ্ধের জন্যই হোক আল্লাহ্র হুকুমেই যখন মৃত্যু হবে, তখন তাতে অবশ্যই সম্মত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত যখন কারও মৃত্যু আসেও, তবে তা) এভাবে যে, তার নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ থাকে। (এতে ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অনর্থক বৈ নয়। সময় এলে মৃত্যু অবশ্যই হবে এবং সময়ের পূর্বে কখনও হবে না। এছাড়া মৃত্যুভয়ে পলায়ন করার ফলই বা কি ? এছাড়া তো নয় যে, পৃথিবীতে আরও কিছু দিন জীবিত থাকা যাবে। অতএব, এর ফলাফলও শুনে নাও) ; যে ব্যক্তি (স্বীয় কাজকর্মে) জাগতিক ফল কামনা করে, আমি তাকে (আমার ইচ্ছা হলে) জগতের অংশ

প্রদান করি। (এবং পরকালে তার কোন অংশ নেই) আর যে ব্যক্তি (স্বীয় কাজকর্মে) পারলৌকিক ফল কামনা করে (উদাহরণত পরকালের সওয়াব লাভের একটি কৌশল মনে করে সে জিহাদের ময়দানে অটল থাকে, আমি তাকে পরকালের অংশ (কর্তব্য মনে করে) প্রদান করব। আমি অতি সত্বর (এমন) কৃতজ্ঞদের (উত্তম) প্রতিদান দেব (যারা স্বীয় কাজকর্মে পরকালে নিয়ামত কামনা করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব ঘটনা অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। একারণেই কোরআন পাক সূরা আল-ইমরানের চার-পাঁচ রুকূ পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধের জয়-পরাজয় ও এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নির্দেশাবলী অব্যাহতভাবে বর্ণনা করেছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর একটি বিচ্যুতির জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মৌলিক বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ বিষয়টিতে মুসলমানদের কার্যত পাকাপোক্ত করার জন্য ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়, হুযূর (সা)-এর আহত হওয়া, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, তজ্জন্য কতিপয় সাহাবীর হতোদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিষয়টি এই ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করা মুসলমানের ঈমানের অংশ বিশেষ। ইসলামী মূলনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতাকেও কুফরের নামান্তর বলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমানরাও ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে, যাতে খৃস্টান ও ইহুদীরা আক্রান্ত হয়েছিল। খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর ভালবাসা ও মাহাত্ম্যকে ইবাদত ও আরাধনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে নিয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের সময় কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেছে। তখন সাহাবায়ে কিরামের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং হওয়া উচিত ছিল, তা সামান্য অনুমান করাও সবার পক্ষে সহজ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহব্বতে যে সাহাবায়ে কিরাম স্বীয় ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাকে জগতের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য মনে করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয়ও দিয়েছেন, তাঁদের আত্মনিবেদন ও ইশ্কে রাসূলের খবর যাঁরা কিছুটা রাখেন একমাত্র তাঁরাই তাদের সে সময়কার মর্মন্তুদ অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারেন।

এসব জানেশকানে রাসূলের কানে যখন এ সংবাদ প্রবেশ করেছিল, তখন তাঁদের অনুভূতি কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজনা বিরাজ করছে, বিজয়ের পর পরাজয়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, মুসলমান যোদ্ধাদের পা উপড়ে যাচ্ছে ; এমনি সংকট মুহূর্তে যিনি ছিলেন সব প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মূল কেন্দ্র, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তিনিও তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন! এর স্বাভাবিক ফল

ছিল এই যে, সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দল ভয়ার্ত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলো। এ পলায়ন জরুরী অবস্থা ও সাময়িক ভয়-ভীতির পরিণতি ছিল। খোদা না-খাস্তা, এতে ইসলাম পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা বা প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের এমন পবিত্র ফেরেশতা-তুল্য দল করতে চান, যারা হবে বিশ্বের জন্য আদর্শ। এ কারণে তাদের সামান্য বিচ্যুতিকেও বিরাট আকারে দেখা হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার কারণে সাহাবীদের এমন কঠোর ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন ইসলাম ত্যাগ করার কারণে করা যেতে পারে। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের সাথেই এ মৌলিক বিষয়টির প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে ধর্ম, ইবাদত ও জিহাদ আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত, যিনি চিরজীবী ও সদা প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা)-এর মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও তাতে অসাধারণত্ব কি? তাঁর মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং দীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে শোভা পায় না। এ কারণেই বলা হয়েছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ... ... অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) একজন রাসূল বৈ তো নন—তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। যদি তিনি তিরোধান করেন অথবা তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়, তবে তোমরা কি পশ্চাৎপদ হয়ে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে পশ্চাৎপদ হয়ে ফিরে যায়, সে আল্লাহ্‌র কোন অনিষ্ট করে না। আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করেন।

এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর পরও মুসলমানদের ধর্মের ওপর অটল থাকতে হবে। এতে আরও বোঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় হুযূর (সা)-এর আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা—যাতে তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে হুযূর (সা) স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্য সত্যই যখন তাঁর ওফাত হবে, তখন আশেকানে রাসূল যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। হুযূর (সা)-এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তিলাওয়াত করেই তাঁদের প্রবোধ দেন। ফলে তাঁরা প্রকৃতিস্থ হয়ে যান।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময়—সবই নির্ধারিত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

উপসংহারে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, ওহুদের দুর্ঘটনার অন্যতম বাহ্যিক কারণ ছিল এই যে, হুযূর (সা) যাদেরকে পশ্চাদ্দিকে গিরিপথের প্রহরায় নিযুক্ত করেছিলেন, তারা প্রাথমিক বিজয়ের সময় গনীমতের মাল আহরণের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করে অন্যান্য মুসলমানের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় আমল দ্বারা ইহকালের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে ইহকালে কিছু অংশ দান করি এবং যে পরকালের প্রতিদান কামনা করে, সে পরকালের প্রতিদান লাভ করে। আমি অতি সত্বরই কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দেব।

এতে ইশারা করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল আহরণের চিন্তায় হুযূর (সা)-এর অর্পিত কাজ ছেড়ে তারা ভুল করেছিল। স্মর্তব্য যে, গনীমতের মাল আহরণ করাও প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজাল দুনিয়া কামনা নয়—যা শরীয়তে নিন্দনীয়। বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল আহরণ করে সংরক্ষিত করা এবং নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাও জিহাদের অংশ বিশেষ এবং ইবাদত। উপরোক্ত সাহাবীরা শুধু জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন নি। কেননা, তাঁরা যদি এ মাল আহরণে অংশগ্রহণ নাও করতেন, তবু শরীয়তের আইন অনুযায়ী ঐ অংশই পেতেন, যা অংশগ্রহণের পর পেয়েছেন। কাজেই তারা জাগতিক লোভ-লালসার কারণে স্থান ত্যাগ করেছিলেন—একথা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত আয়াতের তফসীরেও বলা হয়েছে যে, বড়দের সামান্য বিচ্যুতিকেই অনেক বড় মনে করা হয়। মামুলী অপরাধকে কঠোর অপরাধ গণ্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গনীমতের মাল আহরণ করার সাথে কিছু না কিছু জাগতিক ফায়দার সম্পর্ক অবশ্য ছিল। এ সম্পর্কের মন্দ প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কাজেই সাহাবায়ে কিরামের চারিত্রিক মানকে সমুন্নত রাখার জন্য তাঁদের এ কার্যকে 'দুনিয়া কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে জাগতিক লালসার সামান্য ধূলিকণাও তাঁদের অন্তরে স্থান লাভ করতে না পারে।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

(১৪৬) আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহ্র পথে—তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র রাহে তারা হেরেও

যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি—শুধু বলেছে—হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। (১৪৮) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওহুদ যুদ্ধে সংঘটিত কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে মুসলমানদের হুঁশিয়ার ও তিরস্কার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহেও এর পরিশিষ্ট হিসাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের কিছু কিছু অবস্থা ও ঘটনার দিকে ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অনড় ও অটল রয়েছে, তোমাদেরও তেমনি থাকা উচিত।

কিছু শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ رِبِّيُّوْنَ শব্দটি رَبٌّ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর অর্থ 'রব্ব-ওয়ালা' অর্থাৎ আল্লাহ্ভক্ত। কারও কারও মতে رِبِّيُّوْنَ শব্দের অর্থ অনেকগুলো দল। তাদের মত একটি رِبَّةٌ (দল) অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখানে رِبِّيُّوْنَ আল্লাহ্র ভক্ত বলে কাদের বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এঁরা হলেন আলিম ও ফিক্হবিদ। (রূহুল মা'আনী) اَسْتَكَانُوْا শব্দটি اَسْتَكَانَةٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অপারক হয়ে বসে পড়া। وَهْنٌ থেকে উদ্ভূত হলো وَهَنُوْا অর্থ দুর্বল হওয়া।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক নবী ছিলেন, যাঁদের অনুবর্তী হয়ে অনেক আল্লাহ্ভক্ত (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্র পথে সংঘটিত বিপদাপদের কারণে সাহস হারান নি ; তাঁরা (দেহ ও মনের দিক দিয়ে) দুর্বল হননি এবং তাঁরা (শত্রুর সামনে) নত হননি (যে অপারকতা বা খোশামোদের কথাবার্তা বলা শুরু করবেন)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন দৃঢ়চেতা লোকদের ভালবাসেন। (কাজেকর্মে তারা কি ভুল করবে ?) তাদের মুখ থেকে এ কথা ছাড়া কিছুই বের হয়নি (যে, তারা আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন ঃ) হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কর্মের বাড়াবাড়ি ক্ষমা কর এবং (কাফিরদের বিরুদ্ধে) আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী কর। (এ দৃঢ়তা ও দোয়ার বরকতে) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পার্থিব পুরস্কার বিজয় ও সাফল্য দান করলেন এবং পরকালের উত্তম প্রতিদান দিলেন (অর্থাৎ সন্তুষ্টি ও জান্নাত)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আল্লাহ্-ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণ

উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কয়েকটি দোয়া করতেন ঃ

এক. আমাদের বিগত অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। দুই. বর্তমান জিহাদকালে আমরা যেসব ত্রুটি করেছি, তা মার্জনা করুন। তিন. আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। চার. শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

নিজেদের সৎ কাজের জন্য গর্ব করা উচিত নয় ঃ প্রথম এই যে, সত্যধর্মী মু'মিন ব্যক্তি যত বড় সৎকর্মই করুক এবং আল্লাহ্র পথে যত কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সৎকর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। কারণ, তার সৎকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপারই ফসল। এ কৃপা ব্যতীত কোন সৎকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا — আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথপ্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা যাকাত ও নামায আদায় করতে পারতাম না।

এতদ্ব্যতীত মানুষ যে সৎকর্ম করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক, আল্লাহ্র শানের উপযুক্ত করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তাই কর্ম সম্পাদনের সময়ও মাগফিরাতের দোয়া করা প্রয়োজন।

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সৎকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার সামর্থ্য হবে, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কাজেই বর্তমান কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও এর ওপর কায়েম থাকার দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার।

উল্লিখিত দোয়াসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম অতীত গোনাহ্ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষ যেসব দুঃখ-কষ্ট অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তা অধিকাংশই তার বিগত গোনাহ্র ফল এবং এর প্রতিকার হচ্ছে ইস্তেগফার ও তওবা। মওলানা রূমী বলেন ঃ

غم چو بینی زود استغفار کن
غم بامر خالق آمد کار کن

সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহভক্তদের ইহকাল ও পরকাল— উভয় ক্ষেত্রে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহকালেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে বিজয় এবং উদ্দেশ্যে সাফল্য দান করেন এবং পরকালেও চিরস্থায়ী শান্তি দান করবেন— যার ক্ষয় নেই। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই حسن শব্দটি যোগ করে وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ বলা হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

(১৪৯) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোন, তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। (১৫০) বরং আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।

যোগসূত্র ঃ ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের গুজব ছড়িয়ে পড়তেই মুনাফিকরা দুষ্কৃতির সুযোগ পেয়ে বসে। তারা মুসলমানদের বলতে লাগলো যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নেই, তখন আমরা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে যাই না কেন ? এতে সব বিবাদ-বিসংবাদ মিটে যাবে। এ উক্তি থেকে মুনাফিকদের দুষ্টামি ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ফুটে উঠেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা এসব শত্রুর কথায় কর্ণপাত করবে না, তাদের কোন পরামর্শে শরীক করবে না এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজও করবে না। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আল্লাহ্‌ভক্তদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতেও তেমনি মুনাফিক তথা ইসলামের শত্রুদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসীগণ ! যদি তোমরা কাফিরদের কথা মান্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে (কুফরের দিকে) পশ্চাৎপদে ফিরিয়ে দেবে। (অর্থাৎ তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মচ্যুত করা এবং ধর্মের প্রতি তাদের মনে কুধারণা সৃষ্টি করা। মাঝে মাঝে একথা তারা পরিষ্কার বলেও ফেলে এবং মাঝে মাঝে পরিষ্কার না বললেও এমন কৌশল অবলম্বন করে, যাতে আস্তে আস্তে মুসলমানদের মন থেকে ইসলামের মহত্ত্ব ও ভালোবাসা লোপ পেতে থাকে)। এতে তোমরা সর্বতোভাবে অকৃতকার্য হয়ে যাবে। (মোট কথা বন্ধুত্ব প্রকাশ করলেও তারা কখনই তোমাদের বন্ধু নয়) বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের বন্ধু এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী। (এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত। শত্রুরা যদি তোমাদের সাহায্যের কিছু পন্থা বলে, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের বিপরীতে তা কার্যে পরিণত করো না)।

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى

الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ

حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا

أَرٰىكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن

يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا

عَنكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

(১৫১) এখন আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, তারা যাকে আল্লাহ্র অংশীদার করেছে সে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর তাদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুত জালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (১৫২) আর আল্লাহ্ সেই ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যা আপনার সাথে ছিল—যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে তাদেরকে খতম করেছিলে। এমনকি যখন তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছ এবং কাজ নিয়ে বিবাদ করেছ আর তোমাদের খুশির বস্তু দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর তোমাদের কারো কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন তাদের উপর থেকে, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। বস্তুত তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে রয়েছে আল্লাহ্র কৃপা।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সাহায্যকারী। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহায্যের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এখনই কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি, যেহেতু তারা এমন এক বস্তুকে আল্লাহ্র অংশীদার করেছে, যার (অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রমাণ অবতরণ করেন নি (অর্থাৎ শরীয়তে গ্রাহ্য এমন কোন শব্দগত অথবা অর্থগত প্রমাণ অবতরণ করেন নি। সমুদয় যুক্তিগত প্রমাণ এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও প্রত্যেক মূর্খ ও কাফির কোন না কোন প্রমাণ উপস্থিত করে। কোন ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাদের কাছে নেই)। জাহান্নাম তাদের বাসস্থান। এটা জালিমদের জন্য খুবই মন্দ বাসস্থান। (আয়াতে কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করার ওয়াদাটি এভাবে প্রকাশ পায় যে, প্রথমত মুসলমানদের পরাজয় সত্ত্বেও কাফিররা বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে—বায়যাভী)। অতঃপর কিছু দূর যাওয়ার পর তারা বুঝতে পারে যে, মৃতপ্রায় মুসলমানদের মরণ পর্ব শেষ না করে চলে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এই মনে করে আবার মদীনার দিকে ধাবিত হওয়ার ইচ্ছা করতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা মদীনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে।

কাফিররা জনৈক গ্রাম্য পথিককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বললো ঃ তুমি মদীনায় পৌঁছে মুসলমানদের ভয় প্রদর্শন করো যে, মক্কাবাসীরা আবার মদীনার পথে অগ্রসর হচ্ছে ! মহানবী (সা) ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা জানতে পেরে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু শত্রু সৈন্য পূর্বেই পলায়ন করেছিল। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

পরবর্তী আয়াতে ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও পরাজয়ের কারণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় (সাহায্যের) অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করে দেখালেন—যখন তোমরা (যুদ্ধের প্রথমাবস্থায়) তাঁর আদেশে কাফিরদের হত্যা করছিল (তোমাদের এ চাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলত) যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই (অভিমতে) দুর্বল হয়ে পড়তে, [এভাবে যে, পেছনের রক্ষাব্যূহ পঞ্চাশজন সিপাহী ও অধিনায়ককে নিযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা ভুল বোঝাবুঝিবশত তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে। কেউ কেউ মনে করছিল যে, আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। শত্রুদের মোকাবিলায় সবার সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত]। পরস্পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ সম্পর্কে মতবিরোধ করতে লাগলে (কেউ কেউ সেখানেই অবস্থানের নির্দেশে অটল ছিল এবং কেউ কেউ অন্য প্রস্তাব উত্থাপন করল। এ অন্য প্রস্তাবের কারণেই ভর্ৎসনা করা হচ্ছে—) এবং তোমরা [রাসূল (সা)-এর] কথামত চললে না, তোমাদের মনোবাঞ্ছা (চোখের সামনে) দেখিয়ে দেওয়ার পর (অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয় দেখানো হয়েছিল)। তখন তোমাদের অবস্থা ছিল এই (যে,) তোমাদের কেউ কেউ ইহকালের সামগ্রী কামনা করছিল (অর্থাৎ শত্রুসৈন্য হটিয়ে দিয়ে গনীমতের মাল আহরণ করতে চেয়েছিল) এবং কেউ কেউ (শুধু) পরকাল কামনা করছিল। [কিছু সংখ্যক মুসলমানের পক্ষ থেকে অভিমতের দুর্বলতা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের বিপরীতে ভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা, তাঁর কথামত না চলা, ইহকালের সামগ্রী কামনা করা ইত্যাকার পাপসমূহ প্রকাশ পাওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যতের জন্য সাহায্য বন্ধ করে দেন]। অতঃপর তিনি কাফিরদের (বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া) থেকে তোমাদের বিরত রাখেন। (যদিও এ সাময়িক পরাজয় তোমাদের কর্মেরই ফল, তথাপি এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাজা হিসাবে নয় বরং এ কারণে হয়,) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (ঈমান) পরীক্ষা করেন। (সে মতে এ সময়ই মুনাফিক অর্থাৎ কপট বিশ্বাসী মুসলমানদের কপটতা ফুটে ওঠে এবং খাঁটি মুসলমানদের মূল্য বেড়ে যায়)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করেছেন (এজন্য পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে না) এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের (অবস্থান) প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র কাছে সাহাবায়ে কিরামের উচ্চ মর্তবা ঃ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর মতামত ভ্রান্ত ছিল। এ কারণে পূর্ববর্তী অনেক আয়াতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব অসন্তোষ

প্রকাশ ও হুঁশিয়ারির মধ্যেও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ দর্শনীয়। প্রথমত لِيَبْتَلِيَكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসাবে নয়, বরং পরীক্ষার জন্য। অতঃপর وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করছিলেন এবং একদল শুধু পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন্ কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে ? এটা জানা কথা যে, গনীমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই 'ইহকাল কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তাঁরা স্বীয় রক্ষাব্যূহেই থেকে যেতেন এবং গনীমতের মাল আহরণে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পেত ? কিংবা অংশগ্রহণের ফলে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে ? কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, গনীমতের আইন যাদের জানা আছে, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরীক হওয়া ও রক্ষাব্যূহে অবস্থান করা—উভয় অবস্থাতেই তাঁরা সমান অংশ পেতেন।

এতে বোঝা যায় যে, তাঁদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে না ; বরং একে জিহাদের কাজেই অংশগ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে তখন গনীমতের মালের কল্পনা অন্তরে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণে একেই 'ইহকাল কামনা' রূপে ব্যক্ত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَا
تَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾
ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ ۖ
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ
يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي
أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا

هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَا
جِعِهِمْ ج وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعٰنِ لا اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ج وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ
عَنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٥﴾

(১৫৩) আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছিলেন তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের উপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সে জন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ্ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন। (১৫৪) অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমুচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মত। তারা বলছিল—আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সব কিছুই আল্লাহ্র হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে—তোমার নিকট প্রকাশ করে না, সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবে তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসতো নিজেদের অবস্থান থেকে, যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ্ মনের গোপন বিষয় জানেন। (১৫৫) তোমাদের যে দু'টি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল তাদেরই পাপের দরুন।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াতে এ অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে সাহাবায়ে কিরামের দুঃখ ও মানসিক ক্লেশের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় দীর্ঘ আয়াতেও দুঃখ দূরীকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোনরূপ সাজা হিসাবে এ বিপর্যয় নেমে আসেনি; বরং এটি ছিল খাঁটি ঈমানদার ও কপট বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষা। উপসংহারে সাহাবায়ে কিরামের ত্রুটির পৌনঃপুনিক ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন তোমরা (পলায়নরত অবস্থায় রণভূমিতে) আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কাউকে পেছন ফিরে দেখছিলে না এবং রাসূল (সা) পশ্চাদ্দিক থেকে তোমাদের আহ্বান করছিলেন (যে, এদিকে এস, এদিকে এস। কিন্তু তোমরা শুনছিলে না)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমাদের দুঃখ দিলেন। (রাসূল [সা]-কে তোমাদের) দুঃখ দেওয়ার কারণে—যাতে (এ প্রতিদান ও বিপদ দ্বারা তোমাদের মধ্যে পরিপক্বতা সৃষ্টি হয়—যার ফলে পুনরায়) তোমরা দুঃখিত না হও যা হস্তচ্যুত হয়ে গেছে, তজ্জন্য এবং যা বিপদ উপনীত হয়েছে, তজ্জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (এ কারণে তোমরা যেরূপ কর্ম কর, তিনি তার উপযুক্ত প্রতিদান দেন। পরবর্তী আয়াতে দুঃখ দূর করার কথা বলা হচ্ছে), অতঃপর তিনি এ দুঃখের পর তোমাদের প্রতি শান্তি (ও আরাম) প্রেরণ করলেন। অর্থাৎ তন্দ্রা—(কাফিররা ময়দান ত্যাগ করে চলে গেলে অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে মুসলমানরা তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। ফলে তাদের দুঃখ-ক্লান্তি সব দূর হয়ে যায়।) যা তোমাদের একদল (অর্থাৎ মুসলমানদের)-কে আচ্ছন্ন করছিল, আর একদল (অর্থাৎ মুনাফিকরা) নিজের জীবন নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল (যে, দেখা যাক, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে যাওয়া যায় কি না)। তারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা পোষণ করছিল—যা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা প্রসূত। (তাদের এ ধারণা তাদের পরবর্তী উক্তি থেকে এবং তা যে নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত তা এর জবাব থেকে জানা যায়। তাদের উক্তি ছিল এই) তারা বলছিল ঃ আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা আছে কি ? (অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে আমরা যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তা কেউ শুনল না। মিছামিছি সবাইকে বিপদে ফেলে দিয়েছে।) আপনি বলে দিন ঃ ক্ষমতা তো সবই আল্লাহ্র। (অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ মত কাজ করলেও আল্লাহ্র ফয়সালাই ঊর্ধ্বে থাকতো এবং বিপদাপদ যা আসার, অবশ্যই আসতো। পরবর্তী আয়াতে তাদের উক্তি ও তার জবাব সবিস্তারে বর্ণিত হচ্ছে)। তারা অন্তরে এমন বিষয় গোপন রাখে, যা আপনার কাছে (স্পষ্ট করে) প্রকাশ করে না। (কেননা, "আমাদের কি ক্ষমতা আছে ?" —তাদের এ উক্তির বাহ্যিক অর্থ এরূপ বোঝা যায় যে, তকদীরের মুকাবিলায় মানুষের চেষ্টা-চরিত্র অচল। এটা সাক্ষাত ঈমানের কথা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও এ অর্থ সমর্থন করে সূক্ষ্ম জবাব দেওয়া হয়েছে যে, বাস্তবিক আল্লাহ্র ক্ষমতাই সবকিছুর উপর প্রবল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উক্তির উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না। তারা এ উক্তিটি এই অর্থে) বলে যে, যদি আমাদের কিছু ক্ষমতা থাকত (অর্থাৎ আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হতো) তবে আমরা (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা এখানে নিহত হয়েছে, তারা) এখানে নিহত হতাম না। (এ কথার সারমর্ম এই যে, বিধিলিপি কিছুই না। এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে তাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে) আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা তোমাদের গৃহেও থাকতে, তবুও যাদের বিধিলিপিতে হত্যা অবধারিত ছিল, তারা এসব স্থানের পানে (আসার জন্য) বের হয়ে পড়তো, যেখানে তারা (নিহত হয়ে হয়ে) শায়িত আছে। (উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক ক্ষতি যা হয়েছে, তা অবশ্যই হতো। একে টলানো সম্ভবপর ছিল না।

এর উপকারিতা ছিল বিরাট। কেননা,) যা কিছু হয়েছে, তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের বিষয় (অর্থাৎ ঈমান) পরীক্ষা করেন (কেননা, এ বিপদ মুহূর্তে মুনাফিকদের কপটতা ফুটে ওঠে এবং মু'মিনদের ঈমান আরও শক্ত ও সপ্রমাণিত হয়ে যায়) এবং তোমাদের হৃদয়ে যা আছে, তাকে (অর্থাৎ এ ঈমানকেই মালিন্য ও কুমন্ত্রণা থেকে) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন। (কেননা, বিপদের সময় মু'মিন ব্যক্তির দৃষ্টি সবকিছু থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্র দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ঈমান ঔজ্জ্বল্য ও শক্তিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে খুব ভালোভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। (তার পক্ষে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আদালতের নিয়মে অপরাধীর অপরাধ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়)। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দুই দলের (মুসলমান ও কাফিরের) পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার দিন (অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পশ্চাৎবর্তী হয়েছিল, (এর কারণ) এ ছাড়া কিছুই হয়নি যে, শয়তান তাদের কতক (অতীত) কর্মের কারণে তাদের বিচ্যুত করেছে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে গিয়েছিল, যদ্দরুন শয়তানের মধ্যে তাদের দ্বারা আরও আদেশ অমান্য করানোর লালসা জেগে ওঠে এবং ঘটনাচক্রে সে লালসা চরিতার্থ হয়ে যায়)। নিশ্চয় জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বাস্তবিক আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত সহনশীল (ত্রুটি সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাজা দেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে কিছুসংখ্যক সাহাবীর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুযূরে আকরাম (সা) কর্তৃক আহ্বান করার পরও ফিরে না আসা আর সে জন্য হুযূরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা)-এর ডাকে সাহাবীগণ পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন।

তফসীরে রূহুল মা'আনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রথমে রাসূলে করীম (সা) আহ্বান করেন, যা সাহাবায়ে কিরাম শুনতে পান নি এবং তাঁরা বহু দূরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা)-এর ডাক শুনতে পেয়ে সবাই এসে সমবেত হন।

তফসীরে বয়ানুল কোরআনে হযরত হাকীমুল উম্মত বলেন, (সাহাবীগণের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার) মূল কারণ ছিল হুযূর আকরাম (সা)-এর শাহাদাতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুযূর যখন ডাকলেন তখন তাতে একে তো এ দুঃসংবাদের কোন খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ যদি পৌঁছেও থাকে, তাঁরা তা চিনতে পারেন নি। তারপর যখন হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা) ডাকেন তখন তাতে সে সংবাদের খণ্ডন এবং সাথে সাথে হুযূর (সা)-এর বেঁচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। কাজেই এ কথা শুনে সবাই শান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা এলো কেন এবং

রাসূলে করীম (সা) দুঃখিত হলেন কেন ? তার কারণ এই হতে পারে যে, সাহাবায়ে কিরাম যদি সে সময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুযূরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন।

ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ—আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ এসেছিল এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর যে মুসীবত এসে পতিত হয়েছিল, তা শাস্তি হিসাবে নয়, পরীক্ষা হিসাবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মু'মিন এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর فَأَثَابَكُمْ غَمًّا বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বোঝা যায়, তার ব্যাখ্যা এই যে, এর প্রকৃত রূপটি ছিল শাস্তির মতই, কিন্তু এই শাস্তিটি যে অভিভাবকসুলভ এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোন পিতা তার পুত্রকে এবং ওস্তাদ তাঁর শাগরিদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে ভিন্নতর।

ওহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ ঃ উল্লিখিত বাক্য لِيَبْتَلِيَكُمْ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তাতে তো একথাই বোঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল একান্তই আল্লাহ্র ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই সাহাবীদের পূর্ববর্তী কোন কোন পদস্খলনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ।

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সেই পদস্খলনই ছিল, যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেওয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায় কিন্তু এই পদস্খলন এবং তার পশ্চাৎবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক তাৎপর্য—ليبتليكم বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে যুযাজ্জ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তাঁরা জিহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জিহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

এক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে ঃ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে। যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে আনে; অর্থাৎ পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন কোন একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার পক্ষে অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানুষ যখন কোন পাপ কার্য সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও সুগম করে দেয় ; মনের মধ্যে পাপের আগ্রহ বেড়ে যায়। সেজন্যই কোন কোন বুযুর্গ মনীষী বলেছেন ঃ

انّ من جزاء الحسنة الحسنة بعد ها وان من جزاء السّيئة السيئة بعدها.

অর্থাৎ নেক কাজের একটা নগদ প্রতিদান হলো পরে অন্তত আরও একটি নেকী করার সামর্থ্য লাভ করা যায়। আর মন্দ ও পাপ কাজের একটি শাস্তি হলো সেই পাপের পর আরো পাপের পথ সুগম হয়ে পড়ে।

হাকীমুল উম্মত (র) 'মাসায়েলুস সুলুক' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসের বিবরণ অনুসারে পাপের ফলে অন্তরে একটি অন্ধকার ও কালিমার জন্ম হয়। আর অন্তরে যখন কালিমা ও অন্ধকার উপস্থিত হয়, তখন শয়তান তাকে পরাজিত করে ফেলে।

আল্লাহ্র নিকট সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ঃ ওহুদের ঘটনায় কোন কোন সাহাবীর দ্বারা যেসব পদস্খলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, তা সেক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন ও বিরাট ছিল। পঞ্চাশজন সাহাবীকে যে অবস্থানে সেখান থেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, তাদের অধিকাংশ সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই সরে পড়ার পেছনে যদিও তাঁদের এই ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশও সম্পাদিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন নিচে নেমে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মেশা কর্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মহানবী (সা)-এর পরিষ্কার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় ও ত্রুটির ফলেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভুলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ ব্যাপারেও কোন কোন বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন যুযাজ থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রাসূলে করীম (সা) স্বয়ং তাদের সাথে রয়েছেন এবং পেছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন। এসব বিষয়কে যদি ব্যক্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, সাহাবীগণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, এটা সেসব অপবাদের মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন সত্ত্বেও এদের সাথে কি আচরণ করেছেন ? উল্লিখিত আয়াতে সে প্রসঙ্গটিই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক নিয়ামত তন্দ্রা অবতরণ করে তাদের ক্লান্তি-শ্রান্তি ও হতাশা দূর করে দেওয়া। তারপর বলে দেওয়া হয় যে, তখন মুসলমানদের ওপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আযাব ছিল না। বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

এসব বিষয় ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে এবং এখানে আবার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। এই পুনরাবৃত্তির একটি তাৎপর্য হলো এই যে, প্রথমবারে সাহাবায়ে কিরামের সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে আর এখানে উদ্দেশ্য হলো মুনাফিকদের সে উক্তির খণ্ডন করা যে, তোমরা আমাদের মতানুসারে কাজ করনি বলেই এই বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

যা হোক, এই সমুদয় আয়াতে একান্ত পরিষ্কারভাবে সামনে এসে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সঙ্গী-সাথীগণকে নৈকট্যের এমন এক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যাতে এহেন বিরাট অপরাধ এবং পদস্খলনসমূহ সত্ত্বেও তাঁদের সাথে শুধু ক্ষমাসুন্দর আচরণই নয়, বরং দয়া ও করুণাও প্রদর্শন করা হয়। এ তো গেল আল্লাহ্ তা'আলার এবং কোরআনের বর্ণনা। হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ (রা)-এর এমনি ধরনের একটি বিষয় হুযূরে আকরাম (সা)-এর সামনে উপস্থাপিত হয়। তিনি মক্কার মুশরিকগণকে মদীনার মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। হুযূরে আকরাম (সা) যখন ওহীযোগে এর সন্ধান জানতে পারেন এবং সে পত্রখানা ধরা পড়ে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কঠিন অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে। হযরত ফারূকে আযম নিবেদন করলেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান নিয়ে নেব। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) জানতেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক নন, নিষ্ঠাবান মু'মিন। অবশ্য এ ভুলটি তাঁর দ্বারা হয়ে গেছে। কাজেই তিনি হাতেবকে ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন যে, ইনি আহলে বদরের একজন। আর আল্লাহ্ হয়তো সে সমস্তের ব্যাপারেই ক্ষমা ও মাগফিরাতের নির্দেশ জারি করে দিয়েছেন। এ রেওয়ায়েতটি হাদীসের সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিদ্যমান।

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা ঃ এখান থেকেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় যে, যদিও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছেও ; কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মতের জন্য তাঁদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই যখন তাঁদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাঁদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদেরকে 'রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম ওয়া রাযু আনহু'-এর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোন অধিকার অপর কারো কেমন করে থাকতে পারে ?

সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন হযরত উসমান (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনাক্রমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর সামনে এই মর্মে মন্তব্য করলেন যে, এঁরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো নেই। (সহীহ বুখারী)

কাজেই আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সমস্ত আকায়েদ গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাঁদের প্রতি কটূক্তি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। 'আকায়েদে-নসফিয়্যাহ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

ويكف عن ذكر الصحابة الا بخير-

অর্থাৎ অশালীনভাবে সাহাবীগণকে স্মরণ না করা ওয়াজিব।

শরহে মুসামেরাহ ইবনে হুমামে উল্লেখ রয়েছে ঃ

اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم

অর্থাৎ আহ্লে সুন্নতের আকীদা হচ্ছে সাহাবীদের সকলকেই নির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে এবং প্রশংসার সাথে তাঁদের উল্লেখ করতে হবে। শরহে-মাওয়াকিফ-এ রয়েছে ঃ

يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم.

অর্থাৎ "সকল সাহাবীর তা'যীম করা ওয়াজিব এবং তাঁদের সমালোচনা করা কিংবা কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন থেকে বিরত থাকাও ওয়াজিব।"

হাফেজ ইবনে তায়মিয়াহ (র) আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া গ্রন্থে বলেছেন ঃ

—"আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, ইতিহাসে যেসব রেওয়ায়েতে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত, যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে, যেগুলোতে কমবেশি করে মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীদের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাঁদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুত ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালংঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হলো ان الحسنات يذهبن السيئات। অর্থাৎ সৎ কাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে কিরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাঁদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই। (আকীদায়ে ওয়াস্তিয়া)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

(১৫৬) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফির হয়েছে এবং নিজেদের ভাইয়েরা, যখন তারা ভ্রমণে বের হয় কিংবা জিহাদে লিপ্ত হয়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে তারা মরতও না, নিহতও হতো না ! যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কাজেরই দ্রষ্টা। (১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবের চেয়ে উত্তম। (১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সামনেই সমবেত হবে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هٰهُنَا অর্থাৎ "আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকতো, কিংবা আমাদের মতামত যদি গ্রহণ করা হতো, তাহলে আমরা এখানে (এভাবে) নিহত হতাম না।" পরেও এই বিষয়টি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এমন ধরনের উক্তি শোনার কারণে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনেও কিছুটা দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। কাজেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ ধরনের উক্তি ও অবস্থা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং হায়াত মওতের ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তি বা তকদীরের উপর ভরসা করার জন্য মুসলমানদের হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সেই সমস্ত লোকের মত হয়ে যেও না, যারা (প্রকৃতপক্ষে) কাফির (অবশ্য বাহ্যিকভাবে মুসলমান হওয়ার দাবি করে থাকে) এবং নিজেদের (গোত্রীয়) ভাইয়েরা যখন কোন ভূখণ্ডে সফর করতে যায় (আর ঘটনাচক্রে সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়) কিংবা কোথাও জিহাদে গমন করে এবং তকদীর অনুযায়ী নিহত হয় তখন সেই মুনাফিকরা বলে যে, এরা যদি আমাদের কাছে থাকতো ; (সফর কিংবা যুদ্ধে না যেতো) তাহলে মৃত্যুও বরণ করতো না, নিহতও হতো না। (একথা তাদের মনে এবং মুখে এজন্য আসতো) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটিকে তাদের অন্তরে অনুতাপের কারণ করে দেন (অর্থাৎ এ ধরনের উক্তির ফলে অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই হয় না)। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলাই মৃত্যু কিংবা জীবন দান করেন (তা সফরকালেই হোক অথবা ঘরে থাকাকালেই হোক, যুদ্ধের সময় হোক অথবা শান্তিকালে হোক) আর তোমরা যাই কিছু কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্তই দেখছেন (কাজেই তোমরাও যদি এ ধরনের কোন উক্তি কর কিংবা এ ধরনের কোন ধারণা মনে পোষণ কর, তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপন থাকে না)। আর যদি তোমরা আল্লাহ্র রাহে নিহত হও অথবা (আল্লাহ্র রাহে) মৃত্যুবরণ কর (তাহলে এটা কোন ক্ষতির বিষয় নয়) তাতে লাভই হয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (সমগ্র পৃথিবীর) যে করুণা ও ক্ষমা রয়েছে সে সমস্ত বস্তুসামগ্রী অপেক্ষা (বহু গুণে) উত্তম, যেগুলো তারা সংগ্রহ করে চলেছে (এবং সেগুলোর

লোভেই জীবনকে ভালবাসে। আর) তোমরা যদি (এমনিতেও) মরে যাও কিংবা নিহত হও (তবুও) নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র নিকট নীত হবে। (সুতরাং একে তো নির্ধারিত নিয়তির কোন রদবদল হয় না, আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন থেকে কেউ অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। বস্তুত দীনের পথে মৃত্যুবরণ করা বা নিহত হওয়া হলো ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তির কারণ। কাজেই এমনিতে মরার চাইতে ধর্মের পথে আত্মদান করাই উত্তম। সে জন্যই এ ধরনের উক্তি দুনিয়ায় পরিতাপের বিষয় এবং আখিরাতে জাহান্নামের কারণ। এসব উক্তি থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৯) আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন—আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।

যোগসূত্র ঃ ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন সাহাবীর যে পদস্খলন এবং তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার দরুন হুযূরে আকরাম (সা) অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন, যদিও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুন তিনি সেজন্য সাহাবীগণের প্রতি কোন প্রকার ভর্ৎসনা করেননি এবং কোনরকম কঠোরতাও অবলম্বন করেন নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের এবং মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এই ভুলের দরুন তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল সে সমস্ত বিষয় ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে অধিকতর কোমলতা ও করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং কাজ-কর্মে সাহাবায়ে-কিরামের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সাহাবায়ে কিরামের দ্বারা এমন পদস্খলন সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার অধিকার হুযূরে আকরাম [সা]-এর ছিল) আল্লাহ্‌র (সেই) রহমতের দরুন (যা তাঁর উপর রয়েছে) তিনি তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলেন। আর (খোদা-নাখাস্তা) যদি তিনি কঠোর হতেন, তাহলে এরা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো (তখন তারা এই বরকত

ও মহানুভবতা কেমন করে লাভ করতে পারতো)। কাজেই (আপনি যখন আচরণের বেলায় এমন কোমলতা অবলম্বন করেছেন, তখন তাদের দ্বারা আপনার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে যে ত্রুটি হয়ে গেছে, সেজন্য অন্তর থেকেও) তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনে তাদের যে ত্রুটি হয়েছে, সে জন্য) আপনি তাদের তরফ থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বেই তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনার দোয়া করা তাদের পক্ষে অধিকতর উপকারী ও ফলপ্রদ হবে এবং তাদের মনস্তুষ্টির কারণ হবে)। আর বিশেষ বিষয়ে (যথারীতি) তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকুন (যাতে এই বিশেষ রহমতের দৌলতে তাদের মন থেকে দুঃখ-কষ্ট ধুয়ে যায়)। অতঃপর (পরামর্শ গ্রহণ করার পর) আপনি যখন (কোন একদিকে) মতামত সাব্যস্ত করে ফেলবেন (তা তাদের পরামর্শ অনুযায়ী হোক কিংবা পরিপন্থী হোক), তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা (করে সে কাজ) করে ফেলুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ ঃ যে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর আকরাম (সা)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যাঁরা তাঁকে নিজেদের জানমাল অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করতেন, তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যখন তাঁদের দ্বারা একটি পদস্খলন ঘটে যায়, তখন একদিকে নিজেদের পদস্খলন ও বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাঁদের অনুতাপ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল, যা তাঁদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে পারতো কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো। এরই প্রতিকারে পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এই পদস্খলনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে গেছে ; আখিরাতের পাতা পরিষ্কার।

অপরদিকে এই ত্রুটি ও পদস্খলনের ফলে রাসূলে করীম (সা) আহত হয়ে পড়েন এবং দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক কষ্টের কারণে সাহাবীদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও আশংকা বিদ্যমান ছিল, যা তাদের হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারত। সেজন্য মহানবী (সা)-কে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের পদস্খলন ও ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্যও তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে থাকুন।

এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বিবৃত করেছেন, যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এক. হুযূর আকরাম (সা)-কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁর প্রশংসা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশও ঘটে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

দুই. এর আগে فَبِمَا رَحْمَةٍ শব্দটি বাড়িয়ে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফল, কারো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়। তদুপরি 'রহমত' শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়ে কিরামের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর জন্যও রয়েছে। সে কারণেই আপনাকে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী বাক্যগুলোর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই কোমলতা, সদ্ব্যবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও করুণা করার গুণ যদি আপনার মধ্যে না থাকতো, তবে মানুষের সংশোধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা হয়েছে তা যথাযথভাবে সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্মসংশোধন ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো।

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যে ব্যক্তি দীক্ষাদান, সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করবে, তাকে অপরিহার্যভাবে উল্লিখিত গুন ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম রাসূলের কঠোরতাই সহ্য করা হয়নি, তখন কোন প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক অনমনীয়তার মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে—এমন সাধ্য কার হতে পারে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন যে, আপনি যদি কঠোরস্বভাব ও রূঢ় হতেন, তবে মানুষ আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন দীক্ষাদানকারী পীর ও ধর্ম প্রচারকের পক্ষে কঠোর প্রকৃতি ও রূঢ় ভাষী হওয়া একান্ত ক্ষতিকর এবং তার কাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর বলা হয়েছে فَاعْفُ عَنْهُمْ অর্থাৎ তাদের দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেছে, আপনি তা ক্ষমা করে দিন। এতে বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং কেউ কোন রকম কষ্ট দিলে কিংবা মন্দ বললে তার প্রতি রাগ না করে কোমল ব্যবহার করাও একজন সংস্কারকের একান্ত কর্তব্য।

তারপর বলা হয়েছে ঃ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ অর্থাৎ তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য শুধু নিজে সবরই করবেন না, বরং মনেপ্রাণে তাদের কল্যাণ কামনাও পরিহার করবেন না। আর যেহেতু তাদের আখিরাতের সংশোধনই সবচেয়ে বড় সেহেতু তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে বাঁচাবার লক্ষ্যে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন কাজ-কর্মে এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ

করুন, যাতে তাঁদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা। দ্বিতীয়ত, সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোন বিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা। তৃতীয়ত, তাদের পদস্খলন ও ভুল-ভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা। তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা। উল্লিখিত আয়াতে মহানবী (সা)-কে প্রথম তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কোরআন করীম দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছে। একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা শূরার সেই আয়াতে, যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ সম্পর্কে এই বলা হয়েছে যে, اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ (যারা সত্যিকার মুসলমান) তাঁদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরামর্শ করার হেদায়েত প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হয়েছে। যেমন, রেযাআত বা সন্তানকে স্তন্যদান সম্পর্কিত আহকামে বলা হয়েছে ঃ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ অর্থাৎ সন্তানের দুধ ছাড়ানোর ব্যাপরটি পিতা-মাতার সম্মতি ও পারস্পরিক পরামর্শক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরামর্শ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

এক. امر (আমর) ও مشورہ (মুশওয়ারাহ্) শব্দের অর্থ ; দুই. মুশওয়ারাহ্ বা পরামর্শের শরীয়তসম্মত মান ; তিন. সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে রাসূলে করীম (সা)-এর পরামর্শ গ্রহণের মান ; চার. ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের মান ; পাঁচ. পরামর্শে মতবিরোধ হলে তা মীমাংসার উপায় ; ছয়. যে কোন কাজে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা।

প্রথম বিষয় আমর ও শূরার পর্যালোচনা ঃ আরবী ভাষায় 'আমর' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি ব্যাপক অর্থে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা ও কাজকে বোঝায়। দ্বিতীয় প্রয়োগ হয় নির্দেশ ও রাষ্ট্রীয় বিষয় অর্থে। এরই ভিত্তিতে কোরআন করীমে বলা হয়েছে اُوْلِى الْاَمْرِ আর তৃতীয় প্রয়োগ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ অর্থে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন ঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ اِلَيْهِ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ – اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ – اَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ۔

আর তত্ত্বজ্ঞানী মনীষিগণের মতে قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى আয়াতের এই 'আমর'ই উদ্দেশ্য। এছাড়া وَاَمْرُهُمْ এবং وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আয়াতে উভয় অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত যদি বলা হয় যে, প্রথম অর্থটিই ধরে নেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থও এরই অন্তর্ভুক্ত, তবে তাও অসম্ভব নয়। কারণ সংবিধান ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এসব আয়াতে 'আমর' শব্দের অর্থ (সেই সব বিষয়), যাতে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা সে বিষয়টি রাষ্ট্র সংক্রান্ত হোক কিংবা বৈষয়িক হোক। আর 'শূরা' অর্থ হলো পরামর্শ ও মন্ত্রণা। অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লোকদের মতামত গ্রহণ করা। সে জন্যই وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আয়াতে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে—রাষ্ট্রীয় বিষয়ও যার অন্তর্ভুক্ত— সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ গ্রহণ করুন অর্থাৎ তাঁদের মতামতও জেনে নিন।

এমনিভাবে সূরা শূরার وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আয়াতের অর্থ হচ্ছে—যারা সত্যিকার মুসলমান তাঁদের চিরাচরিত স্বভাব হলো এই যে, তাঁরা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে থাকেন, সে কাজ বিধি-বিধান ও রাষ্ট্র সংক্রান্তই হোক অথবা অন্য কোন বিষয়েই হোক।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ পরামর্শের শরীয়তসম্মত মান ঃ কুরআন করীমের উল্লিখিত বক্তব্য এবং নবী করীম (সা)-এর বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন সব ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ করে নেওয়া রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের রীতি এবং আখিরাতে নাজাতের কারণ, যাতে দ্বিমতের আশংকা রয়েছে। তা সে ব্যাপারটি শরীয়তের বিধান বা রাষ্ট্র সংক্রান্তই হোক কিংবা অন্য কোন বিষয়ই হোক। কোরআন-হাদীসেও এ ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে। আর যেসব রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সম্পর্ক জনসাধারণের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। (ইবনে কাসীর)

ইমাম বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোক কোন কাজ করার ইচ্ছা করে এবং পারস্পরিক পরামর্শ করার পর তার বাস্তবায়ন করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সঠিক ও লাভজনক দিকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি যখন তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন সুখী বা দাতা হবে এবং তোমাদের জাতীয় ও সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ যখন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে, তখন যমীনের ওপর থাকা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। পক্ষান্তরে তোমাদের শাসক যখন নিকৃষ্টতর ব্যক্তি হবে, তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন বখিল বা কৃপণ হবে এবং তোমাদের বিষয়াদি যখন স্ত্রীলোকদের হাতে অর্পিত হবে, তখন মাটির ভেতরে সমাহিত হয়ে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা অপেক্ষা উত্তম হবে।"

অর্থাৎ তোমাদের উপর যখন রিপুর আনুগত্য প্রবল হয়ে পড়বে, যাতে করে ভালমন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণকে উপেক্ষা করে শুধু রমণীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের বিষয়াদি তাদের হাতে অর্পণ করবে, তখন সে সময়ের জীবন অপেক্ষা তোমাদের জন্য মৃত্যুই উত্তম হবে। অবশ্য পরামর্শ করতে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মতামত নেওয়াতে কোন বাধা নেই। রাসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের আচার-আচরণের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে এবং সূরা বাকারার যে আয়াত ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ঃ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ শিশুর দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি পিতা-মাতার পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত হওয়া উচিত। এতে বিষয়টি যেহেতু স্ত্রীলোকের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের সাথে পরামর্শ করার বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে।

এক হাদীসে মহানবী (সা)-এর ইরশাদ রয়েছে ঃ

المستشار مؤتمن اذا استشير فليشره بما هو صانع لنفسه

অর্থাৎ "যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয় সে হলো আমানতদার। কাজেই সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অন্যকেও সে কাজেরই পরামর্শ দেওয়া তার পক্ষে ওয়াজিব। এর ব্যতিক্রম করা আমানতে খেয়ানত করার শামিল। এ হাদীসটি 'মু'জামে-আওসাত' গ্রন্থে হযরত আলী (রা) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে। (মাযহারী)

অবশ্য একথা হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া আবশ্যক যে, পরামর্শ শুধু সে সমস্ত ব্যাপারেই সুন্নত, যেগুলোর ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। পক্ষান্তরে যেসব ব্যাপারে পরিষ্কার শরীয়তী হুকুম রয়েছে তাতে কোন পরামর্শের আদৌ প্রয়োজন নেই। বরং এসব ব্যাপারে পরামর্শ করা জায়েযই নয়। উদাহরণত কোন লোক যদি নামায পড়বে কি পড়বে না, যাকাত দেবে কি দেবে না, হজ্জ করবে কি করবে না—এসব ব্যাপারে পরামর্শ করতে চায়, তবে তা জায়েয নয়। এগুলো পরামর্শের বিষয়ই নয়। শরীয়ত অনুযায়ী এগুলো একান্ত ও অলংঘনীয় ফরয। তবে হজ্জে এ বছরই যাবে কি পরবর্তী বছর যাবে, কিংবা পানির জাহাজে করে যাবে, না উড়োজাহাজে যাবে অথবা অন্য কোন পথে যাবে—এসব বিষয়ে পরামর্শ করা যেতে পারে।

তেমনিভাবে যাকাতের ব্যাপারে এমন পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে যে, তা কোথায়, কোন্ কোন্ লোকের জন্য ব্যয় করবে। কারণ, এসব ব্যাপারই শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐচ্ছিক।

এক হাদীসে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) এ বিষয়টির বিশ্লেষণ করেছেন। হযরত আলী (রা) ইরশাদ করেছেন যে, আমি হুযূরে আকরাম (সা)-এর সমীপে নিবেদন করলাম —আপনার পরে (তিরোধানের পরে) যদি আমাদের সামনে এমন কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যার প্রকৃষ্ট কোন নির্দেশ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যাপারে কোন বক্তব্য আমরা শুনিনি, তখন আমরা কি করবো ? মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, "এমন কাজের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যকার বিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও আবিদ লোকদেরকে সমবেত করবে এবং তাঁদের পরামর্শে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে ; কারও একক মতে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।"

এই হাদীস শরীফের দ্বারা একটি বিষয় তো এ-ই বোঝা যাচ্ছে যে, পরামর্শ শুধু পার্থিব ব্যাপারে নয়, বরং শরীয়তের যেসব আহকাম সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের পরিষ্কার কোন নির্দেশ না থাকবে, সে সমস্ত আহকাম সম্পর্কেও পারস্পরিক পরামর্শ করে নেওয়া সুন্নত। এছাড়া আরও একটি বিষয় বোঝা যায় যে, এমন সব লোকের কাছ থেকেই পরামর্শ নেওয়া উচিত যারা উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিচক্ষণতা ও ইবাদত পালনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। -(আল-খাতীব আররূহ)

খাতীব বাগদাদী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হুযূরে আকরাম (সা)-এর এ বাণীটিও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا

অর্থাৎ "বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না ; অন্যথায় অনুতাপ করতে হবে।"

এতদুভয় হাদীসের সমন্বয় করতে গেলে বোঝা যায় যে, পরামর্শ সভার সদস্যদের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। একটি হলো বুদ্ধিমান ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হলো ইবাদতে পাকা হওয়া। যার সারমর্ম এই যে, তাকে যোগ্যতাসম্পন্ন ও পরহিযগার হতে হবে। আর বিষয়টি যদি শরীয়ত সংক্রান্ত হয়, তাহলে দীনী ব্যাপারে বিচক্ষণতাও অপরিহার্য।

তৃতীয় বিষয় ঃ সাহাবায়ে-কিরামের নিকট থেকে রাসূল (সা)-এর পরামর্শের মান ঃ এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে সাহাবায়ে-কিরামের সাথে পরামর্শ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, মহানবী (সা) হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল এবং ওহীপ্রাপ্ত, কাজেই তাঁর অন্য কারও সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজন ? তিনি যে কোন বিষয় ওহীর মাধ্যমে লাভ করতে পারেন। কাজেই কোন কোন ওলামা পরামর্শের এ নির্দেশকে সাহাবায়ে-কিরামের মনস্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, মহানবী (সা)-এর না ছিল পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন, আর না ছিল তাঁর কোন কাজ পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইমাম জাস্‌সাসের মতে এই মতটি সঠিক নয়। কারণ, একথা যদি জানা থাকে যে, আমাদের পরামর্শের ওপর আমল করা হবে না কিংবা কোন কাজের ব্যাপারে পরামর্শের কোন প্রভাব নেই, তবে এ ধরনের পরামর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা মনস্তুষ্টি কোনটাই থাকে না। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, সাধারণ বিষয়ে মহানবী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে কর্মপন্থা সরাসরি নির্ধারণ করে দেওয়া হতো ঠিকই, কিন্তু হিকমত ও রহমতের তাকীদে কোন কোন ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর মতামত ও বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হতো। এমনি ধরনের ব্যাপারে প্রয়োজন হতো পরামর্শের। আর এসব বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যই হুযূরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মহানবী (সা)-এর পরামর্শ সভার বিবরণ থেকেও একথাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে যখন সাহাবায়ে-কিরামের সাথে পরামর্শ করেন, তখন সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আমাদেরকে যদি সাগরে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ করেন, তবে আমরা তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বো। আর আপনি যদি আমাদেরকে 'বারকূল-গামাদ' হেন দূর-দূরান্তের

দিকে যাত্রা করতে বলেন, তবে তাতেও আমরা আপনার সাথী হবো। মূসা (আ)-এর সাথীদের মত আমরা এ কথা বলবো না যে–"আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে কাফিরদের সাথে লড়াই করুন।" বরং আমরা নিবেদন করবো—"আপনি তশরিফ নিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে থেকে আপনার অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বাঁয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবো।"

এমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধের সময় পরামর্শ করা হয় যে, মদীনা নগরীর অভ্যন্তর থেকে শত্রুকে প্রতিহত করা হবে, না মদীনার বাইরে গিয়ে ? তাতে সাধারণভাবে সাহাবীগণের মত হলো বাইরে বেরিয়ে যাবার পক্ষে। তখন হুযূর (সা) তাই কবূল করে নিলেন। পরিখার যুদ্ধকালে কোন একটি বিশেষ চুক্তির ভিত্তিতে সন্ধি করার বিষয় ইপস্থিত হলে হযরত সা'দ ইবনে মা'আয (রা) এবং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রা) এ চুক্তিকে সমীচীন মনে করতে পারলেন না, তাঁরা বিরোধিতা করলেন। বস্তুত হুযূরে আকরাম (সা)-ও এদের মতই গ্রহণ করলেন। হুদায়বিয়ার কোন একটি ব্যাপারেও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এসব কয়টি বিষয় এমন ছিল যাতে হুযূর (সা)-এর জন্য ওহীর মাধ্যমে বিশেষ কোন দিক সাব্যস্ত করা হয়নি।

সারকথা হলো এই যে, নবুয়ত, রিসালাত এবং ওহীর অধিকারী হওয়া পরামর্শ গ্রহণের জন্য কোন অন্তরায় নয়। তাছাড়া এমনও নয় যে, এসব পরামর্শ শুধু বাহ্যিক ও মনস্তুষ্টির নিমিত্ত হবে ; আসল কাজের ব্যাপারে এ-সবের কোন প্রভাবই থাকবে না। বরং বহু ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাদের মতামতকেই মহানবী (সা) নিজের মতের বিপরীতে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এমন কি কোন কোন ব্যাপারে হুযূর (সা)-এর জন্য সরাসরি ওহীর মাধ্যমে কোন বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ না করে পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করার নির্দেশ দানের পেছনে এ তাৎপর্য এবং হিকমতও নিহিত ছিল যে, এতে ভবিষ্যত উম্মতের জন্য যেন রাসূলের কাজের মাধ্যমেই একটি সুন্নাতের প্রচলন হয়ে যায়। মহানবী (সা) যখন পরামর্শের ব্যাপারে মুক্ত নন, তখন অপর কেউ কেমন করে এ ব্যাপারে মুক্ত বলে দাবি করতে পারে! কাজেই হুযূরে আকরাম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের মাঝে এ ধরনের ব্যাপারাদিতে পরামর্শ রীতি সর্বদা অব্যাহত রয়েছে, যাতে শরীয়তের কোন স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। তাছাড়া মহানবী (সা)-এর পরে সাহাবায়ে-কিরামের মাঝেও এ রীতি অব্যাহতভাবে প্রচলিত রয়েছে। এমনকি পরবর্তীকালে শরীয়তের সে সমস্ত বিধি-বিধান অনুসন্ধান করার ব্যাপারেও পরামর্শের রীতি প্রচলিত থাকে যাতে কোরআন ও হাদীসের কোন প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বিদ্যমান ছিল না। কারণ, হযরত আলী (রা)-এর প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (সা) এই পন্থাই বাতলে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ বিষয় ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের মান কি হবে ঃ উপরে যেমন বলা হয়েছে যে, কোরআন করীমে দু'জায়গায় পরামর্শের ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। তার একটি হলো এ আয়াতে আর অপরটি হলো সূরা শূরার যে আয়াতে মুসলমানদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই বলে উল্লেখ করা হয়েছে وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ "আর তাদের কার্যাদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।" এতদুভয় জায়গাতেই পরামর্শের সাথে 'আমর' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর امر। শব্দের বিস্তারিত পর্যালোচনা উপরে করা

হয়েছে যে, যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা বা কাজকেই 'আমর' বলা হয়। তাছাড়া বিধি-বিধান বা রাষ্ট্রের অর্থেও এ কাজটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'আমর'-এর প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য হোক অথবা দ্বিতীয় অর্থই ব্যবহৃত হোক—যে কোন অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ করে নেওয়া অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়। বিধি-বিধান অর্থ নেওয়া হলে তো কথাই নেই, যদি সাধারণ অর্থেও 'আমর' শব্দের ব্যবহার হয়, তবুও বিধি-বিধান এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ই পরামর্শযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচক্ষণ ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া ইসলামী নেতৃবর্গের একান্ত দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের উল্লিখিত আয়াত এবং রাসূল করীম (সা) ও খোলাফায়ে-রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুমের কার্যধারাই এর প্রকৃষ্ট সনদ।

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো ঐ একটি পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, যাতে পরমর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে ; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। অধুনা ইসলামী শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যসমূহ জোরে হোক, জবরদস্তিতে হোক এ-দিকেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগেকার যুগের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন সমগ্র বিশ্বের উপর বর্তমান তিন বৃহতের স্থলে দুই বৃহতের শাসন বিদ্যমান ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের বিধি-বিধানই ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসাবে একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এতে এক ব্যক্তি লক্ষ কোটি বনী-আদমের উপর শসন করতো, নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে নয়, বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে। আর মানুষকে গৃহপালিত জানোয়ারের মর্যাদা দেওয়াকেও মনে করা হতো একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও ইন'আম। রাষ্ট্রীয় এই মতবাদ দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধু গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ যে, তাঁর উপর কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দুরূহ ব্যাপার। সে কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কোন স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি। বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিস্টটলের দর্শনের একটি শাখা হিসাবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের অপ্রাকৃতিক নীতি-পদ্ধতিসমূহ বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ-অপসারণের বিষয়টি একান্তভাবে জনসাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে, যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং বিচক্ষণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পথে আটকেপড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতিগ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। আজকের পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র নামে অভিহিত করছে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণই হলো এটি।

কিন্তু বর্তমান ধাঁচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক উৎপীড়ন-নিপীড়নেরই প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাও এত অসমঞ্জসভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, জনসাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন বিধানের মুক্ত-মালিকানা দান করেছে, ফলে তাদের মনমস্তিষ্ক আসমান, যমীন ও মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রাধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ্ তা'আলারই দেওয়া গণঅধিকারের উপর আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতাসমূহকে পর্যন্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থী বলে ধারণা করতে শুরু করেছে।

ইসলামী সংবিধান যেভাবে বনী-আদমকে 'কায়সার' ও 'কিসরার' এবং ব্যক্তি শাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্ত করেছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও দেখিয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ। কোন দেশের বিধিব্যবস্থা হোক কিংবা জনসাধারণ—সবাইকে একথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার আইনেরই অনুগত। জনসাধারণ এবং গণসংসদের অধিকার, আইন-প্রণয়ন, মনোনয়ন, অপসারণ সবই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে হতে হবে। শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ ও দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি যেমন পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনিভাবে তাদের আমানতদারী, বিশ্বস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন লোককেই নিজেদের শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি ইল্ম ও পরহিযগারী, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে হবেন সর্বোত্তম। তদুপরি এ নেতা নির্বাচন স্বেচ্ছাচারিতামূলক হবে না, বরং বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সৎ লোকদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে। কোরআনে করীমের উল্লিখিত আয়াত এবং রাসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা) ইরশাদ করেছেন : لاخلافة الا عن مشورة অর্থাৎ পরামর্শকরণ ব্যতীত খিলাফত হতে পারে না। —(কানযুল-উম্মাল)

আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন সময় পরামর্শের উর্ধ্বে চলে যায় কিংবা এমন ধরনের লোকের সাথে পরামর্শে প্রবৃত্ত হয়, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শের যোগ্য নয়, তবে তাকে অপসারিত করা অপরিহার্য।

ذكر ابن عطية ان الشورى من قواعد الشريعة والدين فعز له واجب، هذا مالا خلاف له.

অর্থাৎ ইবনে আতিয়্যাহ বলেন যে, পরামর্শ করা হলো শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। (যে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকদের পরামর্শ না নেবেন) তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। আর এটি এমন একটি মাস'আলা যাতে কারো মতবিরোধ নেই। —(আবূ হাইয়ান রচিত 'বাহ্রে-মুহীত')

পরামর্শ অপরিহার্য হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল লাভ হবে, তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, রাসূলে করীম (সা) পরামর্শকে 'রহমত' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে 'আদী ও বায়হাকী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য এ পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ্ এই পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত সাব্যস্ত করেছেন। —(বয়ানুল-কোরআন)

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তাঁর রাসূলকে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন, পরামর্শের কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু হুযূরের মাধ্যমে পরামর্শ-রীতির প্রচলন করার সাথেই নিহিত ছিল উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল। কাজেই আল্লাহ্ বহু বিষয় এমন রেখে দিলেন, যাতে সরাসরি কোন পরিষ্কার ওহী নাযিল হয়নি। বরং সেগুলোর ব্যাপারে হুযূরে আকরাম (সা)-কে পরামর্শ করে নেওয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

পঞ্চম বিষয় ঃ পরামর্শে মতবিরোধ হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পন্থা ঃ কোন বিষয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কি রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য থাকবেন, না সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠ হোক শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ এবং দেশের অধিকতর স্বার্থের প্রেক্ষিতে যে কোন মত গ্রহণ করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের থাকবে? কোরআন এবং রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের রীতি অনুযায়ী এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় না যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। বরং কোরআনে করীমের কোন কোন ইঙ্গিত-ইশারা এবং হাদীস ও সাহাবায়ে-কিরামের রীতির পর্যালোচনায়ও একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় মঙ্গল বিবেচনায় যে কোন দিক গ্রহণ করতে পারেন। তা সংখ্যাগুরুর মতানুযায়ী হোক কিংবা সংখ্যালঘুর মতানুযায়ী হোক। অবশ্য আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নিজের আত্মসন্তুষ্টি বা ইতমিনান হাসিল করার উদ্দেশ্যে যেমন অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করবেন, তেমনিভাবে সংখ্যাগুরুর মতৈক্যের বিষয়টি বিবেচনা করবেন। অনেক সময় এটাও তার আত্মতুষ্টির সহায়ক হতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে রাসূলে করীম (সা)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ فَـاِذَا عَـزَمْـتَ فَـتَـوَكَّـلْ عَـلَـى اللّٰه অর্থাৎ পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। এতে عزمت শব্দে عزم অর্থাৎ নির্দেশ বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প করাকে শুধু মহানবী (সা)-এর প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। عـزمـتـم (আযামতুম) বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে-কিরামের সংযুক্ততাও বোঝা যেতে পারতো। এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেওয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোন কোন সময় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত বেশি শক্তিশালী হতো তখন

সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমন সব মনীষী উপস্থিত থাকতেন, যাঁরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ। হুযূরে আকরাম (সা)-ও অনেক সময় 'শায়খাইন' অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগলো যে, উল্লিখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য নাযিল হয়ে থাকবে। হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে নিজস্ব সনদ অনুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ

عن ابن عباس (رض) فى قوله تعالى "وَشَاوِرْ هُمْ فِى الْاَمْرِ" قال ابو بكر (رض) و عمر رضى الله عنه (ابن كثير)

অর্থাৎ "ইবনে আব্বাস বলেন, উল্লিখিত شاورهم আয়াতের সর্বনামের লক্ষ্য হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। —(ইবনে কাসীর)

এ প্রসঙ্গে কালবী যে রেওয়ায়েত করেছেন, তা আরও সুস্পষ্ট ঃ

عن ابن عباس رضى الله عنه قال نَزَلَتْ فِى ابو بكر و عمر وكانا حواريتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وابوى المسلمين- (ابن كثير)

অর্থাৎ 'ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা দুজন হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর বিশেষ সাহাবী, উযীর বা মন্ত্রী আর মুসলমানদের মুরুব্বী ছিলেন। —(ইবনে কাসীর)

হুযূরে আকরাম (সা) একবার শায়খাইন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ لواجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما অর্থাৎ "তোমরা দুজন যখন কোন ব্যাপারে একমত হয়ে যাও, তখন আমি তোমাদের বিরোধিতা করি না। —(ইবনে কাসীর)

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এটা তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপন্থী এবং ব্যক্তিশাসনের রীতি। তাছাড়া এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষতির আশংকাও বিদ্যমান।

উত্তর এই যে, ইসলামী আইন পূর্বাহ্নেই এর প্রতি লক্ষ্য করেছে। কারণ যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীর বানিয়ে দেওয়ার অধিকারই জনসাধারণকে সে দেয়নি। বরং জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, আল্লাহ্-ভীতি ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে যাকে সবচেয়ে ভাল মনে করা হবে, শুধু তাকেই নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে। তবে যে ব্যক্তিকে এ সমস্ত উচ্চতর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, তার উপর যদি এমন সব দায়িত্ব আরোপ করা হয়, যা অবিশ্বাসী, ফাসিক ও ফাজির ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়, তবে তা বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়নীতিকে হত্যা করারই নামান্তর এবং যারা কাজের লোক, তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টির শামিল হবে।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ প্রতিটি কাজ করার পূর্বে পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার পর আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা ঃ এখানে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ ও চেষ্টা-চরিত্র করার বিধি-বিধান বাতলে দেওয়ার পর হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর, যখন কাজ করার স্থির সংকল্প করে নেওয়া হবে, তখন নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করবে। কারণ, এসব চেষ্টা-চরিত্রকে বাস্তবায়ন করে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্র হাতে। মানুষ বা তাদের মতামত কিছুই নয়। প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের হাজারো ঘটনায় এসব বিষয়ে অকৃতকার্যতা প্রত্যক্ষ করে থাকে। মওলানা রুমী বলেছেন ঃ

خویش را دیدیم در رسوائ خویش
امتحان ما مکن اے شاہ بیش

তাছাড়া فاذا عزمت فتوكل على الله বাক্যের দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাওয়াক্কুল কিংবা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উপকরণ ও চেষ্টা-চরিত্রকে পরিহার করার নাম নয়। বরং নিকটবর্তী উপকরণ পরিহার করে তাওয়াক্কুল করা নবীর সুন্নত ও কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। তবে দূরবর্তী উপকরণ এবং সুদূরের চিন্তা-ভাবনা পেছনে পড়ে থাকা কিংবা শুধু উপকরণের উপর নির্ভর করা এবং সেগুলোকেই কারিকা শক্তি বলে মনে করে প্রকৃত কারক থেকে গাফিল হয়ে পড়া নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলের খেলাফ।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ
أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ
بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَلَمَّا

أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ
عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ
نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ
يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾
الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا
عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ
اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

(১৬০) যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে ? আর আল্লাহ্র উপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত। (১৬১) আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (১৬২) যে লোক আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্র রোষ অর্জন করেছে ? বস্তুত তার ঠিকানা হলো দোযখ। আর তা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৬৩) আল্লাহ্র নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের। আর আল্লাহ্ দেখেন যা কিছু তারা

করে। (১৬৪) আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (১৬৫) যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল ? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী। (১৬৬) আর যেদিন দু' দল সৈন্যের মুকাবিলা হয়েছে সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ্র হুকুমেই হয়েছে এবং তা এ জন্য যে, যাতে ঈমানদারদের জানা যায় (১৬৭) এবং তাদেরকে যাতে জানা যায়, যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হলো, "এসো আল্লাহ্র রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর।" তারা বলেছিল—"আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।" সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুত আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (১৬৮) তারা হলো সেই সব লোক যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হতো না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৬৯) আর যারা আল্লাহ্র রাহে নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ্ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (১৭১) আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

যোগসূত্র ঃ ওহুদের ঘটনায় সাময়িক পরাজয় এবং মুসলমানদের পেরেশানির কারণে সাহাবায়ে-কিরামের সান্ত্বনার জন্য হুযূরে আকরাম (সা)-কে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে রাসূলে করীম (সা)-এর অসন্তুষ্টির আশংকা দূর হয়েছিল সত্য কিন্তু তাদের মনে এ পরাজয়ের জন্য বড় গ্লানি বিদ্যমান ছিল। সে জন্য আলোচ্য বারটি আয়াতের প্রথমটিতে তাঁদের পরাজয়ের গ্লানি মন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি বদরের দিনে একটি চাদর হারিয়ে গিয়েছিল। তাতে কোন কোন (স্বল্পজ্ঞান মুনাফিক) লোক বলল, হয়তো তা রাসূলে করীম (সা) নিয়ে নিয়েছেন। আর এ বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিল আমানতের খেয়ানত। এতে নবী ছিলেন পবিত্র। কাজেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হযরত রাসূলে মকবুল (সা)-এর মহত গুণ ও বৈশিষ্ট্য, আমানতদারী এবং সেই ধারণার ভ্রান্ততা বর্ণনা করে

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং হুযূরে আকরাম (সা)-এর অস্তিত্বকে মহা নিয়ামত এবং তাঁর আবির্ভাবকে মানব জাতির জন্য মহা অনুগ্রহ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

যেহেতু এই পরাজয়ের জন্য মু'মিনদের মনে অত্যন্ত কঠিন গ্লানি বিদ্যমান ছিল যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এহেন বিপদ কেন এবং কোথা থেকে এল। এরই ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কিরামের মনে বিস্ময় ও আক্ষেপ হচ্ছিল। তদুপরি মুনাফিকরা বলে বেড়াচ্ছিল যে, এরা যদি বাড়িতে বসে থাকত, তাহলে তাদেরকে মরতে হতো না। এরা তাঁদের শাহাদাতকে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনা বলে সাব্যস্ত করছিল। কাজেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম আয়াতে অন্য আরেক শিরোনামে এই সাময়িক বিপদ ও কষ্টের কারণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুনাফিকদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

নবম আয়াতে তাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'বাড়িতে বসে থাকাই মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায়।' আর দশম, একাদশ ও দ্বাদশতম আয়াতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মহান সাফল্য ও নিত্য জীবন লাভ এবং চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি মহান পরওয়ারদেগার তোমাদের সহায় থাকেন, তাহলে কেউ তোমাদের সাথে জিততে পারে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তখন তাঁর উপরে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে (এবং তোমাদেরকে জয়ী করে দেবে) ? আর যারা ঈমানদার তাদের পক্ষে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার উপরই ভরসা করা উচিত। আর নবীর পক্ষে শোভন নয় যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) খেয়ানত করবেন। অথচ (যে লোক খেয়ানতকারী কিয়ামতেও তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হবে। কারণ,) যে লোক খেয়ানত করবে, সে তার খেয়ানতকৃত বস্তু কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত করবে (যাতে সমগ্র সৃষ্টি অবহিত হতে পারে এবং সবার সামনে যাতে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হতে পারে)। অতঃপর (কিয়ামত অনুষ্ঠানের পরে) এই খেয়ানতকারীদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের বদলা (দোযখের মাঝে) পাবে। আর (তাদের) উপর একটুও অন্যায় করা হবে না। (অপরাধের অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না। যা হোক, খেয়ানতকারী তো গযব ও জাহান্নামের যোগ্য হলোই আর আম্বিয়া আলায়হিমুস্‌সালাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার কারণে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন হবেন। কাজেই এ দুটি বিষয়ে একত্রিত হতে পারে না-যেমন, বলা হয়েছে)। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুগত (যেমন, নবী) সে কি ঐ লোকের অনুরূপ হয়ে যাবে, যে লোক আল্লাহ্‌র গযবের অধিকারী হবে এবং যার ঠিকানা হবে দোযখ ? (যেমন, খেয়ানতকারী,) আর তা হলো নিকৃষ্টতম অবস্থান। (কস্মিনকালেও এতদুভয় সমান হবে না। বরং) আলোচ্য (ন্যায় ও সত্যানুগামী এবং যারা গযবের যোগ্য) ব্যক্তিবর্গ মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে হবে ভিন্ন। (যারা সত্যানুগ তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় ও জান্নাতী আর যারা ধিক্কৃত তারা দোযখের যোগ্য)। আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভাল করেই দেখেন তাদের কার্যকলাপসমূহ (কাজেই তিনি প্রত্যেকের সাথেই যথার্থ ব্যবহার করবেন)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি (বড়ই)

অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন (মহান) নবী পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত (ও আহ্‌কাম)-সমূহ পাঠ করে করে শোনান এবং (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পঙ্কিলতা থেকে) তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে থাকেন। আর তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) কিতাব ও জ্ঞানের কথা বাতলাতে থাকেন। বস্তুত বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরা (তাঁর আবির্ভাবের) পূর্ব থেকে পরিষ্কার ভ্রান্তি (অর্থাৎ) শিরক ও কুফরের মধ্যে (লিপ্ত) ছিল। আর (ওহুদের ময়দানে) যখন তোমরা এমনভাবে হেরে গেলে, যার দ্বিগুণ জিতে গিয়েছিলে (বদরের ময়দানে। কারণ, ওহুদে সত্তরজন মুসলমান শহীদ হন আর বদরে তাঁরা সত্তরজন কাফিরকে হত্যা করেন এবং সত্তরজনকে বন্দী করে নিয়ে আসেন)। তাহলে এমন ক্ষেত্রে কি তোমরা (প্রতিবাদ হিসাবে না হোক বিস্ময় প্রকাশছলে) এ কথা বলে থাক যে, (মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও) এই (পরাজয়) কোন্ দিক থেকে হলো (অর্থাৎ কেন হলো) ? আপনি বলে দিন, এই পরাজয় তোমাদেরই পক্ষ থেকে হয়েছে। (তোমরা যদি মহানবী [সা]-এর মতের বিরুদ্ধাচরণ না করতে, তাহলে পরাজয় বরণ করতে না। কারণ , হুযূরের পূর্ণ আনুগত্যের শর্তে বিজয়ের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল)। নিশ্চয়ই আলাহ্ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাবান। যখন তোমরা আনুগত্য প্রদর্শন করেছ, তখন তিনি তোমাদেরকে নিজ ক্ষমতায় বিজয় দান করেছেন। আবার যখন তোমরা বিরুদ্ধাচরণ করেছ, তখন তিনি স্বীয় ক্ষমতায় তোমাদেরকে পরাজয় দান করেছেন। আর যেদিন (মুসলমান ও কাফিরদের) দুটি (সৈন্য) দল পারস্পরিক (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন) তোমাদের উপর যে বিপদ এসে পড়েছিল, তা আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়েছিল। (এতে বহু হিকমত নিহিত ছিল, যা উপরেও উল্লিখিত হয়েছে)। আর (সে সমস্ত হিকমতের মধ্যে একটি হলো) যাতে মুসলমানদেরও আল্লাহ্ দেখে নেন। (কারণ, বিপদের সময়ই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। যেমন, উপরে উল্লিখিত হয়েছে)। এবং সেসব লোককেও যাতে দেখে নেন, যারা প্রতারণামূলক আচরণ করেছে)। আর (যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন তিনশ' লোক মুসলমানদের সহযোগিতা পরিহার করে চলে গিয়েছিল যেমন—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) তাদেরকে বলা হয় যে, (যুদ্ধের ময়দানে) চলে এস (তারপর সাহস হলে) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর কিংবা (সাহস না হলে) শত্রুকে প্রতিহত কর। (কারণ, ভিড় বেশি দেখে তাদের উপর কিছু প্রভাব পড়বে এবং এভাবে হয়তো সরেও পড়তে পারে)। তারা বলল, আমরা যদি নিয়মানুগ লড়াই দেখতাম, তবে তোমাদের সাথে অবশ্যই এসে শামিল হয়ে যেতাম। (কিন্তু এটা কি কোন লড়াই হলো যে, তারা তোমাদের তুলনায় তিন-চার গুণ বেশি ! তদুপরি তাদের কাছে যুদ্ধের উপকরণও রয়েছে বহুগুণ বেশি। কাজেই এমতাবস্থায় লড়াই করা আত্মহত্যারই নামান্তর। একে লড়াই বলা যায় না। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,) এই মুনাফিকরা (যখন এহেন বিশুষ্ক উত্তর দিয়েছিল,) সেদিন (প্রকাশ্যত তারা কুফরের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে সে অবস্থার তুলনায় যে), তারা (প্রথমে বাহ্যত) ঈমানের কিছুটা নিকটবর্তী ছিল। (কারণ, পূর্বে যদিও তারা বিশ্বাসের দিক দিয়ে মু'মিন ছিল না, কিন্তু মুসলমানের সামনে তাদের সমর্থনসূচক কথাবার্তা বলতে থাকত। কিন্তু সেদিন এমনিভাবে চোখ উল্টে গেল যে, তাদের মুখ থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতার কথা বেরিয়ে পড়ল। সুতরাং প্রথমে ঈমানের সাথে যে বাহ্যিক নৈকট্য ছিল, তা কুফরীর নৈকট্যে পরিণত হয়ে গেল। আর এই নৈকট্য পূর্ববর্তী নৈকট্য অপেক্ষা বেশি এজন্য যে, তাদের তখনকার সমর্থনসূচক কথাবার্তাগুলো

আন্তরিক ছিল না। কাজেই তা তেমন শক্তিপূর্ণও ছিল না। পক্ষান্তরে এই বিরোধিতাপূর্ণ কথা-বার্তাগুলো যেহেতু আন্তরিকও ছিল, সেহেতু এগুলো যথেষ্ট জোরদারও ছিল)। এরা নিজের মুখে এমন সব কথাবার্তা বলে, যা তাদের মনের কথা নয় (অর্থাৎ লড়াই যত সুষ্ঠুই হোক, মুসলমানদের সাথে সহযোহিতা না করাই হলো তাদের মনের কথা)। আর তারা যা কিছু নিজের মনে পোষণ করে আল্লাহ্ সে সব বিষয় খুব ভালভাবেই জানেন (কাজেই তাদের সে কথার ভ্রান্ততাও আল্লাহ্র জানা রয়েছে)। এরা এমন সব লোক (যারা নিজে তো জিহাদে অংশগ্রহণ করেইনি, তদুপরি ঘরে বসে বসে) নিজেদের (স্বগোত্রীয়) ভাইদের সম্পর্কে (যারা শহীদ হয়েছে) বলাবলি করে যে, (এরা) যদি আমাদের কথা মানত (অর্থাৎ আমাদের বারণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত) তবে (খামখা) নিহত হতো না। আপনি বলে দিন যে, তাই যদি হবে, নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে রাখ, যদি তোমরা (এ ধারণায়) সত্য হয়ে থাক (যে, মাঠে গেলেই মৃত্যু ঘটে। কারণ, হত্যা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য তো মৃত্যু থেকেই বাঁচা। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন হয়ে যাবে, তখন বসে বসেও মৃত্যু এসে যায়। কাজেই সময় এসে গেলে নিহত হওয়ার ব্যাপার খণ্ডিত হতে পারে না)। আর যারা আল্লাহ্র রাহে (ধর্মের জন্য) নিহত হয়ে গেছে তাদের (সাধারণ মৃত ব্যক্তিদের মত) মৃত বলে ধারণা করো না। বরং তারা (এক অনন্য জীবনধারায়) জীবিত (এবং) স্বীয় পালনকর্তার (দরবারে) নৈকট্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ অতি প্রিয়পাত্র)। তারা রিযিক প্রাপ্তও বটে। আর তারা সে বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দিত যা আল্লাহ্ তা'আলা আপন (কৃপা ও) অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন। (যেমন নৈকট্যের মর্যাদা, জাহিরী ও বাতিনী রিযিক প্রভৃতি)। আর (যেভাবে তাঁরা নিজেদের অবস্থায় আনন্দিত, তেমনিভাবে) যারা এখনও এ পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে ; তাঁদের নিকট পৌঁছতে পারেন নি (বরং) তাদের পেছনে পড়ে রয়েছেন, তাঁদের এ অবস্থার জন্যও (যারা শহীদ হয়েছেন) তাঁরা আনন্দিত যে, (যদি তাঁরাও শহীদ হয়ে যান, তবে আমাদেরই মত) তাদের উপরও কোন রকম ভয়ভীতি আরোপিত হবে না এবং তাঁরা (কোন অবস্থায়) দুঃখিত হবেন না। (সারকথা, তাঁরা দ্বিবিধ আনন্দ লাভ করবেন। একটি হলো নিজেদের সম্পর্কে আর অপরটি হলো নিজেদের সতীর্থদের সম্পর্কে। পরবর্তীতে তাদের এ আনন্দের কারণ বিবৃত হচ্ছে যে,) তারা (নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে আনন্দিত হয়) আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির কারণে (যা তাঁরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন)। আর (অন্যদের অবস্থা সম্পর্কে আনন্দিত হয়) এজন্য যে, (সেখানে যাবার পর তারা প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন যে,) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের (কাজের) প্রাপ্য বিনষ্ট করেন না। (কাজেই তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে সব লোক তাঁদের পেছনে রয়ে গেছেন এবং জিহাদ প্রভৃতির মত সৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরাও এমনি ধরনের পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গনীমতের মাল চুরি করা মহাপাপ ঃ কোন নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতা নেই ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্য থেকে একটি চাদর চুরি হয়ে যায়। কোন কোন লোক বলল, হয়তো সেটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়ে থাকবেন। এসব কথা যারা বলত, তারা যদি মুনাফিক হয়ে থাকে তবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে غلول বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা মহাপাপ হওয়া এবং কিয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ, নবীগণ হলেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত মানুষ।

غلول শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনীমতের মালে খেয়ানত করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর গনীমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশি কঠিন। তার কারণ, গনীমতের মালের সাথে গোটা ইসলামী সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনও কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যর্পণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক (সাধারণত) পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ্ যদি তওবা করার তওফীক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই—কোন এক যুদ্ধে এক লোক যখন উলের কিছু অংশ নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল বন্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হলো, তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে হুযূর (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হলো। তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমগ্র সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করব ? কাজেই কিয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়ো।

'গলূল' তথা গনীমতের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন এজন্যই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করা বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, দেখ কিয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে (এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল)—এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শাফা'আত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহর যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম ,তা সবই পৌছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না।

আল্লাহ্ রক্ষা করুন! হাশর মাঠের এই লাঞ্ছনা এমনই কঠিন হবে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, তারা কামনা করবে যে, আমাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তবু যেন এহেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে বেঁচে যাই।

ওয়াক্ফ ও সরকারী ভাণ্ডারে চুরি করা গলূলেরই পর্যায়ভুক্ত ঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ এবং ওয়াক্ফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার হাজার মুসলমানের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এমনিভাবে রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগার (বায়তুল মাল)-এর হুকুমও তাই। কারণ, এতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে, সে সবারই অধিকারে চুরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত মালেরই কোন একক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না ; বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক থাকে, কাজেই ইদানীং সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশি চুরি ও খেয়ানত এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে একান্ত নিস্পৃহ যে, এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের মাঠে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা। তদুপরি হুযূর আকরাম (সা)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত। —(নাউযুবিল্লাহ্)

মহানবী (সা)-এর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ ঃ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ। আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে। সে আয়াতের তফসীর মা'আরেফুল কোরআনের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এখানে এই আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে ঃ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ। অর্থাৎ রাসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়ে মু'মিনদের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয়টি হলো এই যে, কোরআনে করীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী (সা) হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নিয়ামত ও মহা অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এ আয়াতে শুধু মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হলো এই যে, যদিও রাসূলে মকবুল (সা)-এর অস্তিত্ব মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কোরআনে করীমও সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়েত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও নিয়ামতের ফল শুধু মু'মিন–মুত্তাকীরাই উপভোগ করেছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো রাসূলে করীম (সা)-কে মু'মিনদের জন্য কিংবা সমগ্র বিশ্বের জন্য মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ হিসাবে বিশ্লেষণ করা।

আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতা বিমুখ এবং বস্তুবাদিতার দাসে পরিণত না হতো, তবে এ বিষয়টি কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত না ; যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এই মহা অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর জীব-জন্তুসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু রয়নি, কাজেই তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও ইন'আম বলতেও সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের পেট ও জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ সংগৃহীত হয়। তারা সেগুলোর অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও তার ভালমন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সে কারণেই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম একথা বাতলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের মূল তত্ত্ব শুধু কয়েকটি হাড়গোড় ও চর্ম-মাংসের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য হলো সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার দেহে বর্তমান রয়েছে, ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে যতই দুর্বল, সামর্থ্যহীন ও মুমূর্ষু হোক, দেহে আত্মা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেবার কিংবা তার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে যখনই তার দেহ থেকে এই আত্মা পৃথক হয়ে যায়, তখন সে যত বড় বীর-পাহলোয়ানই হোক, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই সুগঠিত ও সুসংহত থাক, সে আর মানুষ থাকে না—নিজের বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

আম্বিয়া (আ) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্য, যাতে তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজকর্ম মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রতিপন্ন হতে পারে। তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব-জানোয়ারের মত অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রাসূলে মকবুল (সা)-এর মর্যাদা অন্যান্য নবী-রাসূল অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মক্কী জীবনে শুধু মানব সমাজের জন্য ক্যাডার গঠনের কাজই সম্পাদন করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে দিয়েছেন, যার মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতেও উর্ধ্বে। সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনও এমন ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁদের একেকজন রাসূলে করীম (সা)-এর প্রত্যক্ষ মু'জিযার ফসলে প্রতীয়মান হয়েছেন। তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি রেখে গেছেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে-কিরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এই শিক্ষা সারা বিশ্বেরই জন্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যই অনুগ্রহ স্বরূপ। অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মু'মিনগণই পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের কারণ ঃ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ ... আয়াতের পূর্বেও কয়েক স্থানে এ বিষয়টির আলোচনা এসে গেছে। এখানে পুনরায় অধিকতর তাকীদের সাথে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। কারণ, এ ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে কঠিন গ্লানি বিদ্যমান ছিল। এমনকি কোন কোন সাহাবীর মুখে এ কথাও উচ্চারিত হলো যে, أَنَّى هَٰذَا অর্থাৎ এ

বিপদ কোথা হতে এল, অথচ আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি।

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আজ তোমাদের উপর যত বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয়েছে, তোমরা ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধকালে তোমাদের প্রতিপক্ষের উপর এর দ্বিগুণ বিপদ চাপিয়েছিলে। তার কারণ, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন সত্তরজন অথচ বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সত্তরজন সরদার তো নিহত হয়েই ছিল, তদুপরি আরো সত্তরজন বন্দী হয়ে মুসলমানদের হাতে এসেছিল। এ বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবার একটি উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই ভেবে যেন মুসলমানদের বর্তমান গ্লানি কিছুটা লাঘব হয়ে যায় যে, যারা দ্বিগুণ বিজয় অর্জন করেছে, তারা যদি একবার অর্ধেক পরাজিত হয়ে যায়, তবে তাতে তেমন দুঃখিত কিংবা বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ বাক্যে। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, বিপদাপদ যাই এসেছে আসলে তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আসেনি, বরং তোমাদের নিজেদেরই কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ পালনে তোমাদের শিথিল হয়ে যাওয়া।

অতঃপর فَبِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যাই কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সমর্থন হয়েছে, যাতে নিহিত রয়েছে বহু হিকমত ও রহস্য। সেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ্ নিঃস্বার্থ মু'মিনগণকেও দেখে নেবেন অর্থাৎ যাতে মু'মিনদের নিঃস্বার্থতা এবং মুনাফিকদের প্রতারণা এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায়, যাতে যে কোন লোক তা দেখে নিতে পারে। এখানে আল্লাহ্‌র দেখে নেওয়ার অর্থ হলো এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেওয়া। অন্যথায় আল্লাহ্ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুত এই রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফিকরা সরে দাঁড়িয়েছে, আর নিঃস্বার্থ মু'মিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে যেসব মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব প্রতিদান দিয়েছেন, অন্যদেরও তার প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا আয়াতে শহীদদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা : এ আয়াতে শহীদানের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

এখানে শহীদানের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম ফযীলত স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাঁরা মরেন নি, বরং অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাঁদের

মৃত্যুবরণ এবং সমাহিত হওয়াটা একান্তই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বিষয়। তবুও কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদেরকে মৃত না বলার এবং মনে না করার যে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কি ? যদি বলা হয় যে, এতে 'বরযখ'-এর জীবন বোঝানো হয়েছে, তবে এ জীবন তো মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবারই রয়েছে। মৃত্যুর পর তাদের সবার রূহ্ই জীবিত থাকে। আর কবরের সওয়াল-জওয়াবের পর সৎ-মু'মিনদের জন্য সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা এবং বেঈমান কাফিরদের জন্য কবর আযাবের ব্যবস্থার বিষয় তো কোরআন-সুন্নাহ্র দ্বারাই প্রমাণিত। কাজেই বরযখের জীবন যখন সবার জন্যই ব্যাপক, তখন শহীদানের বৈশিষ্ট্য কি রইল ?—

উত্তর এই যে, কোরআনে-করীমের এই আয়াতেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শহীদরা রিযিক পেয়ে থাকেন। আর রিযিক তারাই পেয়ে থাকে, যারা জীবিত। এতে বোঝা যায়, এই জড় পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহীদের জন্য স্বর্গীয় রিযিক প্রাপ্তি আরম্ভ হয়ে যায় এবং তখন থেকে তাঁরা এক বিশেষ ধরনের জীবন প্রাপ্ত হন, যা সাধারণ মৃতদের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)

এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, সে বৈশিষ্ট্যসমূহ কেমন এবং সে জীবনই বা কোন্ ধরনের ? এর তাৎপর্য একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারে না এবং জানার কোন প্রয়োজনও নেই। অবশ্য কোন কোন সময় তাদের এই বিশেষ ধরনের জীবনের কিছু লক্ষণ এ পৃথিবীতেই তাদের দেহে প্রকাশ পায় ; মাটি তাঁদেরকে খায় না, তাঁদের লাশ বরাবর অবিকৃত রয়ে যায়।—এ ধরনের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। —(কুরতুবী)

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তাঁদের অনন্ত জীবন লাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিক প্রাপ্তি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ আয়াতে যে, তাঁরা সদাসর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ্ তাঁদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হলো, وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের যেসব উত্তরসুরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তাঁরাও পৃথিবীতে থেকে সৎ কাজ ও জিহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তাঁরাও এখানে এসে এমনি সব নিয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

আর সাদ্দী (র) বর্ণনা করেছেন যে, শহীদের যেসব আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন তোমার নিকট আসছেন, তখন তিনি তেমনি আনন্দিত হন, যেমন পৃথিবীতে বহু দূরের কোন বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে হয়ে থাকে।

এ আয়াতের যে শানে নযুল হযরত আবূ দাউদ (র) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন যে, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন, তখন আল্লাহ্ তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির পালকের ভেতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝরনা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তাঁরা

সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহ্র আরশের নিচে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, "আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত ; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশ গ্রহণের) চেষ্টা করে।" তখন আল্লাহ্ বললেন, "তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।" এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল করা হয়। —(কুরতুবী)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ
سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ
الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

(১৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহিযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম ; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট ; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী!' (১৭৪) অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহ্র অনুগ্রহ অতি বিরাট। (১৭৫) এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা মেনে নিয়েছে (যখন তাদেরকে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আহ্বান করা হয়, লড়াইয়ের মাঝে) সদ্য যখমী হওয়া সত্ত্বেও, তাদের মাঝে যারা সৎ ও

পরহিযগার (প্রকৃতপক্ষে সবাই সে রকম), তাদের জন্য (আখিরাতে) রয়েছে মহা সওয়াব। এরা এমন (নিঃস্বার্থ) লোক যে, (কোন কোন) লোক (অর্থাৎ আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা) তাদের কাছে (এসে) বলল যে, তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) তোমাদের (মুকাবিলার) জন্য বিরাট সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে তোমাদের আশংকা করা উচিত। তখন এতে (এ সংবাদ) তাদের ঈমান (এর জোশ)-কে আরও বাড়িয়ে দিল এবং (অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একথা) বলে প্রসঙ্গ সমাপ্ত করে দিল যে, (যাবতীয় জটিলতায়) আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। আর তিনিই সমস্ত বিষয় সমর্পণ করার জন্য উত্তম। (এই সমর্পণকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল)। সুতরাং এরা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহে (অর্থাৎ সওয়াব ও আখিরাতের মুক্তিতে) ধন্য হয়ে ফিরে এল। তাদের কোনই অনিষ্ট হলো না। আর এরা (এ ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ্র ইচ্ছার) অনুগত রইল (এবং তার ফলে পার্থিব নিয়ামতের দ্বারাও ধন্য হলো)। আর আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল। (হে মুসলমানগণ) ! এর চেয়ে অধিক (আশংকাজনক) কোন কিছুই হতে পারে না যে, এই সংবাদদাতা শয়তান (কার্যত) সে নিজের (স্বধর্মীয়) বন্ধুদের ব্যাপারে (তোমাদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করছে। সুতরাং তোমরা কখনও তাদের ভয় করো না এবং শুধু আমাকে ভয় করবে, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে নযূল ঃ উপরে গযওয়ায়ে ওহুদের কাহিনীর বর্ণনা ছিল। উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সে যুদ্ধ প্রসঙ্গেই অন্য আরেকটি যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে, যা 'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' নামে খ্যাত। 'হামরাউল আসাদ' হলো মদীনা তাইয়্যেবা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

এই যুদ্ধের ঘটনাটি এই—মক্কার কাফিররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেওয়াই উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের সম্পর্কে এই বলে ভয় ধরিয়ে দেবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুযূর (সা) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। —(ইবনে জারীর, রূহুল বয়ান)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত রয়েছে যে, ওহুদের দ্বিতীয় দিনে রাসূলুলাহ্ (সা) স্বীয় মুজাহিদদের মাঝে ঘোষণা করলেন যে, আমাদেরকে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। কিন্তু এতে শুধু সেসব লোকই যেতে পারবে, যারা গতকালকের যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিল। এ ঘোষণায় দু'শ মুজাহিদ দাঁড়িয়ে গেলেন।

আর সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরিকীনের পশ্চাদ্ধাবন করবে ? তখন সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হলেন, যাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা দিনের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা 'হামরাউল-আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সেখানে নু'আয়ম ইবনে মাসঊদের সাথে সাক্ষাত হলো। সে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ এবং মদীনাবাসীদের স্বাগত জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত, দুর্বল সাহাবায়ে কিরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী।

এদিকে মুসলমানদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেওয়া হলো, কিন্তু মুসলমানরা তাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না। অপরদিকে বনী খোযাআহ্ গোত্রের মা'বাদ ইবনে খোযাআহ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বন্ধুত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবূ সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য আক্ষেপ করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে, তখন সে আবূ সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

এ ঘটনার বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, গযওয়ায়ে ওহুদে আহত হওয়া সত্ত্বেও এবং কঠিন কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে আরেক জিহাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) আহ্বান জানালেন, তখন তাঁরা তার জন্যও তৈরি হয়ে গেলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে যে সব মুসলমানের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর একটি হলো مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে তাঁরাই সাড়া দিয়েছেন যাঁরা ওহুদের যুদ্ধে যখমী হয়েছিলেন। তাঁদের সত্তরজন বীর যোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের শরীরও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তাঁদেরকে আরেক জিহাদের আহ্বান জানানো হলো, অমনি তৈরি হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা ও আত্মবিসর্জনের মহান কীর্তি স্থাপনের সাথে সাথে অনুগ্রহ ও পরহিযগারীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। আর এই সমন্বিত বৈশিষ্ট্যই তাদের মহাপ্রতিদান প্রাপ্তির কারণ।

এ আয়াতে مِنْهُمْ (তাদের মধ্য থেকে) সর্বনাম ব্যবহারের কারণে এমন সন্দেহ করা বাঞ্ছনীয় নয় যে, তাঁদের সবাই অনুগ্রহ ও পরহিযগারীর গুণে গুণান্বিত ছিলেন না, বরং তাঁদের মধ্যে কিছু লোক এ গুণের অধিকারী ছিলেন। তার কারণ এখানে مِنْ শব্দটি বিশিষ্টতা বিধানের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এ আয়াতের প্রাথমিক বাক্যগুলোই সাক্ষ্য বহন করছে—বলা হয়েছে — اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا (অর্থাৎ যারা আহবানে সাড়া দিয়েছে) এই সাড়া দান ও আনুগত্য প্রকাশ ইহ্সান ও তাকওয়ার অবর্তমানে সম্ভব হতে পারে না। কাজেই অধিকাংশ মুফাসসিরিন এ ক্ষেত্রে مِنْ বাক্যটিকে বিশ্লেষণমূলক বলে সাব্যস্ত করেছেন, যার সারমর্ম হলো এই যে, এ সমস্ত লোক যারা ইহ্সান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত, তাঁদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

নিঃস্বার্থতার অবর্তমানে কৃতকার্যতার জন্য শুধু চেষ্টা-চরিত্র ও আত্মনিবেদনই যথেষ্ট নয় ঃ এই বিশেষ বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়টি জানা গেল যে, কোন কাজ যতই সৎ হোক এবং তার জন্য কেউ যতই সচেষ্ট ও নিবেদিতপ্রাণ হোক, আল্লাহ্র দরবারে সে তখনই প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য হতে পারে, যখন তাতে ইহ্সান ও তাকওয়ার সমন্বয় ঘটবে। সারকথা হচ্ছে যে, সে কাজটি একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হবে। অন্যথায় আত্মনিবেদন ও বীরত্বের বিষয় কাফিরদের মধ্যেও কম নেই।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশ ঃ এ ঘটনায় মুশরিকীনদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ যে রাসূলুল্লাহ (সা) দিয়েছিলেন, সে কথা কোরআনের কোন আয়াতে উল্লেখ নেই। কিন্তু এ আয়াতে যখন তাঁদের আনুগত্যের প্রশংসা করা হয়, তখন সে নির্দেশকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল উভয়ের দিকে সম্পর্কিত করে اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ বলা হয়েছে। এতে অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নির্দেশ দান করেছেন, তা আল্লাহ্রও নির্দেশ বটে, তা আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখ থাক আর নাই থাক।

যেসব ধর্মহীন লোক হাদীসকে অস্বীকার করে এবং রাসূল (সা)-কে শুধু একজন দূত বলে অভিহিত করে (মাআযাল্লাহ্) তাদের উপলব্ধির জন্যও বাক্যটি যথেষ্ট হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশকে আল্লাহ্ নিজেরই নির্দেশ বলে সাব্যস্ত করেছেন। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ও স্বীয় দূরদর্শিতার আলোকে অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু নির্দেশ দানের অধিকারী এবং তাঁর দেয়া এ হুকুমের মর্যাদাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া নির্দেশাবলীরই অনুরূপ।

ইহ্সানের সংজ্ঞা ঃ হাদীসে জিবরীলে হুযূর আকরাম (সা) ইহ্সানের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ـ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তোমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। আর এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি করতে না পার, তবে অন্তত এমন অবস্থা তো হবে যে, তিনি তোমাদের দেখছেন।

তাকওয়া বা পরহিযগারীর সংজ্ঞা ঃ তাকওয়ার সংজ্ঞা বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা হলো সেটি, যা হযরত উমর (রা)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) দিয়েছেন। হযরত উমর (রা) প্রশ্ন করেছিলেন, তাকওয়া কি ? হযরত উবাই ইবনে কা'আব বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি কি কখনও এমন পথ অতিক্রম করেছেন, যা পরিপূর্ণভাবে কণ্টকাকীর্ণ? হযরত উমর (রা) বললেন, কয়েকবারই এমন হয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) বললেন, এমন ক্ষেত্রে আপনি কি করেছেন ? হযরত উমর (রা) বললেন, আঁচল গুটিয়ে একান্ত সাবধানতার সাথে চলেছি। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) বললেন, ব্যস, 'তাকওয়া' এরই নাম। এ দুনিয়া হলো একটি কাঁটাবন ; পাপের কাঁটায় পরিপূর্ণ। কাজেই দুনিয়ায় এমনভাবে চলা এবং জীবন যাপন করা উচিত, যাতে পাপের কাঁটায় আঁচল ফেসে না যায়। এরই নাম তাকওয়া, যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। হযরত আবুদ-দারদা (রা) প্রায়ই এই কবিতা পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন ঃ

يَقُوْلُ الْمَرْءُ فَائِدَتِيْ وَمَالِيْ
وَتَقْوَى اللّٰهِ اَفْضَلُ مَااسْتَفَادَا

অর্থাৎ মানুষ নিজের পার্থিব লাভ এবং সম্পদের পেছনে পড়ে থাকে, অথচ তাকওয়াই হলো সবচেয়ে উত্তম পুঁজি।

দ্বিতীয় আয়াতে এই জিহাদে অগ্রসরমান সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অধিকতর প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۔

অর্থাৎ এরা সেসব মহাত্মা ব্যক্তি, যখন তাঁদেরকে লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিরাট সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে ; তাদের ভয় কর। যুদ্ধের সংকল্প নিও না। তখন এ সংবাদ তাঁদের ঈমানী উদ্দীপনাকে আরও বাড়িয়ে দিল। তার কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে যখন তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তখন প্রথম দিন থেকেই অনুভব করছিলেন যে, যে পথে চলতে আরম্ভ করেছি, তা একান্তই শংকাপূর্ণ। প্রতি পদে পদে জটিলতা ও বাধার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের পথ রোধ করা হবে এবং আমাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে মিটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলবে। কাজেই যখন তাঁরা এহেন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা প্রত্যক্ষ করতেন তখন তাঁদের ঈমানের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যেত এবং সর্বাপেক্ষা প্রাণপণ ও আত্মনিবেদনের মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করতেন।

বলা বাহুল্য, এ সকল সাহাবায়ে-কিরামের ঈমান ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই ছিল একান্ত পরিপূর্ণ। কাজেই এ দু'আয়াতে ঈমানের বৃদ্ধি বলতে ঈমানের গুণ ও ফলাফলের বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত সাহাবায়ে কিরামের এ অবস্থানটিও এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সফরের সারা পথে তাঁরা আবৃত্তি

করছিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম সিদ্ধিদাতা।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্র উপর রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের চাইতে অধিক তাওয়াক্কুল তো দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতেই পারে না, কিন্তু তাঁদের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পরিহার করে বসে থাকতেন এবং বলতেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি বসিয়ে বসিয়েই আমাদের বিজয় দান করবেন। কিন্তু তা নয়। বরং তিনি সাহাবায়ে-কিরামকে সমবেত করলেন, আহত মানুষের মনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করলেন, জিহাদের জন্য তাঁদেরকে তৈরি করলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। বস্তুত নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল, সেসবই তিনি করলেন এবং তারপর বললেন, "আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এটাই হলো সেই সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, যার শিক্ষা কোরআনে দেওয়া হয়েছে। আর রাসূলে করীম (সা)-ও এরই উপর আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাছাড়া বাহ্যিক ও পার্থিব উপকরণসমূহও আল্লাহ্তা'আলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা তাঁর অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাত নয়। অবশ্য যদি কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তখন তাকে মনে করা হবে অপারক, মা'যুর। তা না হলে যথার্থ বিষয় হলো ঃ برتوکل زا نوئے اشتربہ بند

রাসূলে করীম (সা) স্বয়ং কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এ আয়াত সম্পর্কেই পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দুব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। এই মীমাংসাটি যে লোকের বিরুদ্ধে গেল তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তা শুনলেন এবং একথা বলতে বলতে চলে যেতে লাগলেন ঃ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ হুযূর (সা) বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তারপর বললেন ঃ

ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل-

অর্থাৎ আল্লাহ্ হাত-পা ভেঙে বসে থাকা পছন্দ করেন না। বরং তোমাদের উচিত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর নরম হয়ে যাওয়া এবং 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কারক' বলে ঘোষণা করা।

তৃতীয় আয়াতে ঐসব সাহাবায়ে-কিরামের জিহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ـ

"এরা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তারা একটুও অসন্তুষ্ট হলো না। আর তারা হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত ।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে তিনটি নিয়ামত দান করেছেন। প্রথম নিয়ামত হলো এই যে, কাফিরদের মনে তাঁদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নিয়ামতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নিয়ামত শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় নিয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তাঁরা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল'।

তৃতীয় নিয়ামতটি হলো আল্লাহ্‌র রেযামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নিয়ামতের উর্ধ্বে এবং যা এই জিহাদে তাঁদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কোরআনে করীম حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আয়াতে যেসব লাভ ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে, তা শুধু সাহাবায়ে-কিরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে এর জপ করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে।

'হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোন দোয়া করা হলে আল্লাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় 'হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নিমা'ল ওয়াকীল' পাঠ করা পরীক্ষিত।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের ভীত করার উদ্দেশ্যে মুশরিকদের প্রত্যাবর্তনের যে সংবাদটি দিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সে ছিল শয়তান। সে তোমাদেরকে স্বীয় সহযোগী বা বিধর্মীয় কাফিরদের ভয় দেখাতে চায়। তাহলে আসল ইবারতে যেন يُخَوِّفُ এর একটি কর্ম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ– يُخَوِّفُكُمْ আর দ্বিতীয় কর্ম أَوْلِيَاءَهُ উল্লিখিত রয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ এ ধরনের সংবাদে মুসলমানদের আদৌ ভয় করা উচিত নয়। অবশ্য আমাকে ভয় করতে থাকা কর্তব্য অর্থাৎ আমার আনুগত্যের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে গিয়ে প্রত্যেক মু'মিনেরই ভয় করা কর্তব্য। বস্তুত আল্লাহ্‌র রহমত থাকলে কোনই ক্ষতি সাধিত হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র ভয় অর্থ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা মুসলমানদের উপর তিনি ফরয করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। বলা হয়েছে يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ কিন্তু কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, কান্নাকাটি আর অশ্রুপাতের নামই আল্লাহ্‌র ভয় নয়, বরং সে লোকই খোদাভীরু, যে এমন প্রত্যেকটি বিষয় পরিহার করে, যাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হাজারো আশংকা বিদ্যমান।

হযরত আবূ আলী দাক্কাক (র) বলেন, আবূ বকর ইবনে কাওয়াফ একবার অসুস্থ ছিলেন। আমি তাকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থতা দান করবেন। তিনি বলতে লাগলেন, তুমি কি মনে করেছ, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি ? তা নয়। মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে আমার ভয় যে, সেখানে না কোন আযাবের সম্মুখীন হতে হয়। —(কুরতুবী)

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ
اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا
الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا
اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۷۸﴾

(১৭৬) আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন তোমাদেরকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আখিরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১৭৭) যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১৭৮) কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কৃতজ্ঞতা ও অকল্যাণকামিতার উল্লেখ ছিল। বর্তমান আলোচ্য আয়াতগুলোতে হুযূর (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি কাফিরদের আচরণে দুঃখিত কিংবা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। তারা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। শেষ আয়াতে এ ধারণার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুনিয়ার এসব কাফিরের প্রচুর উন্নতি সাধন করতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় তাদের অভিশপ্ত এবং লাঞ্ছিত কেমন করে মনে করা যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনার জন্য তারা চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত, যারা তাড়াহুড়া করে কুফরের (কথায়) পড়ে যায়, যথা (মুনাফিকগণ মুসলমানদের অবস্থা সামান্য খারাপ দেখলেই খোলাখুলি কুফরের কথা বলতে আরম্ভ করে। যেমন উল্লিখিত ঘটনায় প্রতীয়মান হয়েছে)। নিশ্চয়ই সে সমস্ত লোক আল্লাহ্ তা'আলার (তথা ধর্মের) সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না। (কাজেই আপনার এ ব্যাপারে দুঃখিত হওয়া উচিত নয় যে, তাদের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণে দীনের কোনরকম ক্ষতি সাধিত হয়ে যাবে। (আর আপনার যদি এই কাফিরদের জন্য দুঃখ হয় যে, এরা কেন এভাবে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তবুও আপনি দুঃখ করবেন না। কারণ,

(সৃষ্টিগতভাবেই) আল্লাহ্ তাই মঞ্জুর করে নিয়েছেন যে, আখিরাতে তাদের কোনই অংশ দেবেন না। অতএব তাদের দ্বারা কোন সহযোগিতার আশা করা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে দুঃখ তখনই হয়, যখন আশা জড়িত থাকে। আর (তাদের জন্য শুধু আখিরাতের নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিতই নয়, বরং) তাদের জন্য রয়েছে মহা-আযাব। (আর এরা যেমন দীন ইসলামের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না, তেমনিভাবে) নিশ্চয়ই যত লোক ঈমান (পরিহার করে)-এর স্থলে কুফরী গ্রহণ করে রেখেছে (তা তারা মুনাফিক হোক কিংবা প্রকাশ্য কাফির হয়ে থাক, কাছের হোক অথবা দূরের হোক) তারা আল্লাহ্ তা'আলার (দীনের) সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না। বস্তুত তাদের (পূর্ববর্তী লোকদের মতই) বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। আর যারা কুফরী করছে, তারা যেন কস্মিনকালেও এমন চিন্তা না করে যে, তাদের (আযাব থেকে) আমার অবকাশ দান তাদের জন্য (তেমনি) উত্তম (ও কল্যাণকর। তা অবশ্য নয়, বরং) আমি এ জন্য অবকাশ দান করছি (যাতে বয়োবৃদ্ধির কারণে তাদের পাপে অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়।) এবং যাতে তারা একবারে সম্পূর্ণ শাস্তি প্রাপ্ত হয়। আর (দুনিয়াতে যদি শাস্তি না হয়ে থাকে, তাতে কি হবে, আখিরাতে তো) তাদের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি হবেই।

কাফিরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আযাবেরই পরিপূর্ণতা ঃ এ ক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাফিরদের অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফিররা নির্দোষ। কারণ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, কাফিরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগবিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয়, এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেয়া পার্থিব ভোগ- বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেসবই ছিল নরকাঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا অর্থাৎ কাফিরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিস্তি, যা আখিরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

(১৭৯) না-পাককে পাক থেকে পৃথক করে দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ এমন নন যে, ঈমানদারদের সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের গায়েবের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর রাসূলদের উপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন কর। বস্তুত তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহিযগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে এ সন্দেহের উত্তর ছিল যে, কাফিররা যদি আলাহ্ তা'আলার কাছে গযবের অধিকারী ও অভিশপ্ত হয়ে থাকে, তবে দুনিয়াতে তারা ধনসম্পদ ও বিলাস বৈভব প্রাপ্ত হবে কেন ? আলোচ্য আয়াতে তারই বিপরীতে এই সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যে সমস্ত মুমিন ও মুসলমান আলাহ্ তা'আলার কাছে প্রিয় তাদের উপর বিপদাপদ ও কষ্ট আপতিত হয় কেন ? অথচ নৈকট্য ও প্রীতির কারণ তো আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ ঈমানদারদের সে অবস্থায় রাখতে চান না, যাতে তোমরা রয়েছ (অর্থাৎ কুফর ও ঈমান, ন্যায় ও অন্যায় এবং মু'মিন ও মুনাফিকের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া পার্থিব নিয়ামতরাজির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য ও বিশেষত্ব নেই। বরং মুসলমানদের উপর বিপদাপদ পতিত হতে থাকা তখন পর্যন্ত অপরিহার্য) যতক্ষণ না নাপাক (মুনাফিকগণ)-কে পাক পবিত্র (নিঃস্বার্থ মুসলমানদের) থেকে পৃথক করে দেওয়া হয় ; (বস্তুত এই পৃথকীকরণ দুঃখ-কষ্ট ও জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হতে পারে। আর যদি কারও মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মু'মিন ও কাফির এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকল্পে কি শুধু বিপদাপদ আরোপ করেই পার্থক্য প্রকাশ করা অপরিহার্য ? আলাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমেও ঘোষণা করতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি নিঃস্বার্থ মু'মিন এবং অমুক মুনাফিক। আর অমুক বিষয় হালাল এবং অমুক বিষয়টি হালাল নয়। এর উত্তর এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (হিকমতের তাকীদে) এমন সব গায়েবী বিষয়ে (তোমাদের সরাসরি পরীক্ষা সম্পর্কে) অবগত করতে চান না। তবে যাদেরকে (তিনি) স্বয়ং এভাবে অবগত করতে চান আর (এসব লোক) হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর। (সরাসরি গায়েবী বিষয়ে অবগতি করার উদ্দেশ্যে দুর্ঘটনাও) তাদেরকে বেছে নেয়। (আর তোমরা যেহেতু পয়গম্বর নও, কাজেই এ ধরনের বিষয়ে তোমাদের অবহিত করা যায় না। অবশ্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে তাদের নিঃস্বার্থতা ও মুনাফিকী আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। যখন একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, পৃথিবীতে কাফিরদের উপর আযাব নাযিল না হয়ে বরং বিলাস-বৈভব প্রাপ্ত হওয়া এবং মুসলমানদের উপর কোন কোন বিপদাপদ আসাটা একান্তই হিকমতের তাকীদ। এসব বিষয়ে কারও নৈকট্য লাভ কিংবা অভিশপ্ত হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না)। সুতরাং এখন (আর) তোমরা ঈমানের পছন্দনীয় হওয়া আর কুফরী পছন্দনীয় না হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ

করো না। বরং আল্লাহ্ এবং সমস্ত রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ফেল। আর তোমরা যদি ঈমান আন এবং (কুফর ও পাপ থেকে) পরহিযগারী অবলম্বন কর, তবে তোমরা বিরাট প্রতিদান পাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মু'মিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বিধানের তাৎপর্য ঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে মুনাফিকের প্রতারণা প্রকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ পার্থক্য বিধান যদিও ওহীর মাধ্যমে মুনাফিকদের নামোল্লেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্তু হিকমতের তাগাদা তা নয়। আলাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ হিকমত তিনিই জানেন। তবে এখানে একটি হিকমত এটাও হতে পারে যে, মুসলমানদের যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হতো যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফিক, তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তার সাথে আচার-আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকত না, যা মুনাফিকরাও সমর্থন করতে পারত। তখন তারা বলত যে, তোমরা ভুল বলছ। আমরা প্রকৃতই মুসলমান।

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে, তাতে মুনাফিকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে ; তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর তাদের এ দাবি করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মুমিন।

এভাবে মুনাফিকী একাশিত হয়ে পড়ায় একটি ফায়দা এও হয়েছে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় মানসিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হতো।

গায়েবী ব্যাপারে কাউকে অবহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব থাকে না ঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবী ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে যে কাউকে অবহিত করেন না। অবশ্য নিজের নবী-রাসূল নির্বাচিত করে, তাদেরকেই গায়েবী ব্যাপারে অবহিত করেছেন। এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যে, তাই যদি হয়, তবে নবীগণও তো ইল্মে গায়েবের অংশীদার এবং আলিমে-গায়েব। কারণ ইল্মে গায়েব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্তার সাথে সংযুক্ত, কোনও সৃষ্টিকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। আর তা হলো দুটি শর্তসাপেক্ষে। (এক) সে ইল্মকে হতে হবে ইলমে যাতী, যা অপর কারও মাধ্যমে আগত বা শেখানো নয়। (দুই) সে ইল্মকে সমগ্র বিশ্বজগৎ ও ভূত-ভবিষ্যতের উপর পরিব্যাপ্ত হতে হবে, যাতে কোন একটি অণুপরমাণু পর্যন্ত গোপন থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী-রাসূলদের যে সমস্ত গায়েবী বিষয় অবহিত করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে ইল্মে গায়েব নয়, বরং গায়েবী বিষয়ের সংবাদ যা নবী-রাসূলদের দেওয়া হয়েছে। কোরআনে করীমও একে কয়েক স্থানে اَنْبَاءِ الْغَيْبِ (তথা গায়েবের সংবাদ বা অবগতি) শব্দে বিশ্লেষণ

করেছে। বলা হয়েছে ঃ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ (অর্থাৎ সেগুলো ছিল গায়েবী সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে)।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ
لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (১৮০) لَقَدْ سَمِعَ
اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ
مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ (১৮১) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيْدِ (১৮২) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ
حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (১৮৩)
فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ (১৮৪) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ
اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (১৮৫)
لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ نف وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ
وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (১৮৬)

(১৮০) আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে—তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের চরম স্বত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জানেন। (১৮১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা আমি লিখে রাখব, অতঃপর বলব, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব।' (১৮২) এ হলো তারই প্রতিফল যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ! বস্তুত আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (১৮৩) সেই সমস্ত লোক যারা বলে যে, আল্লাহ্ আমাদের এমন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন যতক্ষণ না তারা আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়ে আসবেন, যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে।' তুমি তাদের বলে দাও, "তোমাদের মধ্যে আমার পূর্বে বহু রাসূল নিদর্শনসমূহসহ এবং তোমরা যা আবদার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাঁদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।" (১৮৪) তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যারা নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (১৮৫) প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। (১৮৬) অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জন-সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে-কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহিযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।

যোগসূত্র ঃ সূরা আলে-ইমরানের প্রারম্ভে ইহুদীদের বদঅভ্যাস ও দুষ্কর্মের যে আলোচনা চলছিল এখান থেকে পুনরায় সে আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর অধিকাংশই এই বিষয় সম্পর্কিত। তবে মাঝখানে রাসূলে করীম (সা) ও মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা ও উপদেশমূলক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই লোকেরা যেন কস্মিনকালেও এমন ধারণা না করে যারা (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) সে সমস্ত সামগ্রীতে (অর্থাৎ তা ব্যয় করার ব্যাপারে) কার্পণ্য করে যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন। এ বিষয়টি তাদের জন্য তেমন কল্যাণকর হবে না (কস্মিনকালেও) বরং এটা হবে তাদের জন্য অত্যন্ত অশুভ। (কারণ, এর পরিণতি হবে এই যে) কিয়ামতের দিন

তাদের গলায় (এই ধন-সম্পদকে সাপ বানিয়ে) বেড়ি পরানো হবে, যাতে তারা কার্পণ্য করেছিল। আর (কার্পণ্য করাটা এমনিতেও বোকামি। কারণ, শেষ পর্যন্ত যখন সবাই মৃত্যুবরণ করবে, তখন) আসমান-যমীন (এবং এর মাঝে যত সৃষ্টি রয়েছে সে সবই) আল্লাহ্ তা'আলার থেকে যাবে। (কিন্তু তখন এ সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্র হয়ে যাওয়ায় তোমাদের কোনই সওয়াব হবে না। কারণ, তা তোমরা স্বেচ্ছায় দান করনি। পক্ষান্তরে সবই যখন আল্লাহ্ তা'আলার হয়ে যাবে, তখন এখনই সেগুলো স্বেচ্ছায় দিয়ে দেওয়াই হলো বুদ্ধিমত্তার কাজ, যাতে সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়) আর আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন (কাজেই যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্র জন্যই ব্যয় কর)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেই (উদ্ধত) লোকদের কথা শুনে নিয়েছেন, যারা (উপহাসছলে) বলেছেন যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ হচ্ছেন মুফলিস-ফকীর আর আমরা হলাম সম্পদশালী (আমীর)। আর (এটুকু শুনেই শেষ নয়, বরং) আমি তাদের কথিত বক্তব্যকে (তাদের আমলনামায়) লিখে রেখে দেব এবং (তেমনিভাবে তাদের আমলনামায় লেখা হবে) তাদের (দ্বারা) অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার বিষয়টিও। আর আমি (তাদের প্রতি শাস্তি আরোপ করার সময় চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে) বলব (এবার ধর) আগুনের আযাব আস্বাদন কর। (আর তাদেরকে আত্মিকভাবে যাতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলা হবে যে,) এ (আযাব) হচ্ছে সে সব (কুফরী) কার্যকলাপের জন্য যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছ। আর একথা সপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারো প্রতি অন্যায়কারী নন।

তারা (ইহুদীরা) এমন লোক যে, (সম্পূর্ণ মিছামিছিভাবে) বলে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের (পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে) নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন আমরা (পয়গম্বরীর দাবিদার) কারো প্রতি বিশ্বাস না করি (যে, তারা পয়গম্বর), যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার (বিশেষ) নযর-নিয়ায সংক্রান্ত নিদর্শনমূলক মুজিযা উপস্থাপন না করে (আর তা হলো এই) যে, সে সমস্ত (নযর-নিয়ায)-কে কোন (আসমানী) আগুন এসে গ্রাস করে নেয়। (পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের এমন মু'জিযা ছিল যে, কোন প্রাণী অথবা নিস্প্রাণ বস্তু আল্লাহ্র নামে নির্ধারণ করে তাকে কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ের উপর রেখে দেওয়া হতো। তখন গায়েব থেকে আগুন এসে দেখা দিত এবং সে বস্তুটিকে জ্বালিয়ে দিত। এটাই ছিল সদকাসমূহের কবূল হওয়ার লক্ষণ। তার অর্থ আপনি এমন বিশেষ ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করেন নি। কাজেই আমরা আপনার উপর ঈমান আনছি না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর উত্তর শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলছেন যে,) আপনি বলে দিন, নিঃসন্দেহে আমার পূর্বে বহু নবী-রাসূল বহু দলীল-প্রমাণ (মু'জিযা প্রভৃতি) নিয়ে এসেছিলেন এবং স্বয়ং এ মু'জিযাও (এনেছিলেন) যা তোমরা বলছ। অতএব, তোমরা কেন তাঁদেরকে হত্যা করেছিলে যদি তোমরা (এ ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাক ? কাজেই এ সমস্ত (কাফির) লোক যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে (দুঃখ করবেন না। তার কারণ,) আপনার পূর্বে আগত বহু পয়গম্বরকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অথচ তাঁরাও মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন। আর (নিয়ে এসেছিলেন) ছোট ছোট সহীফা এবং

প্রকৃষ্ট কিতাব (কাফিরদের অভ্যাসই যখন নবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তখন আর আপনার তাতে দুঃখ কিসের)।

(তোমাদের মধ্যে) প্রত্যেক প্রাণ (সম্পন্ন)-কে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং (মৃত্যুর পর) তোমাদের (ভালমন্দের) পরিপূর্ণ ফলাফল কিয়ামতের দিনেই তোমরা প্রাপ্ত হবে। (পার্থিব জীবনে যদি কাফিরদের উপর কোন শাস্তি আপতিত নাও হয়, তাতে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পক্ষে আনন্দিত হওয়ার কিংবা সত্য বলে যারা বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অতঃপর এই ফলাফলের বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে) কাজেই যে লোক দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে সে লোকই যথার্থ সফলকাম। (তেমনিভাবে যারা জান্নাত থেকে পৃথক থাকবে এবং দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, তারাই হবে অকৃতকার্য)। তাছাড়া পার্থিব জীবন তো কিছুই নয়, শুধু (এমন একটা বিষয় যেন) ধোঁকার সওদা। (যার প্রকাশ্য আড়ম্বর জৌলুস থেকে খরিদদাররা ফেঁসে যায়। তারপর যখন তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়, তখন অনুতাপ করে। এমনিভাবে দুনিয়ার বাহ্যিক জৌলুসাড়ম্বরে ধোঁকা খেয়ে আখিরাতের ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়া উচিত নয়)।

(এখনই কি !) অবশ্য পরবর্তীতে আরো পরীক্ষা করা হবে—সম্পদের (ক্ষতির) মাধ্যমে এবং প্রাণের (ক্ষতির) মাধ্যমে। আর পরবর্তীতে অবশ্যই শুনবে তাদের কাছ থেকেও অনেক কষ্টদায়ক কথা যাদেরকে তোমাদের পূর্বে আসমানী কিতাব দান করা হয়েছিল (অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাবদের কাছ থেকে)। এবং তাদের কাছ থেকে, যারা মুশরিক। আর যদি (এ সব ক্ষেত্রে) তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে পরহিযগারী অবলম্বন কর তাহলে (তা তোমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলকর হবে। কারণ), এটি (অর্থাৎ সবর ও পরহিযগারী) অবশ্যকরণীয় নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত সাতটি আয়াতের প্রথম আয়াতে কার্পণ্যের নিন্দাবাদ এবং তার উপর অভিসম্পাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কার্পণ্যের সংজ্ঞা এবং সে জন্য শাস্তি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ঃ 'বোখ্‌ল' বা কার্পণ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হলো—'যা আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখ্‌ল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, তাতে ব্যয় করা হারাম নয়—কার্পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্যই বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখ্‌ল হারাম নয়। তবে অনুত্তম।

বোখ্‌ল' বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো شُحٌّ-এর সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল, তা ব্যয় না করা। তদুপরি সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোভের বশবর্তী হওয়া। এটি কার্পণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ। সে কারণেই রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لايجتمع شح وايمان فى قلب رجل مسلم ابدا

অর্থাৎ 'শুহ্' এবং 'ঈমান' কোন মুসলমানের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না।—(কুরতুবী)

কার্পণ্যের যে শাস্তি এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—যে বস্তু ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হয়েছে, তা কিয়ামতের দিন গলবেড়ি বানিয়ে সে লোকের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সা)-এর ইরশাদ রয়েছে ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোককে আল্লাহ্ কোন সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন সে সম্পদকে একটি কঠিন বিষাক্ত সাপে পরিণত করে তার গলায় গলবেড়ি বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সে সাপ তাঁকে পেঁচিয়ে ধরবে এবং বলবে—আমি তোমার ধন, আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতটি পাঠ করেন।—(কুরতুবী, নাসাঈ থেকে)

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী (সা) যখন কোরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সেজন্যই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলা বাহুল্য, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু হুযূরে আকরাম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয় তো বলেছিল যে, কোরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ ফকীর ও পরমুখাপেক্ষী। তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহ্র নির্দেশ তাঁর নিজের কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখিরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 'আল্লাহ্কে ঋণদান' শিরোনামে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথা বোঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহার কস্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কোরআনে করীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধু তাদের ঔদ্ধত্য ও হুযূরে আকরাম (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ এবং তার প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহ্র জন্য লেখার কোনই প্রয়োজন নেই।

অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন

করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কুফরী ও পাপের ব্যাপারে মনেপ্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ ঃ এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনের লক্ষ্য হলো মহানবী (সা) ও মদীনাবাসী ইহুদীবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হলো হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ও যাকারিয়া (আ)-এর সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইহুদীদের উপর আরোপ করা হলো কেমন করে? তার কারণ এই যে, মদীনার ইহুদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলে করীম (সা)-এর এক বাণীতে এ বিষয়ের অধিকতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, যমীনের উপর যখন কোন পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে আর সে কাজকে মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাদের পাপের অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও তাদের কৃত পাপের প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে অংশীদার বলেই গণ্য করা হবে।

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের দোযখে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল ; আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়।

চতুর্থ আয়াতে ইহুদীদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ কল্পে এই ছল উদ্ভাবন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের সদকার বস্তু-সামগ্রী কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেওয়ার নিয়ম ছিল, তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা কবূল হওয়ার লক্ষণ। রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে আগুনের গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরীব-দুঃখীদের দিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের রীতির সাথে এ রীতিটির কোন মিল ছিল না, সেহেতু একে মুশরিকরা বাহানা বানিয়ে নিল যে, যদি আপনি নবীই হতেন, তাহলে আপনিও এমন মু'জিযা প্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার বস্তু-সমগ্রীকে গ্রাস করে ফেলত। অধিকন্তু তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহ্র প্রতিও অপবাদ আরোপ করেছে যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা যেন এমন কোন লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে জ্বালিয়ে দেওয়ার মু'জিযা অনুষ্ঠিত হবে না।

ইহুদীদের এ দাবি যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই তার কোন উত্তর দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। তাদের নিজেদের বক্তব্যের

দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যদি এ দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তবে পূর্ববর্তী যে সব নবী-রাসূল তোমাদের কথামত এই মু'জিযাও দেখিয়ে ছিলেন তখন তোমাদের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি ঈমান আনা কিন্তু তোমরা তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, বরং তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করে দিয়েছ। তা কেমন করে করলে ?

এখানে এমন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদীদের এ দাবি যদিও সর্বৈব ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু যদি মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে এ মু'জিযা প্রকাশিত হতো, তবে হয় তো তারা ঈমান আনত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, তারা শুধু বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশতই এসব কথা বলছে। কথামত মু'জিযা প্রকাশিত হলেও তারা ঈমান গ্রহণ করত না।

পঞ্চম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মিথ্যাবাদের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। তার কারণ, এমনি ধরনের আচরণ সব নবী-রাসূলের সাথেই হয়ে এসেছে।

আখিরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার এবং সমস্ত সংশয়ের উত্তর ঃ ষষ্ঠ আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি কখনও কোথাও কাফিররা বিজয়ীও হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে মুসলমানরা যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন মতাবলম্বী কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বা আরাম-আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোন জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ নাও হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং মৃত্যুর পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে ?

دورانِ بقا چوبار صحرا بگزشت - تلخی وخوشی وزشت وزیبا بگزشت

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখিরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায়ে হোক—যেমন, সৎকর্মশীল আবিদদের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে—অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক—যেমন, পাপী মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলমানই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা

একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে, "দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।" তার কারণ এই যে, সাধারণত এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখিরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখিরাতের সঞ্চয়।

সবর দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার ঃ সপ্তম আয়াতটি নাযিল হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কোরআন-করীমে যখন مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াতটি নাযিল হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনা-ভঙ্গিতে সদকা ও খয়রাতকে আল্লাহ্‌কে করয দেওয়া হয় বলে অভিহিত করা হয় আর সে বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে, যাই কিছু এখানে দান করবে, আখিরাতে তার প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত—যেন অন্যের ঋণ পরিশোধ করা হয়।

একথা শুনে কোন এক মূর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদী বলল—ان الله فقير و نحن اغنياء (অর্থাৎ আল্লাহ্ ফকীর আর আমরা হলাম আমীর)। এতে হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই ইহুদীকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদী এসে রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তারই প্রেক্ষিতে নাযিল হলো। ... . لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এতে মুসলমানদের বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে হবে এবং কাফির, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের কটূক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হলো তাদের পক্ষে উত্তম। তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ؗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا
قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا
وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ
مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

(১৮৭) আর আল্লাহ্ যখন আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে

নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনাবেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচাকেনা। (১৮৮) তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার কাছ থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৮৯) আর আল্লাহ্র জন্যই হলো আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন ইহুদীদের অপকর্ম ও অভ্যাসসমূহের আলোচনা ছিল, তেমনি আলোচ্য প্রথম আয়াতেও তাদের একটি অপকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো, প্রতিজ্ঞা লংঘন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত বিধি-বিধান তওরাত গ্রন্থে এসেছে, তারা তা সাধারণভাবে প্রচার করবে এবং কোন নির্দেশ বা বিধানকেই আত্মস্বার্থে গোপন করবে না। কিন্তু আহলে-কিতাবরা এ প্রতিজ্ঞা লংঘন করেছে। বিধি-বিধান গোপন করেছে। তদুপরি এ ঔদ্ধত্য অবলম্বন করেছে যে, তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং নিজেদের এহেন গর্হিত কাজকে প্রশংসার যোগ্য সাব্যস্ত করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ অবস্থাটি উল্লেখযোগ্য) যখন আল্লাহ্ তা'আলা (পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে) আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা (প্রতিশ্রুতি) নিয়েছেন (অর্থাৎ তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন এবং তারা তা মেনে নেয়) যে, এই কিতাবের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের সামনে বিবৃত করবে এবং (কোন বিষয় পার্থিব স্বার্থের জন্য) গোপন রাখবে না। বস্তুত তারা সে আদেশ পশ্চাতে ফেলে রেখেছে (অর্থাৎ তাতে আমল করেনি)। পক্ষান্তরে তার বদলায় স্বল্পমূল্য বিনিময় নিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা যা আহরণ করেছে তা একান্তই মন্দ বস্তু। কারণ, তার পরিণতি হলো দোযখের শাস্তি।

(তোমরা শোন,) যারা নিজেদের কৃত (অপ-) কর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং যে সৎকর্ম তারা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে চায়, এমন লোকদের (সম্পর্কে) কস্মিনকালেও ধারণা করবে না যে, তারা (দুনিয়ায়) বিশেষ ধরনের আযাব থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। (তা কখনই হবার নয়। এ পৃথিবীতেও তাদের কিছু শাস্তি হবে) এবং (আখিরাতেও) তাদের বেদনাদায়ক শাস্তি হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই (নির্ধারিত) আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আর যাবতীয় বস্তুর উপর আল্লাহ্ই ক্ষমতাশালী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দূষণীয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা

দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোনরকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেনি, বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়ত তারা সৎকর্ম তো করেই না, তদুপরি কামনা করে যে, সৎ কাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি তওরাতে আছে ? তারা তা গোপন করল এবং যা তওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎকর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে ফিরে এলো যে, আমরা চমৎকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না-করা কাজের জন্য প্রশংসার আগ্রহী হওয়া। তা হলো মুনাফিক ইহুদীদের একটি কর্মপন্থা যে, কোন জিহাদ সমাগত হলে তারা কোন ছলছুঁতার ভিত্তিতে ঘরে বসে থাকত এবং এভাবে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উদ্‌যাপন করত। আর রাসূলে করীম (সা) যখন ফিরে আসতেন, তখন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে নানা অজুহাত বর্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক। —(বুখারী)

কোরআনে করীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহ্-রাসূলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। তবে এ গোপন করা ব্যাপারটি হলো তেমনিভাবে গোপন করা যা ইহুদীদের কাজ ছিল। অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর আহকাম গোপন করা। তারা তা করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। অবশ্য কোন ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করা না হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ইমাম শাফিয়ী (র) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে তাদের নানা ফিতনা-ফাসাদে পতিত হয়ে পড়ারও আশংকা দেখা দিতে পারে। এমন আশংকায় কোন হুকুম গোপন করা হলে তাতে কোন দোষ নেই।

কোন সৎ কাজ করে সে জন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপেক্ষা করা হলে সৎ কাজ করা সত্ত্বেও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তা দূষণীয় এবং কাজ না করা সত্ত্বেও এরূপ আচরণ তো আরও বেশি দূষণীয়। আর মনের দিক দিয়ে এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজটি করব এবং তাতে সুনাম হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা করা না হয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ

لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا

خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ

مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا

بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا

تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

(১৯০) নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। (১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে), পরওয়ারদিগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (১৯২) হে আমাদের পালনকর্তা ! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে চরমভাবে অপমানিত করলে ; আর জালিমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্‌বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্‌বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন ; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (১৯৪) হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলদের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদের তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।

যোগসূত্র ঃ আগের আয়াতগুলোতে যেহেতু বিশেষভাবে তওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাই পরবর্তী এ আয়াতগুলোতে তওহীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। সাথে সাথে তওহীদের শিক্ষানুযায়ী আমলকারীদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকেও এদিকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এরও আগে ছিল কাফিরদের তরফ থেকে নির্যাতনের প্রসঙ্গ, তাই এর পরে পুনরায় সে প্রসঙ্গেরই অবতারণা রয়েছে। যেমন, মুশরিকরা হুযূর (সা)-কে বিপাকে ফেলার বদ মতলবে বলেছিল যে, এই সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। সে প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার মত দলীল-প্রমাণ তো চোখের সামনেই অনেক রয়েছে, সেগুলো নিয়ে এরা চিন্তা-ভাবনা করে না কেন ? অধিকন্তু, কাফিরদের এ ধারণা যেহেতু সত্য উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, নিছক বিব্রত করার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত হয়েছিল, কাজেই সেমতে সে আবদার পূর্ণ হওয়ার পরও তারা ঈমান আনতো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং একের পর এক দিন ও রাত্রির আবর্তনে তওহীদের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। যারা সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী তাদের পক্ষে প্রমাণ আহরণের জন্য (এগুলোই) যথেষ্ট! (সুস্থ বুদ্ধির প্রমাণই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার মত বোধশক্তির অধিকারী হওয়া। পরবর্তী আয়াতই সে বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ। যেমন,) সে সমস্ত লোক (সর্বাবস্থায়, অন্তরে এবং মৌখিক স্বীকৃতিতেও) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে—সব অবস্থাতেই। আর আসমান যমীন সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে (বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে) এবং (চিন্তার যে ফল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি, বিশ্বাসে দৃঢ়তা এবং নবায়ন, সে ফল তারা এভাবে প্রকাশ করে—) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এই বিশাল জগৎ অনর্থক সৃষ্টি করেননি। (বরং এতে বিস্তর রহস্য রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রহস্য হচ্ছে এ বিরাট সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে এর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ লাভ করা যাবে)। আমরা আপনাকে (অর্থহীন কিছু সৃষ্টি করবেন, এমনটি থেকে) পবিত্র মনে করি। (তাই আমরা প্রমাণ গ্রহণ করেছি এবং তওহীদ স্বীকার করে নিয়েছি) তাই আমাদের (যেহেতু আমরা মু'মিন ও তওহীদবাদী, সেহেতু) দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (যদিও শরীয়তের নিরিখে তওহীদের ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন কারণ বা দুর্বলতার জন্য আযাবের উপযোগীও আমরা হতে পারি, আযাবে নিক্ষিপ্তও হতে পারি। আমরা আরো আরজী পেশ করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা এজন্য দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় ভিক্ষা চাই) নিশ্চয় আপনি যাকে (তার কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে) দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তাকে সত্যিকার অর্থেই লাঞ্ছিত করবেন (এটা কাফিরদের পরিণাম)। আর এসব অত্যাচারী লোক (যাদের পরিণতি হবে দোযখের শাস্তি) তাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। (অপরদিকে ঈমানদারদের সম্পর্কে আপনার অঙ্গীকার হচ্ছে যে, আপনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন না, পরন্তু তাদের সাহায্য করবেন। তাই আমাদের নিবেদন, কুফরীর প্রকৃত শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা

করুন। ঈমানের প্রকৃত পরিণতি দোযখের আযাব থেকে অব্যাহতি লাভকে আমাদের ভাগ্যলিপি করে দিন)।

হে আমাদের পালনকর্তা, (যেমন আপনার এ বিশাল সৃষ্টি দেখে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করেছি, তেমনি) একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যক্ষভাবে তার যবানী অথবা অন্যের মাধ্যমে তিনি) ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন (যে হে লোক সকল !) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন। সেমতে আমরা (তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে) ঈমান এনেছি (এ আরজীতে আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে রাসূলের প্রতি ঈমানের কথাও এসে গেল। ফলে ঈমানের দুটি অংশই পূর্ণ হয়ে গেল)।

হে আমাদের পালনকর্তা! (পুনরায় আমাদের এ আরজী যে) আমাদের (বড়) গোনাহগুলোও মাফ করে দিন এবং আমাদের (ছোট ছোট) ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও আমাদের থেকে অপসারিত করে (মাফ করে) দিন এবং (আমাদের শেষ পরিণতি যার উপর সবকিছু নির্ভরশীল) আমাদেরকে নেক লোকদের সাথে (শামিল রেখে) মৃত্যু দিন। (অর্থাৎ নেকীর মধ্যে যেন আমাদের জীবন শেষ হয়)।

হে আমাদের পালনকর্তা! (যেভাবে আমরা দোযখ, বড় বড় গোনাহ এবং ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি ক্ষতিকর দিক থেকে আত্মরক্ষার আবেদন পেশ করছি, তেমনি প্রকৃত কল্যাণের জন্যও আরজী পেশ করছি-) আমাদের সেই সব বস্তুও দান করুন (যেমন, সওয়াব ও জান্নাত) যে সম্পর্কে আপনি আপনার রাসূলদের মাধ্যমে ওয়াদা করেছেন (যে মু'মিন নেক বান্দাদের মহত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে) এবং (সে সওয়াব ও জান্নাত আমাদের এমনভাবে দান করুন, যেন তা পাওয়ার আগেও) আমাদের কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। (যেরূপ এক শ্রেণীর লোককে প্রথমে সাজা দিয়ে পরে জান্নাতে দাখিল করা হবে। অর্থাৎ কোনরূপ সাজা ছাড়া প্রথমবারই আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)। নিশ্চিতরূপেই আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। (কিন্তু আমাদের ভয় হয়, যে মু'মিন ও নেক বান্দাদের জন্য এ ওয়াদা করেছেন, তাতে এমন যেন না হয় যে, আমরা সেই সব লোকের গুণে গুণান্বিত হতে না পারি। সে জন্যই আমাদের আরজী যে, আমাদের এমনভাবে গড়ে তুলুন, যেন আমরা ওয়াদাকৃত সেই সব নিয়ামত লাভ করার উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শানে নযুল ঃ এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিস ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবী আ'তা ইবনে আবী রুবাহ হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, হুযূর (সা)-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যে বিষয়টি আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেটি আমাকে বলে দিন। এরই উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাঁর কোন্ বিষয়টির কথা জিজ্ঞেস করছ ? তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয়ই তো ছিল আশ্চর্যজনক। তাঁর থেকে একটা আশ্চর্যজনক

ঘটনার কথা বলছি। সেটি ছিল এমন ঃ হুযূর (সা) এক রাতে আমার কাছে এলেন এবং লেপের নিচে আমার সাথে শুলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—যদি অনুমতি দাও, তবে আমি কিছুক্ষণ আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আসি। একথা বলে বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং ওযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে এমনভাবে রোনাজারী করলেন যে, তাঁর সিনা মুবারক পর্যন্ত অশ্রুতে ভিজে গেল। অতঃপর রুকূতে গিয়েও কাঁদলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং সিজদাতেও তেমনিভাবে কাঁদলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়েও ক্রমাগত কাঁদতেই থাকলেন; এমনিভাবে ভোর হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) এসে নামাযের জন্য ডাকলেন। অবস্থা দেখে হযরত বিলাল (রা) আরজ করলেন, হুযূর (সা)! আপনি এমনভাবে কেন কাঁদেন, আল্লাহ্ পাক তো আপনার সামনের ও পিছনের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন ?

হুযূর (সা) জবাব দিলেন, আমি কি আল্লাহ্‌র শোকর-গোযার বান্দা হবো না ? তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অশ্রু প্রবাহিত করবো না ? আল্লাহ্ তা'আলা যে আজ রাতে আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করেছেন! এই বলে উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন—"অত্যন্ত দুর্ভাগা সেই লোক, যে আয়াতগুলো পড়ার পরও এ সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে না।"

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাবতে হয়।

(এক) 'আসমান-যমীন সৃষ্টি' বলতে কি বোঝায় ঃ خلق শব্দের অর্থে নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে,—আসমান এবং যমীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টিকেও এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন রূপে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে السموت। শব্দ দ্বারা যেমন উর্ধ্বজগত তথা সকল উন্নতি বোঝায়, তেমনি ارض। বলতে নিম্নজগত তথা নিম্নমুখী সব কিছুকেই বোঝায়। সেমতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ পাক যেমন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিম্নজগত তথা সকল নিম্নমুখিতারও সৃষ্টিকর্তা।

(দুই) দিন-রাত্রির আবর্তন ঃ চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন অর্থে কি বোঝানো হয়েছে। এখানে اختلاف। শব্দটি আরবী পরিভাষায় اختلاف فلان فلانًا। (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে,) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেমতে اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ। وَالنَّهَارِ বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন।'

اختلاف। শব্দ দ্বারা কম-বেশিও বোঝায়। যেমন, শীতকালে রাত দীর্ঘ হয় এবং দিন হ্রস্ব হয়, গরমকালে দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিন ও রাতের মধ্যে দৈর্ঘের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোর দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দূরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ হয়। এ সব বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

(তিন) 'আয়াত' শব্দের অর্থ ঃ তৃতীয় ভাবনার বিষয় হচ্ছে 'আয়াত' বা নিদর্শন বলতে কি বোঝায় ? ایات - اية -এর বহুবচন। শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা, মু'জিযাকে যেমন 'আয়াত' বলা হয়, তেমনি কোরআন শরীফের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয়। তৃতীয় অর্থে দলিল-প্রমাণও বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(চার) اولوالالباب। –চতুর্থ বিবেচ্য বিষয়। اولوالالباب। শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ?

الباب। শব্দটি لب শব্দের বহুবচন। অর্থ মগজ। প্রত্যেক বস্তুরই মগজ অর্থে তার সারবস্তুকে বোঝায় এবং সে সারটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মানুষের বুদ্ধি ও মেধাকে لب বলা হয়। কেননা, বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্তু। সেমতে اولوا الالباب। শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমান লোকজন।

বুদ্ধিমান শুধু তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্কে স্মরণ করে ঃ এ বিষয়টি ছিল লক্ষণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে কাদেরকে বোঝায় ? কারণ, সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার দাবিদার। কোন একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে নির্বোধ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সেজন্যই কোরআনে-করীম বুদ্ধিমানের এমন কয়েকটি লক্ষণ বাতলে দিয়েছে যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায়। নির্বোধ জীব-জন্তুর মধ্যেও তা রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো, লক্ষণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান, যমীন এবং এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন এক সত্তার সন্ধান দেয়, যা জ্ঞান-অভিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত এবং যিনি যাবতীয় বস্তু-সামগ্রীকে বিশেষ হিকমতের দ্বারা তৈরি করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুরই হতে পারে। কোন এক আরেফ বলেন ঃ

هر گیا هے کے از زمیں روید
وحدهٗ لاشریك له گوید–

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই তাকে এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না। সেজন্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটি মাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর তা হলো আল্লাহ্র পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁরই যিকর করা। যে ব্যক্তি

এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, সে বুদ্ধিমান বলে কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই কোরআন-মজীদ বুদ্ধিমানদের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে ঃ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ বুদ্ধিমান হলো সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে বসে, শুয়ে, ডানে ও বামে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে নিয়োজিত থাকে।

এতে বোঝা গেল যে, বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধু একটা ধোঁকা। কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত করেছে, কেউ বিভিন্ন ধরনের কল-কব্জা তৈরি করা কিংবা বাষ্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সুস্থ বিবেক ও সুষ্ঠু বুদ্ধির কথা হলো তাই, যা আল্লাহ্ তা'আলার নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যাতে ইল্‌ম ও হিকমতের আলোকে পার্থিব ব্যবস্থা পরম্পরা নিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা করেছে। বিজ্ঞান তোমাদের কাঁচামাল থেকে কল-কারখানা পর্যন্ত এবং কল-কারখানা থেকে বাষ্পবিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধির কাজ হলো আরও একটু এগিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি বা লোহা-তামার, না মেশিনের; অথবা সেগুলোর মাধ্যমে তৈরি বাষ্পের। বরং কাজটি তাঁরই যিনি আগুন, পানি ও বায়ুকে সৃষ্টি করেছেন—যার ফলে এই বিদ্যুৎ, এই বাষ্প তোমরা পেতে পারছ।

বিষয়টি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বোঝা যায় যে, বনে বসবাসকারী কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যখন কোন রেল স্টেশনে গিয়ে হাযির হয় এবং দেখতে পায়, রেলের মত একটা মহাকায় যান একটা লাল পতাকা দেখানোর ফলে থেমে পড়ে আর একটা সবুজ পতাকা দেখাতেই চলতে শুরু করে। এটা দেখার পর যদি সে বলে যে, এই লাল ও সবুজ পতাকা দুটি বিরাট শক্তির অধিকারী—এহেন বিরাট শক্তিশালী ইঞ্জিনকেও সে থামিয়ে দেয় এবং চালায়। তখন যে কোন বুদ্ধিমান জ্ঞানীই তাকে বোকা বলবেন এবং বাতলে দেবেন যে, ক্ষমতা এই পতাকার নয়, বরং সেই লোকটির হাতেই রয়েছে যে ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে। সে-ই এ পতাকা দেখে গাড়ি থামানো কিংবা চালানোর কাজটি সম্পন্ন করে। কিন্তু যার মাথায় এর চেয়েও কিছু বেশি বুদ্ধি রয়েছে সে বলবে, ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে ক্ষমতার অধিকারী বলাও ভুল। কারণ, এতে তার ক্ষমতার কোনই হাত নেই। সে লোক আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সেই ক্ষমতাকে ইঞ্জিনের কলকব্জার সাথে সম্পৃক্ত করবে। কিন্তু একজন দার্শনিক কিংবা একজন বৈজ্ঞানিক তাকে এই বলে নির্বোধ প্রতিপন্ন করবেন যে, নিস্পন্দ কলকব্জার ভেতরে কি থাকবে। আসল ক্ষমতা হলো সেই বাষ্প ও স্টীমের মধ্যে যে আগুন ও পানি আছে তার যার সংমিশ্রণে ইঞ্জিনের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন এখানে এসেই স্তব্ধ হয়ে পড়ে। নবী-রাসূলগণ বলেন, আরে বোকা! পতাকা, ড্রাইভার কিংবা ইঞ্জিনের কলকব্জাগুলোকে ক্ষমতা ও পাওয়ারের অধিকারী মনে করা যেমন ভুল বা মূর্খতা তেমনি বাষ্প এবং স্টীমকে ক্ষমতার অধিকারী বলে ধারণা করাও দার্শনিক ভ্রান্তি। এক ধাপ আরো এগিয়ে যাও। তাহলেই তুমি জট পাকানো এই সুতোর মাথা

পেয়ে যাবে এবং তাতে বিশ্বব্যবস্থার সর্বশেষ বলয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুতে পারবে যে, প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী তিনিই, যিনি এ আগুন আর পানিকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তৈরি হয়েছে এই স্টীম।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সেই সব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহ্কে চিনবেন এবং সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ করবেন। সে জন্যই (أُولِي الْأَلْبَابِ বা বুদ্ধিমান)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন বলেছে ঃ

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ۔

আর সে কারণেই, যদি কেউ মৃত্যুকালে ওসীয়ত করে যায় যে, আমার ধন-সম্পদ বুদ্ধিমানদের দিয়ে দেবে, তবে তা কাকে দেওয়া হবে,—এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রবিদরা লিখেছেন যে, এমন আলিম ও জাহিদ ব্যক্তিরাই সে মালের অধিকারী হবেন, যাঁরা পার্থিব সম্পদাহরণ এবং অপ্রয়োজনীয় জড় বিষয় থেকে দূরে থাকেন। তার কারণ, প্রকৃত অর্থে তাঁরাই হচ্ছেন বুদ্ধিমান।—(দুর্রে মুখতার ঃ ওসীয়ত পরিচ্ছেদ)

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষ্য করার যোগ্য যে, শরীয়তে 'যিক্র' ছাড়া অন্য কোন ইবাদতের আধিক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কিন্তু 'যিক্র'-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে— وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (অর্থাৎ আল্লাহ্র যিক্র কর অধিক পরিমাণে)। তার কারণ এই যে, যিক্র ব্যতীত অন্য সব ইবাদতের জন্যই কিছু নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্ত রয়েছে যার অবর্তমানে সে ইবাদত আদায় হয় না। পক্ষান্তরে মানুষ দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে, ওযূর সাথে, ওযূ ছাড়া যে কোন অবস্থায় যিক্র-এর কাজ সম্পাদন করতে পারে। এ আয়াতেও হয় তো এই তাৎপর্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বুদ্ধিমানদের অপর একটি লক্ষণ বলা হয়েছে যে, তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। বলা হয়েছে ঃ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ—(অর্থাৎ তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে)।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এই চিন্তা করার তাৎপর্য কি এবং তার কারণই বা কি? فكر ও تفكر.. (ফক্র ও তাফাক্কুর)-এর শাব্দিক অর্থ হলো বিবেচনা করা, কোন বিষয়ের তাৎপর্য ও বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছুতে চেষ্টা করা। এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'যিক্র' যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে 'যিকর' বা চিন্তা করাও ইবাদত। পার্থক্য শুধু এই যে, যিক্র হলো আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সাপেক্ষ। আর ফিক্র-এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অন্বেষণ। তার কারণ, আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর তাৎপর্য অনুভব করা মানব বুদ্ধির বহু ঊর্ধ্বে। এতে চিন্তা-গবেষণা করার ফল হতভম্বতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আরেফ রূমী বলেছেন ঃ

دور بینان بارگاه الست
غیر ازیں پے نبرده اند که هست

বরং অনেক সময় আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অধিকতর চিন্তাভাবনা করতে গেলে মানুষের অসম্পূর্ণ বুদ্ধির জন্য তা গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই মা'রেফাতের বুযুর্গ মনীষীবৃন্দ ওসীয়ত করেছেন ঃ تفكروا فى ايت الله ولا تفكروا فى الله অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ সম্পর্কে চিন্তা কর, আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করো না। তা তোমাদের জ্ঞান-পরিধির উর্ধ্বে। সূর্যের আলোতে সব কিছুই দেখা যায়, কিন্তু স্বয়ং সূর্যকে কেউ দেখতে চাইলে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সে কারণেই বড় বড় বিজ্ঞ দার্শনিক ও বিচক্ষণ মহাজনগণ শেষ পর্যন্ত এ উপদেশবাণীই উচ্চারণ করেছেন ঃ

نه هر جائے مرکب تواں تاختن
که جا ها سپر باید انداختن

অবশ্য চিন্তা-ভাবনা এবং বুদ্ধির বিচরণক্ষেত্র হলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার অপরিহার্য ফলই হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মা'রেফাত বা পরিচয় লাভ। এই বিশাল-বিস্তৃত আকাশ আর তাতে স্থাপিত চন্দ্র-সূর্য এবং অন্যান্য স্থির ও চলমান গ্রহ-নক্ষত্ররাজি যা দেখে দর্শকের নিকট যদিও সবগুলোকেই স্থির বলে মনে হয়, তাতে অতি ক্ষীণ কোন স্পন্দন হলে তার জ্ঞান সেই স্পন্দন সৃষ্টিকারীরই হয়ে থাকে। তেমনিভাবে উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে যেগুলো চলমান ও গতিশীল সেগুলোর গতি যেহেতু চন্দ্র-সূর্যের গতির সাথে অত্যন্ত সুদৃঢ় নিয়মে বাঁধা ; না এতে এক মুহূর্তও এদিক-ওদিক হয়, না তার যন্ত্রপাতির কোন কল-কজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙে-চুরে যায় আর না সেগুলোকে কখনও কোন ওয়ার্কশপে পাঠানোর প্রয়োজন হয়, না তার মেশিনারীতে কোন তেল-পানির প্রয়োজন দেখা দেয়।—হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলোর প্রদক্ষিণ-পরিক্রমণ একই নিয়মে নির্ধারিত সময়ের সাথে চলছে। তেমনিভাবে গোটা ভূমণ্ডলীয় উপগ্রহ, তার সাগর-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি—গাছপালা, জীব-জন্তু আর তার ভেতরে লুক্কায়িত খনিসমূহ এবং আসমান-যমীনের মাঝে প্রবাহিত বায়ু, এ দুয়ের মাঝে সৃষ্ট ও বর্ষণমুখর বিদ্যুৎবারি ও তার নির্ধারিত ব্যবস্থাদি সবই চিন্তা-ভাবনাকারীদের জন্য এমন সত্তার সন্ধান দেয়, যিনি ইল্ম ও হিকমত এবং শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত। এরই নাম হলো 'মা'রেফাত'। কাজেই এই মা'রেফাতে-ইলাহী তথা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের কারণ হয় বলেই চিন্তা-ভাবনাও বিরাট ইবাদত। সেজন্যই হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ تفكر ساعة خير من قيام ليلة অর্থাৎ এক প্রহরের চিন্তাভাবনা গোটা রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক উপকারী।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও এই চিন্তা-ভাবনাকে সর্বোত্তম ইবাদত বলে উল্লেখ করেছেন।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত হাসান ইবনে আমের (র) বলেছেন, আমি বহু সাহাবীর কাছে শুনেছি তাঁদের সবাই বলেছেন যে, "ঈমানের আলো ও নূর হলো চিন্তা-ভাবনা।"

হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেছেন যে, আমি যখন ঘর থেকে বেরোই তখন যে বস্তুর উপরেই আমার দৃষ্টি পড়ে আমি তাকে গভীরভাবে দেখি। হয় তো আমার জন্য তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিয়ামত বিদ্যমান রয়েছে কিংবা আমার শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বিদ্যমান আছে।

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ (র) বলেছেন যে, চিন্তা-ভাবনা হলো একটা নূর যা তোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হচ্ছে।

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র) বলেন, যখন কোন লোক অধিক পরিমাণে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন সে বাস্তব বিষয়ের অবগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। আর যে লোক বাস্তব বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারবে, সে-ই হবে জ্ঞানপ্রাপ্ত। আর যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হবে, সে অবশ্যই আমলও করবে। —(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) ইরশাদ করেছেন যে, কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি জনৈক আবিদ-পরহিযগার লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আবিদ লোকটি এমন এক জায়গায় বসেছিলেন, যার একপাশে ছিল একটি কবরস্থান আর অপর দিকে ছিল বাড়ির ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। পথ অতিক্রমকারীকে বুযুর্গ লোকটি বললেন, পৃথিবীর দু'টি ভাণ্ডার তোমার সামনে বিদ্যমান। তার একটি হলো মানুষের ভাণ্ডার আর অপরটি হলো ধন-সম্পদের ভাণ্ডার, যা এ স্থানে পঙ্কিল আবর্জনার আকারে রয়েছে। এ দু'টি ভাণ্ডারই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। —(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) নিজের আত্মার সংশোধনকল্পে শহর থেকে দূরে কোন বিরান-বিয়াবানে বেরিয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে اين اهلك (অর্থাৎ তোমার উপর যারা বাস করতো, তারা কোথায় গেল ?) বলে প্রশ্ন করতেন। তারপর নিজেই তার উত্তর দিতেন ঃ كل شئ هالك الا وجهه অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল। (ইবনে কাসীর) এভাবে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আখিরাতের স্মরণকে নিজের অন্তরে তাজা করতেন।

হযরত বিশরে-হাফী বলেছেন, মানুষ যদি আল্লাহ্র মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে পাপ ও নাফরমানী সংঘটিত হতে পারে না।

হযরত ঈসা (আ) ইরশাদ করেছেন, হে দুর্বলচিত্ত মানব! তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পৃথিবীতে একজন মেহমানের মত বসবাস কর। মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়ে নাও। চোখকে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে, দেহকে সবর করতে আর অন্তরকে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত করে তোল এবং আগামীকালের রিযকের চিন্তা পরিহার কর।

আলোচ্য আয়াতে এ চিন্তা-ভাবনাকেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র মা'রেফাত লাভ এবং দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যেমন সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও স্বয়ং এই সৃষ্টির বাহ্যিক খুঁটিনাটি বিষয়ে জড়িয়ে গিয়ে তার দ্বারা প্রকৃত মালিকের পরিচয় অর্জন না করা সত্যিসত্যিই কঠিন মূর্খতা এবং অবুঝ শিশুসুলভ কাজ। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

همه اندر زمن ترا زین أست-که تو طفلی و خانه رنگین است

আর এই দৃষ্টিহীনতাকেই হযরত মজযুব (র) এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

کچھ بھی مجنوں جو، بصیرت تجھے حاصل ہو جائے

تونے لیلٰی جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বিশ্বসৃষ্টিকে অন্বেষার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে না, তার অনীহার অনুপাতে তার দৃষ্টির প্রখরতা লুপ্ত হতে থাকে। বর্তমান কালের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং তাতেই যারা জড়িয়ে রয়ে গেছে, আল্লাহ্ এবং নিজেদের ব্যাপারে সে সমস্ত আবিষ্কর্তাদের গাফলতি উল্লিখিত বাণীরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক উন্নতি যতই আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শৈল্পিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করে চলেছে, ততই তারা আল্লাহ্‌র পরিচয় এবং বাস্তবতা অনুধাবনের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে আকবর ইলাহাবাদী বলেছেন ঃ

بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو

بس خدا سمجھا ہے اس نے برق وبھاپ کو

কোরআন-করীমে এমনি দৃষ্টিহীন লেখাপড়া জানা মূর্খদের সম্পর্কে বলেছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ.

অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনে কতই না নিদর্শন রয়েছে যেগুলো থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে। সেগুলোর তাৎপর্য, শিল্পবৈশিষ্ট্য এবং সেগুলোর বৈচিত্র্যের প্রতি তারা লক্ষ্যও করে না।'

সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। উল্লিখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক এই অবস্থায় না পৌঁছে পারে না যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি বরং এ সব সৃষ্টির পেছনে হাজারও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-আরাধনার উদ্দেশ্যে। এটাই হলো তাদের জীবনের লক্ষ্য। তারপর তারা চিন্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে যে, গোটা এ বিশ্ব সৃষ্টি নিরর্থক নয়, বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরত ও হিকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনার উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের পালনকর্তাকে চিনে নিয়ে তাঁর মহান দরবারে পেশ করেছিলেন।

প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় আবেদন ঃ আমাদেরকে আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি দান কর। কারণ, যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করাবে, তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। কোন কোন আলিম লিখেছেন, হাশরের মাঠের লাঞ্ছনা এমন এক আযাব হবে যার ফলে মানুষ কামনা করবে যে, হায়! যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেওয়া হতো, তবুও যদি তার অপকর্মের প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো!

তৃতীয় আবেদন ঃ আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারী রাসূলে-মকবুল (সা)-এর আহ্বান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের বড় গোনাহ্গুলো ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি অপসারিত করে দাও। আর আমাদেরকে নেক্কার ও সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর। অর্থাৎ তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করে দাও।

এই তিনটি আবেদন ছিল আযাব, কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য। পরবর্তীতে চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ লাভ সম্পর্কে যে, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের যে প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ, তা আমাদেরকে দান কর। কিয়ামতের দিন যেন লাঞ্ছনাও না হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক জবাবদিহি ও বদনামীর পর মাফ করার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়েই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন-নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান কর, যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা লাভের যোগ্য হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থির থাকতে পারি। আমাদের মৃত্যু যেন ঈমান ও আ'মালে সালেহার সাথে হয়।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ
أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ
كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا
قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

(১৯৫) অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবূল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না—তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্র নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (১৯৬) নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। (১৯৭) এটা হলো সামান্য ফায়দা—এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৯৮) কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা কিছু আল্লাহ্র কাছে আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম। (১৯৯) আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহ্র সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে সৎকর্মশীল ঈমানদার লোকদের কতিপয় দোয়া প্রার্থনার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতগুলোতে সে দোয়ার মঞ্জুরি এবং তাদের সৎকর্মের জন্য বিপুল প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের বাহ্যিক ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ এবং পার্থিব চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমানদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। কারণ, তাদের এহেন অবস্থা সামান্য কয়েক দিনের জন্য মাত্র, তারপরেই রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারপর তাদের পালনকর্তা মঞ্জুর করে নিয়েছেন তাদের দোয়া। তার কারণ (আমার চিরাচরিত নিয়ম হলো এই যে), আমি কারো (সৎ) কাজকে তোমাদের মধ্যে যেই তা করুক বিনষ্ট করি না (তার বিনিময় দেওয়া হবে না, এমন নয়)। তা সে কাজ পুরুষই করুক কিংবা স্ত্রীলোক (উভয়ের জন্য একই নিয়ম। কারণ), তোমরা (উভয়েই) পরস্পরের অংশ বিশেষ। (কাজেই উভয়ের জন্য হুকুমও একই রকম। যখনই সে ঈমান এনে বড় একটা সৎ কাজ করেছে এবং তার প্রেক্ষিতে আগত সুফল লাভের প্রার্থনা করেছে, তখন আমি তার দোয়া-প্রার্থনাকে আমার চিরাচরিত নিয়মের ভিত্তিতেই মঞ্জুর করে নিয়েছি। আর আমি যখন ঈমানের জন্য এমন সুফল দান করে থাকি), তখন যারা (ঈমান এনেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠিন আমলগুলোও সম্পাদন করেছে, যেমন হিজরত করে) দেশত্যাগ করেছে এবং (তাও নিজের খুশিতে নয় ভ্রমণ-পর্যটনের জন্য নয়, বরং তাদেরকে চরমভাবে উত্ত্যক্ত করে) বের করে দেওয়া হয়েছে। আর (হিজরত, নির্বাসন ও অন্যান্য) উৎপীড়ন সবই ভোগ করতে হয়েছে আমার পথে। (অর্থাৎ আমার দীনের কারণে এবং যেগুলোকে তারা সহ্য করেছে) আর (তদুপরি তারা) জিহাদ করেছে এবং (তাদের মধ্যে অনেকেই) শাহাদত বরণ করেছে। (কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি। কাজেই এহেন পরিশ্রমপূর্ণ সৎকর্মের জন্য সুফল প্রাপ্ত হবে নাই বা কেন ?) নিশ্চয়ই তাদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি (যা আমার হকের ব্যাপারে তাদের দ্বারা হয়ে গেছে) আমি তা ক্ষমা করে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট করাব, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে নহরসমূহ। এই প্রতিদান পাবে আল্লাহ্র কাছ থেকে। আর আল্লাহ্র কাছেই আছে (অর্থাৎ তাঁরই ক্ষমতায় রয়েছে) উত্তম প্রতিদান। (উল্লিখিত আয়াতগুলোতে মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টের এবং তার শুভ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে কাফিরদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস এবং সে সবের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা হচ্ছে, যাতে মুসলমানদের সান্ত্বনা এবং অসৎ কর্মীদের সংশোধন ও তওবার তৌফিক হতে পারে)।

(হে সত্যান্বেষী ! রুযী-রোজগার কিংবা বিলাস ব্যসনের জন্য) কাফিরদের চলাফেরা যেন তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত না করে, এটা যে কয়েক দিনের খেলামাত্র। (কারণ, মৃত্যুর সাথে সাথে এর নাম-নিশানা পর্যন্ত থাকবে না। আর) তারপরে তাদের (চিরকালীন) ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা হলো নিকৃষ্টতম অবস্থান। কিন্তু (এদের মধ্যে) যেসব লোক আল্লাহ্কে ভয় করবে (এবং কৃতজ্ঞ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে), তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জান্নাতী উদ্যান। তার (প্রাসাদরাজির) তলদেশে প্রবাহিত থাকবে প্রস্রবণসমূহ। তারা এ সমস্ত উদ্যানে চিরকাল বসবাস করতে থাকবে। এই আতিথেয়তা হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। বস্তুত যেসব বস্তু আল্লাহ্র নিকট রয়েছে (অর্থাৎ উল্লিখিত স্বর্গীয় উদ্যান, প্রস্রবণ প্রভৃতি) তা সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য (কাফিরদের কয়েক দিনের ভোগ-বিলাস অপেক্ষা) অনেক উত্তম।

(উল্লিখিত প্রার্থনা সম্বলিত আয়াতের পূর্বে আহ্লে-কিতাবদের বদভ্যাসমূহ এবং তাদের শাস্তি ও অশুভ পরিণতির বিষয় ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে সে সমস্ত

লোকের আলোচনা করা হয়েছে, আহলে-কিতাবদের মধ্য থেকে যাঁরা সৎকর্মশীল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই কোরআনের রীতি অনুযায়ী মন্দ লোকদের দোষ-ত্রুটির পরে সৎ. লোকদের প্রশংসার আলোচনা এসেছে)। আর নিশ্চয়ই কোন কোন লোক আহ্‌লে-কিতাবদের মাঝে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী এবং সে কিতাবের প্রতিও (বিশ্বাস করে) যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (অর্থাৎ কোরআনের প্রতি)। আর সে কিতাবের প্রতিও (বিশ্বাস করে) যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি। আর আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের যে বিশ্বাস, তা) এভাবে যে, তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (সে কারণেই তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে না যে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তান হওয়ার অপবাদ আরোপ করবে অথবা আহকামের ব্যাপারে কোন প্রকার অপবাদ আরোপ করবে! আর তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি তাদের যে বিশ্বাস এভাবে), আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের মুকাবিলায় (দুনিয়ার) স্বল্পমূল্য বিনিময় গ্রহণ করে না। এমন সব লোকেরাই উত্তম প্রতিদান পাবে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে (আর তাতে তেমন একটা বিলম্বও ঘটবে না। কারণ), নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা যথাশীঘ্র হিসাব-নিকাশ করে দেবেন। (আর এই হিসাব-নিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবার দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হিজরত ও শাহাদতের দ্বারা হক্কুল-ইবাদ ব্যতীত অন্য সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায় ঃ ... لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ... আয়াতের আওতায় তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি-গাফলতি ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) হাদীসে ঋণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বরং তাঁর ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিশানকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাযী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

---

(২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।

যোগসূত্র ঃ এটি সূরা আলে-ইমরানের সর্বশেষ আয়াত। এতে মুসলমানদের জন্য কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত নিহিত রয়েছে এবং এটিই যেন গোটা সূরার সার-সংক্ষেপ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! (কষ্ট ও বিপদাপদে) নিজে সবর কর এবং (কাফিরদের সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে) মুকাবিলা করতে গিয়ে সর্বাবস্থায় সবর কর এবং যুদ্ধের (আশংকা দেখা দিলে), মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক এবং (যে কোন অবস্থায়) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, (শরীয়তের নির্ধারিত সীমালংঘন করো না) যাতে করে তোমরা (আখিরাতে নিশ্চিতভাবে এবং দুনিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রেও) পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটিতে মুসলমানদের তিনটি বিষয়ে নসিহত করা হয়েছে। (১) সবর, (২) মুসাবারাহ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

'সবর'-এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাঁধা! আর কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় এর অর্থ নফ্‌সকে তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে ঃ

এক. সবর আলাত্তাআত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক তাতে মনকে স্থির রাখা।

দুই. সব্‌র 'আনিল মাআসী'। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক, যত স্বাদেরই হোক, তা থেকে বিরত রাখা।

তিন. সব্‌র আলাল মাসায়েব অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা।

'মুসাবারাহ্' শব্দটি সব্‌র থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ শত্রুর মুকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর 'মুরাবাতা' অর্থ হলো ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কোরআনে-করীমে বলা হয়েছে ঃ من رباط الخـــيل। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।

(২) জামা'আতের নামাযের এমন নিয়মানুবর্তিতা করা যে, এক নামাযান্তেই দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ থাকা। এ দুটি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম্য অসংখ্য—অগণিত! এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেওয়া হলো।

রিবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা ঃ ইসলামী সীমান্তের হিফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকাইে 'রিবাত' ও 'মুরাবাতাহ' বলা হয়। এর দুটি রূপ হতে পারে। প্রথমত যুদ্ধের কোন আশংকা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধু অগ্রিম হিফাযত হিসাবে তার দেখাশোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষবাস করে নিজের রুযী-রোজগার করাও জায়েয।

এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোজগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হিফাযত না হয়, বরং নিজের রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যত সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন লোক 'মুরাবাত ফী সাবীলিল্লাহ্' হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত, সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদের সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে।—(কুরতুবী)

এতদুভয় অবস্থাতে 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন—"আল্লাহ্র পথে একদিনের 'রিবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তাঁর সব কিছু থেকেও উত্তম।"

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "একদিন ও এক রাতের রিবাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোযা এবং সমগ্র রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার রিযিক জারি থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে।"

আবূ দাউদ (র) ফুযালাহ্ ইবনে ওবায়েদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধু মুরাবাত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া অর্থাৎ তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াকফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন এ উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলমানের সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের সৎ কাজের কারণ হয়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার 'রিবাত' কর্মের সওয়াবও অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর সওয়াব আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারি থাকবে। যেমন বিশুদ্ধ সনদসহ ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে-করীম (সা)-ইরশাদ করেছেন ঃ

من مات مرابطًا فى سبيل الله اجرى عليه اجر عمله الصالح الذى كان يعمله واجرى عليه رزقه وامن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة امنا من الفزع-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে দুনিয়ায় যে সমস্ত সৎ কাজ করতো তার সওয়াব সব সময় জারি থাকবে এবং তার রিযিকও জারি থাকবে এবং সে শয়তান (কিংবা কবরের সওয়াল-জওয়াব) থেকে বেঁচে থাকবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে এমন বিশেষভাবে উঠাবেন যে, হাশরের ময়দানে কোন ভয়ভীতিই তার মধ্যে থাকবে না।

এই রেওয়ায়েতে যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তার একটি শর্ত রয়েছে যে, তাঁকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য কোন কোন রেওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, সে জীবিত অবস্থায় তার সন্তান-সন্ততির কাছে ফিরে গেলেও সে সওয়াব জারি থাকবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'আব রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, রমযান ছাড়া অন্যান্য দিনে একদিন মুসলমানদের কোন দুর্বল সীমান্ত রক্ষার কাজ নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করার সওয়াব শতবর্ষের ক্রমাগত রোযা এবং রাত্রি জাগরণের চেয়েও উত্তম। আর রমযানের সময় একদিন সীমান্ত প্রহরার কাজ এক হাজার বছরের সিয়াম ও কিয়ামের চাইতে উত্তম। এখানে এ শব্দের সামান্য দোদুল্যমানতা প্রকাশ করার পর বর্ণনাকারী বলেন, আর যদি আল্লাহ্ অক্ষত অবস্থায় তাকে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে নেন, তবে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন পাপ লেখা হবে না। বরং পুণ্য লেখা হতে থাকবে এবং তার সীমান্ত রক্ষার কাজের বিনিময় কিয়ামত অবধি জারি থাকবে।—(কুরতুবী)

নামাযের জামা'আতের অনুবর্তিতা ঃ আবূ সালমাহ্ ইবনে আবদুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন,—আমি তোমাদেরকে এমন কিছু বিষয় বলে দিচ্ছি যাতে আল্লাহ্ তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। সে বিষয়গুলো হচ্ছে এই ঃ ঠাণ্ডা কিংবা কোন ক্ষতের কারণে ওযূর অঙ্গগুলো ধোয়া কষ্টকর হলেও সে অঙ্গগুলোকে খুব ভালভাবে ধোয়া, অধিক পরিমাণে মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক নামায শেষ করার পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। তারপর বলেন ঃ ذلكم الرباط। অর্থাৎ এও আল্লাহ্র ওয়াস্তে সীমান্ত প্রহরার অনুরূপ।

জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে প্রথমে মুসলমানদেরকে সবর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রেই হতে পারে। আর এর বিস্তারিত বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত 'মুসাবারাহ্'-এর নির্দেশ করা হয়েছে যা কাফিরদের সাথে মুকাবিলার সময় হয়ে থাকে। তৃতীয়ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুরাবাতার, যা কাফিরদের সাথে মুকাবিলার আশংকার সময় হয়ে থাকে। আর সর্বশেষে দেওয়া হয়েছে তাকওয়া তথা পরহিযগারীর হুকুম ; যা এ সমুদয় কাজের প্রাণ এবং আমল কবূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রেই এসব বিষয় প্রযোজ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে এসব আহকামের উপর আমল করার পুরোপুরি তওফীক দান করুন। আমীন !

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

সূরা আন্-নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৭০ আয়াত, ২৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ① وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ②

পরম দয়ালু ও দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে!

(১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (২) ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়, এটা বড়ই মন্দ কাজ।

যোগসূত্র ঃ সূরা আলে-ইমরানের সর্বশেষ আয়াতটি ছিল তাকওয়া সম্পর্কিত। আর আলোচ্য সূরা 'নিসা'ও শুরু হয়েছে তাকওয়ারই বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে।

প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তুসামগ্রীর (গনীমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন—অনাথ-ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হক্কুল-ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এ সব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এ সব অধিকারকে তৌলদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এ সব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্‌ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া'। বস্তুত এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ... ... —অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবত এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিয়ের খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খুতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে সমগ্র মানুষই--পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী—প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টি-লোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যার রবুবিয়াত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান!

এর পরই আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ্ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটিমাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্-ভীতি এবং

পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃ বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে নেয়।

اَلَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

অর্থাৎ সে মহাসত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমত হযরত আদম (আ)-এর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলত পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ভূমিকা হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহ্‌র অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের পরিমাণ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসাবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবি কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। এ পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক, তা পিতার দিক থেকেই হোক অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াতীম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারি করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র প্রাণীসত্তা (অর্থাৎ হযরত আদম [আ] থেকে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত মানুষের সৃষ্টির মূল উৎস তিনিই)। আর সে প্রাণীসত্তা থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর যুগল (অর্থাৎ আল্লাহ্ আদম থেকেই সহধর্মিনী বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন) এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই মানব-যুগল থেকেই অসংখ্য নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। আর (হে মানুষ! তোমাদেরকে এ ব্যাপারেও বিশেষ তাকীদ করা হচ্ছে যে,) তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে ভয় করবে যার নামে শপথ করে তোমরা (নিজেদের অধিকার) আদায়ের চেষ্টা করে থাক। (অর্থাৎ তোমরা অন্যের কাছে নিজেদের অধিকার আদায় প্রসঙ্গে বলে থাক যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে আমাদের অধিকার দিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য যখন অন্যদের আহ্বান করে থাক, তখন তাতে

বোঝা যাচ্ছে যে, তোমরা তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য বলে মনে করে থাক। তাই তোমাদের বিশেষভাবে তাকীদ দেওয়া হচ্ছে এইজন্য যে, তোমরাও আল্লাহ্কে ভয় কর)। আর (এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্র সমগ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা। বস্তুত এখানে একটি বিশেষ ব্যাপারে সতর্ক ও ভয় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে,) আত্মীয়-স্বজনের অধিকার যাতে বিনষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাক। আল্লাহ্ তোমাদের সবার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। (তোমরা যদি আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী কিছু কর, তবে তার শাস্তি অবশ্যই পাবে।) এবং যে সব শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করে (অর্থাৎ যারা ইয়াতীম হয়ে যায়) তাদের ধন-সম্পদের সংরক্ষণ করো (যাতে তা নষ্ট হয়ে না যায়। বরং তাদের ধনসম্পদ তাদের কাজেই খরচ কর। এছাড়া যতদিন পর্যন্ত সে সব ইয়াতীমের ধন-সম্পদ তোমাদের দায়িত্বে থাকে, সেগুলোকে সূক্ষ্মভাবে হিফাযত করো) এবং কোনক্রমেই তাদের ভালো মালগুলো বেছে নিয়ে তার সাথে তোমাদের খারাপ মালগুলো সংমিশ্রিত করো না। আর তাদের ধন-দৌলত তোমরা কখনো ভোগ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিজস্ব সম্পদ রয়েছে। (অবশ্য তোমরা যদি একান্তই নিঃস্ব হয়ে থাক, তাহলে তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কিছু পরিমাণ পারিশ্রমিক নেওয়া সঙ্গত হতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ঃ আলোচ্য সূরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয়ই বোঝানো হয়েছে। কালামে-পাকে 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রিহ্ম'। আর 'রিহ্ম' অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয় অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলত মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায়—'সেলায়ে-রিহ্মী' বলা হয়। আর এতে কোন রকম ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেতয়ে-রিহ্মী'।

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।" —(মিশকাত, পৃ. ৪১৯)

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ-জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন ঃ মহানবী (সা)-এর মদীনায় আগমনের সাথে সাথে আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাযির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই ঃ

يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلو الا رحام وصلوا
با لليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.

—হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশি বেশি সালাম দাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং এমনি সময় নামাযে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।—(মিশকাত, পৃ. ১০৮)

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনাহ (রা) তাঁর এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন, 'তুমি যদি বাঁদীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে বেশি পুণ্য লাভ করতে পারতে।' —(মিশকাত, পৃ. ১৭১)

ইসলাম দাস-দাসীদের আযাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন ঃ

الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة.

—'কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদ্‌কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়।' —(মিশকাত, পৃ. ১৭১)

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের অধিকার আদায় যেমন অত্যন্ত পুণ্যের কাজ, তেমনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও মহানবী (সা) অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لايدخل الجنة قاطع —'যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' —(মিশকাত, পৃ. ৪১৯)

لاتنزل الرحمة علے قوم فيه قاطع رحم.

—যে কওমের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কোন ব্যক্তি বিরাজ করবে, তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবে না।'—(মিশকাত, পৃ. ৪২০)

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও

পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে এর কোন মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্কে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে কোন বেগ পেতে হয় না। কারণ, তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

কোরআনে-করীমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি।

কোরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আন্তরিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ইয়াতীমের অধিকার ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ—ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী 'ইয়াতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে-ইয়াতীম' বা 'নিঃসঙ্গ মুক্তা' বলা হয়ে থাকে।

ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে। অবশ্য জীব-জন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব জীব-জন্তুর মা মরে যায়, তাদেরকে ইয়াতীম বলা হয়।

ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) বলেছেন, 'বালেগ হবার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না।'—(মিশকাত, পৃ. ২৮৪)

ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসাবে কিছু সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তাহলে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হিফাযত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক, তার উপরই ইয়াতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধনসম্পদ থেকে নির্বাহ করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াতীম বালেগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালেগ হলেই কেবল তার নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌঁছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অতএব ইয়াতীমের মালামাল তার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার পন্থা হলো ইয়াতীমের মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালেগ হলে যথাসময় তার নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

কোরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে ইয়াতীমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না, এটাই যথেষ্ট নয় ; বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং ইয়াতীম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজ দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করা।

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, ইয়াতীমের উত্তম সম্পদগুলো তোমাদের মন্দ সম্পদের সাথে অদলবদল করো না। অনেক লোক এমনও রয়েছে যে, সংখ্যার দিক দিয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন না ঘটালেও ভালো ভালো জিনিস নিজেদের জন্য এবং মন্দগুলো ইয়াতীমের জন্য নির্ধারণ করে থাকে। যেমন, একপাল ছাগলের মধ্য থেকে মোটাতাজা এবং সবল ছাগলগুলো নিজেদের ভাগে এবং অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল ছাগলগুলো ইয়াতীমের জন্য বরাদ্দ করে থাকে। এমনিভাবে একটি অচল মুদ্রা ইয়াতীমের জন্য এবং ভালো মুদ্রাটি নিজের জন্য বণ্টন করে। এটাও আত্মসাৎ এবং খেয়ানত বৈ আর কিছুই নয়। আর এ জন্যই কোরআন একান্ত স্পষ্ট করে ইয়াতীমের অধিকারগুলো সংরক্ষণের কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। এই ধরনের অদলবদল অথবা পরিবর্তন যেমন অভিভাবকের নিজের বেলায় চলে না, তেমনি অন্যের বেলায়ও অভিভাবককে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকতে হবে, যাতে ইয়াতীম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সূরার তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে ঃ ইয়াতীমের ধন-সম্পদ নিজের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে খেয়ো না অর্থাৎ ইয়াতীমের মাল যাতে কেউ অবৈধ পন্থায় ভোগ করতে না পারে, সে জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নিজের সম্পদের সাথে তোমরা ইয়াতীমের সম্পত্তি ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করো এবং ভিন্নভাবে ব্যয় করো। আর যদি একত্রেও রাখ, তাহলে এমনিভাবে হিসাব-নিকাশ করে রাখবে, যাতে বুঝতে পার যে, তাদের মালামাল তোমাদের ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহারে ব্যয় হয়নি। এর পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা বাকারার ২৭তম রুকূতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ ও ভোগ করার ক্ষেত্রে সাধারণত ঐ সব লোকই বেশি পাওয়া যায়, যাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ রয়েছে। আর তাদের কথা এখানে উল্লেখ করে বস্তুত তাদের লজ্জা দেওয়া হয়েছে যে, কি করে এই ধরনের লোকেরা ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করতে পারে, যাদের আল্লাহ্ ধন-দৌলতের অধিকারী করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমের মালামাল ভক্ষণ করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ধন-সম্পদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভোগ ও ব্যবহার। কিন্তু পরিভাষা হিসাবে ধন-সম্পদের ক্ষয় সাধন করাকেই ভক্ষণ বলা হয়ে থাকে। তা ব্যবহারের মাধ্যমেই হোক অথবা ভোগের মাধ্যমেই হোক। কোরআন এই পরিভাষাটিকে সামনে রেখেই 'ভক্ষণ করো না' বলে ইয়াতীমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে। সুতরাং ইয়াতীমের সম্পদ যে কোন অবৈধ পন্থায় ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

আলোচ্য আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে ঃ 'এটা হবে মস্ত বড় অপরাধ'। এখানে 'হুবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন—এ শব্দটি হাবশি ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ হচ্ছে মস্ত বড় অপরাধ। আর আরবী ভাষায়ও এ শব্দটি সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ ইয়াতীমের মালামাল সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাবেই হোক অথবা অভিভাবক তার নিজের মালের সাথে সংমিশ্রিত করেই হোক, অপচয় ও আত্মসাৎ করলে তা হবে তার জন্য মস্ত বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

---

(৩) আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে ইয়াতীমের হক বিনষ্ট করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, অভিভাবকগণের পক্ষে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা হারাম। আলোচ্য আয়াতে কিছু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পূর্বোক্ত নির্দেশটিই পুনরালোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যাদের অভিভাবকত্বে ইয়াতীম মেয়ে রয়েছে তারা যেন ওদের এমন মতলব নিয়ে বিয়ে না করে যে, এদের যেনতেন মোহর দিয়ে বিয়ে করা যাবে এবং ওদের যেসব বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে, তা গ্রাস করে নেওয়া যাবে।

মোটকথা, কোরআনের এ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করার যে কোন ফন্দি-ফিকিরই নাজায়েয। পরন্তু অভিভাবকগণের উপর সর্বতোভাবে ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ফরয।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি তোমাদের সামনে এমন কোন সম্ভাবনা উপস্থিত হয় (যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে তো কথাই নেই) যে, ইয়াতীম মেয়েদের ক্ষেত্রে (তাদের মোহরের বেলায়) সুবিচার করতে পারবে না (তবে তাদের বিয়ে করো না, বরং) তবে (হালাল) স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে যারা

তোমাদের নিকট (যে কোন দিক দিয়ে) পছন্দ হয়, তাদের বিয়ে কর (কেননা, অন্যান্য স্ত্রীলোক যেহেতু স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারবে; তাও যারা একাধিক বিয়ে করতে চায়, তারা একজনে) দুজন পর্যন্ত স্ত্রীলোককে (অথবা একজনে) তিনজন স্ত্রীলোককে (অথবা একজনে) চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোককে (বিয়ে করতে পারে)। তবে যদি এরূপ সন্দেহ থাকে যে, (একাধিক বিয়ে করে স্ত্রীদের মধ্যে) ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, (বরং কোন স্ত্রীর অধিকার বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে,) তবে এমতাবস্থায় এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। (আর যদি মনে কর যে, এক স্ত্রীর অধিকারও পূরণ করা সম্ভব হবে না, তবে) যেসব ক্রীতদাসী (শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী) তোমাদের অধিকারে রয়েছে, তাতেই তৃপ্ত থাক। এমতাবস্থায় (এক স্ত্রী কিংবা শুধু ক্রীতদাসীতে তৃপ্ত থাকার বেলায়) সীমালংঘন বা অবিচার না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। (কেননা, এ অবস্থায় যেহেতু একই স্ত্রীর ব্যাপার, তাই অবিচার হওয়ার তেমন অবকাশ থাকে না। দাসীদের ব্যাপারে অবিচার হওয়ার আশংকা আরো কম। কেননা, এক্ষেত্রে মোহর দিতে হয় না। অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রেও তাদের স্ত্রীর সমান অধিকার থাকে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ ঃ জাহিলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হতো। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু ধন-সম্পত্তি থাকতো, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফিকির করতো। এসব অসহায় মেয়ের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করতো না।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা)-এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সেই ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সেই ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিলো এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মোহর' আদায় তো করলোই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَاِنْ خِفْتُمْ ... مِنَ النِّسَآءِ—অর্থাৎ মেয়ের তো অভাব নেই; বিয়ে যদি করতেই হয় তবে অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার।

নাবালেগের বিয়ে প্রসঙ্গে ঃ আলোচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে ইয়াতীম মেয়ে। আর শরীয়তের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালেগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইয়াতীমের অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে বালেগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনি অনেক বড় বড় মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোন একটি মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়—এটা কোনক্রমেই ঠিক নয়।

এ ছাড়া এমন অনেক বালেগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালেগ হলেও মেয়ে-সুলভ লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়।

এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বহু-বিবাহ ঃ বহু-বিবাহের প্রথাটি ইসলাম-পূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিসর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তার পুনঃপ্রচলন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

ইউরোপের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মিঃ ডিউন পোর্ট বহু-বিবাহের একজন বড় প্রবক্তা। বহু বিবাহের সমর্থনে তিনি পবিত্র ইনজীল কিতাবের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বহু-বিবাহ শুধু পছন্দনীয় নয়, বরং তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ উপকারিতাও রেখেছেন।

এভাবে ইউরোপের পাদরী নিকসন, জন মিল্টন এবং আইজাক টেইলর প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তি বহু-বিবাহ প্রথা চালু করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; এমনকি পণ্ডিত ডিরাক অসংখ্য স্ত্রী রাখার পক্ষপাতী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এক ব্যক্তি দশ থেকে সাতাশটি বিয়েও করতে পারবেন একই সময়ে।

কৃষ্ণকে হিন্দুরা তাদের পরম দেবতা বলে স্বীকার করে। সেই কৃষ্ণেরও দশ সহস্র স্ত্রী ছিল বলে বর্ণনা করা হয়।

মোট কথা, ধর্মীয় পবিত্রতা ও সামাজিক কাঠামো সুবিন্যস্ত রাখার তাকীদে এবং সমাজ থেকে জেনা ও ব্যভিচার প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ নির্মূল করার স্বার্থে বহুবিবাহ প্রথা একান্তই প্রয়োজন। এছাড়া অনেক সমাজে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাই অধিক। বহু-বিবাহের মাধ্যমে এ সমস্যারও প্রতিকার হতে পারে।

বহু-বিবাহের সুযোগ না থাকলে সমাজে গণিকাবৃত্তি ও প্রমোদ-বালাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর সত্য কথা এই যে, যেসব সমাজে বহু-বিবাহের অনুমতি নেই সেখানে ব্যভিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই।

আজকের ইউরোপীয় সমাজের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেখানে বহু-বিবাহের উপর তো বিধি-নিষেধ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশার আবরণে জেনা ও এ জাতীয় অসামাজিক কার্যকলাপ চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ জন্য তাদের কোন বাধেও না, বরং এর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

মোটকথা, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, এর প্রতি কোন প্রকার বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদী, খৃস্টান, আর্য, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে সে সময় অগণিত বহু-বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্যদিকে এ থেকে উদ্ভূত দায়িত্বের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না, বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাঁদীর মত এবং তাদের সাথে যাচ্ছে-তা ব্যবহার করত। তাদের প্রতি কোন প্রকার ইনসাফ করা হতো না। চরম বৈষম্য বিরাজ করত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

অনেক সময়, পছন্দসই দু'একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবশিষ্টদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হতো।

ইসলামের বিধান ঃ কোরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু-বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময় চার-এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন অথবা চারজন স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে ماطاب (যা তোমাদের ভাল লাগে) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের এবং ইবনে মালেক (র) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন ماحل শব্দ দ্বারা ; যার অর্থ হচ্ছে, যেসব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তফসীরকার উপরোক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয়

ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপূত এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার ঊর্ধ্বসংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—তাও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মহানবী (সা)-এর বর্ণনা দ্বারাও এ বিষয়টি অর্থাৎ চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধকরণের কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর গায়লান বিন আসলামা সাকাফী নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন ; তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল। তাঁর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। মহানবী (সা) নির্দেশ দিলেন, এ দশজন স্ত্রীর মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে রেখে বাকি সবাইকে যেন তালাক দিয়ে দেওয়া হয়। গায়লান বিন আসলামা সাকাফী রসূল (সা)-এর নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন। অর্থাৎ চারজন রেখে আর সবাইকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিলেন।—(মিশকাত, পৃ. ২৭৪, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)

মসনাদে-আহমদে এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে ঃ গায়লান বিন আসলামা শরীয়তের হুকুম মোতাবেক চারজন স্ত্রী রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে তিনি সে চারজন স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর ছেলেদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দেন। এ ব্যাপারটি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর গোচরে এলে তিনি তাঁকে ডাকালেন এবং বললেন, "তুমি স্ত্রীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ যা একান্তই জুলুম। অতএব, তুমি শীঘ্র তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ কর এবং তোমার সে ধন-সম্পদ তোমার ছেলেদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দাও। আর যদি এ ব্যবস্থা না কর তাহলে মনে রাখবে যে, এ জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

কায়েস ইবনুল হারিস আসাদী (রা) বলেন ঃ আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন আমার আট স্ত্রী ছিল। আমি ব্যাপারটি মহানবী (সা)-এর গোচরীভূত করলাম। তিনি আমাকে চারজন স্ত্রী রেখে বাকি সবাইকে বিদায় করে দিতে বললেন ।—(আবূ দাউদ, পৃ. ৩০৪)

ইমাম শাফিয়ী (র) তাঁর মসনাদে নওফেল বিন মুয়াবিয়া দায়লামীর একটি ঘটনা নকল করেছেন। ঘটনাটি এরূপ যে, তিনি (দায়লামী) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পাঁচজন স্ত্রী ছিল। মহানবী (সা) তাঁকে একজন স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনা মিশকাত শরীফের ২৭৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। হুযূর (সা)-এর এবং সাহাবীদের এরূপ আচরণ থেকে কোরআনের উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ সবার কাছেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর তা হচ্ছে এই যে, চারজন স্ত্রীর অধিক সংখ্যক স্ত্রী একসঙ্গে রাখা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

বহু-বিবাহ ও মহানবী (সা) ঃ আমরা জানি মহানবী (সা)-এর আগমন ছিল পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর আগমনের মূল লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্র দীনের

প্রচার ও প্রসার, মানুষকে কলুষমুক্ত করে তার মুক্তি সাধন এবং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কালামের বাণীকে বিশ্ব-মানবের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেওয়া। তিনি ইসলামের মহান শিক্ষাকে কথা ও কাজে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোন একটি অধ্যায় বা বিভাগ নেই, যেখানে মহানবী (সা)-এর হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করা থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবার-পরিজনের লালন-পালন, এমনকি পায়খানা-প্রস্রাব এবং পবিত্রতা অর্জনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে গৃহাভ্যন্তরের যাবতীয় কাজকর্ম, স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক, বাইরে থেকে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে অপেক্ষমান মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান অর্থাৎ এভাবে হাজারো প্রশ্নের সমাধান শুধু মহানবী (সা)-এর স্ত্রীদের মাধ্যমেই উম্মত লাভ করতে পেরেছে।

ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারকাজের পরিপ্রেক্ষিতেই মহানবী (সা)-এর জন্য বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ছিল। একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর মাধ্যমেই দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস আমরা লাভ করতে পেরেছি যা হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া হযরত উম্মে সালমা (রা) তিনশ আটাত্তরটি হাদীস বর্ণনা করে গেছেন।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রা) 'আলামুল-মুয়াককেয়ীন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে, 'যদি হযরত উম্মে-সালমা (রা)-এর বর্ণিত ফতওয়াসমূহ সংকলন করা হয়, তা হলে একটি বিরাট গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। তিনি মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের জবাবে এসব ফতওয়া দিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা এবং তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ। হযরত রাসূলে-করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে মশগুল ছিলেন।

শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে মহানবী (সা)-এর দুজন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য স্ত্রীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও কম নয়।

দুনিয়ার ভোগবাদী মানুষের সাথে নবী-রাসূলদের কোন তুলনাই হয় না। কারণ, নবী-রাসূলদের লক্ষ্য ছিল গোটা বিশ্ব-মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এবং পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সংশোধন করা। আর পৃথিবীর ভোগসর্বস্ব মানুষেরা নিজেদের ওপর ধারণা করেই সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

অথচ অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় নাস্তিক এবং বস্তুবাদীরা হুযূর (সা)-এর বহু-বিবাহের ব্যাপারটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আসছে। তাদের মতে (নাউযুবিল্লাহ) যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যই তিনি এমনটা করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা)-এর জীবনপদ্ধতির প্রতি যদি কোন চিন্তাশীল লোক একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাহলে তাঁর একাধিক বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে এভাবে চিন্তা করতে পারবেন না। কারণ, তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিই প্রমাণ করে দেবে যে, তিনি এ উদ্দেশ্যে তা করেন নি।

তাঁর জীবন কুরায়শ তথা আরব-জাহানের সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। জীবনের পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এমন একজন বিধবা মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন যাঁর এর পূর্বে আরও দুজন স্বামী মারা গিয়েছিল এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি ঘর-সংসার করেন। পূত-চরিত্রের অধিকারিণী বলে আরবে যাঁর পরম সুখ্যাতিও ছিল। মজার কথা এই যে, তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পর অনেক সময় মাসের পর মাস তিনি হেরা পর্বত গুহায় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন; আরবের কে এই ঘটনা না জানে ?

এরপর যে সব বিয়ে হয়েছে, তা পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরই হয়েছে। এই পঞ্চাশ বছর এবং বিশেষ করে তাঁর যৌবনকাল সমস্তই মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মক্কার কোন শত্রুও তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। তাঁর শত্রুরা তাঁকে অবশ্যই যাদুকর, উন্মাদ প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছিল, কিন্তু তাঁকে ভোগসর্বস্ব বা তাঁর মধ্যে কোন যৌনবিকারগ্রস্ততা আছে, এমন মিথ্যা দাবি তারা কখনও করতে পারেনি।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতেই আমরা চিন্তা করতে পারি যে, জীবনের পঞ্চাশটি বছর দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-বিলাসিতা হতে পবিত্র থেকে অবশেষে শেষ জীবনে তিনি কি উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটি বিয়ে করতে বাধ্য হন। তা হলে যে কোন সুস্থ এবং নিরপেক্ষ বিবেকসম্পন্ন মানুষই নিশ্চয় বলবেন যে, বিশেষ কোন কারণেই তিনি বহু-বিবাহের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বহু-বিবাহ কিভাবে হলো তার সঠিক তথ্যও আমাদের জানা থাকা দরকার।

পঁচিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একমাত্র হযরত খাদীজাতুল-কোবরা তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে থাকেন। অতঃপর হযরত খাদীজাতুল-কোবরা ইন্তিকাল করলে তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও হযরত সাওদা (রা)-কে বিয়ে করেন। বিয়ের পর বিবি সাওদা মহানবী (সা)-এর ঘরে চলে আসেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে তাঁর পিতার গৃহেই অবস্থান করেন।

অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় সালে মদীনা শরীফে হযরত আয়েশা (রা) নবীর সন্নিধানে আসেন। এ সময় মহানবী (সা)-এর বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর। আর এ বয়সেই তাঁর দুজন স্ত্রী একত্রিত হলেন। আর এখান থেকেই তাঁর বহু-বিবাহ শুরু হয়। এর এক বছর পর হযরত হাফসা (রা)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এর কয়েক মাস পরেই হযরত জয়নব বিনতে খোযায়মাকে তিনি বিয়ে করেন। হযরত জয়নব (রা) আঠার মাস মহানবী (সা)-এর সঙ্গে জীবন-যাপন করার পর ইন্তিকাল করেন! অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি তিন মাস পর ইনতিকাল করেন। অতঃপর চতুর্থ হিজরীতে মহানবী (সা) হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে বিয়ে করেন এবং এরপর পঞ্চম হিজরীতে তিনি জয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-কে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স আটান্ন বছরে উপনীত হয়েছে। আর এই বয়সেই তাঁর চারজন স্ত্রী একত্রিত হয়েছেন। অথচ মুসলমানদের যখন একত্রে চার বিয়ে করার অনুমতি ছিল হযরত তখন থেকেই ইচ্ছে করলে চার বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

এরপর ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত (সা) জুয়ায়রিয়া (রা)-কে, ৭ম হিজরীতে হযরত উম্মে হাবিবা (রা)-কে এবং একই বছর হযরত সাফিয়া ও হযরত মায়মুনা (রা)-কে বিয়ে করেন।

মোট কথা, জীবনের ৫৪টি বছর পর্যন্ত মহানবী (সা) একজন স্ত্রী নিয়েই ঘর-সংসার করেছেন। অর্থাৎ পঁচিশ বছর হযরত খাদীজাতুল-কোবরা (রা)-কে নিয়ে এবং চার-পাঁচ বছর হযরত সাওদা (রা)-কে নিয়ে সংসার করেন। এরপর আটান্ন বছর বয়সে তাঁর চারজন স্ত্রী একত্রিত হন। এ ছাড়া অন্যান্যকে পরবর্তী দু'তিন বছরে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন।

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব স্ত্রীর মধ্যে কেবল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-ই অপ্রাপ্ত বয়সে কুমারী হিসেবে নবী করীম (সা)-এর সন্নিধানে আসেন। এ ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন বিধবা, যাদের কারো কারো পূর্বে দুজন স্বামীও অতিবাহিত হয়েছিল।

একথা কে না জানে যে, সাহাবায়ে-কিরাম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই ছিলেন মহানবী (সা)-এর ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ। এমতাবস্থায় তিনি চাইলে উল্লিখিত সংখ্যক কুমারী মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি দু'মাস অন্তর অন্তর তিনি ইচ্ছা করলে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

মহানবী (সা) ছিলেন আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ। আর আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষরা কখনো কোন মনগড়া কাজ করতে পারেন না। যা কিছু করেন আল্লাহ্র নির্দেশেই করেন। নবীকে নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এ জাতীয় বিতর্কের অবকাশ থাকে না। আর যদি কেউ তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে অর্থাৎ না মানে এবং এই অভিযোগ আনে যে, তিনি যৌনস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যই একাধিক বিয়ে করেছিলেন, তাহলে তাকে কোরআনের সে আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে তাঁর নিজের উপরও বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ—অর্থাৎ হে নবী! এরপর আপনার জন্য আর কোন স্ত্রী বৈধ নয়। আর এ আয়াতটিও নিঃসৃত হয়েছে মহানবী (সা)-এর মুখ থেকে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) যা কিছু করেছেন তা সবই ছিল আল্লাহ্র নির্দেশে।

হযরত (সা)-এর বহু-বিবাহের কারণে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক কল্যাণ হয়েছে তার হিসাব করা কঠিন। হাদীসের গ্রন্থসমূহই তার প্রকৃষ্ট সাক্ষী।

হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর স্বামী আবূ সালমার মৃত্যুর পর হযরত (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। উম্মে সালমা তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর সবকটি ছেলে-মেয়েসহ নবীর গৃহে চলে আসেন। মহানবী (সা) সেসব ছেলে-মেয়ে অতীব যত্নের সাথে লালন-পালন করেন। নবীর স্ত্রীগণের মধ্যে শুধু উম্মে-সালমাই পূর্ব স্বামীর ঘরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসেন। এটাও উম্মতের জন্য একটা শিক্ষা যে, বিধবাকে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার পূর্ব স্বামীর ছেলে-মেয়েদেরকেও প্রয়োজনবোধে লালন-পালন করে, তাদেরকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। উম্মে সালমার ছেলে হযরত উমর বিন আবি সালমা বলেন ঃ আমি মহানবী (সা)-এর আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছি। একবার তাঁর সাথে খেতে বসেছি। আমি খাবারের থালার চতুর্দিক থেকে লোকমা গ্রহণ

করছিলাম। এই অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) অত্যন্ত আদর করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে খাও, ডান হাতে এবং থালার সম্মুখ ভাগ থেকে খাও। (—মিশকাত, পৃ. ৩৬৩)

আর একটি ঘটনা ঃ হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) এক যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন। অন্য বন্দীদের মতো তিনিও বণ্টিত হন। সাবেত বিন কায়েস অথবা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ভাগে তিনি পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁর মুনিবের সাথে এমনি আচরণ করতে থাকেন যাতে তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। তিনি তাঁর মুনিবকে সম্মত করে সম্পদের বিনিময়ে মুক্তি লাভের পন্থা অবলম্বন করেন।

এরপর হযরত জুয়ায়রিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট এ সংবাদ নিয়ে আগমন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) ছিলেন গোত্রপতির কন্যা এবং সে গোত্রের সহস্রাধিক লোক সাহাবী (রা)-দের হাতে বন্দী হয়ে এসেছিলেন। এরপর সাহাবীরা যখন জানতে পারলেন যে, জুয়ায়রিয়া (রা)-এর সাথে হযরতের বিয়ে হয়েছে, তখন তাঁরা মহানবী (সা)-এর সম্মানে স্ব স্ব দাস-দাসীদের মুক্ত ও বিদায় করে দেন। এতেই বোঝা যায়, মহানবী (সা)-এর প্রতি সাহাবী (রা)-দের কতখানি প্রগাঢ় আনুগত্য ও সম্মান ছিল। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন ঃ "হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে বিয়ে করার কারণে বনি মুসতালিক গোত্রের শত শত ঘর আযাদ হয়ে গিয়েছিল। একটি গোত্রের জন্য জুয়ায়রিয়া (রা)-এর মতো অন্য কোন ভাগ্যবতী মহিলা অন্তত আমার নজরে পড়েনি।"

হযরত উম্মে হাবিবা (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তাঁর স্বামীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কাফেলার অন্যান্য লোকের সাথে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান। সেখানে কিছু দিন পর তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করেন।

মহানবী (সা) এ সংবাদ শুনে নাজ্জাশীর মাধ্যমে তাঁর কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠান। হযরত উম্মে-হাবিবা সে পয়গাম গ্রহণ করার পর নাজ্জাশী নিজে উকিল হয়ে তাঁকে হযরতের নিকট বিয়ে দিয়ে দেন।

মজার ব্যাপার এই যে, হযরত উম্মে হাবিবা (রা) ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ সুফিয়ানের কন্যা। আর আবূ সুফিয়ান তখন সে গোত্রেরই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যে গোত্রের লোকেরা ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেখেছিল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আবূ সুফিয়ান এক সময়ে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উত্ত্যক্ত করার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে কোন মওকাই হাতছাড়া করেন নি।

এমন এক মুহূর্তে মহানবী (সা) হযরত উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই বিয়ের কথা শোনার পর আবূ সুফিয়ানের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং তিনি

বলেছিলেন--মুহাম্মদ (সা) নিঃসন্দেহে সম্মানিত ব্যক্তি ; তাঁকে অসম্মানিত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। একদিকে তাঁকে এবং তাঁর সংগীদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি আর অন্যদিকে সে মুহূর্তেই তিনি আমার কন্যাকে বিয়ে করলেন।

মোদ্দাকথা, এ বিয়ের কারণে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হলো এবং ইসলামের মুকাবিলায় কাফিরদের শ্রদ্ধেয় নেতার মানসিক বল অনেকটা ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়লো।

এ বিয়ের কারণে ইসলাম এবং মুসলমানদের যে রাজনৈতিক বিজয় হলো, তা মোটেই কম গুরুত্বের নয়। আর নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ মহানবী (সা) সে দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

এখানে সামান্যই আলোকপাত করা হলো। এ ছাড়া ইতিহাসের যে কোন নিরপেক্ষ এবং চিন্তাশীল পাঠকই মহানবী (সা)-এর বহু-বিবাহের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পাঠকদেরকে আরো বিস্তারিত জ্ঞান আহরণের জন্য كثرت ازدواج لصاحب المعراج নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করবো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কিছুসংখ্যক খোদাদ্রোহীর বিস্তারকৃত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য আমি শুধু সংক্ষেপে এখানে কিছু বক্তব্য পেশ করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। আমার এ লেখার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাদের সাথে সাথে অজ্ঞতাবশত কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিও এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ছেন। আসলে তারা মূলত মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষা থেকে একান্তই বঞ্চিত। আর ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন, তাও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আল্লাহ্‌দ্রোহী লোকদের কাছ থেকেই অথবা তাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকেই।

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় ঃ চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ۔

অর্থাৎ—যদি আশংকা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক।

পবিত্র কোরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায়বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরীয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে, তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারক হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ।

জাহিলিয়াত যুগে এক ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী রাখতো কিন্তু সবার সাথে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো না। এ প্রসঙ্গে আয়াতের শুরুতে হাওয়ালাসহ

আলোচিত হয়েছে। কোরআনে-করীম স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছে যে, যদি সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে না পার, তবে এক স্ত্রী নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে অথবা ক্রীতদাসী নিয়ে সংসারধর্ম পালন করবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আয়াতে যে ক্রীতদাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শরীয়তের বিধি-নিষেধ সাপেক্ষ হতে হবে। আজকালকার যুগে যেহেতু সেসব বিধান অনুযায়ী দাসীর অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এ যুগে বিবাহ-বন্ধন ব্যতীত কোন স্ত্রীলোক নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম।

মোটকথা, কোরআন যদিও চারটি পর্যন্ত স্ত্রীলোককে একসাথে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে এবং কেউ এরূপ বিয়ে করলে তা শুদ্ধও হবে, তবে একাধিক বিয়ের বেলায় স্ত্রীদের সবার সাথে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা ওয়াজিব করা হয়েছে। এ নিয়মের অন্যথা করা কঠিন গোনাহ্র কাজ। সুতরাং কেউ একের অধিক বিয়ে করতে চাইলে তাকে প্রথমে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, প্রত্যেক স্ত্রীর হক পুরা করার মত সামর্থ্য তার রয়েছে কি না! যদি এরূপ সামর্থ্য না থাকে, তবে একের অধিক বিয়ে করতে যাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একটা কঠিন পাপে নিমজ্জিত করারই নামান্তর। এরূপ গোনাহর আশংকা থেকে বিরত থাকা এবং এক স্ত্রীতেই তুষ্ট থাকা তার পক্ষে বিধেয়।

অন্য কথায়, কেউ যদি একই সঙ্গে একই ঈজাব-কবূলের মাধ্যমে চারের অধিক স্ত্রী লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে সব কজনের বিয়েই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, চারের অধিক বিয়ে করার কোন অধিকারই নেই। আর যদি স্ত্রীর সংখ্যা চারের ভেতরে সীমিত থাকে, তবে সে বিয়ে হয়ে যাবে। তবে স্ত্রীদের মধ্যে যদি সমতাপূর্ণ ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তবে কঠিন গোনাহগার হবে। যে স্ত্রীর হক বিনষ্ট হবে, সে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তার অধিকার আদায় করে নিতে পারবে।

রাসূলে-করীমে (সা) একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না।

এক হাদীসে হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে।—(মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৭৮)

তবে ব্যবহারে সমতা রক্ষা করা শুধু সে সমস্ত ব্যাপারেই জরুরী, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত। যেমন খরচপত্র প্রদান, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। আর যেসব বিষয় মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, যথা—অন্তরের আকর্ষণ যদি কোন একজনের প্রতি বেশি হয়ে যায়, আর এ বিশেষ আকর্ষণের প্রভাব যদি সাধ্যায়ত্ত বিষয়াদির উপর বিস্তার না করে, তবে অবশ্য কোন অপরাধ হবে না।

রাসূলে-করীম (সা)-ও সাধ্যায়ত্ত ব্যাপারে পরিপূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করার পর যা সাধ্যের বাইরে, সে বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দোয়া করেছেন ঃ

اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك و لا املك.

অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! যেটা আমার সাধ্যায়ত্ত সেটা আমি সমভাবে বণ্টন করেছি। আর ঐ বস্তু যা আপনার করায়ত্ত আমার সাধ্যে নয়, সেটার জন্য আমাকে যেন অপরাধী করবেন না।

আল্লাহ্‌র একজন মা'সুম রাসূল (সা) পর্যন্ত যে ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা রাখতেন না, সে ব্যাপারে অন্য কেউ কিভাবে সমতা বজায় রাখতে পারবে? এজন্যই কোরআনের অপর এক আয়াতে মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত এ বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ.

অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা কোন অবস্থাতেই সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ভালবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নয়। তাই এ অসাধ্য বিষয়টিতেও সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমরা আন্তরিক আকর্ষণ বেশি হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্য জনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। আলোচ্য আয়াতে فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً—অর্থাৎ যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, বলে সে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এসব ব্যাপারে বেইনসাফী মহাপাপ। আর যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব ঃ সূরা আন্-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে 'তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না' এ দু আয়াতের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়েরই নির্দেশ এবং খোদ কোরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং পরোক্ষভাবে কোরআন এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বিবাহ রহিত করে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে ভুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কেননা, একাধিক বিয়ে বন্ধ করাই যদি আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় হতো, তবে 'নারীদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার'—এরূপ বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا বলে ইনসাফ কায়েম না করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করারও কোন অর্থ হয় না।

এ ছাড়া খোদ রাসূল (সা) সাহাবীদের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা-দ্বিধায় একাধিক বিয়ের রীতি প্রচলিত থাকাই প্রমাণ করে যে, বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন না।

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা আন্-নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দুটি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ لَا تَعُوْلُوْا এতে দুইটি শব্দ রয়েছে। একটি اَدْنٰى এটি دُنُوٌّ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে ঃ لاتعولوا = عال-يعيل ঝুঁকে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হলো—সমতা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরীয়ত-সম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর—এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের আশংকাও দূর হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'তোমরা জুলুম না করার নিকটে থাকবে' এরূপ বলার অর্থ কি ? বরং এখানে বলা উচিত ছিল যে, এক বিবাহের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে।

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্রীকেও নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর সংসার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালংঘন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাবে এরূপ না বলে اَدْنٰى (আদ্‌না) শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এটা অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা। এ পথ অবলম্বন করলে তোমরা ইনসাফের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবে। আর পরিপূর্ণ ইনসাফ তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজ, উদ্ধত আচরণ প্রভৃতি সবকিছু ধৈর্য সহকারে বরদাশ্‌ত করতে পারবে।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓــًٔا مَّرِیْٓــًٔا ④

---

(৪) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে একাধিক স্ত্রীর বেলায় স্ত্রীদের প্রতি অনুষ্ঠিত সম্ভাব্য নির্যাতনের পথ বন্ধ করা হয়েছিল। এ আয়াতে নারীদের একটা বিশেষ হক বা অধিকারের কথা উল্লেখ করে এক্ষেত্রে যেসব জুলুম-নির্যাতন হতে পারত তা দূর করা হয়েছে। সে অধিকার হচ্ছে স্ত্রীর দেনমোহর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশিমনে দিয়ে দিও। তবে হ্যাঁ, যদি স্ত্রীরা খুশির সাথে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় (অবশ্য পূর্ণ মোহরের বেলায়ও একই হুকুম), তবে (এমতাবস্থায়) তোমরা তা ভোগ কর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্ত্রীদের মোহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা প্রচলিত ছিল।

এক. স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে পৌঁছাতো না; মেয়ের অভিভাবকরাই তা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। যা ছিল একটা দারুণ নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কোরআন নির্দেশ দিয়েছে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মোহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মোহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

দুই. স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমত, মোহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই আয়াতে نحلة শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে نحلة বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়।

মোট কথা, আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্টচিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

তিন. অনেক স্বামীই তার বিবাহিতা স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মোহর মাফ করিয়ে নিতো। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো না। অথচ স্বামী মনে করতো যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং মোহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا.

অর্থাৎ—যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।

অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশিমনে মোহরের অংশ বিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েয হবে।

এ ধরনের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহিলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কোরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মোহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

আয়াতে হৃষ্টচিত্তে প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মোহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবি ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। হুযূর (সা) নিম্নোক্ত হাদীসে শরীয়তের মূল-নীতিরূপে ইরশাদ করেছেন ঃ

الا لاتظلموا الا لايحل مال امرء الا بطيب نفس منه.

—অর্থাৎ "সাবধান! জুলুম করো না। মনে রেখো, কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।" —(মিশকাত, পৃ. ২৫৫)

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেনদেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

আজকালকার যুগে স্ত্রীরা যেহেতু মনে করেন যে, স্বাভাবিকভাবে মোহর তো পাওয়া যাবেই না বরং দাবি করলে তিক্ততা এমনকি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়, তাই তারা মোহরের দাবি মাফ করে দিয়ে থাকেন ; এ ধরনের ক্ষমার দ্বারা কিন্তু মোহরের ঋণ মাফ হয় না।

হযরত হাকীমুল-উম্মত মাওলানা থানভী (র) বলতেন, মোহরের অর্থ স্ত্রীর হাতে দেওয়ার পর স্ত্রী যদি তা ইচ্ছা মত খরচ করার সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও স্বামীকে দিয়ে দেয়, কেবল তবেই সেটাকে মাফ করার পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে।

মা-বোনের ওয়ারিসী স্বত্বের ব্যাপারেও এ শর্তই প্রযোজ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছেলেরাই দখল করে বসে। বোনদের অংশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। কেউ কেউ হয়ত দীনদারীর খেয়াল করে বোনদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়। বোন যেহেতু মনে করে যে, তার পাওনা অংশ আদায় করা সহজ নয়, তাই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভাইয়ের মন রক্ষার জন্য মৌখিকভাবে মাফ করে দেয়। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের অংশ, বিশেষত বিমাতার প্রাপ্য অংশ নিয়েও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব অংশীদারের প্রাপ্য যে আন্তরিক তুষ্টির সাথে ক্ষমা করা হয় না, তা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং এটাও হাদীস শরীফের সাবধানবাণী অনুযায়ী সরাসরি জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এ ব্যাপারে হযরত থানভী (র) আরো বলেন, হাদীস-শরীফে 'আন্তরিক তুষ্টির' শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বিচার-বিবেচনার তুষ্টির কথা বলা

হয়নি। কেননা, স্থূল বিচারে অনেক সময় বৃহত্তর কোন স্বার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে মানুষ ঘুষ-রিশওয়াত দিয়েও তুষ্ট হয়। বড় কোন লাভের আশায় অনেকে হৃষ্টচিত্তে সুদ দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে। সুতরাং 'স্থূল বিচারে সন্তুষ্টি' শর্ত হলে এ ঘুষ এবং সুদের অর্থও গ্রহণকারীর জন্য হালাল হতো কিন্তু যেহেতু ঘুষ বা সুদ দিয়ে কেউ 'আন্তরিক তুষ্টি' লাভ করতে পারে না, তাই এ অর্থ গ্রহীতার জন্য হালাল হয় না।"

মসজিদ-মাদরাসার চাঁদার ব্যাপারেও দাতার আন্তরিক তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সমাজ পঞ্চায়েত বা নেতৃস্থানীয় কোন লোকের চাপের মুখে যদি কেউ আন্তরিক তুষ্টি ছাড়াই চাঁদা দান করে, তবে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা জায়েয হবে না ; এ অর্থ দাতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

আয়াতে صدقات শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা صدقه শব্দের বহুবচন। صدقه এবং صداق স্ত্রীলোকের মোহরকে বলা হয়। মোল্লা আলী ক্বারী (র) মিশকাত শরীফের ভাষ্য 'মিরকাত'-এ লিখেছেন ঃ

وسمى به لانه يظهر به صدق ميل الرجل الى المرأة.

অর্থাৎ মোহরকে 'সাদুকা' বা 'সুদাক' এজন্য বলা হয় যেহেতু صدق ধাতুর মধ্যে নিষ্ঠা বা আকর্ষণ অর্থ পাওয়া যায়। মোহর যেহেতু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বা নিষ্ঠার প্রমাণ করে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই মোহরকে 'সাদুকা' বলা হয়।

هنيئا ومريئا—প্রায় সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। অভিধানে ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই অর্জিত হয়। এমন খাদ্যবস্তুকে বোঝায়, যা অত্যন্ত সহজে গলাধঃকরণ করা চলে এবং কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই হজম ও শরীরের অংশে পরিণত হয়ে যায়।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٥ وَابْتَلُوا
الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْ
فَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦

(৫) আর যে সম্পদকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও। (৬) আর ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা সচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহ্ই হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াতীমের মাল তাদের হাতে অর্পণ এবং স্ত্রীলোকের মোহর তাদেরকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে এরূপ বুঝবার অবকাশ ছিল যে, ইয়াতীম এবং স্ত্রীলোকদের সম্পদ তাদের হাতেই তাৎক্ষণিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য—সে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার মত বয়স ও বুদ্ধি-বিবেচনা তাদের থাকুক বা নাই থাকুক! এরূপ ভুল বোঝার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই পরবর্তী এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, নির্বোধের হাতে ধন-সম্পদ ছেড়ে দিও না, বরং তাদের প্রতি নজর রাখতে থাক, যে পর্যন্ত না সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা খরচ করার মত বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ তাদের মধ্যে হয়। যখন দেখবে, নিজের ধন-সম্পদ সামলে রাখার মত বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, তখন তাদের মাল তাদের হাতেই তুলে দাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার সহায়-সম্পত্তি তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কিন্তু যদি সে অল্পবয়স্ক অর্বাচীন হয়, তবে) তোমরা (সেই) স্বল্পবুদ্ধির অর্বাচীনদের হাতে তোমাদের (অর্থাৎ তাদের) সেই সম্পদ তুলে দিও না, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকলের জীবিকার অবলম্বন করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ সহায়-সম্পদ যত্নের সাথে সংরক্ষণ করার জিনিস। তাই এমন সময়ে তা ওদের হাতে দিও না, যখন তারা তা বিনষ্ট করে ফেলতে পারে)। আর এ সম্পদ থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে থাক এবং সান্ত্বনা দিতে থাক (যে, তোমরা ভালর জন্যই এগুলোর দায়িত্ব তোমার হাতে দেওয়া হচ্ছে না। বড় হয়ে বুদ্ধি-বিবেচনা হলে পর এগুলো তোমাকেই দেওয়া হবে এবং সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করার আগে কিছু কিছু করে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা যাচাই করার প্রয়োজন হলে) তাদের পরীক্ষা করতে থাক (কিছু কিছু কেনা-বেচা এবং ছোট ছোট লেন-দেনের দায়িত্ব দাও)। যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে (অর্থাৎ বালেগ হয়ে যায়। কেননা, বিবাহের যোগ্যতা বালেগ হলে তার পরই হয়ে থাকে)। অতঃপর (বয়ঃপ্রাপ্তি ও পরীক্ষার পর) যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও (অর্থাৎ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা অনুভব কর) তখন তাদের মাল তাদের হাতে

তুলে দাও। (আর যদি মনে কর যে, সম্পদ রক্ষা করার মত বুদ্ধি তার হয়নি, তবে এ অবস্থায়ও তার হাতে ধন-সম্পদ তুলে দিও না)। আর এ ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা এ ধারণায় যে, সে বড় হয়ে যাবে ; তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। (হ্যাঁ, যদি এভাবে গ্রাস করার মতলব না থাকে, তবে নির্দেশ হচ্ছে,) যে ব্যক্তির (এ সম্পদ) ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই (অর্থাৎ যার গ্রাসাচ্ছাদনের মত নিজের সম্পদ রয়েছে, যদি সে নিসাব-পরিমাণ মালের অধিকারী নাও হয়) সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে (সামান্য কিছু ব্যবহার করা থেকেও) মুক্ত রাখবে। আর যে ব্যক্তি দরিদ্র, সে সঙ্গত পরিমাণে (অর্থাৎ যাতে জরুরী প্রয়োজন সম্পন্ন হয় সে পরিমাণ) খেতে পারে। অতঃপর যখন (অর্থাৎ বালেগ ও বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়ার পর) তাদের সম্পদ তাদের কাছে দেওয়ার সময় সাক্ষী রাখবে। (কেননা, এরপর কোন কথা উঠলে যেন সাক্ষী কাজে আসে) এবং (এমনিতেই তো) আল্লাহ্ তা'আলাই হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। (যদি আত্মসাৎ না হয়ে থাকে, তবে সাক্ষী না রাখলেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা, প্রকৃত হিসাব যার সামনে দিতে হবে, তিনি তো তার হিসাব ভালভাবেই জানেন। আর যদি কিছু আত্মসাৎ করে থাকে তবে সাক্ষী রাখায় কোন ফায়দা নেই। কেননা, যাঁর কাছে হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে, তিনি তো খেয়ানত সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। শুধু বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে সাক্ষী কাজে আসবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পদের হিফাযত জরুরী : এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ হয়েছে এবং তৎসঙ্গে সম্পদের হিফাযতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ত্রুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়।

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়া নিষিদ্ধ : মুফাসসিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, কোরআন-পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রী লোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেওয়ার আবদার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকাও যেন দেখা না দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোন স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ তুলে না দেওয়ার নির্দেশ প্রমাণিত হয়—যাদের হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের

কোন পার্থক্য নেই। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-ও এ আয়াতের এরূপ তফসীরই বর্ণনা করেছেন। ইমামে-তফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এ আয়াতের নির্দেশ ইয়াতীমদের বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'তোমাদের সম্পদ' বলে যে ইশারা করা হয়েছে, তাতেও ইয়াতীম এবং সাধারণ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবার বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

মোটকথা, মালের হিফাযত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ।

নিজের সম্পদের হিফাযত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। যেমন, জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। হুযূর (সা) ইরশাদ করেন ঃ من قتل دون ماله فهو شهيد নিজের মালের হিফাযত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ। অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে সে শহীদের মর্যাদা পাবে।—(বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. (مشكوة)

অর্থাৎ—একজন নেক লোকের সৎপথে অর্জিত সম্পদ কতই না উত্তম!

অন্য আর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لاباس بالغنى لمن اتقى الله عز و جل. (مشكوة)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, তার সম্পদশালী হওয়াতে দীনের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই।

শেষের দুটি হাদীসে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, নেককার, মুত্তাকী লোকদের কাছে ধন-সম্পদ থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এ সব লোক তাদের ধন-সম্পদ গোনাহ্র পথে ব্যয় করবে না।

বহু ওলী, সূফী-জাহিদ যে নিজের অধিকারে ধন-সম্পদ রাখার অপকারিতা বর্ণনা করেছেন তার অর্থও এই যে, মানুষ সাধারণত পাপ পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে নিজের অর্জিত সম্পদ দ্বারাই আখিরাতের আযাব ক্রয় করে থাকে। তা ছাড়া প্রকৃতিগতভাবেই যেহেতু মানুষ সম্পদশালী হওয়ার পর অপচয় এবং সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা ছেড়ে দেয়, এ জন্য সাধারণভাবে ধন-সম্পদ থেকে দূরে সরে থাকাই উত্তম মনে করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের সাধারণ নিয়ম ছিল যে, তাঁরা প্রয়োজন মত রোজগার করতেন এবং আল্লাহ্র যিকর করে সময় কাটিয়ে দিতেন। এ তরীকায় তাঁরা সম্পদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব থেকে আত্মরক্ষা করতেন। কিন্তু আধুনিক কালে যেহেতু মানুষের মধ্যে দীন-ঈমানের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গেছে, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি আকর্ষণ এত প্রবল হয়ে গেছে যে, দীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা তো দূরের কথা, বাহ্যিক কোন ফ্যাশনের খেলাফ হলেও দীন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় ; সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য হালাল সম্পদ রোজগার এবং তা

যত্নের সাথে সংরক্ষণ করার গুরুত্ব প্রচুর। এ শ্রেণীর লোকদের প্রেক্ষিতেই হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

كاد الفقران يكون كفرا ‧ (مشكوة) — অর্থাৎ দারিদ্র মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে কুফরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ

كان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فهو ترس المؤمن.

অর্থাৎ—অতীতকালে ধন-সম্পদ অপছন্দনীয় ছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে তা মু'মিনের জন্য ঢালস্বরূপ। তিনি আরো বলেন ঃ

من كان فى يده من هذه شيئا فليصلحه فانه زمان ان احتاج كان اول من يبذل دينه.

"যার কাছে কিছু অর্থ-কড়ি রয়েছে, তার উচিত তা ঠিকমত কাজে লাগানো। কেননা, এটা এমন এক যমানা যখন কারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ করার জন্য সর্বপ্রথম দীনই খরচ করে আসবে।" অর্থাৎ প্রয়োজন মেটানোর তাকীদ দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চাইতে তীব্র হয়ে গেছে।—(মিশকাত, পৃ. ৪৯১)

নাবালেগদের যাচাই করা ঃ প্রথম আয়াত দ্বারা যখন বোঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে ধন-সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ.

অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোট কথা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় ; (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়; (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ।

ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ-কারবার এবং লেনদেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে ...... وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى বাক্যের অর্থ এটাই। এ থেকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যদি তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে ঃ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয় সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

বালেগ হওয়ার বয়স ঃ আয়াতে শিশুর বালেগ হওয়ার সময়সীমা বলতে গিয়ে কোরআনে-পাক বয়সের কোন সীমা উল্লেখ না করে বলেছে ঃ فَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ — অর্থাৎ তারা যখন বিয়ের বয়সে পৌঁছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বালেগ হওয়া বয়সের সীমার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং বালেগ হওয়ার যেসব লক্ষণ রয়েছে, সেগুলোই এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য। সুতরাং শিশু যখন বিয়ে করার যোগ্যতা লাভ করবে, তখনই তাকে বালেগ বলে গণ্য করা হবে। এ যোগ্যতা কোন কোন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তের-চৌদ্দ বছর বয়সেও প্রকাশ পেতে পারে। তবে যদি কোন বালক-বালিকার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার লক্ষণ আদৌ প্রকাশ না পায়, তবে সেক্ষেত্রে বয়স গণনা করেই তাকে বালেগ বলে ধরতে হবে। কোন কোন ফিক্‌হবিদের মতে এ বয়স বালকদের ক্ষেত্রে আঠারো এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে সতেরো। কারো কারো মতে বালক-বালিকা উভয়ের ক্ষেত্রে পনের বছর বয়স বালেগ হওয়ার সময়সীমা। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে পনের বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক এবং বালিকা উভয়কেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বলে গণ্য করতে হবে।

বুদ্ধি-বিবেচনার সংজ্ঞা ঃ আয়াতে উল্লিখিত آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا বাক্য দ্বারা কোরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনার' সময়সীমা কি? কোরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য কোন কোন ফিক্‌হবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়-সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সিদ্ধান্ত এই যে, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকার অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং তার বিষয়-সম্পত্তি তখন তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কেননা, অনেকের মধ্যে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্তও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি। তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। আর যদি সে লোক বদ্ধ পাগল কিংবা একেবারেই নির্বোধ হয়, তবে তার হুকুম স্বতন্ত্র। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে নাবালেগ শিশুদের হুকুমই কার্যকর হবে। পাগলামির এ

অবস্থায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবককে সারা জীবনই তার সহায়-সম্পত্তির দেখাশোনা করতে হবে।

ইয়াতীমের মালের অপচয় ঃ উপরের আলোচনায় বোঝা গেল যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কিত যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ না ঘটা পর্যন্ত তাদের মাল তাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু বেশি সময় অপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় ক্ষেত্রবিশেষে ওলী বা অভিভাবকের তরফ থেকে এমন কোন পদক্ষেপও হওয়া বিচিত্র নয়, যাতে ইয়াতীমের সম্পদের ক্ষতি হতে পারে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ....

অর্থাৎ—ইয়াতীমের ধন-সম্পদ প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে খরচ করো না কিংবা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।

এ আয়াতে ইয়াতীমের অভিভাবককে দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। (এক) ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করতে এবং (দুই) অদূর ভবিষ্যতে যার মাল তাকে ফেরত দিতে হবে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাড়াতাড়ি সে সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়িয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে ঃ শেষ আয়াতে ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কিত নির্দেশ বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে সংস্থান করতে পারে, তার উচিত ইয়াতীমের মাল থেকে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা, ওলী হিসেবে ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করার দায়িত্ব তার উপর ফরয কর্তব্য। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ ওলীদের মধ্যে যে ব্যক্তি গরীব এবং যার রোজগারের অন্য কোন পথ নেই, সে নিতান্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে।

সাক্ষী রাখার নির্দেশ ঃ সর্বশেষে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا.

অর্থাৎ—পরীক্ষা করে দেখার পর ইয়াতীমের মাল যখন তাদের হাতে প্রত্যর্পণ কর, তখন কয়েকজন বিশ্বাসযোগ্য লোককে সাক্ষী করে রেখো, যাতে ভবিষ্যতে কোন ঝগড়া-ঝাটির সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ না থাকে। তবে স্মরণ রেখো, সবকিছুর হিসাবই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রয়েছে।

ধর্মীয় ও জাতীয় খিদমতের পারিশ্রমিক ঃ আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশনার দ্বারা প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা জানা গেল। তা হচ্ছে যাঁরা কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির

দেখা-শোনায় নিযুক্ত হন, মসজিদ বা মাদরাসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিংবা কোন ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানের যে কোন দায়িত্বে নিয়োজিত হন বা এমন কোন জাতীয় কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন যে কর্তব্য সম্পাদন ফরযেকিফায়া—তাঁদের পক্ষেও যদি নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করার মত সংস্থান থাকে, তবে এ ধরনের খিদমতের বদলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বায়তুল-মাল থেকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ না করা উত্তম। অপরদিকে যদি পরিবারের ভরণ-পোষণ করার মত সহায়-সম্পদ না থাকে এবং রুজি-রোজগারের সময়টুকু উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত হয়ে যায়, তাহলে এমতাবস্থায় পরিবারের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মেটানোর মত কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণে দোষ নেই। তবে 'প্রয়োজনীয় পরিমাণ' কথাটার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেকে কাগজ-কলমে অবশ্য দীনী প্রতিষ্ঠানের খিদমতের বিনিময় নামেমাত্র কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে নিজের এবং সন্তানাদির জন্য অনেক বেশি খরচ করে ফেলেন। এ ধরনের অসাবধানতার প্রতিকার একমাত্র আল্লাহ্র ভয় দ্বারাই হতে পারে। এদিকে ইশারা করেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا অর্থাৎ যারা এ ধরনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, তাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একদিন হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে—এ অনুভূতিটুকু তাদের মধ্যে অবশ্যই জাগিয়ে রাখতে হবে। এ অনুভূতিই কেবল অসাবধানতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿٧﴾ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْ
لُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى
ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿١٠﴾

(৭) পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে ; অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত। (৮) সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। (৯) তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশংকা করে ; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। (১০) যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

যোগসূত্র ঃ সূরা আন্-নিসার প্রথমেই সাধারণ মানবিক অধিকার বিশেষত পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াতীমদের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়েও নারী ও ইয়াতীমদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিশেষ অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে জাহিলিয়াত যুগের একটি কুপ্রথা বাতিল করা হয়েছে। তখন নারীদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্যই স্বীকার করা হতো না। এ আয়াতে তাদেরকে শরীয়তসম্মত অংশের অধিকারিণী সাব্যস্ত করে তাদের অংশ কম করতে এবং তাদের ক্ষতি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর যেহেতু উত্তরাধিকার সত্ত্বেও হকদারদের প্রসঙ্গ এসেছিল এবং এরূপ ক্ষেত্রে বন্টনের সময় হকদার নয়—এমন ফকির ও ইয়াতীম বালক-বালিকাও উপস্থিত হয়ে যায়, তাই দ্বিতীয় আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও খাতির-যত্ন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ আদেশ ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব।

এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও ইয়াতীমদের বিধি-বিধান প্রসঙ্গে এ বিষয়বস্তুর প্রতিই জোর দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পুরুষদের জন্যও (ছোট হোক কিংবা বড়) অংশ তা থেকে (নির্ধারিত) আছে, যা (পুরুষদের) পিতা-মাতা ও (অথবা অন্যান্য) নিকটাত্মীয়রা (মৃত্যুর সময়) পরিত্যাগ করে যায় এবং (এমনিভাবে) নারীদের জন্যও তা থেকে (ছোট হোক কিংবা বড়) অংশ (নির্ধারিত) আছে যা স্ত্রীলোকদের পিতা-মাতা ও (অথবা অন্যান্য) নিকট-আত্মীয়রা (মৃত্যুর সময়) পরিত্যাগ করে যায়, তা (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) কম হোক অথবা বেশি (সবগুলো থেকেই পাবে)। অংশ(-ও এমন, যা) অকাট্যরূপে নির্ধারিত আছে। এবং (যখন ওয়ারিসদের মধ্যে ত্যাজ্য সম্পত্তি) বন্টনের সময় (এসব লোক) উপস্থিত থাকে (অর্থাৎ দূরবর্তী) আত্মীয়, (যাদের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন অংশ নেই) ইয়াতীম ও দরিদ্র লোক (যারা এরূপ আশা করে যে, সম্ভবত আমরাও কিছু পেতে পারি। আত্মীয়রা সম্ভবত পাওনাদার হওয়ার ধারণা নিয়ে আসবে এবং অন্যরা দান-খয়রাত পাওয়ার আশায় আসবে) তবে তাদেরকেও এ (ত্যাজ্য সম্পত্তি) থেকে (যতটুকু সম্ভব) কিছু দিয়ে দাও

এবং তাদের সাথে ভদ্র (ও নম্র) কথা বল। (আত্মীয়দের সাথে নম্র কথা এই যে, তাদেরকে বুঝিয়ে দাও যে, শরীয়তের আইনে এতে তোমাদের অংশ নেই। কাজেই আমরা অপারক। এবং অন্যদের সাথে এই যে, কিছু দান-খয়রাত করে অনুগ্রহ প্রকাশ করো না) এবং (ইয়াতীমদের ব্যাপারে) তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে ছোট ছোট সন্তান রেখে (মারা) গেলে তাদের (সন্তানদের) জন্য শঙ্কিত হয় (যে, এদেরকে বুঝি কেউ কোন কষ্ট দেয়। অতএব, অন্যের সন্তানদের প্রতিও এমনি লক্ষ্য রাখা উচিত এবং তাদেরকে কোন কষ্ট না দেওয়া উচিত)। অতএব, (একথা চিন্তা করে) তাদের উচিত, (ইয়াতীমদের সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা (এর নির্দেশ অমান্য করা)-কে ভয় করা (অর্থাৎ কার্যত কষ্ট না দেওয়া ও ক্ষতি না করা) এবং (কথা-বার্তায়ও তাদের সাথে) যথোপযুক্ত কথা বলা। (এতে সান্ত্বনা ও মনোরঞ্জনের কথাবার্তাও এসে গেছে এবং শিক্ষা ও শিষ্টাচারের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মোট কথা, তাদের জান ও মাল উভয়ের সংস্কার সাধন করা)। নিশ্চয়, যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ ন্যায্য অধিকার ছাড়া খায় (ভোগ করে,) তারা নিজেদের পেটে আর কিছু নয়--অগ্নি (এর স্ফুলিঙ্গ) ভর্তি করছে। (অর্থাৎ এ খাওয়ার পরিমাণ তাই হবে) এবং এ পরিমাণ বাস্তবায়িত হতে বেশি দেরি নেই। কারণ, অতিসত্বর (তারা দোযখের) জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে (যেখানে এই পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব ঃ ইসলাম-পূর্ব কালের আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমত তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেওয়ার সাধ্য কারও ছিল না।

ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর এসব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহণ করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। --(রূহুল মা'আনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১০)।

বলা বাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধু যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিস হতে পারতো। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিস বলে গণ্য হতো না, প্রাপ্ত বয়স্কা হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলের একটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। আউস ইবনে সাবেত (রা) স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক নাবালেগ পুত্র রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি অনুযায়ী

তাঁর দুই চাচাতো ভাই এসে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সন্তান ও স্ত্রীকে কিছুই দিল না। কেননা, তাদের মতে প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, নারী সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারের যোগ্য গণ্য হতো না। ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রকেও বাদ দেওয়া হলো এবং দুই চাচাতো ভাই সমগ্র বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে গেলো।

আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী এ প্রস্তাবও দিল যে, যে চাচাত ভাই তাদের বিষয়-সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, তারা তার কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করে নিক, যাতে সে তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু তারা এ প্রস্তাবেও স্বীকৃত হলো না। তখন আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলো এবং সন্তানদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার অভিযোগ করলো। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দিতে বিলম্ব করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ওহীর মাধ্যমে এই নিপীড়নমূলক আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করা হবে। সেমতে তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا ـ

এরপর উত্তরাধিকারের অন্যান্য আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে অংশসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় রুকূতে এসব বিবরণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআনী বিধান অনুযায়ী মোট ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীকে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে এভাবে বন্টন করলেন যে, অর্ধেক পুত্রকে এবং কন্যাদ্বয়কে সমান হারে দিলেন। চাচাতো ভাই সন্তানদের তুলনায় নিকটবর্তী ছিল না। তাই তাদের বঞ্চিত করা হলো।—(রূহুল-মা'আনী)

উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি ঃ আলোচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের কতিপয় বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে।

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ এ শব্দদ্বয় উত্তরাধিকারের দুটি মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। এক. জন্মের সম্পর্ক, যা পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং যা وَالِدَانِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. সাধারণ আত্মীয়তা, যা اَقْرَبُوْنَ শব্দের মর্ম। বিশুদ্ধ মত অনুসারে اقربون শব্দটি সর্ব প্রকার আত্মীয়তায় পরিব্যাপ্ত ; পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক হোক, যেমন পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে কিংবা অন্য প্রকার সম্পর্ক হোক, যেমন সাধারণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক হোক—সবগুলোই اقربون শব্দের আওতাভুক্ত। কিন্তু পিতা-মাতার গুরুত্ব অধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি আরও ব্যক্ত করেছে যে, কোন আত্মীয়তার যে কোন সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা, নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি করা না হয়,

তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের মানুষের মধ্যে বন্টন করা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা, সব মানুষই এক পিতা-মাতা—আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিক দিয়ে কিছু-না-কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমত সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, যদি কোনরূপে চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেওয়া যায়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করতে করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, যা কারও কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া জরুরী ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করতে হবে। অবশ্য যদি কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে, একই সময়ে সবাই নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন, তবে সবাই ওয়ারিস হবে। যেমন, সন্তানদের সাথে পিতা-মাতা কিংবা স্ত্রী থাকা—এরা সবাই নিকটতম ওয়ারিস, যদিও এ নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন।

اقربون। শব্দটি আরও একটি বিষয় ব্যক্ত করেছে যে, পুরুষদেরকে যেমন উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা, সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতা-মাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন সম্পর্ক হোক, প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে যেমন পিতা-মাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতা-মাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোন কারণই থাকতে পারে না।

এরপর কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গিও লক্ষণীয়। للرجال والنساء কে একত্রে উল্লেখ করে সংক্ষেপে তাদের হক বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু কোরআন তা করেনি, বরং পুরুষদের হক যেরূপ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে, তেমনি বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সহকারে নারীদের হকও পৃথকভাবে উল্লেখ করেছে, যাতে উভয়ের হক যে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ, তা ফুটে ওঠে।

اقربون। শব্দ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির বন্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়, বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, তাকে বেশি হকদার মনে করা জরুরী নয়। বরং সম্পর্কে যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশি হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠির পরিবর্তে কোন কোন আত্মীয়ের অভাবগ্রস্ত ও উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেওয়া হয়, তবে তা কোন বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ, দারিদ্র্য ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবিদার অনেক বের হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে।

ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন ঃ আজকাল ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটিকে অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ কোরআনে উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও اقربون -এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিস হতে পারে না। কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

ঐ প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য ভক্ত নব শিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এ কথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না, তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হোক।

মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন সব বস্তুতে ওয়ারিসদের হক আছে ঃ আয়াতে مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ বলে অপর একটি মূর্খতাসুলভ প্রথার সংস্কার করা হয়েছে। তা এই যে, কোন কোন সম্প্রদায়ে কোন কোন মালকে কিছু সংখ্যক বিশেষ ওয়ারিসদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হতো। উদাহরণত ঘোড়া, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রে শুধু যুবক পুরুষদের হক ছিল। অন্য ওয়ারিসদেরকে এগুলো থেকে বঞ্চিত করা হতো। কোরআন পাকের এ নির্দেশ ব্যক্ত করছে যে, মৃত ব্যক্তির মালিকানায় যা কিছু থাকে—ছোট হোক বড় হোক—সবকিছুতেই প্রত্যেক ওয়ারিসের হক আছে। কোন বিশেষ বস্তু বন্টন ছাড়াই নিজে রেখে দেওয়া কোন ওয়ারিসের জন্য বৈধ নয়।

উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মীমাংসিত ঃ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا এতে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ওয়ারিসের জন্য যে বিভিন্ন অংশ কোরআন নির্দিষ্ট করেছে, এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। এতে কারও নিজস্ব অভিমত ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অধিকার নেই।

উত্তরাধিকারিত্ব একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা ঃ مَفْرُوْضًا শব্দ থেকে আরও একটি মাসআলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ওয়ারিসরা যে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিসের কবূল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরী ও শর্ত নয়, বরং সে যদি মুখে স্পষ্টত বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনত সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি অথবা বিলি-বন্টন করে দিতে পারবে।

বঞ্চিত আত্মীয়দের মনস্তুষ্টি বিধান করা জরুরী ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা শরীয়তের বিধি অনুযায়ী তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। বলা বাহুল্য, ফরায়েযের বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক আত্মীয়ই অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে। তাই যেসব আত্মীয় নিয়মানুযায়ী বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তারা বিষণ্ন ও দুঃখিত হতে পারে, যদি তারা বন্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং বিশেষত যখন তাদের মধ্যে কিছু ইয়াতীম, মিসকীন ও

অভাবগ্রস্তও থাকে। এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য আত্মীয় নিজ নিজ অংশ নিয়ে যায় আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে, তখন তাদের বেদনা, নৈরাশ্য ও মনোকষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রই অনুমান করতে পারে।

এখন কোরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্যও লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কোরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয়ের মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

অর্থাৎ যেসব দূরবর্তী ইয়াতীম, মিসকীন ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া। এটা তাদের জন্য এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ। যে সময় ওয়ারিসরা কোনরূপ চেষ্টা-চরিত্র ও কর্ম ব্যতিরেকেই শুধু আল্লাহ্র দীনের বিধানে ধন-সম্পদ পাচ্ছে, সে সময় আল্লাহ্র পথে সদকা-খয়রাতের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মনে থাকা উচিত। এর একটি নযীর অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ—অর্থাৎ নিজেদের বাগানের ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং যেদিন ফল কর্তন কর, সেদিন এর হক বের করে ফকির-মিসকীনদেরকে দিয়ে দাও। এ আয়াত সূরা আন'আমে আসবে।

মোট কথা এই যে, ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের সময় আইনত অংশীদার নয়—এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন যদি সেখানে উপস্থিত হয়ে যায়, তবে তাদের উপস্থিত হওয়ার কারণে তোমরা মন ছোট করো না, বরং যে অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বিনা পরিশ্রমে দান করেছেন, তা থেকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কিছু দান কর এবং খরচ করার যে চমৎকার সুযোগ পেয়েছ, একে সৌভাগ্য মনে কর। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু-না-কিছু দান করার ফলে এসব দূরবর্তী আত্মীয়দের মনোবেদনা ও দুঃখ লাঘব হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির বঞ্চিত পৌত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তার চাচা ও ফুফুদের উচিত, নিজ নিজ অংশ থেকে সানন্দে তাদের কিছু দান করা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا—যদি তারা এভাবে অল্প দেওয়াতে সন্তুষ্ট না হয় বরং অন্যান্যের সমান অংশ দাবি করতে থাকে, তবে তাদের এ দাবি আইন বিরুদ্ধ এবং অন্যায়ভিত্তিক হওয়ার কারণে তা মেনে নেওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু এরপরও তাদেরকে এমন কোন কথা বলা অনুচিত, যা মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, বরং যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তোমাদের কোন অংশ নেই। আমরা যা দিয়েছি তা নিছক সৎকাজ হিসাবে দিয়েছি। এখানে আরও একটি বিষয় জেনে নেওয়া জরুরী যে, তাদেরকে খয়রাত হিসাবে যা দেওয়া হবে, তা সমষ্টিগত মাল থেকে

নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবে, তারা নিজেদের অংশ থেকে দেবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ থেকে দেওয়া জায়েয নয়।

বন্টনের সময় আল্লাহ্‌কে ভয় করবে : তৃতীয় আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার সন্তানরা যাতে পুরোপুরি পায় এবং এমন কোন পন্থা অনুসরণ করা না হয়, যার ফলে সন্তানদের অংশে অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সে বিষয়ে পুরোপুরি যত্নবান হতে হবে। এর ব্যাপকতার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত যে, আপনি কোন মুসলমানকে যদি এমন ওসিয়ত কিংবা ক্ষমতা প্রদান করতে দেখেন, যার ফলে তার সন্তান ও অন্যান্য ওয়ারিস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে আপনার অবশ্য কর্তব্য হবে তাকে বাধা দান করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে সম্পূর্ণ মাল কিংবা অর্ধেক মাল সদকা করতে বাধা দান করেছিলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ মাল সদকা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। —(মিশকাত, পৃ. ২৬৫) কেননা, সম্পূর্ণ মাল কিংবা অর্ধেক মাল সদকা করা হলে ওয়ারিসদের অংশ বিলুপ্ত হতো অথবা হ্রাস পেতো।

এ বিষয়টিও আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত যে, ইয়াতীমদের অভিভাবকরা তাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করার যোগ্য বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পুরোপুরি তাদেরকে অর্পণ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। এতে কোনরূপ শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অভিভাবকরা অপরের ইয়াতীম সন্তানদের অবস্থা নিজেদের সন্তান ও নিজেদের স্নেহ-মমতার সাথে তুলনা করে দেখবে। যদি তারা চায় যে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের সাথে মানুষ সদ্ব্যবহার করুক, সন্তানরা উদ্বিগ্ন না হোক এবং কেউ তাদের প্রতি জুলুম না করুক, তবে তাদেরকেও অপরের ইয়াতীম সন্তানদের সাথে সর্বপ্রকার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

ইয়াতীমের মাল গ্রাস করার পরিণাম : চতুর্থ আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পত্তিতে অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের জন্য ভীষণ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি অবৈধভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, সে পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে।

এ আয়াতে ইয়াতীমের মালকে জাহান্নামের আগুন বলা হয়েছে। অনেক তফসীরবিদ একে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া এমন, যেমন কেউ পেটে আগুন ভর্তি করে। কেননা, তার পরিণাম কিয়ামতে এরূপই হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের উক্তি এই যে, আয়াতে কোনরূপ অপ্রকৃত ও রূপক অর্থ নেই; বরং ইয়াতীমের যে মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া হয়, তা আগুন ছাড়া কিছুই নয়, যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে তার রূপ আগুনের মত মনে হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তি দিয়াশলাইকে আগুন বলে অথবা সংখিয়া কালকূট-কে প্রাণ সংহারক বলে। বলা বাহুল্য, দিয়াশলাই হাতে নিলে হাত পুড়ে যায় না বা সংখিয়া স্পর্শ করলে এমন কি মুখে রাখলেও কেউ মরে যায় না। তবে সামান্য ঘষা খাওয়ার পর বোঝা যায়, যে ব্যক্তি দিয়াশলাইকে আগুন বলেছিল, সে ঠিকই বলেছিল। এমনিভাবে কণ্ঠনালীর নিচে চলে যাওয়ার পর জানা যায় যে, কালকূট বা সংখিয়াকে প্রাণ সংহারক বলা ঠিকই ছিল। কোরআন পাকের সাধারণ প্রয়োগ-বিধিও এর সমর্থন করে। মানুষ সৎ-অসৎ যেসব কর্ম করছে, এগুলোই জান্নাতের বৃক্ষ, ফল-ফুল অথবা জাহান্নামের অঙ্গার, যদিও এগুলোর আকার এখানে অন্যরূপ।

কিন্তু কিয়ামতের দিন সব কিছুই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কোরআন বলে ঃ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا —অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা যেসব আযাব ও সওয়াব প্রত্যক্ষ করবে প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হবে তাদেরই কৃতকর্ম।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার পেটের ভেতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা মুখ, নাক ও চক্ষু দিয়ে উপচে পড়তে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক সম্প্রদায় এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তাদের মুখ আগুনে জ্বলত থাকবে। সাহাবায়ে-কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কোরআনে পাঠ করনি اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا (ইবনে-কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬)

আয়াতের সারমর্ম এই যে, অন্যায়ভাবে ভক্ষিত ইয়াতীমের মাল প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের আগুন হবে যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে আগুন হওয়া অনুভূত নয়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে ঃ

احرج مال الضعيفين المراة واليتيم —আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে দু'ধরনের অসহায়ের মাল থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করছি ; একজন নারী ও অপরজন ইয়াতীম।—(ইবনে-কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬)

সূরা নিসার প্রথম রুকূর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়াতীমদেরই বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, তাদের মালকে নিজের মাল করে না নেওয়া এবং ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ থেকে তাদেরকে অংশ দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। তারা বড় হয়ে যাবে—এ আশংকায় তাদের ধন-সম্পদ দ্রুত উড়িয়ে দেওয়া, ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করে মোহরানা কম দেওয়া অথবা তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাওয়া পেটে আগুনের অঙ্গার ভর্তি করার নামান্তর। কেননা, এর দায়ে মৃত্যুর পর এ ধরনের লোকদের পেটে আগুন ভরে দেওয়া হবে। يَاْكُلُوْنَ শব্দ ব্যবহার করে ইয়াতীমের মাল খাওয়ার শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে। কিন্তু ইয়াতীমের মালের সর্ব প্রকার ব্যবহার পানাহারের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যভাবে ভোগ করার মাধ্যমে হোক—সবই হারাম এবং আল্লাহ্‌র গজব ও শাস্তির কারণ। কেননা, বাকপদ্ধতিতে কারও অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলার অর্থ সর্বপ্রকার ব্যবহারকেই বোঝায়।

কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার সম্পদের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তুর সাথে প্রত্যেক ওয়ারিসের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা যদি ইয়াতীম হয়, তবে এসব সন্তানের সাথে সাধারণত প্রতি পরিবারেই জুলুম ও অন্যায় ব্যবহার করা হয়। এসব সন্তানের পিতার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ স্বীয় অধিকারভুক্ত করে নেয়, তাদের চাচা

হোক কিংবা বড় ভাই হোক কিংবা মাতা হোক কিংবা অন্য কোন অভিভাবক অথবা অছি হোক, সে প্রায়ই আলোচ্য রুকূতে নিষিদ্ধ অপরাধসমূহ করে থাকে। প্রথমত বছরের পর বছর চলে যায় ; মাল বণ্টনই করে না। ইয়াতীমদের অন্ন, বস্ত্র বাবদ কিছু কিছু ব্যয় করতে থাকে মাত্র। এরপর বিদ'আত, কুপ্রথা ও বাজে খাতে এই যৌথ মাল থেকে ব্যয় করতে থাকে। নিজের জন্যও খরচ করে এবং সরকারী রেকর্ড-পত্রে নাম পরিবর্তন করে নিজ সন্তানদের নামও লিখিয়ে নেয়। এ ধরনের অপকর্ম থেকে কোন একটি পরিবারও মুক্ত আছে কি না সন্দেহ।

মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানাসমূহে ইয়াতীমদের জন্য যে চাঁদা আদায় হয়, তা ইয়াতীমদের জন্য ব্যয় না করাও ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করার অন্যতম পন্থা।

মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পরিধানের পোশাকও ত্যাজ্য সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হিসাবে শামিল না করে এমনিতেই সদকা করে দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় তামা-পিতলের বাসন-পত্র ও মালামাল বণ্টন করা ব্যতিরেকেই ফকির-মিস্কীনকে দান করে দেয়। অথচ এগুলোতে নাবালেগ ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদেরও হক থাকে। প্রথমে মালামাল বণ্টন করে মৃতের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের মধ্যে আইনত যার যার অংশ আছে, তাদেরকে দিয়ে দেবে। এরপর নিজের খুশিতে যে যা চাইবে, মৃতের পক্ষ থেকে খয়রাত করবে কিংবা সম্মিলিতভাবে করলে শুধু বালেগরা করবে। নাবালেগের অনুমতিও ধর্তব্য নয়। যে ওয়ারিস অনুপস্থিত, তার অংশ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত ব্যয় করা বৈধ নয়।

মৃতকে কবরস্তানে নিয়ে যাওয়ার সময় লাশের উপর যে চাদর রাখা হয়, তা কাফনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা মৃতের মাল থেকে ক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, তা হলো যৌথ মাল। কেউ নিজের পক্ষ থেকে ক্রয় করে দিলে জায়েয হবে। কোন কোন এলাকায় জানাযার নামাযের ইমামের জন্য কাফনের কাপড় দিয়েই জায়নামায তৈরি করা হয়। এরপর তা ইমামকে দান করা হয়। এ খরচও কাফনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কাজেই ওয়ারিসদের যৌথ মাল দ্বারা তা ক্রয় করা বৈধ নয়।

কোন কোন স্থানে মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য নতুন পাত্র ক্রয় করা হয়। অতঃপর তা ভেঙে ফেলা হয়। প্রথমত নতুন পাত্র ক্রয় করা অনাবশ্যক। কারণ, ঘরে যে পাত্র আছে, তা দ্বারাই গোসল দেওয়া যায়। অগত্যা ক্রয় করার প্রয়োজন হলে ভেঙে ফেলা জায়েয নয়। কেননা, এতে সম্পদের অপচয় হয়। এ ছাড়া এর সাথে ইয়াতীম ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদের হক জড়িত থাকতে পারে।

ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে তা থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন, দান-খয়রাত ইত্যাদি করা বৈধ নয়। এ ধরনের দান-খয়রাত দ্বারা মৃত ব্যক্তি কোন সওয়াব পায় না, বরং সওয়াব মনে করে দেওয়া আরও কঠোর গোনাহ্। কারণ, কারও মৃত্যুর পর সমস্ত মাল ওয়ারিসদের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। ওয়ারিসদের মধ্যে ইয়াতীমও থাকতে পারে। এরূপ যৌথ মাল থেকে দেওয়া কারও মাল চুরি করে মৃতের জন্য সদকা করার অনুরূপ। কাজেই প্রথমে মাল বণ্টন করতে হবে। এরপর ওয়ারিস যদি নিজের মাল থেকে স্বেচ্ছায় মৃতের জন্য খয়রাত করে, তবে তা করতে পারে।

বণ্টনের পূর্বেও ওয়ারিসদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যৌথ ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে দান-খয়রাত করবে না। কারণ, তাদের মধ্যে যারা ইয়াতীম, তাদের অনুমতি ধর্তব্যই নয়। যারা বালেগ, তারাও সানন্দে অনুমতি দিয়েছে কি না তা নিশ্চিত নয়। হতে পারে তারা চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে বা লোকনিন্দার ভয়ে অনুমতি দিয়েছে। লোকে বলবে, নিজেদের মুর্দার জন্য দু'পয়সাও ব্যয় করলে না ; এ লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনিচ্ছায় হ্যাঁ বলে দিয়েছে ; অথচ শরীয়তে শুধু ঐ মালই হালাল, যা মনের খুশিতে দেওয়া হয়। এর পূর্ণ বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে জনৈক বুযুর্গের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এতে মাসআলাটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বুযুর্গ ব্যক্তি জনৈক অসুস্থ মুসলমানকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ রোগীর কাছে বসতেই রোগীর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেল। তখন গৃহে একটিমাত্র বাতি জ্বলছিল। বুযুর্গ ব্যক্তি কালবিলম্ব না করে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে তেল আনিয়ে বাতি জ্বালালেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ লোকটি জীবিত ছিল, ততক্ষণ সে বাতির মালিক ছিল এবং তার আলো ব্যবহার করা জায়েয ছিল। এখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। ফলে তার প্রত্যেকটি বস্তু ওয়ারিসদের মালিকানায় চলে গেছে। অতএব, সব ওয়ারিসের অনুমতিক্রমে আমরা বাতিটি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তারা সবাই এখানে উপস্থিত নয়। কাজেই নিজের পয়সা দিয়ে তেল আনিয়ে আমি আলোর ব্যবস্থা করেছি।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

(১১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক, তবে তাদের জন্য ঐ মালের তিন ভাগের দুই অংশ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য

সম্পত্তির ছয় ভাগের এক অংশ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক অংশ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক অংশ ওসিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অংশ—নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী রুকূতে لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ আয়াতে উত্তরাধিকারের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের কোন কোন প্রকারের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অবস্থাসাপেক্ষে তাদের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ সূরার শেষে বর্ণিত হবে এবং অবশিষ্ট অংশগুলো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। ফিকহ্‌বিদরা কোরআন ও হাদীস থেকে এর বিস্তারিত বিবরণ চয়ন করে 'ফারায়েয'-এর আকারে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে আরও কিছু মাসআলা উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দেন তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়া) সম্পর্কে। (তা এই যে,) পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান (অর্থাৎ পুত্র-কন্যা একজন একজন কিংবা কয়েকজন মিশ্রিত থাকলে, তাদের অংশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হবে এই যে,, প্রত্যেক পুত্র দ্বিগুণ এবং প্রত্যেক কন্যা এক গুণ পাবে।) এবং যদি (সন্তানদের মধ্যে) শুধু কন্যাই থাকে, যদিও দু'-এর অধিক হয়, তবে কন্যারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে ঐ সম্পত্তির, যা মৃত ব্যক্তি ছেড়ে যায়। (আর যদি দুই কন্যা হয়, তবে তো তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়া বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, যদি তাদের মধ্যে এক কন্যার স্থলে পুত্র থাকতো, তবে এক কন্যার অংশ তার ভাই-এর তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও এক-তৃতীয়াংশ থেকে হ্রাস পেত না। সুতরাং দ্বিতীয়টিও যখন কন্যা, তখন এক-তৃতীয়াংশ থেকে হ্রাস পাওয়া সম্ভব নয়। উভয় কন্যা একই অবস্থায় আছে। সুতরাং তারও এক-তৃতীয়াংশ হবে। এভাবে উভয়ে মোট দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। তাই বলা হয়েছে যে, যদিও কন্যারা 'দুই-এর অধিক হয় ; তবুও অংশ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক হবে না।) এবং যদি একই কন্যা থাকে, তবে সে (সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে (এবং প্রথম মাসআলার অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ এবং শেষোক্ত মাসআলার অবশিষ্ট অর্ধেক অন্যান্য বিশেষ বিশেষ আত্মীয় পাবে কিংবা যদি কেউ না থাকে, তবে পুনরায় তাকেই দেওয়া হবে। ফারায়েয গ্রন্থসমূহে এরূপই বর্ণিত আছে)। আর পিতা-মাতার (অংশ পাওয়া তিন প্রকার। এক প্রকার এই যে, তাদের) জন্য (অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্য) মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক (নির্ধারিত আছে) যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি থাকে (পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী, একজন হোক কিংবা বেশি। অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানরা এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ওয়ারিস পাবে। এর পরও অবশিষ্ট থাকলে পুরনায় সবাইকে দেওয়া হবে।) এবং যদি (মৃত

ব্যক্তির) সন্তানাদি না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই তার ওয়ারিস হয়, (এটা দ্বিতীয় প্রকার। 'শুধু' বলার কারণ এই যে, ভাই-বোনও নেই ; যেমন পরে বর্ণিত হবে)। তবে (এমতাবস্থায়) তার মাতার অংশ তিন-ভাগের এক (এবং অবশিষ্ট তিন-ভাগের দুই পিতার। বর্ণিত মাসআলায় এটা সুস্পষ্ট ছিল, তাই বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়নি)। এবং যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন (যে কোন প্রকারের) থাকে (মা-বাপ উভয়ের মধ্যে শরীক হোক, যাকে সহোদর বলে কিংবা শুধু বাপ এক ও মা ভিন্ন ভিন্ন হোক, যাকে বৈমাত্রেয় বলে। মোট কথা, যে কোন প্রকার ভাই-বোন যদি একাধিক থাকে আর তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং পিতা-মাতা থাকে, এটা তৃতীয় প্রকার)। তবে (এমতাবস্থায়) মা (ত্যাজ্য সম্পত্তির) ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। (আর অবশিষ্ট অংশ পাবে পিতা। এ সব অংশ) মৃত ব্যক্তির কৃত ওসিয়ত (-এর পরিমাণ মালও) বের করে নেওয়ার পর কিংবা ঋণের (যদি থাকে তাও বের করে নেওয়ার) পর (বন্টন হবে)। তোমাদের যেসব ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন রয়েছে, তোমরা (তাদের সম্পর্কে) পূর্ণরূপে জানতে পার না যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমাদেরকে (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক) উপকার পৌঁছানোর ব্যাপারে (আশার দিক দিয়ে) নিকটবর্তী। (অর্থাৎ এ ব্যাপারটি যদি তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে অবস্থাদৃষ্টে তোমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকতর উপকার পৌঁছানোর লক্ষ্যে অগ্রপশ্চাৎ ও কম-বেশি বন্টন করতে। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কোন পন্থা কারও জানা নেই। অতএব, একে ভিত্তি সাব্যস্ত করা নির্ভুল নয়। সুতরাং 'উপকার পৌঁছানো' ভিত্তি হওয়ার যোগ্য নয়। তাই অন্যান্য উপযোগিতা ও রহস্যকে—যদিও সেগুলো তোমাদের বোধগম্য নয় ও বিধানের ভিত্তি সাব্যস্ত করে। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। (এটা নিশ্চিতরূপে স্বীকৃত যে,) আল্লাহ্ তা'আলা সুবিজ্ঞ ও রহস্যবিদ। (সুতরাং তিনি নিজ জ্ঞান থেকে এ ব্যাপারে যেসব রহস্য বিবেচনা করছেন, সেগুলোই বিবেচ্য। তাই তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে দেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পদ বন্টনের পূর্বে করণীয় ঃ শরীয়তের নীতি এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরীয়তানুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশি হয়, তবে কেউ ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওসিয়ত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওসিয়ত করে থাকলে এবং তা গোনাহ্র ওসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওসিয়ত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত কার্যকর হবে না। এমনটি করা সমীচীন নয় এবং ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে ওসিয়ত করা পাপ কাজও বটে।

ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফরায়েয গ্রন্থসমূহে

দ্রষ্টব্য। ওসিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

সন্তানের অংশ ঃ পূর্ববর্তী রুকূতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিকটবর্তিতার ক্রমানুসারে ওয়ারিসী স্বত্ব বন্টন করতে হবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও পিতা-মাতা যেহেতু সর্বাধিক নিকটবর্তী, তাই তারা সর্বাবস্থায় ওয়ারিসী স্বত্ব পায়। এ দু'টি সম্পর্ক মানুষের অধিকতর নিকটবর্তী ও প্রত্যক্ষ। অন্যান্য সম্পর্ক পরোক্ষ। কোরআন পাকে প্রথমে তাদেরই অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং সন্তানের অংশ দ্বারা সে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ এটি এমন একটি সামগ্রিক বিধি যে, পুত্র ও কন্যা উভয়কে ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারীও করেছে এবং প্রত্যেকের অংশও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ থেকে এ নীতি জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির অংশীদারদের মধ্যে পুত্র ও কন্যা উভয় শ্রেণীর সন্তান থাকলে তাদের অংশের সম্পত্তি এভাবে বন্টন করা হবে যে, প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ পাবে। উদাহরণত কেউ এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেলে সম্পত্তিকে চার ভাগ করে চার ভাগের দুই ভাগ পুত্রকে এবং চার ভাগের এক ভাগ হারে প্রত্যেক কন্যাকে দেওয়া হবে।

কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার গুরুত্ব ঃ কোরআন পাক কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে এবং لِلْاُنْثَيَيْنِ مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرِ (দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ) বলার পরিবর্তে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ (এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি। এরূপ ক্ষমা শরীয়তের আইনে ক্ষমাই নয় ; ভাইদের যিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিসী স্বত্ব আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর গোনাহগার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালেগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেওয়া দ্বিগুণ গোনাহ্। প্রথম গোনাহ্ শরীয়তসম্মত ওয়ারিসের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গোনাহ্ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার।

এরপর আরও ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ অর্থাৎ যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশি হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

দুই-এর অধিক কন্যার বিধান কোরআনে فَوْقَ اثْنَتَيْنِ শব্দের মধ্যে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে দুই কন্যার বিধানও তাই, যা দুই-এর অধিকের বিধান। এর প্রমাণ হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امراة من الانصار فى الاسواف فجاءت المراة با بنتين لها- فقالت يا رسول الله ها تان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم احد وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله ولم يدع ما لا الا اخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى الله فى ذلك- وقال نزلت سورة النساء "يوصيكم الله فى اولادكم" الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لى المرأة وصاحبها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فلك-

—হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বাইরে বের হলাম। ইতিমধ্যে আসওয়াফ নামক স্থানে জনৈকা আনসার মহিলার কাছে গেলাম। মহিলা তার দুই কন্যাকে নিয়ে এলো এবং বলতে লাগলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! এ কন্যাদ্বয় (আমার স্বামী) সাবেত ইবনে কায়েসের। সে আপনার সঙ্গী হয়ে ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছে। এদের চাচা এদের পিতার যাবতীয় ত্যাজ্য সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ? আল্লাহ্র কসম ! যদি কন্যাদের কাছে অর্থ-সম্পদ না থাকে, তবে কেউ তাদেরকে বিয়ে করতেও সম্মত হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন। হযরত জাবের (রা) বলেন ঃ অতঃপর যখন সূরা নিসার আয়াত يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ঐ মহিলা ও তার দেবরকে (অর্থাৎ কন্যাদের চাচা, যে সমস্ত সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল) ডেকে আন। তিনি কন্যাদের চাচাকে বললেন ঃ কন্যাদ্বয়কে মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়ে দাও। তাদের মাতাকে দাও আট ভাগের একভাগ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তুমি নিজে নাও।—(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

এই হাদীসে বর্ণিত মাসআলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই কন্যাকেও তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়েছেন। দুই-এর অধিক কন্যার বিধান স্বয়ং কোরআনে তাই বর্ণিত হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি এক কন্যা থাকে এবং পুত্রসন্তান মোটেই না থাকে, তবে সে তার পিতা-মাতার ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে।

পিতা-মাতার অংশ ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেছেন এবং এর তিনটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম অবস্থা ঃ পিতা-মাতা উভয়ই জীবিত এবং সন্তানাদিও রয়েছে, তা এক পুত্র অথবা কন্যাই হোক না কেন। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ হারে পাবে।

অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ওয়ারিস সন্তান ও স্ত্রী অথবা স্বামী পাবে। কোন কোন অবস্থায় অবশিষ্ট কিছু অংশ পুনরায় পিতা পেয়ে থাকে যা তার জন্য নির্ধারিত ষষ্ঠাংশের অতিরিক্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ভাই-বোন কিছুই নেই, শুধু পিতা-মাতা আছে। এমতাবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা এবং অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবে। এ বিধান তখনই বলবৎ হবে, যখন মৃত ব্যক্তির ওয়াসিরদের মধ্যে স্বামী অথবা স্ত্রী জীবিত থাকবে না। স্বামী অথবা স্ত্রী বেঁচে থাকলে সর্বপ্রথম তাদের অংশ পৃথক করা হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা এবং তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবে।

তৃতীয় অবস্থা ঃ মৃত ব্যক্তির যদি সন্তানাদি না থাকে ; কিন্তু ভাই-বোন থাকে যাদের সংখ্যা দুই ভাই কিংবা দুই বোন অথবা দুই-এর বেশি। এমতাবস্থায় মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। যদি অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে, তবে অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পাবে পিতা। মৃত ব্যক্তির ভাই ও বোনের বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাস পাবে, কিন্তু তার ভাই-বোন কিছুই পাবে না। কেননা, পিতা ভাই-বোনের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী। কাজেই যা অবশিষ্ট থাকবে পিতাই পাবে। এমতাবস্থায় মাতার অংশ তিন ভাগের এক ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। যে ভাই-বোনের কারণে মাতার অংশ কমে যায়, তারা সহোদর হোক কিংবা বৈমাত্রেয় হোক অথবা বৈপিত্রেয় হোক, সর্বাবস্থায় তাদের বর্তমানে মায়ের অংশ হ্রাস পায়। তবে শর্ত হলো এই যে, অংশীদার একাধিক হতে হবে।

নির্ধারিত অংশসমূহ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার এসব অংশ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের মতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি রহস্যবিদ। যেসব অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোতে অনেক রহস্য রয়েছে। যদি তোমাদের অভিমতের উপর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারটি ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তোমরা উপকারী হওয়াকে বন্টনের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করতে। কিন্তু উপকারী কে হবে এবং সর্বাধিক উপকার কার দ্বারা হতে পারে, এর নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অধিক নিকটবর্তী হওয়াকে এ বিধানের ভিত্তি করা হয়েছে।

কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত বলে দিয়েছে যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির যেসব অংশ আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো তাঁর অকাট্য বিধান। এ ব্যাপারে কারও মন্তব্য করা অথবা কমবেশি করার অধিকার নেই। একে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের স্রষ্টা ও পরওয়ারদিগারের এ বিধান চমৎকার রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। তোমাদের উপকারের কোন দিক তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়। তিনি যা কিছু আদেশ করেন, তা কোন তাৎপর্য থেকে খালি নয়। তোমাদের মধ্যে নিজেদের উপকার ও অপকারের সত্যিকার জ্ঞান থাকতে পারে না। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারটি স্বয়ং তোমাদের মতামতের

উপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তোমরা স্বল্পজ্ঞানহেতু নিশ্চয়ই নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতে না। ফলে বন্টনের ব্যাপারে অসমতা দেখা দিতো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজটি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন, যাতে সম্পত্তি বন্টনে ন্যায় ও সুবিচার পুরোপুরিভাবে বহাল থাকে এবং মৃত ব্যক্তির সম্পদ ন্যায়ভিত্তিক পন্থায় বিভিন্ন অধিকারীর হাতে প্রবণ্টিত হয়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ

(১২) তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায় ; ওসিয়তের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওসিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যোগসূত্র ঃ এ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সাথে বংশগত ও জন্মগত সম্পর্কশীল ওয়ারিসদের অংশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে অন্যান্য কিছু সংখ্যক ওয়ারিসের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক বংশগত নয় বরং বৈবাহিক। এর বর্ণনা এরূপ ঃ

তোমরা ঐ সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যা তোমাদের স্ত্রীরা ছেড়ে যায় যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি স্ত্রীদের কোন সন্তান থাকে (তোমাদের ঔরসজাত হোক কিংবা অন্য স্বামীর) তবে (এমতাবস্থায়) তোমরা তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক-চতুর্থাংশ পাবে (কিন্তু সর্বাবস্থায় এ ওয়ারিসী স্বত্ব) ওসিয়ত (পরিমাণ মাল) বের করার পর, যা তারা ওসিয়ত করে, অথবা ঋণ যদি থাকে, (তবে তা) বের করার পর (পাবে)। স্ত্রীরা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে (একজন হোক কিংবা একাধিক। একাধিক হলে এক-চতুর্থাংশ সবার মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে) যদি তোমাদের (এক বা একাধিক পুত্র বা কন্যা) কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে (এমতাবস্থায়) তারা (একজন হোক কিংবা

কয়েকজন) তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ পাবে। (এটাও দুই প্রকার। উভয় প্রকারে অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে। কিন্তু এ ওয়ারিসী স্বত্ব) ওসিয়ত পরিমাণ মাল বের করার পর, যা তোমরা ওসিয়ত কর কিংবা ঋণের (যদি থাকে, তাও বের করার) পর (পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ ঃ উপরোক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এর গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী ভিন্ন পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় তার সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেওয়া থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা হতে পারে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যই বোধ হয় স্বামীর অংশ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে।

মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক—পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্য ওয়ারিসরা পাবে। এ হচ্ছে স্বামীর অংশের বিবরণ।

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের একভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশের অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

মাসআলা ঃ প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মোহরানা দেওয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিসই অংশ পাবে না।

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে ওসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যোগসূত্র ঃ বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীলদের সংক্ষিপ্ত হক বর্ণনা করার পর এখন এমন মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও স্ত্রী নেই।

যদি কোন মৃত, যার ত্যাজ্য সম্পত্তি অন্যেরা পাবে সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী, যদি তার উর্ধ্বতন (অর্থাৎ বাপ-দাদা) এবং অধঃস্তন (অর্থাৎ সন্তান ও পুত্রের সন্তান) এবং তার (অর্থাৎ মৃতের বৈপিত্রেয়) এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তারা এর চাইতে (অর্থাৎ একের চাইতে) অধিক (দুই কিংবা বেশি) হয় তবে তারা সবাই এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে (সমান) অংশীদার হবে (তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী সমান অংশ হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে এবং কেউ না থাকলে পুনরায় তাদেরকেই দেওয়া হবে। এ হলো দুই প্রকার। উভয় প্রকারে এ ওয়ারিসী স্বত্ব) ওসিয়ত (পরিমাণ মাল) বের করার পর যা ওসিয়ত করা হয় কিংবা (যদি) ঋণ (থাকে, তাও) পরিশোধ করার পর (পাবে।) শর্ত এই যে, (ওসিয়তকারী) কারও (অর্থাৎ কোন ওয়ারিসের) ক্ষতি না করে (বাহ্যতও না, ইচ্ছাকৃতও না। বাহ্যত যেমন এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত করা। এ ওসিয়ত ওয়ারিসী স্বত্বের উপর অগ্রগণ্য হবে না। ইচ্ছাকৃত এই যে, এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই ওসিয়ত করলো, কিন্তু ওয়ারিসদের অংশ কমানোর নিয়তে করলো। এ ওসিয়ত বাহ্যত কার্যকর হয়ে যাবে ; কিন্তু গোনাহ হবে) এ নির্দেশ (যতটুকু এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ, (তিনি জানেন কে মানে এবং কে মানে না, তাদেরকে যে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এর কারণ তিনি) সহনশীল (ও) বটে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'কালালার' ওয়ারিসী স্বত্ব ঃ আলোচ্য আয়াতে 'কালালার' পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। কালালার অনেক সংজ্ঞা আছে। আল্লামা কুরতুবী এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে—অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই 'কালালা'।

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন ঃ 'কালালা' শব্দটি আসলে ধাতু। এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে 'কালালা' বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল।

অতঃপর 'কালালা' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এক–ঐ মৃত ব্যক্তি, যে কোন সন্তান ও পিতা রেখে যায়নি। দুই–ঐ ওয়ারিস, সে মৃতের পুত্র বা পিতা নয়। অভিধানের দিক দিয়ে যে মূল ধাতু বলা হয়েছে, সে অনুযায়ী 'কালালা' শব্দের অর্থ 'যু-কালালা' অর্থাৎ 'দুর্বল সম্পর্কধারী' হওয়া দরকার। তিন –ঐ ত্যাজ্য সম্পত্তি, যা পুত্র ও পিতাবিহীন মৃত ব্যক্তি রেখে যায়।

মোট কথা এই যে, যদি কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায়, তার বাপ-দাদা ও সন্তানাদি না থাকে এবং সে এক বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বোন রেখে যায়, তবে তাদের মধ্যে ভাই হলে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে এবং ভাই না থাকলে বোন ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি অধিক হয়, উদাহরণত এক ভাই ও এক বোন হয় কিংবা দুই ভাই কিংবা দুই বোন হয়, তবে সবাই মৃতের মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রীর দ্বিগুণ পাবে না। আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ

وليس فى الفرائض موضع يكون فيه الذكر والانثى سواء الافى ميراث الاخوة الامّ.

অর্থাৎ একমাত্র বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ছাড়া ফরায়েযের আর কোথাও স্ত্রী-পুরুষের সমান অংশ হয় না।

ভাই-বোনের অংশ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও আয়াতে বৈপিত্রেয় শর্তটি উল্লিখিত নেই, কিন্তু ইজমার মাধ্যমে এটা সাব্যস্ত হয়েছে। হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওয়াক্কাসের কিরআতও এ আয়াতে এভাবে وله اخ اواخت من امّه। আল্লামা কুরতুবী, আবূ বকর জাসসাস প্রমুখ তফসীরবিদ তাই উদ্ধৃত করেছেন। কিরআতটি মুতাওয়াতির নয় ; কিন্তু ইজমা হওয়ার কারণে কার্যক্ষেত্রে গ্রহণীয়। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার শেষাংশেও কালালার ওয়ারিসী স্বত্ব বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, এক বোন হলে সে অর্ধেক পাবে এবং এক ভাই হলে বোনের সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। দুই বোন হলে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পাবে। আর যদি একাধিক ভাই-বোন হয়, তবে পুরুষকে স্ত্রীর দ্বিগুণ দেওয়া হবে। সূরার শেষে বর্ণিত এই নির্দেশ সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্পর্কিত। এখানে যদি

বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভাই-বোনকে শামিল করে নেওয়া হয়, তবে বিধানাবলীতে বৈপরীত্য অনিবার্য হয়ে যাবে।

ওসিয়ত ঃ এ রুকূতে তিনবার ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ বর্ণনা করার সাথেই বলা হয়েছে যে, অংশসমূহের এই বন্টন ওসিয়ত ও ঋণের পর হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, মৃতের কাফন-দাফনের পর মোট সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা থেকে এক-তৃতীয়াংশে ওসিয়ত কার্যকর হবে। এর বেশি ওসিয়ত হলে আইনত তা অগ্রাহ্য হবে। বিধানের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ ওসিয়তের পূর্বে। যদি ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে ওসিয়তও কার্যকর হবে না এবং ওয়ারিসরাও কিছু পাবে না। এ রুকূতে যেখানে যেখানে ওসিয়তের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ওসিয়ত ঋণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ঋণের পূর্বে ওসিয়ত কার্যকর করতে হবে। এ ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

انكم تقرؤن هذه الاية من بعد وصيّةٍ توصون بها اودين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيّة.

অর্থাৎ তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْدَيْنٍ — এতে ওসিয়ত শব্দটি অগ্রে উল্লেখিত হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) একে ঋণের পরে কার্যকর হবে বলে বিধান দিয়েছেন। —(তিরমিযী)

এতদসত্ত্বেও এ তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকা দরকার যে, ওসিয়ত কার্যত যখন পশ্চাতে তখন বর্ণনায় অগ্রে উল্লেখ করার কারণ কি ? রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এ সম্পর্কে লিখেন ঃ

وتقديم الوصيّة على الدين ذكرًا مع ان الدين مقدم عليها حكمًا لاظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط فى ادائها...

অর্থাৎ আয়াতে ঋণের পূর্বে ওসিয়ত উল্লেখ করার কারণ এই যে, ওসিয়ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই পাওয়া যায় এবং এতে আত্মীয় হওয়াও জরুরী নয়। তাই ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে একে কার্যকর করার ব্যাপারে ত্রুটি অথবা দেরি করার প্রবল আশংকা ছিল। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যের কাছে যাওয়া ওয়ারিসদের কাছে অপ্রিয় ঠেকতে পারতো, তাই ওসিয়তের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একে ঋণের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক মৃতেরই ঋণগ্রস্ত থাকা জরুরী নয়। জীবদ্দশায় ঋণ থাকলেও মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকা জরুরী নয়। যদি মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকেও, তবে ঋণদাতার পক্ষ থেকে দাবি ওঠে। তাই ওয়ারিসরাও অস্বীকার করতে পারে না। এ কারণে এতে ত্রুটির আশংকা ক্ষীণ। ওসিয়ত এরূপ নয়। কারণ, মৃত ব্যক্তি যখন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তখন তার মন চায় যে, সদকায়ে-জারিয়া হিসেবে কিছু অংশ কোন সৎ কাজে ব্যয় করে যাবে। এখানে এই মালে কারও পক্ষ থেকে দাবি ওঠে না। তাই ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে ত্রুটির আশংকা ছিল। এ ত্রুটির নিরসনকল্পে সর্বত্র ওসিয়তকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

মাসআলা ঃ ঋণ ও ওসিয়ত না থাকলে কাফন-দাফনের পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত করলে তা কার্যকর হবে না। যদি কেউ পুত্র, কন্যা, স্বামী অথবা স্ত্রীর জন্য কিংবা এমন কোন ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করে, যে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশীদার, তবে এ ওসিয়তের কোন মূল্য নেই। ওয়ারিসরা শুধু ওয়ারিসী স্বত্বের অংশ পাবে। এর অতিরিক্ত তারা কোন কিছুর অধিকারী নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন ঃ

ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দান করেছেন। অতএব কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত চলবে না।

হ্যাঁ, যদি অন্য ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়, তবে যে ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে, তার জন্য ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মতভাবে বণ্টন করতে হবে। এতে উক্ত ওয়ারিসও তার অংশ পাবে। কোন কোন হাদীসে الا ان يشاء الورثة বলে এর ব্যতিক্রমও উল্লিখিত হয়েছে।—(হিদায়া)

غير مضار -এর তফসীর ঃ কালালার ওয়ারিসী স্বত্বের উপসংহারে এই ওয়ারিসী স্বত্ব ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করার পর غير مضار বলা হয়েছে। এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দুজায়গায় ওসিয়ত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিসদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয়। ওসিয়ত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ্।

ঋণ অথবা ওসিয়তের মাধ্যমে হকদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে। উদাহরণত কোন বন্ধুকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ঋণের স্বীকারোক্তি করা কিংবা নিজের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ সম্পর্কে একথা প্রকাশ করা যে, এটি অমুকের আমানত, যাতে এতে ওয়ারিসী স্বত্ব না চলে কিংবা এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি ওসিয়ত করা অথবা কোন ব্যক্তির উপর নিজের অনাদায়ী ঋণ থাকলে মিছামিছি বলে দেওয়া যে, ঋণ আদায় হয়ে গেছে, যাতে ওয়ারিসরা না পায় কিংবা মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি কাউকে দান করে দেওয়া। এগুলো হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত করার উপায়। প্রত্যেক মৃত্যুপথযাত্রীকেই জীবন সায়াহ্নে এ ধরনের অনিষ্টকর কার্য থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

নির্ধারিত অংশ-অনুযায়ী বণ্টন করার তাকীদ ঃ অংশ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ। অর্থাৎ যেসব অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঋণ ও ওসিয়ত সম্পর্কে যে তাকীদ করা হয়েছে, এগুলো কার্যকর করা খুবই জরুরী। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি মহান ওসিয়ত ও গুরুত্বপূর্ণ আদেশ। এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব জানেন। তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা

প্রত্যেকের অবস্থা জেনে বুঝেই অংশ নির্ধারণ করেছেন। যারা উল্লিখিত বিধানসমূহ পালন করবে, তাদের এ নেকী আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বাইরে নয়। পক্ষান্তরে যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের দুষ্কর্মও আল্লাহ্‌র গোচরীভূত। ফলে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

যে কোন মৃত ব্যক্তি ঋণ অথবা ওসিয়তের মাধ্যমে ন্যায্য অংশীদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, আল্লাহ্ তার সম্পর্কেও জানেন ; তাঁর পাকড়াও থেকে ভয়মুক্ত হয়ো না। তবে আল্লাহ্ বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহজগতে শাস্তি নাও দিতে পারেন। কারণ, তিনি সহনশীল। কাজেই বিরুদ্ধাচরণকারীদের 'বেঁচে গেলাম' বলে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

(১৩) এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। (১৪) যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাঁকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

যোগসূত্র ঃ ওয়ারিসী স্বত্বের উল্লিখিত বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য এ দু'টি আয়াতে সে সব বিধান মান্য করা ও বাস্তবায়ন করার ফযীলত এবং অমান্য করার শোচনীয় পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লিখিত বিধানসমূহের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ওয়ারিসী স্বত্ব কিংবা ইয়াতীম সম্পর্কিত বিধানাবলী)—উল্লিখিত এ সব বিধান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে (অর্থাৎ এসব বিধি-বিধান মেনে চলবে) আল্লাহ্ তাকে এমন বেহেশতসমূহে (তৎক্ষণাৎ) প্রবেশ করাবেন, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের কথা মানবে না এবং (সম্পূর্ণতই) তাঁর বিধি লংঘন করবে (অর্থাৎ মেনে চলাকে জরুরীও করবে না; এটা কুফরের অবস্থা।) তাকে (দোযখের) আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে অনন্তকাল থাকবে এবং তার অপমানকর শাস্তি হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলী বর্ণনা করার পর পরিশিষ্ট হিসাবে মান্যকারীদের জন্য উৎসাহবাণী এবং তাদের ফযীলত উল্লেখ করা হয় আর অমান্যকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়।

এখানেও বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য শেষ আয়াতে আনুগত্যকারী ও অবাধ্যকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়ারিসী স্বত্বের বিধানাবলীর পরিশিষ্ট

মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না ঃ ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তার উপর রচিত। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিস এবং যে ওয়ারিস তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না। কাজেই মুসলমান কোন কাফিরের এবং কাফির কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم—অর্থাৎ মুসলমান কাফিরের এবং কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না। —(মিশকাত)

এ বিধান তখনকার জন্য, যখন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফির হয়। কিন্তু কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, এরপর (নাউযুবিল্লাহ্) ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। আর ধর্মত্যাগী অবস্থায় উপার্জিত মাল বায়তুল মালে জমা হবে।

কিন্তু কোন স্ত্রীলোক ধর্ম ত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোন মুসলমানের কাছ থেকে অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না।

হত্যাকারীর স্বত্ব ঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ القاتل لايرث। —অর্থাৎ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।—(মিশ্কাত) তবে ভুলবশত হত্যার কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। বিস্তারিত তথ্য ফিকহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ব ঃ যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিসদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না কন্যা, একজন না বেশি, তা জানা যেহেতু দুষ্কর, তাই গর্ভের এ সন্তান জন্মগ্রহণ পর্যন্ত বণ্টন মুলতবি রাখা উচিত। কোন কারণে যদি তাৎক্ষণিকভাবেই বণ্টন জরুরী হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে এক পুত্র অথবা এক কন্যা উভয়ের মধ্য থেকে যা ধরে বণ্টন করলে ওয়ারিসরা কম

পায়, সেই প্রকার স্বত্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য রেখে দিতে হবে।

ইদ্দত পালনকারিণীর স্বত্ব ঃ যে স্ত্রীকে 'রিজয়ী' প্রকারের তালাক দেওয়া হয়েছে, যদিও রুজু করার এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তার স্বামী মারা যায় তবে সে স্ত্রী এ স্বামীর ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবে। কারণ, তার বিবাহ আইনত বহাল রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় যদি তা বায়েন অথবা চূড়ান্ত তালাক হয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তালাকদাতা মারা যায়, তবে সে স্ত্রী তার ওয়ারিস হবে। তাকে ওয়ারিস করার জন্য দুটি ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘ, সেটিই অবলম্বন করা হবে। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে, তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয এবং স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন। এতদুভয়ের মধ্যে যে ইদ্দতটি বেশি দিনের হয়, সেটিকেই ইদ্দত সাব্যস্ত করা হবে, যাতে স্ত্রীর অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বায়েন অথবা চূড়ান্ত তালাক দিয়ে দেয় এবং কয়েকদিন পর স্ত্রীর ইদ্দত চলা অবস্থায় সে মারা যায়, তবে এমতাবস্থায় স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না। তবে 'রিজয়ী' প্রকারের তালাক দিলে ওয়ারিস হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্বেচ্ছায় 'খুলা' তালাক নিয়ে নেয়, তবে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে মারা গেলেও সে ওয়ারিস হবে না।

আসাবাদের স্বত্ব ঃ ফরায়েযের নির্ধারিত অংশ বারজন ওয়ারিসের জন্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত। তাদেরকে 'আসহাবুল-ফুরূয' বলা হয়। তাদের কিছু বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি আসহাবুল ফুরূযের মধ্য থেকে কেউ না থাকে কিংবা আসহাবুল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আসাবাদেরকে দেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে একই ব্যক্তি উভয় দিক দিয়েই অংশ পেতে পারে। কোন কোন অবস্থায় মৃতের সন্তান এবং মৃতের পিতাও আসাবা হয়ে যায়। দাদার সন্তান অর্থাৎ চাচা এবং পিতার সন্তান অর্থাৎ ভাইও আসাবাভুক্ত হয়।

আসাবা কয়েক প্রকার । বিস্তারিত বিবরণ ফরায়েয গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। মনে করুন—স্ত্রী, কন্যা, মা ও চাচা—এই চারজন ওয়ারিস রেখে যায়েদ মারা গেল। এমতাবস্থায় তার সম্পত্তি মোট চব্বিশ ভাগে ভাগ করা হবে। অর্ধেক অর্থাৎ বারো ভাগ পাবে কন্যা, আট ভাগের একের হিসাবে তিন ভাগ পাবে স্ত্রী, ছয় ভাগের একের হিসাবে চার ভাগ পাবে মা এবং অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ আসাবা হওয়ার কারণে পাবে চাচা।

মাসআলা ঃ যদি আসাবা না থাকে, তবে আসহাবে-ফরায়েযকে দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা তাদের অংশ অনুযায়ী পুনরায় তাদেরকেই দেওয়া হয়। ফরায়েযের পরিভাষায় একে 'রদ' বলা হয়। তবে স্বামী ও স্ত্রীর উপর রদ হয় না। তারা কোন অবস্থায়ই নির্ধারিত অংশের বেশি পায় না।

যদি আসহাবুল-ফুরূয ও আসাবা এতদুভয়ের মধ্যে কেউ না থাকে, তবে যাবিল-আরহাম ওয়ারিসী স্বত্ব লাভ করে। যাবিল আরহামের তালিকা দীর্ঘ। দৌহিত্র, দৌহিত্রী, বোনের সন্তানাদি,

ফুফু, মামা, খালা—এরা যাবিল-আরহামের তালিকায় পড়ে। এর বিশদ বিবরণ ফিকহ্ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে।

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًا ﴿۱۵﴾ وَالَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ﴿۱۶﴾

(১৫) আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথনির্দেশ না করেন। (১৬) তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, দয়ালু।

যোগসূত্র ঃ জাহিলিয়াত যুগে ইয়াতীমদের সম্পর্কে এবং ওয়ারিসী স্বত্বের ক্ষেত্রে যে সব অসম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেগুলোর সংস্কার সাধন করা হয়েছে। তারা নারীদের উপরও অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতো এবং তাদের ব্যাপারে নানাবিধ কুপ্রথায় লিপ্ত ছিল। যে সব স্ত্রীলোককে বিয়ে করা বৈধ নয়, তারা তাদেরকেও বিয়ে করতো।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বিষয়ের সংস্কার করা হচ্ছে এবং শরীয়তের আইনে অন্যায়—এমন কোন কাজ কোন স্ত্রী দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কুসংস্কার ও অন্যায়ের প্রতিবিধানের এই বিষয়বস্তু পরবর্তী দু'তিন রুকূ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের (বিবাহিতা) নারীদের মধ্য থেকে যারা অশ্লীল কাজ (অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়) তোমরা তাদের (এ কাজের) বিপক্ষে নিজেদের মধ্য থেকে চারজন (অর্থাৎ মুসলমান মুক্ত, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, পুরুষ) সাক্ষী আন (যাতে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী) বিচারকরা পরবর্তী

শাস্তি জারি করতে পারেন। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্যদান করে, তবে (তাদের শাস্তি এই যে,) তোমরা তাদেরকে (বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী) গৃহের মধ্যে (দৃষ্টান্তমূলকভাবে) আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত (হয়) মৃত্যু তাদের খতম করে দেয় (না হয়) কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ (অর্থাৎ পুনঃনির্দেশ) প্রদান করেন (পরে এ ব্যাপারে যে নির্দেশ করা হয়, তা আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে উল্লেখ করা হবে)। এবং (ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীর কোন বিশেষত্ব নেই ; বরং) তোমাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, মুসলমানদের মধ্য থেকে) যে কোন দু'ব্যক্তিই সে অশ্লীল কাজে (অর্থাৎ ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাদের উভয়কে শাস্তি প্রদান কর। অনন্তর (শাস্তি প্রদানের পর) যদি তারা উভয়েই (অতীত কুকর্ম থেকে) তওবা করে নেয় এবং (ভবিষ্যতের জন্য) নিজেদের সংশোধন করে নেয় (অর্থাৎ পুনরায় এরূপ কুকর্ম তাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়), তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। (কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবূলকারী, দয়ালু। (তাই আল্লাহ্ স্বীয় দয়া দ্বারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই তোমাদেরও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার ফিকিরে থাকা উচিত নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যে সব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চারজন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরীয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে। যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে—নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত চারজন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাইবোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতাবশত অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চারজন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদী সাক্ষীরা সব মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং একজন মুসলমানের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার দায়ে তাদের 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়।

সূরা-নূরে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ

لَوْلاَ جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِنْ لَّمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ۔

অর্থাৎ—যারা ব্যভিচারের অভিযোগের সমর্থনে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, আল্লাহ্‌র কাছে তারা মিথ্যাবাদী।

কোন কোন বুযুর্গ চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ এ ব্যাপারে যেহেতু দু'ব্যক্তি জড়িত হয়, পুরুষ ও স্ত্রী, তাই একই ব্যাপার যেন দু'ব্যাপারের পর্যায়ভুক্ত। প্রত্যেক ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী দরকার হয়। তাই এখানে চারজন সাক্ষী জরুরী হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি তারা উভয়ে তওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের থেকে নিবৃত্ত হও। এর অর্থ এই যে, শাস্তি দেওয়ার পর যদি তারা তওবা করে, তবে তাদেরকে তিরস্কার করো না এবং আরও শাস্তি দিয়ো না। এরূপ অর্থ নয় যে, তওবা দ্বারা শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে। কারণ, আয়াতে শাস্তির পরে তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; 'ফা' অক্ষর থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি তওবা না করে, তবে শাস্তির পরও তিরস্কার করা যায়।

কোরআন পাকের এ দু'আয়াতে ব্যভিচারের কোন নির্দিষ্ট হদ বা শাস্তি বর্ণিত হয়নি; বরং শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাদেরকে যন্ত্রণা দাও এবং ব্যভিচারিণী নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ।

যন্ত্রণা দানের বিশেষ কোন পন্থাও ব্যক্ত করা হয়নি, বরং বিচারকদের মতামতের উপরই তা ন্যস্ত করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে যন্ত্রণা দানের অর্থ তাদেরকে মৌখিক লজ্জা দেওয়া, শরমিন্দা করা এবং হাত বা জুতা ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ উক্তিও দৃষ্টান্তমূলক মনে হয়। আসল ব্যাপার তাই যে, ব্যাপারটি বিচারকের মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অবতরণের দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ক্রম এরূপ যে, শুরুতে তাদেরকে যন্ত্রণাদানের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। এরপর বিশেষভাবে নারীদের জন্য এ বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, যে পর্যন্ত তারা মারা না যায়। তাদের জীবদ্দশাতেই পুনরাদেশ এসে গেলে 'হদ' হিসাবে তাই প্রয়োগ করা হবে।

সেমতে পরবর্তীকালে এ আয়াতে প্রতিশ্রুতি سبيل বা পথ বলে দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ 'পথের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ يعنى الرجم للثيب والجلد للبكر অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তির জন্য প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা এবং অবিবাহিতের জন্য বেত্রদণ্ড।—(বুখারী)

'মরফু' হাদীসসমূহেও এ 'পথের' বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়েয ইবনে মালেক (রা) ও ইযদ গোত্রের জনৈকা মহিলার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তারা উভয়েই বিবাহিত ছিল বিধায় তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল। এছাড়া জনৈক ইহুদীকেও ব্যভিচারের কারণে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল। তার জন্য এ ফয়সালা করা হয়েছিল তওরাতের নির্দেশ মোতাবেক।

অবিবাহিতের বিধান স্বয়ং কোরআন-পাকে সূরা নূরে উল্লিখিত আছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ ـ

'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ এতদুভয়ের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।'

শুরুতে প্রস্তর বর্ষণের বিধানের জন্য কোরআন-পাকে আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার তিলাওয়াত রহিত করে বিধান বাকি রাখা হয়।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

ان اللّٰه بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل اللّٰه تعالى اية الرجم رجم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم ورجمنا بعده والرجم فى كتاب اللّٰه حق على من زنٰى اذا احصن من الرجال والنساء...

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাবও নাযিল করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ যে সব ওহী নাযিল করেছেন, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যার আয়াতও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রস্তর বর্ষণ করেছেন এবং তৎপরবর্তীকালে আমরাও প্রস্তর বর্ষণ করেছি। প্রস্তর বর্ষণের বিধান সে ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যে বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় — পুরুষ হোক কিংবা নারী।—(বুখারী)

মোট কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের বর্ণিত গৃহে আবদ্ধ করা ও যন্ত্রণা দেওয়ার বিধান শরীয়তের হদ বা শাস্তি নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে যায়। এখন ব্যভিচারের শাস্তি একশ' বেত্রাঘাত কিংবা প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই অপরিহার্য হবে। আরও বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ সূরা আন-নূরের তফসীরে বর্ণিত হবে।

অস্বাভাবিক পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শাস্তি ঃ কাযী সানাউল্লাহ্ পানীপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে লেখেন ঃ আমার মতে اَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا বলে সে সব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা অস্বাভাবিক পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে অর্থাৎ সমকামে লিপ্ত হয়।

কাজী সাহেব ছাড়াও অন্য আরো কিছুসংখ্যক তফসীরবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কোরআনের ভাষায় الذان ياتيا نها বাক্যে موصول ও صله উভয়টি পুংলিঙ্গ। তাই তাদের এ উক্তি অবান্তর নয়। যারা এখানে ব্যভিচারী নারী অর্থ করেছেন, তারা تغليب-এর নীতি অনুযায়ী পুংলিঙ্গ পদের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গকেও শামিল রেখেছেন। এতদসত্ত্বেও স্থানের সাথে মিল থাকার কারণে সমকামের অবৈধতা, জঘন্যতা এবং এর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হাদীস ও ইমামদের উক্তি থেকে এ ব্যাপারে যা কিছু প্রমাণিত হয়, তা থেকে নমুনা হিসাবে নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

عن ابى هريرة (رضـ) ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم قال لعن اللّٰه سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته وردّد اللعنة على واحد

منهم ثلاثًا ولعن كلّ واحد منهم لعنة تكفيه قال ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে সাত প্রকার লোকের প্রতি সপ্ত আকাশের উপর থেকে অভিসম্পাত করেছেন। তাদের মধ্যে একজনের প্রতি তিন তিনবার অভিসম্পাত করেছেন এবং অবশিষ্টদের প্রতি একবার! তিনি বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লূতের অনুরূপ কুকর্ম করে, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লূতের অনুরূপ কুকর্ম করে, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লূতের অনুরূপ কুকর্ম করে। —(তারগীব ও তারহীব)

عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اربعة يصبحون فى غضب الله ويمسون فى سخط الله - قلتُ من هم يا رسول الله قال المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذى ياتى البهيمة والذى ياتى الرجال-

—হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ চার ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র গযবে পতিত থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! তারা কারা ? তিনি বললেন ঃ ঐ সকল পুরুষ, যারা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে এবং ঐ সকল স্ত্রীলোক, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ঐ ব্যক্তি, যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ঐ ব্যক্তি, যে পুরুষের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। —(তারগীব ও তারহীব)

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা কোন লোককে কওমে লূতের ন্যায় অস্বাভাবিক কর্ম করতে দেখলে তাকে ও যার সাথে এ অপকর্ম করা হয়, উভয়কে কতল করে দাও।—(তারগীব ও তারহীব)

হাফেয যকিউদ্দীন তারগীব ও তারহীব গ্রন্থে লেখেন ঃ চার খলীফা—হযরত আবূ বকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা) এবং হিশাম ইবনে আবদুল মালিক নিজ নিজ খিলাফতকালে অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

এ সম্পর্কে তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের রেওয়ায়েতক্রমে একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন যে, খালেদ ইবনে ওলীদ (রা) একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে এই মর্মে এক পত্র লিখেন যে, এখানে আরবের এক এলাকায় একজন পুরুষ রয়েছে, যার সাথে নারীদের অনুরূপ যৌনক্রিয়া করা হয়।

হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবায়ে-কিরামকে একত্র করে এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করেন। পরামর্শদাতাদের মধ্যে হযরত আলী (রা)-ও উপস্থিত হন এবং তিনি বলেন ঃ এ গোনাহটি একটি জাতি ব্যতীত অন্য কেউ করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা সে জাতির সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তা আপনাদের সবার জানা আছে। আমার অভিমত এই যে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক। অন্যান্য সাহাবায়ে-কিরামও এর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। সেমতে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন।

উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহে বারবার কওমে লূতের কুকর্মের কথা বলা হয়েছে। হযরত লূত (আ) যে জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা কুফ্র ও শির্ক ছাড়াও এই জঘন্যতম অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। লূত (আ)-এর দাওয়াত ও প্রচারে তারা যখন মোটেই প্রভাবান্বিত হলো না, তখন আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের জনপদগুলোকে উপরে তুলে সম্পূর্ণ উল্টে মাটিতে নিক্ষেপ করে। সূরা আ'রাফে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো হচ্ছে সমকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন কোন রেওয়ায়েতে নারীদের সাথে অস্বাভাবিক কাজ করার জন্যও কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاينظر الله عز و جل الى رجل اتى رجلا او امراة فى دبرها-

অর্থাৎ—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন না, যে পুরুষ কিংবা নারীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করে। —(তারগীব ও তারহীব)

عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لايستحيى من الحق ثلاث مرات لاتأتوا النساء فى ادبار هن-

অর্থাৎ—খুযায়মা ইবনে সাবেত বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। (অতঃপর বললেন ঃ) তোমরা নারীদের সাথে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে উপগত হয়ো না। —(তারগীব ও তারহীব)

عن ابى هريرة (رضـ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من اتى امرأة فى دبرها-

অর্থাৎ—হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, অস্বাভাবিক পন্থায় যে (পশ্চাৎদ্বারে) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। —(তারগীব ও তারহীব)

وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضًا اوامراةً فى دبرها اوكاهنًا فصدّقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ—হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ যে পুরুষ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা অস্বাভাবিক পন্থায় স্ত্রীগমন করে অথবা কোন অতীন্দ্রিয়বাদী গণকের কাছে গমন করে, অতঃপর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তার সংবাদকে সত্য মনে করে, সে ঐ ধর্মকে অস্বীকার করে, যা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

এ কুকর্মের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণের ব্যাপারে ফিক্হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, যা ফিক্হ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। মোট কথা, ফিক্হর কিতাবে এর জন্য কঠোরতর শাস্তির কথা বর্ণিত আছে। উদাহরণত আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, দেয়ালচাপা দিয়ে পিষে দেওয়া , উঁচু জায়গা থেকে নিচে ফেলে দিয়ে প্রস্তর বর্ষণ করা, তরবারি দ্বারা হত্যা করা ইত্যাদি।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

(১৭) অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (১৮) আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারও মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি ! আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে তওবার কথা এসেছিল। এখন আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তওবা কবূলের শর্তসমূহ এবং কবূল হওয়া না হওয়ার অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তওবা (ওয়াদা অনুযায়ী কবূল করা) আল্লাহ্র দায়িত্ব, তা তো তাদেরই, যারা নির্বুদ্ধিতা বশত কোন গোনাহ্ (সগীরা হোক বা কবীরা) করে বসে, অতঃপর যথাশীঘ্র (অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে, যার অর্থ পরে বর্ণিত হবে) তওবা করে নেয়। অতএব, এমন লোকদের প্রতি তো আল্লাহ্ (তওবা কবূল করার জন্য) মনোনিবেশ করেন (অর্থাৎ তওবা কবূল করে

নেন) এবং আল্লাহ্ খুব জানেন (সে, মনেপ্রাণে তওবা করেছে), তিনি রহস্যবিদ (যারা মনেপ্রাণে তওবা করে না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন)। আর তাদের তওবা (কবূলই) হয় না, যারা (অনবরত) গোনাহ্ করতে থাকে ; এমনকি, যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু এসে দাঁড়ায় (মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ এই যে, পরজগতের দৃশ্যাবলী তার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে) তখন বলতে থাকে ঃ আমি এখন তওবা করছি (অতএব, না তাদের তওবা কবূল হয়,) আর না তাদের (তওবা অর্থাৎ তখন ঈমান আনা মকবুল হয়) যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের (কাফিরদের) জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (অর্থাৎ দোযখের আযাব) প্রস্তুত করে রেখেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ্ মাফ হয় কি না ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোরআন পাকে بِجَهَالَةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবূল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তওবা কবূল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে-কিরাম এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে جهالة এর অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্র কাজটি যে গোনাহ্ তা জানে না কিংবা গোনাহ্র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্র অশুভ পরিণাম ও পারলৌকিক আযাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার গোনাহ্র কাজ করার কারণ ; যদিও গোনাহ্টি যে গোনাহ্, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে।

পক্ষান্তরে جهالة শব্দটি এখানে 'নির্বুদ্ধিতা' ও 'বোকামি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে এর নযীর বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ۔—এতে ভাইদেরকে জাহিল বলা হয়েছে, অথচ তারা যে কাজ করেছিল, তা কোন ভুল অথবা ভুলে যাওয়া বশত ছিল না ; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, জেনে-শুনেই করেছিল। কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফিল হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহিল বলা হয়েছে।

আবুল-আলিয়া ও কাতাদাহ্র বর্ণনা মতে সাহাবায়ে-কিরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, كل ذنب اصابة عبد فهو جهالة عمدًا كان او غيره — অর্থাৎ বান্দা যে গোনাহ্ করে—অনিচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها —অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যত বড় আলিম ও বিশেষ জানাশোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই বটে।—(ইবনে-কাসীর)

আবূ হাইয়্যান তফসীরে বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ এটা এমনই, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لايزني الزاني وهو مؤمن অর্থাৎ ব্যভিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে

না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানের তাকীদ থেকে দূরে সরে পড়ে।

তাই হযরত ইকরিমা বলেনঃ امور الدنيا كلها جهالة—অর্থাৎ দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহ্র আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে।

মোট কথা, গোনাহ্র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক কিংবা ভুলক্রমে—উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশত সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ্ করে, তার তওবাও কবূল হতে পারে। —(বাহরে-মুহীত)

আলোচ্য আয়াতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে তওবা কবূল হওয়ার জন্য শর্ত রাখা হয়েছে যে, যথাশীঘ্র বা কাছাকাছি সময়ে তওবা করতে হবে। তওবা করায় দেরি করা যাবে না। প্রশ্ন এই যে, এখানে 'যথাশীঘ্র' বলে কতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীসে স্বয়ং এর তফসীর করেছেন। তিনি বলেনঃ ان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر —হাদীসের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা তখন পর্যন্ত কবূল করেন, যে পর্যন্ত তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণার গরগরা প্রকাশ না পায়।

মুহাদ্দিস ইবনে মরদুইয়াহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেনঃ মু'মিন বান্দা যদি মৃত্যুর এক মাস অথবা একদিন অথবা এক মুহূর্ত পূর্বেও গোনাহ্ থেকে তওবা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবাও কবূল করবেন ; যদি আন্তরিকতা সহকারে খাঁটি তওবা করা হয়। (ইবনে কাসীর)

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) من قريب-এর যে তফসীর করেছেন, তা থেকে জানা গেল যে, মানুষের সমগ্র জীবনকালই নিকটবর্তীর অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে তওবা করা হবে, তা কবূল হবে। তবে মৃত্যুর গরগরার সময় যে তওবা করা হবে, তা কবূল হবে না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত মওলানা থানবী (র) তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে দু'রকম অবস্থা দেখা দেয়। একটি হলো নৈরাশ্যের অবস্থা। তখন মানুষ প্রত্যেক চিকিৎসা ও তদবীর থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, এখন মৃত্যু সমাগত। একে باس (বা'স)-এর অবস্থা বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থা এর পরে আসে, যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় এবং উর্ধ্বশ্বাস শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থাকে 'ইয়াস' বলা হয়। প্রথমোক্ত অবস্থা অর্থাৎ 'বাস'-এর অবস্থা পর্যন্ত সময় তো من قريب-এরই অন্তর্ভুক্ত এবং তখনকার তওবাও কবূল হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ 'ইয়াস'-এর অবস্থায় যে তওবা করা হয়, তা কবূল হয় না। তখন ফেরেশতা এবং পরজগতের দৃশ্যাবলী মানুষের দৃষ্টির সামনে এসে যায়। বস্তুত, এটা من قريب-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ আয়াতে من قريب শব্দটি সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের সমগ্র জীবনই স্বল্পকাল এবং যে মৃত্যুকে সে দূরে মনে করছে, তা অতি নিকটে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত قريب -এর তফসীরের প্রতি অন্য এক আয়াতে স্বয়ং কোরআনও ইঙ্গিত করেছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ মৃত্যুর সময়কার তওবা মকবুল হয় না।

আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম হলো এই যে, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে—বুঝে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত করুক, তা সর্বাবস্থায় মূর্খতাই বটে। এমন প্রত্যেক গোনাহ্ থেকে মানুষের তওবা কবূল করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। তবে শর্ত এই যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সত্যিকারভাবে তওবা করতে হবে।

'তাদের তওবা কবূল করার দায়িত্ব আল্লাহ্র'–এ কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন, যা পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত। নতুবা আল্লাহ্র যিম্মায় কোন ফরয, ওয়াজিব অথবা কারও হক প্রাপ্য হয় না। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে ঐ তওবার কথা বলা হচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

এতে বলা হয়েছে ঃ তাদের তওবা কবূলযোগ্য নয়, যারা সারা জীবন নির্ভয়ে গোনাহ্ করতে থাকে আর মৃত্যু যখন মাথার উপর ছায়াপাত করে এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ও ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বলে ঃ আমরা এখন তওবা করছি। তারা জীবনের সুযোগ অযথা ব্যয় করে তওবার সময় হারিয়ে ফেলে। তাই তাদের তওবা কবূল হবে না; যেমন ফেরআউন ও ফেরআউনের সভাসদরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার সময় চিৎকার করে বলেছিল ঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ ঈমানের সময় চলে যাওয়ার পর এখন ঈমান আনায় কোন ফায়দা নেই।

আয়াতের শেষ বাক্যে এ বিষয়টিই বলা হয়েছে যে, তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং ঠিক মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় ঈমানের স্বীকারোক্তি করে। এ স্বীকারোক্তি ও ঈমান অসময়োচিত, অর্থহীন। তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আযাব।

তওবার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ঃ আয়াতদ্বয়ের শাব্দিক তফসীরের পর তওবার সংজ্ঞা, স্বরূপ ও স্তর বর্ণনা করা জরুরী মনে হচ্ছে।

ইমাম গাযযালী 'ইহইয়াউল-উলুম' গ্রন্থে বলেন ঃ গোনাহ্র তিনটি স্তর রয়েছে ঃ

এক. কোনো সময়ই কোনো গোনাহ্ না করা। এটা ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য। দুই. গোনাহ্ করা এবং অব্যাহতভাবে করে যাওয়া কোন সময় অনুশোচনা না করা এবং তা ত্যাগ করার কথা চিন্তা না করা। এ স্তর শয়তানদের। তৃতীয় স্তর মানবজাতির। অর্থাৎ গোনাহ্ হয়ে গেলে অবিলম্বে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা বর্জন করতে কৃতসংকল্প হওয়া।

এতে বোঝা গেল যে, গোনাহ্ হয়ে যাওয়ার পর তওবা না করা শয়তানের কাজ। তাই উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে তওবা করা ফরয। কোরআন পাক বলে ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْاۤ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ-

অর্থাৎ—হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর—সত্যিকার তওবা। আশ্চর্য নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের গোনাহ্‌সমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার মহিমা দেখুন! মানুষ সারা জীবন তাঁরই নাফরমানীতে লিপ্ত থেকেও মৃত্যুর পূর্বে সর্বান্তকরণে তওবা করলে তিনি শুধু তার দোষই ক্ষমা করে দেন না, বরং তাকে প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত করে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

التائب حبيب الله-التائب من الذنب كمن لاذنب له —অর্থাৎ তওবাকারী আল্লাহ্‌র প্রিয়। যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায়, যেন গোনাহ্ করেনি।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বান্দা যখন কোন গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং তার তওবা আল্লাহ্‌র কাছে কবূল হয়ে যায়, তখন সে গোনাহ্‌র জন্য শুধু যে তাকে পাকড়াও করা হয় না তাই নয়, বরং গোনাহ্‌টি ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা থেকেও মিটিয়ে ফেলা হয়, যাতে সে অপমানের সম্মুখীনও না হয়।

তবে তওবা 'তওবায়ে-নসূহ' তথা নির্ভেজাল হওয়া জরুরী। নির্ভেজাল তওবার তিনটি স্তর রয়েছে।

এক. স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। হাদীসে আছে ঃ انما التوبة الندم অর্থাৎ অনুতাপকেই তওবা বলা হয়।

দুই. কৃত গোনাহ্ অবিলম্বে বর্জন করা এবং ভবিষ্যতেও তা থেকে বিরত থাকার পাকাপোক্ত সংকল্প করা।

তিন. ক্ষতিপূরণের চিন্তা করা। অর্থাৎ যে গোনাহ্ হয়ে গেছে, সাধ্যানুযায়ী তার প্রতিকার করা। উদাহরণত নামায-রোযা কাযা হয়ে থাকলে তার কাযা করা। পরিত্যক্ত নামায ও রোযার সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তা অনুমানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করবে। অতঃপর সেগুলোর কাযা করতে যত্নবান হবে। এক সময়ে করতে না পারলে প্রত্যেক নামাযের সাথে এক এক নামাযের 'ওমরী-কাযা' পড়বে। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে রোযার কাযার প্রতি যত্নবান হবে। ফরয যাকাত অনাদায়ী থাকলে বিগত দিনের যাকাতও একমুঠে অথবা কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করবে। কারও হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা ফেরত দেবে। কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু যদি কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ না হয়, কিংবা অনুতাপ হলেও ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ বর্জন করা না হয়, তবে তা তওবা নয় ; যদিও মুখে হাজার বার তওবা তওবা করে।

উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী যখন কেউ তওবা করে নেয়, তখন সর্বপ্রকার গোনাহ্ করা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হয়ে যায়।

যদি মনুষ্যসুলভ দুর্বলতার কারণে পুনরায় কোন সময় সে গোনাহ্ করে ফেলে, তবে অবিলম্বে পুনরায় নতুন তওবা করে নেবে এবং পরম করুণাময়ের দরবার থেকে প্রত্যেকবার তওবা কবূলের আশা রাখবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْ
هُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا
وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ
بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى
بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

(১৯) হে ঈমানদারগণ ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না, যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ নিয়ে নাও ; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (২০) যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীর পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর, এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহ্‌র মাধ্যমে গ্রহণ করবে ? (২১) তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রসঙ্গক্রমে তওবার কথা আলোচিত হয়েছিল। এর পূর্বে নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহেও নারী সম্পর্কিত বিধানাবলী ব্যক্ত হয়েছে। জাহিলিয়াত আমলে নারীদের উপর স্বামীদের পক্ষ থেকেও উৎপীড়ন হতো এবং ওয়ারিসদের পক্ষ থেকেও।

কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ওয়ারিসরা তার সাথে যদৃচ্ছা ব্যবহার করতো। মন চাইলে নিজেই তাকে বিয়ে করে নিত কিংবা অপরের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিত। মনে না চাইলে নিজেও বিয়ে করতো না, অপরের কাছে বিয়ে বসতেও বাদ সাধতো এবং তাদেরকে বন্দী করে রাখতো, যাতে অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়। কেননা, এমতাবস্থায় হয় তারা নিজস্ব ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিত, না হয় তাদের গৃহেই বন্দী জীবন-যাপন করতে হতো এবং এভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

স্বামীরাও স্ত্রীদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাতে দ্বিধা করতো না। মনে না চাইলে তাদের সাথে সম্পর্কও স্থাপন করতো না এবং তালাকও দিতো না, যাতে সে অর্থকড়ি দিয়ে তালাক অর্জন করে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অনিষ্টেরই মূলোৎপাটন করা হয়েছে। عَاشِرُوْهُنَّ বলে বিশেষভাবে স্বামীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ থেকে مِيْثَاقًا غَلِيْظًا পর্যন্ত আয়াত দুটিও এ বিষয়-বস্তুরই পরিশিষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, নারীদের (জান ও মালের) বলপূর্বক মালিক হয়ে যাও। (মালের মালিক হওয়া তিন প্রকার। এক—ওয়ারিসী স্বত্বে নারীর প্রাপ্য হ্রাস করা—তাকে না দেওয়া। দুই— তাকে অন্যত্র বিয়ে না দেওয়া, যাতে সে এখানেই মারা যায় এবং তার ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা যায় কিংবা নিজেই কিছু দিতে বাধ্য হয়। তিন—স্বামী তাকে অহেতুক বাধ্য করবে, যাতে তাকে কিছু ধন-সম্পদ দেয় এবং বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

প্রথম ও তৃতীয় প্রকারে 'বলপূর্বক' বলার তাৎপর্য এই যে, নারীর সম্মতিক্রমে এসব কাজ সম্পন্ন হলে তা বৈধ ও হালাল। দ্বিতীয় প্রকারে এ বলপ্রয়োগ বাস্তবে বিয়েতে বাধাদানের জন্য। এর উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। তাই শব্দগতভাবে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। এর তাৎপর্যও তাই। অর্থাৎ নারী স্বেচ্ছায় বিয়ে না করলে তাদের কোন গোনাহ নেই।

জানের মালিক হওয়ার অর্থ এই যে, তারা মৃতের স্ত্রীকে মৃতের ধন-সম্পদের মত ওয়ারিসী সম্পত্তি মনে করতো। এমতাবস্থায় 'বলপূর্বক' কথাটি বাস্তবসম্মত। অর্থাৎ তারা যে এরূপ করতো একথা বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীরা স্বেচ্ছায় মৃতের ধন-সম্পত্তির মত নিজেকে ত্যাজ্য সম্পত্তি করে নিলে (সত্যি সত্যি ত্যাজ্য সম্পত্তি হয়ে যাবে।) এবং নারীদেরকে এ উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করো না যেন যা কিছু তোমরা (অর্থাৎ স্বয়ং তোমরা কিংবা তোমাদের স্বজনরা) তাদেরকে প্রদান করেছ, তার কোন অংশ (-ও তাদের কাছ থেকে) আদায় করে নাও। (এ বিষয়বস্তুটিও তিন প্রকার। এক. মৃতের ওয়ারিস মৃতের স্ত্রীকে বিয়ে করতে দেবে না, যাতে স্ত্রী তাকে কিছু দেয়। দুই. স্বামী তাকে বাধ্য করবে যে, আমাকে কিছু দিলে আমি ছেড়ে দেব। তিন. তালাক দেওয়ার পরও স্বামী কিছু ঘুষ ছাড়া তাকে অন্যত্র বিয়ে বস্তে দেবে না। এখানকার প্রথম প্রকার বিষয় পূর্ববর্তী দ্বিতীয় প্রকার বিষয়টির একটি অংশ এবং

এখানকার দ্বিতীয় প্রকার বিষয় হুবহু পূর্ববর্তী তৃতীয় প্রকার বিষয়ের অনুরূপ। পূর্ববর্তী প্রথম প্রকার বিষয় এবং এখানকার তৃতীয় প্রকার বিষয় পৃথক) কিন্তু (কোন কোন অবস্থায় তাদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা কিংবা তাদেরকে আটক করা বৈধ। তা এই যে,) নারীরা যদি কোন গর্হিত কাজ করে। (এতেও তিন অবস্থা রয়েছে। এক. গর্হিত কাজটি হবে স্বামীর প্রতি অবাধ্যতা ও চরিত্রহীনতা। এমতাবস্থায় অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে, যা মোহরানার চাইতে বেশি হবে না—স্ত্রীকে আটক রাখতে পারে। দুই. গর্হিত কাজটি হবে ব্যভিচার। ইসলামের প্রথম যুগে ব্যভিচারের শাস্তি অবতরণের পূর্বে এ অপরাধের কারণে স্বামীর জন্য নিজের দেয়া অর্থ-সম্পদ ফেরত গ্রহণ করে স্ত্রীকে বহিষ্কার করা বৈধ ছিল। এখন এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। ব্যভিচারের কারণে মোহরানার অপরিহার্যতা নষ্ট হয় না। উপরোক্ত উভয় অবস্থায় অর্থ গ্রহণ করা যাবে। তিন. গর্হিত কাজটি ব্যভিচার হলে স্বামীর জন্য এবং অন্য ওয়ারিসদের জন্য শাস্তি হিসাবে বিচারকের আদেশে স্ত্রীদেরকে গৃহমধ্যে আটক রাখা বৈধ ছিল; যেমন রুকূর শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর এ বিধানও রহিত হয়ে গেছে। অতএব এ আটক রাখা হবে শাস্তি হিসাবে, অর্থ আদায় করার উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং ৮। এর মাধ্যমে যে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে, তা হবে—সাধারণ عـضـل তথা আটক রাখা থেকে শর্তযুক্ত আটক রাখা অর্থাৎ অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আটক রাখা থেকে নয়। এরপর বিশেষভাবে স্বামীদেরকে আদেশ করা হচ্ছে—) এবং স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর (অর্থাৎ সচ্চরিত্রতা ভরণ-পোষণের ও দেখা-শোনার মাধ্যমে) এবং যদি (মনের চাহিদা অনুযায়ী) তারা তোমাদের পছন্দ না হয় (কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অপছন্দের কোন কারণও না ঘটে), তবে (তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধির তাকীদ মেনে নিয়ে এমন চিন্তা করে সহ্য কর যে,) সম্ভবত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, আল্লাহ্ তা'আলা যার মধ্যে (জাগতিক অথবা পারলৌকিক) বড় রকমের কোন কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (উদাহরণত তারা তোমাদের সেবিকা, সুখ বিধানকারিণী ও সহানুভূতিশীলা হবে। এটা পার্থিব উপকার। অথবা কমপক্ষে অপছন্দনীয় বস্তুর জন্য সবর করার সওয়াব ও ফযীলত তো অবশ্যই পাওয়া যাবে।) আর যদি তোমরা (আগ্রহাতিশয্যের কারণে) এক স্ত্রীর স্থলে (অর্থাৎ প্রথম স্ত্রীর স্থলে) অন্য স্ত্রীর পরিবর্তন করতে চাও (এবং প্রথম স্ত্রীর কোন দোষ না থাকে) এবং তোমরা একজনকে (মোহরানায় কিংবা এমনিতেই দান-বখশিশ হিসাবে) প্রচুর অর্থ দিয়ে থাক (হাতে সমর্পণ করে থাক কিংবা বিশেষ মোহরানার জন্য চুক্তিপত্রে দেওয়া সাব্যস্ত করে থাক), তবে (অর্থাৎ প্রদত্ত কিংবা চুক্তিবদ্ধ অর্থ) থেকে (স্ত্রীকে বিরক্ত করে) কিছুই (ফেরত) গ্রহণ করো না। (বস্তুত ক্ষমা করানোও কার্যত ফেতর নেওয়ারই অন্যরূপ।) তোমরা কি তা (ফেরত) গ্রহণ করবে (তার উপর অবাধ্যতা কিংবা অশ্লীলতার) অপবাদ আরোপের মাধ্যমে কিংবা (তার অর্থ সম্পদে) প্রকাশ্য গোনাহ্ (অর্থাৎ উৎপীড়ন) করে? (অপবাদ প্রকাশ্য হোক কিংবা অর্থগত হোক। পূর্বে শুধু অবাধ্যতা ও কুকর্মের অবস্থায় তার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের অনুমতি ছিল। কাজেই তার কাছ থেকে যখন অর্থ গ্রহণ করা হবে, তখন যেন তাকে অপরের দৃষ্টিতে অবাধ্যকারিণী ও কুকর্মীরূপেই চিত্রিত করা হলো। আর্থিক জুলুমের কারণ সুস্পষ্ট যে, মনের খুশিতে স্ত্রী তার সে অর্থ দিয়ে থাকে। আর দান করার ক্ষেত্রে এটা এজন্য জুলুম হবে যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একজন অন্যজনকে হাদিয়া দিলে শরীয়তের আইনে তা ফেরত গ্রহণের অধিকার কারোই থাকে না। সুতরাং ফেরত নিলে তা এক প্রকার ছিনতাই

হবে। বস্তুত আরোপের প্রয়োজনীয়তাও এ থেকেই দেখা দেয়। কেননা, ফেরত গ্রহণ করার মানে যেন একথা বলা যে, সে আমার স্ত্রী ছিল না। এটা যে অপবাদ তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, এতে স্ত্রী বিবাহের দাবিতে মিথ্যাবাদিনী এবং সমাজে পাপাচারিণী সাব্যস্ত হয়।) এবং তোমার প্রদত্ত এ অর্থ (সত্যিকারভাবে অথবা বিধিগতভাবে) কিরূপে গ্রহণ করবে, অথচ (অপবাদ ও জুলুম ছাড়া একে গ্রহণ করার মধ্যে আরও দু'টি বাধা রয়েছে। এক.) তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাথে নিরাবরণভাবে সাক্ষাৎ করেছ (অর্থাৎ সহবাস করেছ কিংবা অবাধ নির্জনতায় মিলিত হয়েছ ; এটাও সহবাসেরই পর্যায়ভুক্ত। মোট কথা, স্ত্রী নিজ সত্তাকে তোমাদের আনন্দ উপভোগের জন্য তোমাদের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। মোহরানা এ আত্মসমর্পণেরই বিনিময়। সুতরাং যার বিনিময়, তা অর্জন করার পর বিনিময়কে ফেরত গ্রহণ করা অথবা বিনিময় প্রদান না করা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যদি ঐ অর্থ মোহরানা না হয়ে দান হয়, তবে এই নিরন্তরায় অর্থ ফেরত গ্রহণে বাধা দান করে এবং প্রকৃত অন্তরায় হলো বৈবাহিক সম্পর্ক।) আর (দ্বিতীয় বাধা এই যে,) নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে (অঙ্গীকার এই যে, বিবাহের সময় তোমরা মোহরানা নিজ দায়িত্বে রেখেছিলে। অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করাও বিবেকের কাছে নিন্দনীয়। যদি তা দান কিংবা উপহার হয়, তবে নিরাবরণ মিলনের পূর্বে এ অঙ্গীকারও বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া হওয়ার কারণে সে দান ফেরত গ্রহণে বাধা দান করে। মোট কথা, চারটি বাধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ফেরত গ্রহণ করা খুবই নিন্দনীয়)।

ইসলাম-পূর্ব যুগের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ আলোচ্য আয়াত তিনটিতে সেই সব নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলাম-পূর্ব কালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিস ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিস ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই যখন এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। এই একটি মাত্র মৌলিক ভ্রান্তির ফলে নারীদের উপর নানা ধরনের অগণিত নির্যাতন চলতো। উদাহরণত ঃ

এক. যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসাবে লাভ করতো, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো।

দুই. যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিতো, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে, বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়।

তিন. মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করতো এবং স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করতো না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও

করতো না, যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে অলংকার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিংবা অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাকপ্রাপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয় কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

চার. কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত না—মূর্খতাপ্রসূত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু অর্থ আদায় করার লোভে।

এ সব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তি এমন কি, তার প্রাণেরও মালিক মনে করতো। কোরআন পাক এসব অনর্থের সেই মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত নির্যাতনসমূহের প্রতিকার কল্পে ঘোষণা করেছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا.

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।"

'বলপূর্বক কথাটি এখানে শর্ত হিসাবে বলা হয়নি, যাতে মনে হবে নারীদের সম্মতিক্রমে তাদের মালিক হওয়া হয়তো শুদ্ধ হবে, বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্য সংযুক্ত হয়েছে। শরীয়তসম্মত ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে পারে। কোন বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না।—(বাহরে মুহীত) এ কারণেই শরীয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোন নারী নির্বুদ্ধিতাবশত কারও মালিকানাধীন হতে রাযী হলেও ইসলামী আইন এতে রাযী নয় যে, কোন স্বাধীন মানুষ কারও মালিকানাধীন চলে যাবে।

জুলুম ও অনর্থ নিষিদ্ধ করার সাধারণ পন্থা হচ্ছে নেতিবাচক আদেশের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা। কিন্তু এ স্থলে কোরআন সাধারণ পন্থা বাদ দিয়ে لَا يَحِلُّ বলে নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছে। এতে ব্যাপারটি যে কঠোর গোনাহ্ তার ঊর্ধ্বেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, যদি কেউ কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার সম্মতি ও অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করে, তবে এ বিয়ের দ্বারা উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব এবং বংশের বিধানাবলীও এর সাথে সম্পৃক্ত হয় না।

এমনিভাবে যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে জোর-জবরদস্তি করে তার কাছ থেকে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত গ্রহণ করে কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়, তবে এই জোর-জবরদস্তি ফেরত গ্রহণ ও ক্ষমা শরীয়তে ধর্তব্য নয়। এর ফলে গ্রহণকৃত অর্থ স্বামীর জন্য হালাল হয় না এবং কোন প্রাপ্য মাফ হয় না। এ বিষয়টিরই অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ –অর্থাৎ নারীদেরকে ইচ্ছা মত বিয়ে করতে বাধা দিও না এরূপ ধারণা করে যে, যে অর্থ তোমার অথবা তোমাদের স্বজনরা তাদেরকে মোহরানা কিংবা উপঢৌকন হিসাবে দান করেছে, তা তাদের কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করবে।

নির্ধারিত মোহরানা মাফ করানোও মোহরানা দিয়ে ফেরত গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা, প্রদত্ত মোহরানা বলপূর্বক ফেরত নেওয়া কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা বলপূর্বক মাফ করানো, এ সবই অবৈধ ও হারাম। এমনিভাবে যে অর্থ উপঢৌকন হিসাবে স্ত্রীর মালিকানায় প্রদান করা হয়, তা ফেরত নেওয়াও স্বামীর জন্য এবং ওয়ারিসদের জন্য হালাল নয়। 'মালিকানায় প্রদান' বলার তাৎপর্য এই যে, স্বামী যদি কোন অলংকার অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু স্ত্রীকে ধার হিসাবে ব্যবহারের জন্য দান করে, তবে তা স্ত্রীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং তা ফেরত গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ নয়।

এরপর إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ বলে এমন কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলোতে স্বামীর জন্য প্রদত্ত মোহরানা ইত্যাদি ফেরত গ্রহণ করা বৈধ হয়ে যায়।

অর্থাৎ যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন প্রকাশ্য অশোভন আচরণ প্রকাশ পায়, যদ্দরুন পুরুষ স্বভাবতই তালাক দিতে বাধ্য হয়, তবে এমতাবস্থায় প্রদত্ত মোহরানা ইত্যাদি ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ না করা পর্যন্ত স্বামী তালাক নাও দিতে পারে।

এখানে فَاحِشَة শব্দের অর্থ অশোভন আচরণ বলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা), যাহ্হাক প্রমুখের মতে স্বামীর অবাধ্যতা ও কুৎসিত গালিগালাজ প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে এবং আবূ কালাবা ও হাসান বসরীর মতে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় যে, নারীদের দ্বারা যদি কোন নির্লজ্জ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় অথবা তারা অবাধ্যতা ও কটূক্তি করে, যদ্দরুন বাধ্য হয়ে পুরুষ তালাক দিতে উদ্যত হয় ; তবে এমতাবস্থায় যেহেতু দোষ স্ত্রীর, তাই প্রদত্ত মোহরানা ফেরত গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা নির্ধারিত মোহরানা মাফ না করানো পর্যন্ত স্ত্রীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

পরবর্তী দু'আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায়, কিন্তু স্বামী নিছক মনের খায়েশ ও খুশির জন্য বর্তমান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়, তবে এমতাবস্থায় যদি সে অগাধ অর্থ-সম্পদও তাকে দিয়ে থাকে, তবে তালাকের বিনিময়ে তার কোন অংশ ফেরত গ্রহণ করা কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করানো স্বামীর জন্য বৈধ নয়। কেননা, এক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন দোষ নেই এবং মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার যে কারণ, তাও পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ বিয়েও হয়ে গেছে এবং উভয়ে পরস্পর মিলিতও হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণ করার কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করানোর কোন অধিকার তার নেই।

এরপর অর্থ ফেরত গ্রহণ যে জুলুম ও গোনাহ্ এ বিষয়টি তিন পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে ঃ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا অর্থাৎ তোমরা কি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার ইত্যাদির অপবাদ আরোপ করে প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের পথ বের করতে চাও ? অর্থাৎ যখন একথা জানা যায় যে, প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণ তখনই জায়েয, যখন স্ত্রী কোন অশোভন কাজ করে। তখন তার কাছ থেকে অর্থ ফেরত গ্রহণ করার মানে প্রকৃতপক্ষে এরূপ ঘোষণা করা যে, সে

কোন অশোভন কাণ্ড ও নির্লজ্জতা ইত্যাদি করেছে। মুখে তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করুক বা না করুক, এমতাবস্থায় এটা অপবাদেরই একটা রূপ। এটা যে প্রকাশ্য গোনাহ্ তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় পর্যায় বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ — অর্থাৎ এখন তোমরা কেমন করে স্বীয় অর্থ তাদের কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করতে পার, যখন শুধু বিয়েই নয়, অবাধ নির্জনবাস এবং পরস্পরের মাঝে মিলনও হয়ে গেছে ? কেননা, এমতাবস্থায় প্রদত্ত অর্থ মোহরানা হলে স্ত্রী তার পূর্ণ অধিকারিণী ও মালিক হয়ে গেছে। কারণ, যে আপন সত্তাকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে। এখন তা ফেরত নেওয়ার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বামীর নেই। আর যদি প্রদত্ত অর্থ উপঢৌকন হয়, তবুও এমতাবস্থায় তা ফেরত দেওয়া সম্ভবপর নয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে দান করলে তা ফেরত গ্রহণ শরয়ীতমতে সিদ্ধ নয় এবং আইনতও তা কার্যকর হয় না। মোট কথা, বৈবাহিক সম্পর্ক দান—ফেরত গ্রহণের পরিপন্থী।

এ বিষয়টিই তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا অর্থাৎ নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিয়েছে। এতে বিবাহবন্ধনে অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র নামে খোতবা সহকারে জনসমক্ষে করা হয়।

মোট কথা এই যে, বৈবাহিক অঙ্গীকার ও পারস্পরিক মিলনের পর প্রদত্ত অর্থ ফেরতদানের জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করা প্রকাশ্য জুলুম ও অবিচার। মুসলমানদের এ রূপ আচরণ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

(২২) যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা—যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (২৪) এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়—এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য—ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকে জাহিলিয়াত 'কুপ্রথার বিষয় বর্ণিত হয়ে' আসছে। তন্মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে, তারা কোন কোন হারাম নারী; যেমন বিমাতাকে বিয়ে করতো। এক বোন বিবাহে থাকা অবস্থায় অন্য বোনকে বিয়ে করতো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে অন্য হারাম নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তারা পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম মনে করতো। একেও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমন কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের বৈধতাও বর্ণিত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে মুসলমানদের সন্দেহ ছিল। যেমন, এমন ক্রীতদাসী যে

মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে এবং তার প্রথম স্বামী দারুল-হরবে থেকে যায়। এতদসঙ্গে বিয়ের শর্তাবলী, মোহরানা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টও বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা ঐ নারীদেরকে বিয়ে করো না, যাদেরকে তোমাদের পিতা (অথবা দাদা অথবা নানা) বিয়ে করে ; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে (ভবিষ্যতে এটা যেন আর না হয়)। নিশ্চয় এটি (এ বিষয়টি যুক্তিগতভাবেও) খুব অশ্লীল (সুস্থ বিবেকবান লোকদের পরিভাষায়ও) অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং (শরীয়তের আইনেও) নেহায়েত মন্দ পন্থা। তোমাদের জন্য (এসব নারী) হারাম করা হয়েছে (অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হারাম ও বাতিল। তারা কয়েক প্রকার। প্রথম বংশগত হারাম নারী। তারা হচ্ছে) তোমাদের জননী, তোমাদের কন্যা (উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সবই তাদের অন্তর্ভুক্ত), তোমাদের বোন (সহোদরা হোক, বৈমাত্রেয়ী হোক কিংবা বৈপিত্রেয়ী), তোমাদের ফুফু (এতে পিতার এবং সব উর্ধ্বতন পুরুষের তিন প্রকার বোন অন্তর্ভুক্ত আছে), তোমাদের খালা (এতে মাতার এবং সব উর্ধ্বতন নারীর তিন প্রকার বোন রয়েছে), ভ্রাতৃকন্যা (এতে তিন প্রকার ভাই-এর সব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সন্তান অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার দুধ-সম্পর্কিত হারাম নারী। তারা হচ্ছে) তোমাদের ঐসব মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে (অর্থাৎ ধাত্রী) এবং তোমাদের ঐসব বোন, যারা দুধ পান করার কারণে বোন (অর্থাৎ তোমরা তাদের আপন অথবা তারা তোমাদের আপন কিংবা দুধ-মার দুধ পান করেছে ; যদিও বিভিন্ন সময়ে পান করে)। এবং (তৃতীয় প্রকার শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী। তারা হচ্ছে) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা (এতে স্ত্রীর সব উর্ধ্বতন নারী এসে গেছে), তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা (এতে স্ত্রীর সব অধঃস্তন নারী এসে গেছে), যারা (স্বভাবতই) তোমাদের লালন-পালনে থাকে (কিন্তু এতে একটি শর্তও আছে। তা এই যে, কন্যারা) ঐ স্ত্রীদের গর্ভজাত (হওয়া চাই) যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ। (অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার কারণেই শুধু তার কন্যা হারাম হয় না ; বরং যখন কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস হয়ে যায়, তখন তার কন্যা হারাম হয়।) এবং যদি (এখনও) তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে থাক (যদিও বিয়ে হয়ে যায়), তবে (এমন স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করায়) তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই। এবং তোমাদের ঐ সব পুত্রের স্ত্রী (-ও হারাম), যারা তোমাদের ঔরসজাত (এতে সব অধঃস্তন পুরুষের স্ত্রী এসে গেছে। 'ঔরসজাত'-এর অর্থ এই যে, পোষ্য-পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়।) এবং এটাও (হারাম) যে, তোমরা দুবোনকে (দুধ বোন হোক কিংবা বংশগত হোক বিয়েতে) একত্রিত রাখ ; কিন্তু যা (এ বিধানের) আগে হয়ে গেছে (তা মাফ)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু (দয়া দ্বারা গোনাহ্ মাফ করে দেন)। এবং চতুর্থ প্রকার ঐসব নারী, যারা সধবা ; কিন্তু (এই প্রকারে তারা ব্যতিক্রম) যারা (শরীয়তসম্মতভাবে) তোমাদের দাসী হয়ে যায় (এবং তাদের হরবী স্বামী দারুল হরবে থাকে। তারা এক হায়েযের পর কিংবা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসবের পর হালাল)। আল্লাহ্ এ সব বিধান তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। এ সব নারী ছাড়া অন্য সব নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

(অর্থাৎ) তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে (বিয়ে আনতে) চাইবে। (অর্থাৎ বিবাহে মোহরানা অবশ্যই থাকতে হবে এবং) এভাবে যে, তোমরা (তাদেরকে) স্ত্রী বানাবে (এর শর্তাবলী শরীয়তে প্রসিদ্ধ। উদাহরণত সাক্ষী থাকা এবং বিয়ে নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য না হওয়া ইত্যাদি)। শুধু কাম-প্রবৃত্তিই চরিতার্থ করবে না (যিনা, মুত'আ সবই এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত ; যদিও তাতে অর্থ ব্যয় করা হয়) অতঃপর (বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শরীয়ত-সিদ্ধ পন্থাসমূহের মধ্য থেকে) যে পন্থায় তোমরা নারীদেরকে ভোগ কর, (তার বিনিময়ে) তাদেরকে মোহরানা দাও যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং (এরূপ মনে করো না যে, এই নির্দিষ্ট পরিমাণে নামায-রোযার মত কমবেশি হতে পারে না ; বরং) নির্দিষ্ট হওয়ার পরও যার উপর (অর্থাৎ যে পরিমাণের উপর) তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পরে সম্মত হও, তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই। (উদাহরণত স্বামী মোহরানা বৃদ্ধি করে দিল কিংবা স্ত্রী হ্রাস করে দিল অথবা মাফই করে দিল—সব দুরস্ত।) নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত জ্ঞানী (তোমাদের উপযোগিতা খুব জানেন), গভীর রহস্যবিদ (এ সব উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান নির্ধারণ করেছেন; যদিও কোন কোনটি তোমাদের বোধগম্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না ; তাদেরকে 'মোহাররামাতে-আবাদীয়্যা' (চিরতরে হারাম) বলা হয়। কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত তিন প্রকার ঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে তখন পর্যন্ত হারাম।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ —জাহিলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিতো। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে 'আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মাসআলা ঃ আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোন কথা নেই যে, পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে। কাজেই যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনও হালাল নয়।

এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয় ; যদিও পুত্র শুধু বিয়েই করে—সহবাস না করে। আল্লামা শামী বলেন ঃ

تحرم زوجة الاصل و الفرع بمجرد العقد دخل بها او لا.

মাসআলা ঃ যদি পিতা কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তবুও তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ —অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَبَنَاتُكُمْ —স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।

মোটকথা কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম এবং অন্য স্বামীর ঔরসজাত সৎকন্যাকে বিয়ে করা জায়েয কি না—সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয় ; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে বিয়ে করা জায়েয—যদি অন্য কোন পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরস্ত নয়।

وَاَخَوَاتُكُمْ —সহোদরা ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী ভগিনীকেও বিয়ে করা হারাম।

وَعَمَّاتُكُمْ—পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

وَخَالَاتُكُمْ—আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

وَبَنَاتُ الْاَخِ —ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম, আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক— বিয়ে হালাল নয়।

وَبَنَاتُ الْاُخْتِ —বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগ্নীর সাথেও বিয়ে করা হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

وَاُمَّهَاتُكُمُ الّتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ —যেসব নারীর স্তন্যপান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশি, একবার পান করুক কিংবা একাধিক বার—সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে 'হুরমতে-রিযাআত' বলা হয়।

তবে এতটুকু স্মরণ রাখা জরুরী যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময়ে দুধ পান করলেই এই হুরমতে-রিযাআত কার্যকরী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انما الرضاعة من المجاعة —অর্থাৎ দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। —(বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)সহ অন্যান্য ফিকহ্‌বিদের মতে মাত্র দুবছর বয়স পর্যন্ত দুগ্ধ পান করলে

অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর ফতোয়াও তাই। কোন বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ —অর্থাৎ দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদের ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীলোকের ভাসুর ও দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পরে বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পরে যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

মাসআলা ঃ একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

মাসআলা ঃ দুধ ভাই কিংবা দুধ বোনের বংশগত মাকে বিয়ে করা জায়েয এবং বংশগত বোনের দুধ-মাকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে দুধ বোনের বংশগত বোনের সাথে এবং বংশগত বোনের দুধ-বোনের সাথেও বিয়ে জায়েয।

মাসআলা ঃ দুধ পানের সময়কালে মুখ কিংবা নাকের পথে দুধ ভেতরে গেলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়। যদি অন্য কোন পথে দুধ ভেতরে প্রবেশ করানো হয় কিংবা দুধের ইনজেকশন দেওয়া হয়, তবে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধ ; যেমন চতুষ্পদ জন্তু কিংবা পুরুষের দুধ দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না।

মাসআলা ঃ যদি দুধ ঔষধে কিংবা গরু-ছাগলের দুধের সাথে মিশ্রিত হয়, তবে দুধ পানজনিত অবৈধতা তখন প্রমাণিত হবে, যখন নারীর দুধ পরিমাণে অধিক হয়। সমান সমান হলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়, কম হলে নয়।

মাসআলা ঃ কোন পুরুষের বুকে যদি দুধ হয় এবং তা কোন শিশু পান করে তবে এ দুধ পানের দ্বারা দুধ পানজনিত অবৈধতা বর্তায় না।

মাসআলা ঃ দুধ পান করার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তদ্দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। যদি কোন মহিলা কোন শিশুর মুখে স্তন দেয়, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে তাতে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না এবং বিয়ে হালাল হবে।

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো, অতঃপর অন্য এক মহিলা বললো ঃ আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি, যদি তারা উভয়ে এ কথার সত্যায়ন করে, তবে বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে যদি মিথ্যা বলে এবং মহিলা ধার্মিকা ও আল্লাহ্ভীরু হয়, তবু বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে না। কিন্তু এর পরও তালাকের মাধ্যমে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উত্তম।

মাসআলা ঃ দুধপান-জনিত অবৈধতা প্রমাণ করার জন্য দুইজন ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা দুগ্ধপান প্রমাণিত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু হারাম ও হালালের, তাই সাবধানতা উত্তম। এমন কি, কোন কোন ফিক্হবিদ লিখেছেন যে, যদি কোন মহিলা বিয়ে করার সময় একজন ধার্মিক পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এরা উভয়েই দুধ ভাইবোন, তবে বিয়ে জায়েয হবে না। বিয়ের পরে সাক্ষ্য দিলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উত্তম। এমনকি একজন মহিলা সাক্ষ্য দিলেও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করাই উত্তম হবে।

মাসআলা ঃ দু'জন ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা যেমন দুগ্ধপানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তেমনি একজন ধার্মিক পুরুষ ও একজন ধার্মিকা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারাও এ অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে থাকে। তবে সাক্ষীর নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ না হলেও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অবৈধতাকে অগ্রাধিকার দান করা উচিত।

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ —স্ত্রীদের মাতাও স্বামীর জন্য হারাম। এখানেও স্ত্রীদের নানী, দাদী বংশগত হোক কিংবা দুধগত—সবাই অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলা ঃ বিবাহিত স্ত্রীর মা যেমন হারাম, তেমনি ঐ মহিলার মাও হারাম, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে কিংবা যাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে।

মাসআলা ঃ শুধু বিবাহ দ্বারাই স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যায়। এর জন্য সহবাস ইত্যাদি জরুরী নয়।

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

—যে মহিলাকে বিয়ে করে সহবাসও করেছে, সেই মহিলার অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী হারাম হয়ে যায়। তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি সহবাস না হয়—শুধু বিয়ে হয়, তবে উল্লিখিত নারীরা হারাম হয় না। বিয়ের পর যদি তাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা তার গুপ্ত অঙ্গের অভ্যন্তরে কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তবে এগুলোও সহবাসের পর্যায়ভুক্ত। ফলে স্ত্রীর কন্যা হারাম হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ এখানে نِسَائِكُمْ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত ; কাজেই ঐ মহিলার কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রীও হারাম হয়ে যায়, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে।

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ —পুত্রের স্ত্রী হারাম। পৌত্র, দৌহিত্রও পুত্র শব্দের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের স্ত্রীকে বিয়ে করাও জায়েয হবে না।

مِنْ أَصْلَابِكُمْ —কথাটি পোষ্যপুত্রকে বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। দুধ-পুত্রও বংশগত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম।

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ —দুই বোনকে বিয়েতে একত্রিত করাও হারাম সহোদর বোন হোক কিংবা বৈমাত্রেয়ী কিংবা বৈপিত্রেয়ী হোক, বংশের দিক দিয়ে হোক, কিংবা দুধের দিক দিয়ে—এ বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য। তবে এক বোনের তালাক হয়ে যাওয়ার পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে কিংবা মৃত্যু হলে অপর বোনকে বিয়ে করা জায়েয—ইদ্দতের মাঝখানে জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ যেভাবে এক সাথে দুই বোনকে এক ব্যক্তির বিয়েতে একত্রিত করা হারাম, তেমনি ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও খালা ও ভাগ্নেয়ীকেও এক ব্যক্তির বিয়েতে একত্রিত করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لايجمع بين المرأة وعمتها ولابين المرأة وخالتها (বুখারী, মুসলিম)

মাসআলা ঃ ফিক্‌হবিদগণ একটি সামগ্রিক নীতি হিসাবে লিখেছেন ঃ প্রত্যেক এমন দুজন মহিলা, যাদের মধ্যে একজনকে পুরুষ ধরা হলে শরীয়ত মতে উভয়ের পরস্পর বিয়ে দুরস্ত হয় না, তারা একজন পুরুষের বিয়েতে একত্রিত হতে পারে না।

اِلاَّ قَدْ سَلَفَ —অর্থাৎ জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এ বাক্যটি وَلَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানেও এই অর্থই যে, জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু ঘটেছে, মুসলমান হওয়ার পর তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। তবে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

এমনিভাবে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সময় পিতার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা দুই বোন একত্রিত থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরী। দুই বোন থাকলে এক বোনকে পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য।

বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বুরদা ইবনে দীনারকে জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। কারণ সে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। —(মিশকাত)

ইবনে-ফিরোয দায়লামী পিতার কথা বর্ণনা করেন ঃ যখন আমি মুসলমান হই, তখন দুই বোন এক সঙ্গে আমার স্ত্রী ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ তাদের একজনকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং একজনকে রেখে দাও।—(মিশকাত)

এ সব রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, মুসলমান অবস্থায় যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার বিবাহিতা স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয নয়, তেমনি কাফির অবস্থায় এরূপ বিয়ে হয়ে থাকলে মুসলমান হওয়ার পর তা বহাল রাখাও জায়েয হবে না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا —মুসলমান হওয়ার পূর্বে তারা নির্বুদ্ধিতাবশত যা কিছু করেছে, মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহ্ তার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি দয়ার চোখে চাইবেন।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ —অর্থাৎ যাদের স্বামী রয়েছে, এমন (সধবা) নারীও হারাম। যতদিন কোন মহিলা কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, অন্য ব্যক্তি তাকে বিয়ে করতে পারে না। এ

থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, একজন মহিলা একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান যুগের কোন কোন মূর্খ ধর্মদ্রোহী বলতে শুরু করেছে যে, পুরুষদের জন্য যখন একাধিক স্ত্রীর অনুমতি রয়েছে, তখন নারীদের জন্যও একাধিক স্বামী ভোগ করার অনুমতি থাকা উচিত। এ দাবি আলোচ্য আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই মূর্খরা বোঝে না যে, পুরুষের জন্য বহু-বিয়ে একটি নিয়ামত। এটা প্রত্যেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বৈধ। মানবেতিহাস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু নারীর জন্য এক সময়ে একাধিক স্বামী থাকা স্বয়ং নারীর জন্যও বিপদের কারণ এবং যে দুজন পুরুষ এক নারীকে বিয়ে করবে, তাদের জন্যও নিছক নির্লজ্জতা। এ ছাড়া এতে সন্তানের বংশ নির্ধারণেরও কোন পথ খোলা থাকে না। যখন কয়েকজন পুরুষ একজন নারীকে ভোগ করবে, তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাকে তাদের মধ্য থেকে কোন একজনের সন্তান সাব্যস্ত করার কোন উপায় থাকবে না। এ ধরনের জঘন্যতম দাবি তারাই করতে পারে, যারা মানবতার জঘন্য দুশমন এবং যাদের লজ্জাশরমের ধারণা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। সন্তান ও পিতা-মাতার অধিকারের মাধ্যমে যে রহমত আত্মপ্রকাশ করে, এরা তা থেকে সমগ্র মানবতাকে বঞ্চিত করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। যখন বংশ প্রমাণিত হবে না, তখন পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের দায়িত্ব কার স্কন্ধে আরোপ করা হবে?

খাঁটি স্বভাব ও যুক্তির দিক দিয়েও যদি দেখা যায়, তবে একজন নারীর জন্য একাধিক স্বামী থাকার কোন বৈধতা দৃষ্টিগোচর হয় না।

(১) বিয়ের বুনিয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে বংশ বিস্তার। এ দিক দিয়ে একাধিক মহিলা তো একজন পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে ; কিন্তু একজন নারী একাধিক পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে না। সে একজন দ্বারাই গর্ভবতী হবে। তাই একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় একজন ছাড়া অবশিষ্ট সব স্বামীর শক্তি বিনষ্ট হবে। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপকার অর্জিত হবে না।

(২) অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, নারী নরের তুলনায় অবলা। সে বছরের অধিকাংশ সময়ে ভোগ করারও যোগ্য থাকে না। কোন কোন অবস্থায় তার পক্ষে একজন স্বামীর হক পূর্ণ করাও সম্ভবপর হয় না। একাধিক স্বামী হলে কি অবস্থা হবে, তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

(৩) যেহেতু পুরুষ দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে নারীর তুলনায় অধিক সবল, তাই যদি কোন পুরুষের যৌনশক্তি স্বাভাবিকের চাইতে বেশি হয় এবং একজন নারী দ্বারা সে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তবে তার জন্য বৈধ পন্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিয়ের সুযোগ থাকা দরকার। নতুবা সে অন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবে এবং গোটা সমাজকে দূষিত করবে; কিন্তু নারী দ্বারা এমন অনর্থ সৃষ্টির আশংকা কম।

ইসলামী শরীয়তে এ বিষয়টির গুরুত্ব এত অধিক যে, শুধু স্বামীর বর্তমানে নারীর অন্য বিয়েকে হারাম করা হয়নি; বরং কোন নারীর স্বামী তালাক দিয়ে দিলে কিংবা মারা গেলে তার ইদ্দত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্তও অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হতে পারে না।

اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ –এ বাক্যটি وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ থেকে ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সধবা স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তির বিয়ে করা জায়েয নয়। কিন্তু কোন নারী যদি মালিকানাধীন দাসী

হয়ে আসে, তবে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। মুসলমানরা যদি দারুল-হরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং সেখান থেকে কিছু সংখ্যক নারী বন্দী করে আনে ; তবে এদের মধ্যে যে নারী দারুল-ইসলামে আসে এবং তার স্বামী দারুল-হরবে থেকে যায়, তার বিয়ে দারুল ইসলামে আসার কারণে পূর্ব স্বামীর সাথে ভেঙে যায়। এখন এই নারী ইহুদী, খৃস্টান কিংবা মুসলমান হলে দারুল ইসলামের যে কোন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে পারে। আমীরুল মু'মিনীন যদি তাকে দাসী করে কোন সিপাহীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের মধ্যে দিয়ে দেয়, তবুও তাকে ভোগ করা জায়েয। কিন্তু এই বিয়েও ভোগ করা এক হায়েয আসার পরে কিংবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার পর জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন কাফির মহিলা দারুল-হরবে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফির থাকে, তবে শরীয়তের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। যদি সে অস্বীকার করে, তবে বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করবে। এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। এরপর ইদ্দত অতিবাহিত হলে মহিলা যে কোন মুসলমানকে বিয়ে করতে পারবে।

كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ — অর্থাৎ যেসব হারাম নারীর কথা উল্লেখ করা হলো, তাদের অবৈধতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মীমাংসিত।

কুরতুবী বলেন ঃ اى حرمت هذه النساء كتابًا من الله عليكم অর্থাৎ উপরোক্ত নারীদের বিয়ে না করার নির্দেশ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের প্রতি মীমাংসিত করে দেওয়া হয়েছে।

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ — অর্থাৎ উল্লিখিত হারাম নারীদের ছাড়া অন্যান্য নারী তোমাদের জন্য হালাল। উদাহরণত চাচার মেয়ে, খালার মেয়ে, মামাত বোন, মামা ও চাচার স্ত্রী—তাদের মৃত্যু অথবা তালাকের পর যদি তারা অন্য কোন সম্পর্ক দ্বারা হারাম না হয়। পালক পুত্রের স্ত্রী—যদি সে তালাক দিয়ে দেয় কিংবা মারা যায়, স্ত্রী মারা গেলে তার বোন–ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার আছে যাদের সবাইকে مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা ঃ এক সময়ে চারজনের অধিক নারীকে বিবাহে রাখা জায়েয নয়। সূরা আন্-নিসার শুরুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নিকটবর্তী কোন আয়াতে এর উল্লেখ না দেখে কেউ যেন ভুল করে না বসে যে, مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ -এর অর্থে ব্যাপকতার কারণে কোন বাধা-নিষেধ ছাড়াই নারীদেরকে বিয়ে করা জায়েয। এছাড়া অনেক হারাম নারীর কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। তফসীর প্রসঙ্গে আমরা সেগুলো বর্ণনাও করেছি।

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ –অর্থাৎ হারাম নারীদের বর্ণনা এজন্য করা হয়েছে,যাতে তোমরা স্বীয় অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর এবং তাদের বিয়ে কর।

আবূ বকর জাস্‌সাস (র) 'আহ্‌কামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন ঃ এ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। এক. মোহর ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না ; এমন কি, যদি স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সিদ্ধান্ত নেয় যে, মোহর ব্যতীত বিয়ে হবে, তবুও মোহর অপরিহার্য হবে। এর বিবরণ ফিক্‌হ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। দুই. মোহর এমন বস্তু হতে হবে, যাকে 'মাল' বলা যায়।

হানাফীদের মাযহাব এই যে, দশ দিরহামের কম মোহর হওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য যে, সাড়ে তিন মাষা রৌপ্যে এক দিরহাম হয়।

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ — অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারী তালাশ কর এবং জেনো, মহিলাদের তালাশ সততা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য, যা বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিয়ের মাধ্যমে এটিই অর্জন কর ; অর্থ ব্যয় করে ব্যভিচারের জন্য নারী তালাশ করো না।

এতে বোঝা গেল যে, ব্যভিচারীও অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু সে অর্থ ব্যয়ও হারাম। এ অর্থ দ্বারা যে নারী অর্জন করা হয়, তাকে ভোগ করা হালাল হয় না।

غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ — শব্দ বৃদ্ধি করে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্যভিচারের মধ্যে শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ও বীর্যপাত করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা, এতে সন্তানের বাসনা ও বংশ রক্ষার ইচ্ছা থাকে না। মুসলমানদের পবিত্র থাকা এবং মানব-বংশ বৃদ্ধি করার জন্য স্বীয় শক্তিকে যথাস্থানে ব্যয় করা উচিত। এর পন্থা হচ্ছে বিয়ে ও খরিদমুক্ত ক্রীতদাসীর মালিকানা।

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً — অর্থাৎ বিয়ের পরে যেসব নারীকে ভোগ করবে, তাদের মোহর দিয়ে দাও। এটা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

এ আয়াতে استمتاع (ভোগ করা) বলে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বোঝানো হয়েছে। যদি শুধু বিয়ে হয়, স্বামীর ঘরে না যায় এবং স্বামী ভোগ করার সুযোগ না পায় ; বরং তার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়, তবে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়। ভোগ করার সুযোগ পেলেই সম্পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়। এ আয়াতে বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, যখন তোমরা কোন নারীকে ভোগ করে ফেল, তখন তাকে মোহর দেওয়া তোমাদের উপর সর্বতোভাবে ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ত্রুটি করা শরীয়তের আইনের খেলাফ। মানবিক লজ্জাবোধেরও তাকীদ এই যে, বিয়ের উদ্দেশ্য যখন হাসিল হয়ে গেছে, তখন স্ত্রীর অধিকার প্রদানে ত্রুটি ও টালবাহানা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে শরীয়ত স্ত্রীকে এ অধিকারও দেয় যে, মোহর 'মুয়াজ্জল' (অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য) হলে মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করতে পারে।

মুতার অবৈধতা : استمتاع — শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে م ت ع –এর অর্থ ফল লাভ হওয়া। কোন ব্যক্তি অথবা অর্থের দ্বারা ফল লাভ করলে তাকে استمتاع বলা হয়। ব্যাকরণের দিক দিয়ে কোন শব্দের ধাতুতে س ও ت সংযুক্ত করলে চাওয়া ও অর্জনের অর্থ সৃষ্টি হয়। এই আভিধানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ -এর সোজা অর্থ সমগ্র উম্মতের মতে আমরা এইমাত্র উপরে যা বর্ণনা করেছি, তাই। কিন্তু একদল বলে যে, এখানে পারিভাষিক এবং প্রচলিত 'মুতা' বোঝানো হয়েছে। তাদের মতে আয়াতটি মুতা হালাল হওয়ার প্রমাণ। অথচ যাকে মুতা বলা হয়, আয়াত مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ দ্বারা তা রদ হয়ে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা পরে বর্ণিত হবে।

একদল লোক পরিভাষাগত মূতা বৈধ বলে দাবি করে। পরিভাষাগত মূতা হচ্ছে কোন নারীকে এরূপ বলা যে, এতদিনের জন্য এত টাকার বিনিময়ে কিংবা অমুক দ্রব্যের বিনিময়ে তোমার সাথে মূতা করছি। আলোচ্য আয়াতের সাথে পরিভাষাগত মূতার কোন সম্পর্ক নেই; শুধু শব্দটির মূলের প্রতি লক্ষ্য করেই এ দল দাবি করছে যে, আয়াত দ্বারা মূতার বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রথম কথা এই যে, যখন অন্তত অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা থাকবে (যদিও আমাদের মতে তা নির্দিষ্ট), তখন প্রমাণের পথ কি থাকতে পারে ?

দ্বিতীয় কথা এই যে, কোরআন পাক হারাম নারীদের কথা উল্লেখ করার পর বলেছে : তাদের ছাড়া স্বীয় অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর—এমতাবস্থায় যে, তোমরা 'বীর্যপাতকারী' না হও। অর্থাৎ শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যেন না হয়। সাথে সাথে محصنين কথাটিও যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্রতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। মূতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। তাই এতে সন্তান লাভ, ঘর-সংসার পাতা এবং পবিত্রতা ও সাধুতা উদ্দেশ্য থাকে না। এ জন্যই যে নারীর সাথে মূতা করা হয়, যারা মূতাকে হালাল বলতে চায় তারাও তাকে ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারিণী স্ত্রী সাব্যস্ত করে না এবং প্রচলিত স্ত্রীদের মধ্যেও গণ্য করে না। যেহেতু এর উদ্দেশ্য শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, তাই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সাময়িকভাবে নতুন নতুন নারী ও পুরুষ খুঁজে বেড়ায়। এমতাবস্থায় মূতা সাধুতা ও পবিত্রতার সহায়ক নয় বরং দুশমন।

হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম মালেক এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি মূতার বৈধতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হিদায়ার টীকাকার অন্যরা পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে হিদায়ার গ্রন্থকার ভুল করেছেন।

তবে কেউ কেউ দাবি করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) শেষ পর্যন্ত মূতার বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন; অথচ আসল ব্যাপার তা নয়। ইমাম তিরমিযী (র) ما جاء فى نكاح المتعة অধ্যায়ের আওতায় দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসটি এই :

عن على بن ابى طالب ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الا هلية زمن خيبر-

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খয়বর যুদ্ধের সময় নারীদের সাথে মূতা করতে এবং পালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আলী (রা)-এর এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফেও উদ্ধৃত রয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসটি এই :

عن ابن عباس قال انما كانت المتعة فى اول الاسلام حتى اذا نزلت الاية اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ- قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حَرَامٌ.

—"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ মূতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিল। অতঃপর যখন اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ—আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন তা রহিত হয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এরপর শরীয়তসম্মত স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া সর্বপ্রকার গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার করাই হারাম হয়ে গেছে।

একথা সত্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কিছুদিন পর্যন্ত মূতাকে জায়েয মনে করতেন। এরপর হযরত আলী (রা)-এর বোঝানোর ফলে (যেমন মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে) এবং - اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ আয়াতদৃষ্টে তিনি পূর্বমত পরিত্যাগ করেন। যেমন, তিরমিযীর উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, যে দলটি মূতার বৈধতার প্রবক্তা, তারা হযরত আলী (রা)-এর ভক্ত ও আনুগত্যের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধী।

فسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার কাযী আয়ায বর্ণনা করেন, খয়বর যুদ্ধের পূর্বে মূতা হালাল ছিল। খয়বর যুদ্ধের সময় হারাম করা হয়েছে। এরপর মক্কা বিজয়ের দিন হালাল করে দেওয়া হয় এবং তিনদিন পর চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়।

এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলার এই ফরমান এত সুস্পষ্ট যে, এতে দ্ব্যর্থতার কোন অবকাশ নেই। এ থেকে মূতার অবৈধতা পরিষ্কার বোঝা যায়। এর বিপরীতে কোন কোন অখ্যাত ক্বিরাআতের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্তই ভুল।

পূর্বেও বলা হয়েছে استمتعتم থেকে পারিভাষিক মূতা বুঝে নেওয়ার কোন প্রমাণ নেই। এটা নিছক একটা সম্ভাবনা اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ এর অকাট্য বিষয়বস্তুর কিছুতেই বিপরীত হতে পারে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, উভয় প্রমাণ শক্তিতে সমান, তবে বলা হবে যে, উভয় প্রমাণ বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী। যদি পরস্পর বিরোধিতা মেনে নেওয়া হয়, তবুও সুস্থ বিবেকের তাকীদ এই যে, অবৈধতা প্রতিপন্নকারীকে বৈধতা প্রতিপন্নকারীর বিপরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

মাসআলা ঃ মূতা বিয়ের মত 'মুয়াক্কাত' (সাময়িক) বিয়েও হারাম ও বাতিল। মুয়াক্কাত বিয়ে হলো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মূতা বিয়েতে 'মূতা' শব্দ বলা হয় এবং মুয়াক্কাত বিয়ে 'নিকাহ্' শব্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ—অর্থাৎ পরস্পর মোহর নির্দিষ্ট করার পর নির্দিষ্ট মোহর অকাট্য হয়ে যায় না যে, তাতে কম-বেশি করা যাবে না ; বরং স্বামী নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট মোহর বৃদ্ধি করতে পারে এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলে মনের খুশিতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ মোহর ক্ষমাও করতে পারে। শব্দের ব্যাপকতাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, স্ত্রী যদি মুয়াজ্জল

(অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য) মোহরকে বিলম্বে পরিশোধযোগ্য মোহরে রূপান্তরিত করে দেয় তবে তাও দুরস্ত এবং এতে কোন গোনাহ্ নেই।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا —আয়াতের শেষে এ বাক্যটি যুক্ত করে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব খবর রাখেন। কেউ যদি উল্লিখিত বিধানসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে যদিও কোন বিচারক, শাসক বা মানুষ তা না জানে ; কিন্তু আল্লাহ্ সব জানেন। তাঁকে সর্বাবস্থায় ভয় করতে থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, বর্ণিত সমস্ত বিধান হিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন সূক্ষ্ম বিষয়কে হিকমত বলা হয়, যা প্রত্যেকের বোধগম্য নয়। আয়াতে বর্ণিত অবৈধতা ও বৈধতা সম্পর্কিত বিধানাবলীর নিগূঢ় তাৎপর্য কারও বোধগম্য হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সেগুলো মেনে নেওয়া জরুরী। কেননা এ বিষয়ে আমাদের কারণ জানা না থাকলেও বিধানদাতা আল্লাহ্ তা'আলার তো জানা আছে, যিনি সর্বজ্ঞ ও রহস্যবিদ।

এ যুগের অনেক লেখাপড়া জানা মূর্খ লোক খোদায়ী বিধানের কারণ খুঁজে বেড়ায়। কোন কারণ জানা না গেলে, নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্র বিধানকে অনুপযোগী অথবা বর্তমান যুগের চাহিদার পরিপন্থী বলে এড়িয়ে যায়। আলোচ্য বাক্যে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ তোমরা মূর্খ, আল্লাহ্ তা'আলা বিজ্ঞ। তোমরা অবুঝ, আল্লাহ্ তা'আলা রহস্যবিদ। সুতরাং নিজের বুদ্ধিমত্তাকে সত্যাসত্যের মাপকাঠি করো না।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক ; অতএব তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মোহরানা

প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে—ব্যভিচারিণী কিংবা উপপতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। ঐ ব্যবস্থা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকেই বিয়ের বিধানাবলী বর্ণিত হয়ে আসছে। তাই এ প্রসঙ্গে এখন শরীয়তসম্মত দাসীদেরকে বিয়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। অতঃপর তাদের হক তথা শাস্তির বিধান সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, দাস ও দাসীর শাস্তি স্বাধীন পুরুষ ও নারীর শাস্তি থেকে ভিন্ন হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীদের বিয়ে করার পূর্ণ সামর্থ্য রাখে না, সে নিজেদের মধ্যকার মুসলমান দাসীদের যারা তোমাদের (শরীয়তসম্মত) মালিকানাধীন—বিয়ে করবে। (কেননা, অধিকাংশ দাসীর মোহর ইত্যাদি কম হয়ে থাকে এবং তাদেরকে গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে সংকোচও করা হয় না।) এবং (দাসীকে বিয়ে করতে সংকোচ করা উচিত নয়। কেননা, ধার্মিকতার দিক দিয়ে দাসী তোমাদের চাইতেও উত্তম হতে পারে। ধার্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানের উপর ভিত্তিশীল)। তোমাদের ঈমানের পূর্ণ অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন (যে, কে উত্তম, কে অধম। কেননা, এটা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। অন্তরের পূর্ণ খবর আল্লাহ্ তা'আলারই জানা আছে। পার্থিব দিক দিয়ে সংকোচের বড় কারণ হচ্ছে বংশের বড় পার্থক্য। বংশের আসল উৎস হলেন হযরত আদম ও হাওয়া [আ]। উৎসের এই অভিন্নতার দিক দিয়ে) তোমরা সবাই পরস্পর একে অন্যের সমান। তাহলে সংকোচের কি কারণ ? অতএব (সংকোচ না করার কারণ যখন জানা গেল, তখন উল্লিখিত প্রয়োজনের সময়) তাদেরকে বিয়ে কর, (কিন্তু তা) মালিকদের অনুমতিক্রমে (হওয়াও শর্ত) এবং তাদের (মালিকদের)-কে তাদের মোহরানা (শরীয়তের) নিয়মানুযায়ী প্রদান কর (এ মোহরানা প্রদান করা) এমতাবস্থায় (হবে) যখন, তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রী করা হবে—প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী ও গোপন অভিসারিণী হবে না। (অর্থাৎ মোহরানাটি বিবাহের বিনিময় অনুযায়ীই হবে—ব্যভিচারের পারিশ্রমিক হিসাবে দিলে দাসী হালাল হবে না) অতঃপর যখন দাসীদের বিবাহিতা স্ত্রী করে নেওয়া হয়, তখন যদি তারা বড় অশ্লীলতার কাজ (অর্থাৎ যিনা) করে, তবে (প্রমাণের পর মুসলমান হওয়ার শর্তে) তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক (প্রযোজ্য) হবে, যা (অবিবাহিতা) স্বাধীন নারীদের উপর হয়। (বিয়ের পূর্বেও দাসীদের বিয়ে করা ঐ ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত), যে তোমাদের মধ্যে (কামভাবের প্রবলতা ও স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার অসামর্থ্যতা হেতু) ব্যভিচারের (অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার) আশংকা রাখে। (যে ব্যক্তি এরূপ আশংকা রাখে না, তার জন্য দাসীকে বিয়ে করা উপযুক্ত নয়) এবং (যদি আশংকার অবস্থায়ও রিপুর উপর সংযম থাকে, তবে) (দাসীকে বিয়ে করার চাইতে)

তোমাদের সবর করা অধিক উত্তম। এবং (এমনিতে) আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল (যদি আশংকা না থাকা অবস্থায়ও বিয়ে করে ফেল, তবে তিনি পাকড়াও করবেন না এবং) করুণাময় (যে, দাসীকে বিয়ে করা অবৈধ বলে আদেশ দেননি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طول - এর অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতদূর সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত—দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব তাই। তিনি বলেন ঃ স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদী-খৃস্টান দাসীকে বিয়ে করা মকরূহ।

হযরত ইমাম শাফিয়ী (র) ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদী বা খৃস্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ।

মোট কথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় উত্তম। যদি অগত্যা করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে করবে। কারণ, দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক। অমুসলমান দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে জননীর চাল-চলন অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে যেতে পারে। অতএব, সন্তানকে গোলামির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঈমানদার বানানোর জন্য সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরুরী। দাসী হলে কমপক্ষে ঈমানদার হওয়া দরকার, যাতে সন্তানের ঈমান সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ স্বাধীন ইহুদী-খৃস্টান নারীকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, ইহুদী ও খৃস্টান রমণীরা আজকাল সাধারণত স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের বিয়ে করে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ –অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন। ঈমান শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। কোন কোন সময় গোলাম-বাঁদীও ঈমানের ক্ষেত্রে স্বাধীন পুরুষ ও নারী অপেক্ষা অগ্রে থাকতে পারে। কাজেই ঈমানদার দাসী বিয়ে করতে ঘৃণা করবে না ; বরং তার ঈমানের মূল্য দেবে।

শেষে বলা হয়েছে ঃ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ অর্থাৎ স্বাধীন ও গোলাম সবাই একই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সবাই একই সত্তা থেকে উদ্ভূত। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়া। মাযহারী বলেন ঃ

فهاتان الجملتان لتانيس الناس بنكاح الاماء ومنعهم عن الاستنكاف منهن–

অর্থাৎ মানুষ যাতে ক্রীতদাসীদের বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং একে ঘৃণার যোগ্য মনে না করে, সে জন্য এ দু'টি বাক্যের অবতারণা করা হয়েছে।

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۔

অর্থাৎ মালিকদের অনুমতিক্রমে দাসীদের বিয়ে কর। তারা অনুমতি না দিলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ, দাসীর নিজের উপরও কোন কর্তৃত্ব নেই। গোলামের অবস্থাও তদ্রূপ। সে প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ বাঁদীদের বিয়ে করে তাদের মোহরানা উত্তম পন্থায় আদায় করে দাও ; অর্থাৎ টালবাহানা করো না এবং পুরোপুরি আদায় কর, বাঁদী মনে করে কষ্ট দিও না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেকের মাযহাব এই যে, মোহর বাঁদীর প্রাপ্য। ইমামগণ বলেন ঃ বাঁদীর মোহরানার অর্থের মালিকও তার প্রভু।

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ অর্থাৎ মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে কর এমতাবস্থায় যে, সতী-সাধ্বী হয়, প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী ও গোপন অভিসারিণী যেন না হয়। যদিও এখানে বাঁদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিয়ের জন্য সতী-সাধ্বী বাঁদী অন্বেষণ কর ; কিন্তু স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকাও উত্তম।

আয়াত থেকে জানা গেল যে, স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে বাঁদীকে বিয়ে কর। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মূতা বৈধ নয়। কারণ, মূতা বৈধ হলে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য মূতাই ছিল সহজতম পথ। এতে যৌন-বাসনারও পরিতৃপ্তি হতো এবং আর্থিক বোঝাও বিয়ের তুলনায় অনেক কম হতো।

এছাড়া আয়াতে বাঁদীদের বিশেষণে مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু কামসঙ্গিনীই হবে না। মূতার বেলায় কেবল কামসঙ্গিনী হওয়া ছাড়া কিছুই হয় না। একজন নারী অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক ব্যক্তির ব্যবহারে আসে। এমতাবস্থায় যেহেতু সন্তানকে কারও সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না, তাই এতে বংশ-বিস্তারের উপকারও লাভ হয় না এবং সবার শক্তি শুধু যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যেই বিনষ্ট হয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ। অর্থাৎ বাঁদীরা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের সতী-সাধ্বী থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়, তখন যদি যিনা করে বসে, তবে এরা স্বাধীন নারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক শাস্তি ভোগ করবে। এখানে অবিবাহিতা স্বাধীন নারী বোঝানো হয়েছে। অবিবাহিতা স্বাধীন নারী বা পুরুষ যিনা করলে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করা হয়। সূরা আন-নূরের দ্বিতীয় আয়াতে এর উল্লেখ আছে। বিবাহিতা নারী বা পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি হচ্ছে রজম অর্থাৎ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। যেহেতু এ শাস্তি অর্ধেক করা যায় না, তাই চারজন ইমামেরই মাযহাব হচ্ছে—গোলাম ও বাঁদী বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত, তারা যিনা করলে শাস্তি হবে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। বাঁদীদের বিধান তো আয়াতেই উল্লেখিত আছে, গোলামের

বিধানও এ থেকেই বোঝা যায়। ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ —অর্থাৎ বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য, যার যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ —অর্থাৎ যিনার আশংকা সত্ত্বেও যদি সবর কর এবং নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে পার, তবে এটা তোমাদের জন্য বাঁদীকে বিয়ে করার চাইতে উত্তম।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ —অর্থাৎ বাঁদীকে বিয়ে করা মকরূহ্। যদি এই মকরূহ কাজ করে ফেল, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন। তিনি দয়ালুও বটে। কারণ, তিনি বাঁদীকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন ; নিষিদ্ধ করেননি।

উল্লিখিত আয়াতের তফসীরে গোলাম ও বাঁদী বলতে শরীয়তের শর্ত অনুযায়ী অধিকৃত গোলাম ও বাঁদীকেও বোঝানো হয়েছে। এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, শরীয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদী কারা ? ইসলামী জিহাদে যেসব নারী ও পুরুষকে বন্দী করা হতো এবং আমীরুল-মু'মিনীন মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দিতেন, তারাই বাঁদী ও গোলামে পরিণত হতো। তাদের বংশধরও গোলাম-বাঁদী থেকে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। যেদিন থেকে মুসলমানরা শরীয়তের জিহাদ পরিত্যাগ করেছে এবং জিহাদ, শান্তি ও যুদ্ধের ভিত্তি ধর্মদ্রোহীদের ইশারা-ইঙ্গিতের উপর রেখে দিয়েছে, সেদিন থেকে তারা গোলাম ও বাঁদী থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের চাকর-নকর এবং গৃহ-পরিচারিকারা গোলাম-বাঁদী নয়। কারণ, তারা স্বাধীন ও মুক্ত।

কোন কোন এলাকায় শিশুদেরকে বিক্রি করা হয় এবং গোলাম করে নেওয়া হয়। এটা পরিষ্কার হারাম। এতে তারা গোলাম হয়ে যায় না।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

---

(২৬) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সবকিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথপ্রদর্শন করতে চান এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (২৭) আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড় ; (২৮) আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিধানাবলীর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ বর্ণনা করেন যে, এসব বিধান প্রবর্তন করার মাঝে তোমাদের উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে ; যদিও তোমরা তা বিস্তারিত না বুঝ। অতঃপর সাথে সাথে এই সব বিধান পালন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের ঘৃণ্য দুরভিসন্ধি সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে যে, এরা তোমাদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কারণ, তারা তোমাদেরকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (উপরোক্ত বিষয়বস্তু এবং অন্য বিষয়বস্তুসমূহের বর্ণনা দ্বারা নিজের কোন উপকার চান না। এটা যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব ; বরং তোমাদের উপকারের জন্য) চান যে, (বিধানাবলীর আয়াতসমূহে তো) তোমাদের কাছে (তোমাদের উপযোগিতার বিধানাবলী) বর্ণনা করে দেন এবং (কিস্সা-কাহিনীর আয়াতসমূহে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তোমাদেরকে বলে দেন, (যাতে তোমাদের মধ্যে অনুসরণের আগ্রহ এবং বিরোধিতার প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়)। এবং (মোটামুটি অভিন্ন উদ্দেশ্য এই যে,) তোমাদের প্রতি (রহমত সহকারে) অভিনিবেশ করেন। (বর্ণনা করা এবং বলে দেওয়াই অভিনিবেশ। এতে আদ্যোপান্ত বান্দাদেরই উপকার)। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী (বান্দাদের উপযোগিতা জানেন) রহস্যবিদ (ওয়াজিব নয়, তবুও তিনি এসব উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বিধানাবলী ও কিসসা-কাহিনী বর্ণনা দ্বারা) আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তো তোমাদের অবস্থার প্রতি (রহমত সহকারে) অভিনিবেশ করা, আর (কাফির ও পাপাচারীদের মধ্য থেকে) যারা প্রবৃত্তি পূজারী, তারা চায় যে, তোমরা (সৎপথ থেকে) বিরাট বক্রতায় পড়ে যাও (এবং তাদের মতই হয়ে যাও)। সেমতে তারা নিজেদের কুৎসিত চিন্তাধারা মুসলমানদের কানে প্রবেশ করাতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বিধানাবলীর ক্ষেত্রে যেমন তোমাদের উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তেমনি সেগুলোকে সহজ করার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন ; যেমন বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা (বিধানাবলীতে) তোমাদের বোঝা হালকা (অর্থাৎ সহজও) করতে চান এবং (এর কারণ এই যে,) মানুষ (অন্য আদিষ্টদের তুলনায় দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে) দুর্বল সৃজিত হয়েছে। (তাই তার দুর্বলতার উপযোগী বিধানাবলী নির্ধারণ করেছে। নতুবা উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দুরূহ কর্ম নির্ধারণ করাতেও দোষ ছিল না। কিন্তু আমি সমষ্টিগতভাবে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। এটা খুব জ্ঞান-গরিমা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিয়ের অনেকগুলো বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তোমাদেরকে বিধানাবলী বলে দেন এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও পুণ্যবানদের অনুসৃত পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও হালালের এই বিবরণ শুধু তোমাদের জন্যই, বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত

হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল। তারা এসব বিধান পালন করে আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে।

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী যিনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে হারাম-হালাল বলে কোন কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। তোমরা তাদের কাছ থেকে হুঁশিয়ার থাকবে। কোন কোন ধর্মে নিষিদ্ধ নারীদেরকেও বিয়ে করা দুরস্ত। বর্তমান যুগে অনেক ধর্মদ্রোহী বিয়েপ্রথা খতম করার পক্ষে কাজ করছে। কোন কোন দেশে নারীকে "ইজমালী সম্পত্তি" সাব্যস্ত করার পাঁয়তারা চলছে। এসব কথাবার্তা তারাই বলে, যারা আপাদমস্তক প্রবৃত্তির গোলাম। ইসলামের কলেমা উচ্চারণকারী কিছুসংখ্যক দুর্বল বিশ্বাসী লোক এসব ধর্মদ্রোহীর সাথে ওঠাবসা করে এবং তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে ধর্মীয় বিধানাবলীকে এ যুগের জীবনধারার ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলে মনে করে। তারা শত্রুদের কথাবার্তাকে মানবতার উন্নতির পথ বলে ধারণা করতে শুরু করে। অজ্ঞাতসারেই এ খামখেয়ালীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তারা যেমন আধুনিক মতাদর্শের সমর্থক, তাদের ধর্মও যদি এর অনুমতি দিত ! নাউযুবিল্লাহ ! আল্লাহ্ পাক হুঁশিয়ার করেছেন যে, তোমরা এমন দুষ্টমতি লোকদের মতাদর্শ থেকে দূরে সরে থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হাল্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পারে। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। উভয় পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মোহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا — অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি ; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। বিয়ের পর মন ও দৃষ্টির পবিত্রতা এবং আরও অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়। ফলে উভয় পক্ষ শক্তি সঞ্চয় করে। সুতরাং বিয়ে দুর্বলতা দূর করার পারস্পরিক চুক্তি ও একটি অনুপম পন্থা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

(২৯) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৩০) আর যে কেউ সীমালংঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।

যোগসূত্র ঃ সূরা আন্-নিসার প্রথমে সমগ্র মানবজাতিকে একই পিতা-মাতার সন্তান এবং পরস্পর রক্ত সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলে উল্লেখ করে মানবজাতির পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণ এবং একে অন্যের হক প্রদানের প্রতি সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর ইয়াতীম ও স্ত্রীলোকদের অধিকার সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর ওয়ারিসী স্বত্বের বিশদ আলোচনা হয়েছে, যাতে নারী, ইয়াতীমসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক প্রদানের প্রতি তাকীদ রয়েছে। এরপর বিয়ের বিধি-নিষেধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকের সাথে বিয়ে বৈধ এবং কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকের সাথে তা বৈধ নয়। কেননা, বিয়ে একটা সম্পর্ক, যার দ্বারা একজন স্ত্রীলোকের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করার সুযোগ উপস্থিত হয়। আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মানুষেরই জান ও মালের পূর্ণ হিফাজতের বিধান এবং সেগুলোর মধ্যে যে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এতে নারী-পুরুষ, আপন-পর, মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। —(মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরস্পর একে অন্যের সম্পদ অন্যায় (হালাল নয় এমন) পন্থায় ভোগ করো না। তবে (যদি হালাল পন্থায় হয় যেমন) যদি কোন ব্যবসার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়, যা পরস্পরের সম্মতির মাধ্যমে আসে (অবশ্য শরীয়তের সকল শর্ত মোতাবেক যদি তা হয়) তবে তাতে দোষ নেই। (এটা ছিল সম্পদে হস্তক্ষেপ করার বিধান, অতঃপর জানের উপর হস্তক্ষেপের বিধান বলা হচ্ছে) এবং তোমরা একে অপরকে হত্যাও করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ। (এ জন্যই একে অন্যের ক্ষতি করার পন্থাগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বিশেষত কারো কোন ক্ষতি করলে পর সেও যেহেতু তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাই এরূপ পন্থা পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকেও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন)। এবং (যেহেতু ক্ষতি করার বিভিন্ন পন্থার মধ্যে হত্যাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, এজন্য হত্যার কঠিন পরিণাম বর্ণনা করে বলা হচ্ছে) যে ব্যক্তি এরূপ কাজ (অর্থাৎ হত্যা) করবে (এমনভাবে যে,) শরীয়তের সীমালংঘন করে (এ সীমালংঘনও ভুলক্রমে নয় বরং) জুলুমের বশবর্তী হয়ে, তবে খুব শীঘ্রই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) তাকে (দোযখের আগুনে প্রবেশ করাবো এবং এ বিষয়টি অর্থাৎ এরূপ শাস্তি প্রদান) আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ। (কোন যোগাড়-যন্তরের প্রয়োজন হবে না যে, এমন ধারণা হতে পারে যে, কোন সময় হয়ত সে যোগাড়-যন্তর না হওয়ার দরুন সে শাস্তির আশংকা বিদূরিত হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা বৈধ নয় ঃ আলোচ্য আয়াতের মধ্যে أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ—শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ "তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে"–এর দ্বারা তফসীরকারেরা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আবূ হাইয়্যান 'তফসীরে-বাহ্‌রে মুহীত'-এ বলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতে لَا تَأْكُلُوا বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খেয়ো না'। পরিভাষার বিচারে 'খেয়ো না' বলতে যে—কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন। কেননা, সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়।

باطل —শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায় পন্থায়' ; হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) এবং সাহাবীগণের মতে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাস-ভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

'বাতিল' পন্থায় খাওয়া ঃ কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দ بِالْبَاطِلِ বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। লেনদেন-এর ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, লেনদেন-এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোরআনে উল্লিখিত 'বাতিল' শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র। ফলে হাদীসে উল্লিখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃত পক্ষে কোরআনেরই নির্দেশ।

অবশ্য হাদীস শরীফে উল্লিখিত বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত প্রতিটি নির্দেশই প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনেরই নির্দেশ। এ গুলো কোরআনের কোন কোন আয়াত বা শব্দ থেকে প্রাপ্ত ইশারার ভিত্তিতেই প্রদান করা হয়েছে। সে শব্দ বা আয়াতের ইশারা আমাদের বোধগম্য হোক বা না হোক—তাতে কিছু যায়-আসে না।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করার পর দ্বিতীয় বাক্যে বৈধ পন্থাগুলোকে সে নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ‎•

অর্থাৎ অন্যের অধিকারভুক্ত সে সম্পদ হারাম নয়, যা ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত হয়।

একের মাল অন্যের নিকট হস্তান্তর করার বৈধ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ব্যবসা ছাড়া যদিও আরো অনেক পন্থা রয়েছে, যথা—ভাড়া, ঐচ্ছিক দান, হেবা, সদকা প্রভৃতি তবুও ব্যবসা-বাণিজ্যকেই অধিকতর প্রচলিত পন্থা হিসাবে গণ্য করা যায়।

অপরপক্ষে সাধারণভাবে 'তিজারত'-এর অর্থ শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইজারা, চাকুরী প্রভৃতি কায়িক শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থও 'তিজারত' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেমন মালের বিনিময়ে অর্থ লাভ হয়, তেমনি অন্যান্য পন্থায়ও শ্রম কিংবা অন্য কোন কিছুর বিনিময়েই অর্থলাভ হয়ে থাকে। ফলে সেগুলোও এক ধরনের 'তিজারত' বৈ কিছু নয়।—(মাযহারী)

সে হিসাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, অন্যায় পন্থায় কোন লোকের সম্পদ ভোগ করা হারাম। তবে যদি পারস্পরিক সম্মতির পন্থাসমূহ, যেমন—ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, চাকুরী প্রভৃতির মাধ্যমে তা হস্তান্তরিত হয়, তবে সে সম্পদের যে কোন রকম ভোগদখল জায়েয।

ব্যবসা ও শ্রম ঃ অন্যের সম্পদ লাভ করার বৈধ পন্থাগুলোর মধ্যে শুধু 'তিজারত' শব্দটি উল্লেখ করার একটা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, জীবিকার্জনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে ব্যবসা ও শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

সাহাবী হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—জীবিকার্জনের কোন্ পদ্ধতিটি সর্বোত্তম ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

عمل الرجل بيده وكل مبيع مبرور (رواه احمد و حاكم)

অর্থাৎ ব্যক্তির হাতের শ্রম অথবা সমস্ত ধোঁকা-ফেরেবহীন পরিচ্ছন্ন ও সৎ বেচাকেনা। —(তারগীব ও তারহীব, মাযহারী)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء

—সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গী হবে। —(তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة

—সৎ ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে থাকবে। —(ইসফাহানী, তারগীব)

সৎ-রোজগারের শর্তাবলী ঃ হযরত মুআয-ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন—সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে, তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। কোন পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেওয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘোরাবে না। অপরপক্ষে তার কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না। —(ইসফাহানী, তফসীরে-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

انّ التجار يبعثون يوم القيامة فجّاراً الا من اتقى الله وبر وصدق. (اخرجه الحاكم عن رفاعة بن رافع)

অর্থাৎ—যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে এবং সত্য বলে—সে সব লোক ছাড়া কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহ্‌গারদের কাতারে উত্থিত হবে।

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দুটি শর্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সে সব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা।

তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম। ফিকহ্‌বিদদের পরিভাষায় প্রথম পন্থাটিকে 'বাতিল' এবং দ্বিতীয়টিকে 'ফাসিদ' ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

মোট কথা, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মালের হস্তান্তরকেই 'তিজারত' বা ব্যবসা বলা হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন এক পক্ষে মাল থাকে এবং অন্যপক্ষে মাল না থাকে, তবে একে ব্যবসা বলা যায় না। যেমন–কেউ যদি এমন কোন পণ্য অগ্রিম বিক্রয় করে, যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাতে আসা না-আসার কোন নিশ্চয়তা নেই, তবে সেটা ব্যবসা না হয়ে প্রতারণার পর্যায়ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

সুদের অবস্থাও অনেকটা তাই। সুদ বাবদ যা আদায় করা হয়, তা একটা সময়সীমার বিনিময় মাত্র। কিন্তু সময় যেহেতু কোন নির্দিষ্ট পণ্য নয়, তাই এর বিনিময় হতে পারে না। জুয়া এবং ফটকাবাজারীর মধ্যেও অনুরূপ অনিশ্চয়তা থাকে বলেই তা তিজারত নয়, সম্পদ অর্জনের 'বাতিল' পন্থা মাত্র।

পারস্পরিক সন্তুষ্টির তাৎপর্য ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তৃতীয় একটা পন্থা এমনও হতে পারে যে, তাতে উভয় পক্ষ থেকেই মালের আদান-প্রদান হয় এবং দৃশ্যত সন্তুষ্টিও দেখা যায়। কিন্তু এ পন্থায় এক পক্ষ যেহেতু অনন্যোপায় হয়ে ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তাই বাহ্যত স্বাভাবিক ব্যবসা মনে হলেও পূর্বোক্ত দুটি পন্থার ন্যায় এটাও বাতিল এবং হারাম পন্থার অন্তর্ভুক্ত বলে ফিকহ্‌বিদরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, কেউ বাজারের কোন একটা আবশ্যকীয় পণ্যের সমগ্র মওজুদ ক্রয় করে গুদামজাত করে ফেললো। অতঃপর সে তার ইচ্ছামত মূল্য নির্ধারণ করে তা বিক্রয় করতে শুরু করলো। এ অবস্থায় ক্রেতারা যেহেতু অনন্যোপায় হয়ে এ বর্ধিত মূল্য প্রদান করতে বাধ্য হয়, তাই এ ক্রয়-বিক্রয় যে সন্তুষ্টির সাথে হয় না, তা সুনিশ্চিত। এ কারণেই এরূপ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ গ্রাস করার পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং হারাম।

অনুরূপ কোন স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে এরূপ ব্যবহার শুরু করে, যার ফলে স্ত্রী মোহর মাফ করে দিতে বাধ্য হয়, তবে এ অবস্থায় যেহেতু সে ক্ষমা আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রসূত নয়, তাই এটাও অর্থ আত্মসাৎ করার বাতিল পন্থারই অন্তর্ভুক্ত।

তেমনি কেউ যদি লক্ষ্য করে যে, তার ন্যায্য ও বাঞ্ছিত কাজ উৎকোচ ছাড়া সমাধা হওয়ার নয়, তখন যদি সে খুশির সাথেই কিছু দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয়, তবে সেটাও সন্তুষ্টির সাথে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না। এরূপ আদান-প্রদানও বাতিল পন্থারই অন্তর্ভুক্ত।

এ আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, আয়াতে উল্লিখিত ঃ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَـارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. বাক্যের মর্মানুযায়ী তিজারত বা ক্রয়-বিক্রয়ের শুধু সে সমস্ত পন্থাই জায়েয, যেগুলো রাসূল (সা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সমর্থিত হয়েছে। ফিকহ্‌বিদগণ শুধু এসব পন্থা লিপিবদ্ধ করেই ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের তিজারত অধ্যায়টি সংকলিত করেছেন। এ ছাড়া তিজারত ও লেন-দেনের অন্যান্য যেসব পন্থা বর্তমান রয়েছে, ইসলামী কানুন মুতাবিক সে সবগুলোই বাতিল এবং হারাম পন্থা ।

আয়াতে উল্লিখিত 'বাতিল' শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর আওতায় স্বাভাবিক লেনদেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ পন্থাসমূহের সীমারেখা বহির্ভূত অন্য সব পন্থাই শামিল রয়েছে।

আয়াতের তৃতীয় বাক্য ঃ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ –এর শাব্দিক অর্থ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করো না, –তফসীরকারদের সর্ব সম্মতিক্রমে আত্মহত্যাও এ আয়াতে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যকে হত্যা করার অবৈধতাও এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত।

আয়াতের প্রথম বাক্যে মানবসমাজের পারস্পরিক অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ এবং তৎপ্রতি বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছিল। আয়াতের এ অংশে জানের হিফাযত এবং তৎসম্পর্কিত অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমে মালের উল্লেখ করে পরে জানের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, জানের চাইতে অর্থনৈতিক অধিকারের সীমালংঘনের প্রবণতা ব্যাপক এবং খুব সহজেই মানুষ এতে জড়িত হয়ে পড়ে। হত্যা ও খুন-জখম যদিও অর্থনৈতিক অধিকার লংঘনের তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক অপরাধ, সন্দেহ নেই, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতার চাইতে হত্যার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا —অর্থাৎ এ আয়াতে যে সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যথা, অন্যের সম্পদ অন্যায় পন্থায় আত্মসাৎ করো না কিংবা কাউকে হত্যা করো না—এসব নির্দেশ তোমাদের জন্যও আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ বিশেষ। যেন তোমরা এসব অপরাধের পরকালীন শাস্তি এবং ইহকালীন দুর্ভোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا.

অর্থাৎ কোরআনের এসব সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পরও যদি কেউ জেনেশুনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং জুলুম ও সীমালংঘনের পথ অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে কিংবা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আমি খুব শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। 'জুলুম ও সীমালংঘনের মাধ্যমে' শব্দযোগে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত সাবধানবানীর আওতা থেকে মুক্ত থাকবে।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

(৩১) যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কতকগুলো কঠিন গোনাহ্ এবং সেগুলোতে জড়িত হওয়ার কঠিন শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। কোরআনের বিশেষ বর্ণনারীতিতে কোথাও কোন অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথেই যেসব লোক এ সব গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তাদের জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কারের কথাও শোনানো হয়। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ পুরস্কারের কথা বলা হচ্ছে। তা এই যে, যদি তোমরা বড় গোনাহ্গুলো থেকে আত্মরক্ষা করতে পার, তবে ছোট ছোট ত্রুটি -বিচ্যুতিগুলো আমি নিজে থেকেই ক্ষমা করে দেব। এতে করে তোমরা সমস্ত ছোট-বড় তথা সগীরা-কবীরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে সম্মান ও শান্তির সে স্থানে প্রবেশ করতে পারবে, যার নাম জান্নাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে সমস্ত (পাপ কাজ) থেকে তোমাদেরকে (প্রথম) নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো কঠিন (পাপের) কাজ রয়েছে, তা থেকে যদি তোমরা বেঁচে থাকতে পার, তবে (এই বেঁচে থাকার কারণে আমি ওয়াদা করছি যে, তোমাদের সে সমস্ত সৎকর্মের দরুন যখন তা কবূল হয়ে যাবে) আমি তোমাদের হালকা ত্রুটিসমূহ (অর্থাৎ ছোট ছোট পাপসমূহ যা তোমাদেরকে দোযখে নিয়ে যেতে পারে) তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেব। (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেব। যাতে তোমরা দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে)। আর আমি তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে (অর্থাৎ বেহেশতে) প্রবিষ্ট করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পাপের প্রকারভেদ ঃ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পাপের প্রকারভেদ দু'রকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগীরা গোনাহ্গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন।

যাবতীয় ফরয–ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয–ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্। বস্তুত যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ

পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা করে দেবেন।

সৎকর্মসমূহ সগীরা গোনাহ্র প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ : প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই যে, কর্তার সৎকর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেওয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন লোক যখন নামায পড়ার জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহবার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায় ; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে।

কবীরা গোনাহ্ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয় : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, অযু, নামায প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহর কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হলো সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুত সগীরা গোনাহ মাফের শর্ত হলো, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোন লোক কবীরা গোনাহে লিপ্ত থেকেও অযু-নামায আদায় করতে থাকে, তবে শুধু অযু-নামায কিংবা অন্যান্য সৎকর্ম দ্বারা তার সগীরা গোনাহ্র কাফ্ফারাও হবে না—কবীরা গোনাহ্ তো থাকলই। –কাজেই কবীরা গোনাহ্র একটা বিরাট অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধানবাণী বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সত্যিকার তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না। তাছাড়া এর ফলে অন্য আরও বহু লাঞ্ছনাও তার জন্য বর্তমান রয়েছে। যেমন, সেগুলোর কারণে তার গোনাহ মাফও হবে না এবং হাশরের মাঠে সে লোক কবীরা ও সগীরা উভয় প্রকার ছোট-বড় গোনাহ্র বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে ; অথচ অন্য কেউই তার সে বোঝা লাঘব করতে পারবে না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহ্ : আয়াতে كبائر (কাবায়ির ; কবীরার বহুবচন) শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং কবীরা গোনাহ্ কাকে বলে এবং তা মোট কত প্রকার তা বুঝে নেওয়া উচিত। এতদসঙ্গে সগীরা গোনাহ্ কি এবং তা কত প্রকার, এটাও জেনে নেওয়া দরকার।

উম্মতের উলামা সম্প্রদায় এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

কবীরা ও সগীরা গোনাহ্র সংজ্ঞা নিরূপণের পূর্বে একথা বিশদভাবে জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয় যে, 'গোনাহ্' বলতে সেসব কাজকে বোঝায় যা আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ। এতে পাঠকবর্গ হয়তো অনুমান করতে পারবেন যে, পরিভাষাগতভাবে যাকে সগীরা গোনাহ্ বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও ছোট নয়। যে কোন অবস্থায়ই আল্লাহ্র নাফরমানী এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যন্ত কঠিন অপরাধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইমামুল-হারামাইন ও অন্যান্য উলামা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেকটি নাফরমানী এবং তাঁর ইচ্ছার যে কোন রকম বিরুদ্ধাচরণই কবীরা ও কঠিনতর পাপ। তবে কবীরা ও সগীরার যে পার্থক্য, তা শুধু তুলনামূলক।

এ অর্থেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ كل ما نهى عنه فهو كبيرة অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সে সমস্তই গোনাহে-কবীরা।

সারকথা, যে গোনাহ্‌কে পরিভাষাগতভাবে সগীরা বা ছোট গোনাহ্ বলা হয়, কারও মতেই তার অর্থ এমন নয় যে, এসব গোনাহে লিপ্ততার ব্যাপারে কোনরকম শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে এবং এগুলোকে মামুলী মনে করে অবহেলা করা চলবে। বরং কোন সগীরা গোনাহ্ যদি নির্ভয়ে ও বেপরোয়াভাবে করা হয়, তবে সে সগীরাও কবীরা হয়ে যায়।

কোন এক বুযুর্গ বলেছেন—স্থূল দৃষ্টিতে ছোট গোনাহ্ ও বড় গোনাহ্‌র উদাহরণ, যেন ছোট বিচ্ছু ও বড় বিচ্ছু ; কিংবা আগুনের বড় হল্কা ও ছোট অঙ্গার। এ দুটির কোন একটির দহনও মানুষ সহ্য করতে পারে না। সে কারণেই মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুযূতী বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো গোনাহ্‌সমূহ বর্জন করা। যে সমস্ত লোক নামায ও তসবীহ্ তাহ্‌লীলের সাথে সাথে গোনাহ্ বর্জন করে না, তাদের ইবাদত কবূল হয় না। হযরত ফুযায়েল ইবনে আয়ায (রা) বলেছেন যে, তোমরা কোন গোনাহ্‌কে যতই হাল্কা বিবেচনা করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ততই বড় অপরাধে পরিণত হতে থাকবে। আর পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বলতেন যে, প্রতিটি গোনাহ্ই কুফরীর অগ্রদূত, যা মানুষকে কুফরীসুলভ কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের প্রতি আহ্বান করে থাকে।

মসনদে আহ্‌মদ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) একবার হযরত মুআবিয়া (রা)-কে এক পত্রে লেখেন যে—বান্দা যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে, তখন তার প্রশংসাকারীরাও তার নিন্দা করতে আরম্ভ করে এবং মিত্ররাও তার শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। গোনাহ্‌র ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে পড়া মানুষের জন্য স্থায়ী বিনাশের কারণ।

বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "কোন ঈমানদার যখন কোন গোনাহ্ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু খচিত হয়ে যায়। পরে যদি সে তওবা করে নেয়, তাহলে সে বিন্দুটি মুছে যায়। কিন্তু যদি তওবা না করে সে বিন্দুটি বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার গোটা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।" কোরআনে এরই নাম বলা হয়েছে 'রাইন'। ইরশাদ হয়েছে ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ—অর্থাৎ তাদের অসৎ কর্ম তাদের অন্তরে মরচে ধরিয়ে দিয়েছে।" —অবশ্য গোনাহ্‌র দোষ, অশুভ পরিণতি ও অনিষ্টের প্রেক্ষিতে সেগুলোর মাঝে একটা পারস্পরিক পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। এই পার্থক্যের ভিত্তিতেই কোন গোনাহ্‌কে 'কবীরা' এবং কোনটিকে 'সগীরা' গোনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কবীরা গোনাহ্ ঃ কোরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী উলামাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী গোনাহে-কবীরার সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ যে গোনাহের জন্য কোরআনুল করীম কোন শরীয়তী শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে কিংবা যে পাপের জন্য লা'নতসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অথবা যে সবের কারণে জাহান্নাম প্রভৃতির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে সে সমস্তই 'গোনাহে-কবীরা'। তেমনিভাবে সে সমস্ত গোনাহ্ও গোনাহে-কবীরার অন্তর্ভুক্ত হবে, যার অনিষ্ট ও পরিণতি কোন কবীরা গোনাহের

অনুরূপ কিংবা তার চাইতেও অধিক। যে সমস্ত সগীরা গোনাহ্ নির্ভয়ে করা হয় অথবা যা নিয়মিতভাবে করা হয়, সেগুলোও গোনাহে কবীরার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রা)-এর সামনে কোন এক ব্যক্তি গোনাহে-কবীরার সংখ্যা সাতটি বলে উল্লেখ করলে তিনি বললেন—সাত নয়, সাতশ বললেই ভালো হয়।

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (র) তাঁর 'আযাযাওয়াজির' গ্রন্থে সে সমস্ত গোনাহের তালিকা ও প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী যেগুলো কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সে গ্রন্থে কবীরার সংখ্যা ৪৬৭ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অনেকে শুধু গোনাহের বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছেদগুলো গণনা করেছে, ফলে তাতে সংখ্যা কম লেখা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনেকে সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার প্রকারভেদগুলোও তুলে ধরেছেন। ফলে সংখ্যার দিক দিয়ে তা অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এতে কোন বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই।

রাসূলে করীম (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে কবীরা গোনাহ্ বলে অভিহিত করেছেন। পরিস্থিতি অনুপাতে কোথাও তিন, কোথাও সাত এবং কোথাও এর চেয়ে বেশি সংখ্যক কাজকে কবীরা গোনাহ্ বলে অভিহিত করেছেন। এ সব বর্ণনা থেকেই আলিমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কবীরা গোনাহের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুপাতে যেখানে যেসব বিষয় কবীরা গোনাহ্ বলে মনে হয়েছে, সেগুলোর কথাই বলে দেওয়া হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কবীরা গোনাহ্গুলোর মধ্যেও যে কয়টি সবচাইতে বড় সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ গোনাহ্গুলোর সংখ্যা তিনটি। যথা, কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা বা তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা।

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন—সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্ কোন্‌টি ? জবাবে তিনি বললেন—আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা ; অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর সব চাইতে বড় গোনাহ্ কি ? বললেন, তোমার খোরাকের মধ্যে এসে ভাগ বসাবে, কিংবা এদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিতে হবে, এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা।

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এরপর সবচাইতে বড় গোনাহ্ কোন্‌টি ? জবাব দিলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। ব্যভিচার এমনিতেই জঘন্য অপরাধ, তদুপরি নিজের পরিবার-পরিজনের ন্যায় পড়শীর উজ্জত-আবরুর হিফাযত করাও যেহেতু তোমার একটা নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব এজন্য পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের গোনাহ্ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ নিজের পিতা-মাতাকে গাল দেওয়া কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! এটা কি করে হতে পারে যে, কেউ তার পিতা-মাতাকে গাল দেবে।

বললেন, কেন হবে না ? কেউ যখন অন্যের পিতা-মাতাকে গাল দেয় এবং সে যখন এর প্রতিউত্তর দিতে থাকে, তখন তার নিজের পিতা-মাতার প্রতি বর্ষিত গাল যেহেতু তার প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া, সেহেতু প্রকারান্তরে সে নিজেই তো তার মাতা-পিতাকে গাল দিলো।

বুখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিরক করা, অকারণে কাউকে হত্যা করা, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের অসম্মান করাকে কবীরা গোনাহ্ বলে অভিহিত করেছেন।

হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে কুফরিস্তান থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে আসার পর পুনরায় কুফরিস্তানে ফিরে যাওয়াকেও কবীরা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথা—মিথ্যা কসম খাওয়া, অন্যদের প্রয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকে রাখা, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা এবং যাদুর আমল করা। কোন কোন বর্ণনায় উল্লিখিত রয়েছে যে—সমস্ত কবীরা গোনাহের বড় গোনাহ্ হচ্ছে 'মদ্য পান'। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যাবতীয় অশ্লীলতার মূল উৎস হচ্ছে শরাব। কেননা, শরাব পান করে মাতাল হওয়ার পর মানুষ যে কোন মন্দ কর্ম অবাধে করে ফেলতে পারে।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গোনাহ্ হচ্ছে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করা, যদ্দ্বারা তার ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট হতে পারে।

অনুরূপ আর এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত কোন ওজর ছাড়াই দু'ওয়াক্তের নামায একত্র করে ফেলে, সে কবীরা গোনাহ্য় পতিত হয়। অর্থাৎ কোন ওয়াক্তের নামায সে ওয়াক্তের মধ্যে আদায় না করে পরের ওয়াক্তে কাযা পড়াও কবীরা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গোনাহ্। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও কবীরা গোনাহ্।

এক রেওয়ায়েতে আছে যে, কোন ওয়ারিসকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কিংবা তার অংশ কমানোর উদ্দেশ্যে কোন ওসিয়্যত করাও কবীরা গোনাহর অন্তর্গত।

সহীহ্ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা রাসূলে করীম (সা) বলতে লাগলেন, এরা ভাগ্যহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে ; কথাটা তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন। সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন, "প্রথমত সেই ব্যক্তি যে পাজামা, লুঙ্গি অথবা কুর্তা অহঙ্কারভরে পায়ের গিরার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে তার অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ হওয়ার পরও ব্যভিচার করে, চতুর্থত ঐ ব্যক্তি যে শাসক কিংবা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও মিথ্যা বলে, পঞ্চমত ঐ ব্যক্তি যে সন্তান-সন্ততির জনক হওয়ার পরও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়, ষষ্ঠত ঐ ব্যক্তি যে কেবল পার্থিব কোন স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কোন ইমামের হাতে বায়'আত করে।"

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। নাসায়ী, মসনদে-আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যথা—শরাবী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়-স্বজনের সাথে অকারণে সম্পর্ক ছিন্নকারী, কারো প্রতি অনুগ্রহ করে সে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে যে কথা শোনায়, জিন্নাত, শয়তান কিংবা অনুরূপ অন্য কোন কিছুর আমলের মাধ্যমে যে ব্যক্তি গায়েবের খবর বলে, দাইয়ুস অর্থাৎ নিজের পরিবার-পরিজনকে যে ব্যক্তি বেহায়াপনা থেকে বাধা দান করে না।

মুসলিম শরীফের এ হাদীসে উক্ত হয়েছে যে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে কোন জন্তু কোরবানী করে।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

(৩২) আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। (৩৩) পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়রা যা ত্যাগ করে যান, সে সবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি ! আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কিত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি নারী ও পুরুষ উভয়ই থাকে এবং মৃতের সাথে যদি তাদের একই ধরনের সম্পর্ক থাকে, তবে পুরুষ নারীর তুলনায় দ্বিগুণ অংশ পাবে। নারীর তুলনায় পুরুষের এমনি ধরনের আরো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। একবার হযরত উম্মে-সালমা হুযূর (সা)-এর খেদমতে এ বিষয়টি উত্থাপন করে আরয করেছিলেন যে, আমাদের স্ত্রী জাতির জন্য ওয়ারিসী স্বত্বের অর্ধেক নির্ধারিত

হয়েছে। এমন ধরনের আরো কিছু বৈষম্য নারীদের বেলায় কেন করা হলো ? এখানে উদ্দেশ্য আপত্তি উত্থাপন নয়, বরং এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা যে, আমরাও যদি পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতাম, তবে আমরাও পুরুষদের ন্যায় সর্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পারতাম ! কোন কোন স্ত্রীলোক এরূপ আক্ষেপও প্রকাশ করেছিলেন যে, হায় ! আমরাও যদি পুরুষ হতাম, তবে জিহাদে অংশগ্রহণ করে ফযীলত লাভ করতে পারতাম।

জনৈক স্ত্রীলোক একবার রাসূল (সা)-এর কাছে এ মর্মে প্রশ্নও করেছিলেন যে, আমরা নারীরা ওয়ারিসী স্বত্বের অর্ধেক পাই। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও দু'জন স্ত্রীলোকের সমান ধরা হয় একজন পুরুষকে। এমনিভাবে আমল-ইবাদতের ফলও কি আমরা অর্ধেক পাবো ? এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই এ আয়াত দুটি নাযিল হয়েছে। এতে ولاتتمنوا বলে হযরত উম্মে সালমার প্রশ্নের এবং للرجال نصيب বলে অপর স্ত্রীলোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তোমরা (সকল পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ের) আকাঙ্ক্ষা করো না যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এক শ্রেণীকে (পুরুষকে) অন্য শ্রেণীর উপর (স্ত্রীলোকদের উপর তাদের কোন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই) প্রাধান্য দান করেছেন। (যেমন, পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা, পুরুষদের জন্য দ্বিগুণ হিস্সা নির্ধারিত হওয়া, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দু'জন স্ত্রীলোকের সমান গণ্য হওয়া ইত্যাদি)। পুরুষদের জন্য তাদের আমলের (সওয়াব) অংশ (আখিরাতে) নির্ধারিত এবং স্ত্রীলোকদের জন্যও তাদের আমলের (সওয়াব) অংশ (আখিরাতে) নির্ধারিত রয়েছে। (আর নিয়মানুযায়ী এ আমলের উপরই পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল। আমলের ক্ষেত্রে কারো কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সুতরাং একের উপর যদি অন্যের প্রাধান্য লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমলের ক্ষেত্রে সে প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টা কর। কেননা, এটা সবারই সাধ্যায়ত্ত। এছাড়া যেসব বৈশিষ্ট্য আলাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেগুলোর আকাঙ্ক্ষা করা নিছক অর্থহীন লালসা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে যদি এমন কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ হয়, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত যেমন, আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন, তবে তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য এ আকাঙ্ক্ষার পন্থাও এই নয় যে, শুধু মৌখিক আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতে থাকবে, বরং) আল্লাহ্র কাছে তাঁর (বিশেষ) অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে থাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই উত্তমরূপে জ্ঞাত রয়েছেন। (এতে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদানের তাৎপর্য এবং মানুষের সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লাভ করার জন্য দোয়া করার বৈধতাও বর্ণনা করা হলো) আর প্রত্যেক এমন সম্পদের জন্য যা পিতামাতা এবং (অন্যান্য) আত্মীয়-স্বজন (মৃত্যুর পর) ছেড়ে যায়, আমি ওয়ারিস নির্ধারিত করে দিয়েছি। আর যেসব লোকের সাথে (পূর্ব থেকেই) তোমাদের চুক্তি করা আছে, তাদেরকে তাদের হিস্সা দিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে অবহিত। (চুক্তিবদ্ধ লোক যাদের 'মাওয়ালাত' বলা হতো তাদের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে এ হিস্সা কে দেয় এবং কে দেয় না, সে সব কিছুর খবর তিনি অবশ্যই রাখেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা ঃ এ আয়াতে অন্যের এমনসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-বুদ্ধি বা শারীরিক সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে হীন বলে মনে করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অন্তরে হিংসার বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এতে কম করে হলেও তার মনে সেই সব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোকের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মত নয়। কেননা, তা অর্জন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বা কোন সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের সেরা কোন পরিবারের সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কারো পক্ষে অত্যন্ত সুশ্রী হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে তবে সারা জীবন সাধ্যসাধনা করেও তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণত কোন বেঁটে কদাকার লোক সুন্দর-সুঠাম হওয়ার জন্য কিংবা কোন সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, কোন দাওয়া তদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অন্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, আমার পক্ষে যখন এরূপটি হওয়া সম্ভব নয়, তখন অন্য আর একজন কেন এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে ? এরূপ মনোভাবকে 'হাসাদ' বা হিংসা বলা হয়। এটা মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগ বিশেষ। দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া-ফাসাদ এবং হত্যা-লুণ্ঠনের উদগাতাই হচ্ছে মানব-চরিত্রের এ কুৎসিত ব্যাধি।

কোরআন-করীম সেই অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই ইরশাদ করেছে ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ-

অর্থাৎ আলাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন হিকমতের কারণেই মানুষের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করেছেন। তাঁর কল্যাণ-হস্তই এক-একজনের মধ্যে এক-এক ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিতরণ করেছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই তার আপন ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অন্যের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর বিষিয়ে তোলা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা, এতে নিজেকে অর্থহীন মানসিক পীড়া এবং হিংসারূপী কঠিন গোনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শুকুরগুযারী করা কর্তব্য। অপর পক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে সন্তুষ্ট থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হতো, তবে হয়তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো না বরং উল্টো গোনাহ্গার হতে হতো। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নিয়ামতের শুকরিয়া করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও

অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয়তো কোন মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ্ পাক আমাকে এই চেহারা বা অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি সুশ্রী হতাম, তবে হয়তো কোন ফেতনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেই যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোন লোকের পক্ষেও রক্ত-ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা, হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। তাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও সদগুণের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ করতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে ছাড়িয়ে আরো অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে পারে।

কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক সহীহ্ হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) শুধু ঐ সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তাঁর কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। আলোচ্য এ আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ .

অর্থাৎ পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে।

আয়াতের মর্ম দ্বারা আরো জানা গেল যে, কারো জ্ঞান-গরিমা এবং চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য দেখে সেরূপ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রশংসনীয় কাজ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বহুল প্রচলিত একটা ভুল ধারণার অপনোদন হয়ে যায়, যদ্দ্বারা সচরাচর অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। যেমন, চেষ্টা-তদবিরের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না, অন্যের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অনেকেই জীবনের শান্তি-স্বস্তি বিসর্জন দিয়ে বসেন, এমন কি যদি সে আকাঙ্ক্ষা হাসাদ-এর পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, তবে এর দ্বারা আখিরাতও বিনষ্ট করে দেন। কেননা, হাসাদ এমন একটা কঠিন গোনাহ্ যদ্দ্বারা মানুষের আখিরাত অতি সহজেই বরবাদ হয়ে যায়।

অপরপক্ষে অনেকেই কর্ম-বিমুখতা ও উদ্যমহীনতার কারণে সেগুলো অর্জন করার জন্যও উদ্যোগী হয় না, যেসব বৈশিষ্ট্য মানুষের চেষ্টা-সাধনার দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, নিজেদের আলস্য ও অকর্মণ্যতাকে আড়াল করে রাখার জন্য, তকদীরকে দায়ী করে।

মানুষের এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব বিষয় মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, বরং নিছক আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যেমন কারো পক্ষে সুঠাম তনুশ্রীর অধিকারী হওয়া কিংবা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তকদীরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র শুকুর করা কর্তব্য। যতটুকু সে লাভ করেছে এর বেশি আকাঙ্ক্ষা করা এ ক্ষেত্রে শুধু অর্থহীনই নয়, সীমাহীন মানসিক যাতনা ডেকে আনার নামান্তর মাত্র।

অপরদিকে মানুষ স্বীয় সাধনাবলে যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, সেগুলোর জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উপকারী। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে তা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা ও সাধনাও থাকতে হবে। আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন চেষ্টাকারীর চেষ্টাই বৃথা যাবে না, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককেই তার চেষ্টা ও সাধনা অনুপাতে ফল দেওয়া হবে।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের পূর্বে لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ এবং وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করতে কিংবা কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতে সে দু'টি অপরাধের উৎসমুখ বন্ধ করার লক্ষ্যেই তাকীদ করা হয়েছে যে, অন্য লোকদেরকে যে ধন-সম্পদ কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অথবা মান-সম্ভ্রম প্রভৃতিতে তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্ প্রদত্ত যে বৈশিষ্ট্য বা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তোমরা সেসবের আকাঙ্ক্ষাও করো না। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, চুরি-ডাকাতি, হত্যা-লুণ্ঠন প্রভৃতি অপরাধের মূল উৎসই হচ্ছে অপরের সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতি অন্যায় লোভ ও লালসা। সে লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই মানুষ এসব অন্যায়ের পথে ধাবিত হয়। কোরআন এসব অনাচারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অন্যের সুখ ও সৌভাগ্যের প্রতি অন্যায় লালসার উৎসমুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَاسْـئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ এতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অন্যকে তোমাদের চাইতে যে কোন বিষয়ে সমৃদ্ধ দেখতে পাও তবে তার সেটুকুই লাভ করার অর্থহীন আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে তুমি নিজের জন্যই আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে থাক। কেননা, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে বর্ষিত হয়ে থাকে। কারো প্রতি এ অনুগ্রহ ধন-সম্পদের আকারে দেখা দেয়! কেননা সে ব্যক্তি যদি সম্পদহীন হতো, তবে হয়তো কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়তো! আবার কারো পক্ষে হয়তো দারিদ্র্যই আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, যদি তার হাতে অর্থ-সম্পদ আসতো, তবে হয়তো সে হাজার রকমের গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়তো।

এ জন্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কাছে যখন চাও, তখন বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। যেন তিনি তাঁর হিকমত অনুপাতে তোমার পক্ষে যা কল্যাণকর, সেরূপ অনুগ্রহের দ্বারই তোমার জন্য খুলে দেন।

আয়াতের শানে নযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে, ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন কোন স্ত্রীলোক এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন যে, আমরা যদি নারী না হয়ে পুরুষ হয়ে জন্মাতাম, তবে দ্বিগুণ স্বত্বের অধিকারী হতে পারতাম। সে দিকে লক্ষ্য করেই ওয়ারিসী স্বত্বের বিষয়টিও এখানে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ আকাঙ্ক্ষার জবাব হয়ে যায়। বলা হয়েছে যে, অংশীদারদের যার জন্য যে হিস্সা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বিশেষ হিকমতের মাধ্যমে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতেই করা হয়েছে। মানুষের স্থূল বুদ্ধি যেহেতু সব ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা রাখে না, সেজন্যই এ অংশ নির্ধারণের গূঢ় তাৎপর্য হয়তো সে সহজে বুঝে উঠতে পারে না। সে মতে যার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতেই তার সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ্‌র শুকুর করা কর্তব্য।

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির অংশ : আয়াতের শেষে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির যে অংশের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে দু'ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের চুক্তি হতো। এ চুক্তি অনুযায়ী একে অপরের ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশীদার হতো। কিন্তু পরবর্তীতে وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ শীর্ষক আয়াত নাযিল হয়ে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির অংশ প্রদানের নির্দেশ রহিত করে দিয়েছে। ফলে যে ব্যক্তির কোরআন নির্দেশিত ওয়ারিস রয়েছে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির কোন অংশ নেই।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

(৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকেরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হিফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হিফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। (৩৫) যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে নারীদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে তাদের অধিকার বিনষ্ট করা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাও ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে পুরুষদের হক বর্ণনা করা হচ্ছে। এতদসঙ্গে পুরুষ কর্তৃক সে অধিকার আদায়, প্রয়োজনে শাসন এবং কোন মারাত্মক বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার পন্থাও উল্লিখিত হয়েছে। আনুষঙ্গিকভাবে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় এক স্তর উর্ধ্বে। সুতরাং পরোক্ষভাবে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ স্তরভেদের কারণেই পুরুষের জন্য নারীর দ্বিগুণ ওয়ারিসী স্বত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পুরুষ শ্রেণী অভিভাবক স্ত্রী শ্রেণীর ওপর (দু'টি কারণে প্রথমত) এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে কাউকে (অর্থাৎ পুরুষ শ্রেণীকে) কারো কারো উপর (অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের উপর স্বভাবগত) প্রাধান্য দান করেছেন এবং (দ্বিতীয়ত) এজন্য যে, পুরুষরা (স্ত্রীলোকের জন্য) স্বীয় সম্পদ (মোহর ও ভরণ-পোষণ বাবদ) ব্যয় করে থাকে (স্বভাবতই যারা খরচ করে, তাদের মর্যাদা উপরে থাকে)। সুতরাং যেসব স্ত্রীলোক সতী-সাধ্বী (তারা পুরুষের প্রকৃতিগত প্রাধান্য ও অধিকারের কারণে) অনুগতা হয়ে থাকে (এবং) পুরুষদের চোখের আড়ালেও আল্লাহ্র (তওফীক অনুযায়ী) হিফাযত করে থাকে পুরুষের ইজ্জত-আবরু ও ধন-সম্পদ। আর যেসব স্ত্রীলোক (এরূপ গুণসম্পন্না হয় না, বরং) এমন হয় যে, তোমরা (বিভিন্ন আচরণের দ্বারা) তাদের উগ্রতা অনুভব কর, তাদেরকে (প্রথমে) উপদেশের মাধ্যমে বোঝাও। (কিন্তু) যদি (তাতে) না মানে, তবে বিছানায় একা থাকতে দাও (অর্থাৎ তাদের সাথে একত্রে শয়ন করা ত্যাগ কর)। বস্তুত (এতেও যদি পথে না আসে, তবে) তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এতেই যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তবে তাদের (উপর অধিক বাড়াবাড়ি করার) জন্য উসিলা (এবং মওকা) তালাশ করো না। (কেননা) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সুমহান এবং সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। (তাঁর শক্তি, জ্ঞান এবং অধিকারের সীমা অনেক প্রশস্ত। তোমরা যদি

বাড়াবাড়ি কর, তবে তিনিও তোমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার হাজার ধরনের পথ বের করতে পারবেন।) এবং যদি (অবস্থাদৃষ্টে) তোমরা এই দম্পতির মধ্যে (এমন বিবাদ-বিসংবাদের) আশংকাই কর (যা তারা নিজেরা নিষ্পত্তি করতে পারবে না বলে মনে হয়), তবে তোমরা নিষ্পত্তি করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন স্বামীর পরিবার থেকে এবং একজন (অনুরূপ) নিষ্পত্তি করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক স্ত্রীর পরিবার থেকে (নির্বাচন করে তাদের মধ্যকার তিক্ততা দূর করার দায়িত্ব দিয়ে) প্রেরণ কর (যাতে তারা গিয়ে উভয়ের মধ্যকার তিক্ততার কারণ যাচাই করে এবং যার দোষ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে)। যদি এ দু'ব্যক্তি (নিষ্ঠার সাথে) নিষ্পত্তির চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই দম্পতির মধ্যে নিষ্পত্তির পথ খুলে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ এবং সবকিছু অবহিত। (কোন্ পথে এদের মধ্যকার তিক্ততা দূর হবে, তা তিনি জানেন। সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি ঠিক থাকে, তবে কিভাবে এদের মধ্যে নিষ্পত্তি হবে, তা তিনিই তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা নিসার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল নারী শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র অবলা নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্যাতনমূলক অন্যায় আচরণ প্রচলিত ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কোরআন সেগুলোর উচ্ছেদ সাধন করেছে। বস্তুত পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও সেরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। নারীদের জিম্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরয করেছে।

সূরা বাকারার এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের অধিকার পুরুষের উপর ততটুকুই ওয়াজিব, যতটুকু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অধিকার। এখানে উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান বলে ঘোষণা করে তার বাস্তবায়নের নিয়ম-পদ্ধতি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। এতে জাহিলিয়াতের যুগ থেকে নারীদের ব্যাপারে যেসব অমানবিক আচরণ করা হতো সেসবের উৎখাত করা হয়েছে। অবশ্য এটা জরুরী নয় যে, অধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিও একই ধরনের হবে। নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধরন অবশ্যই স্বতন্ত্র, কিন্তু অধিকারের সীমা সংকুচিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। নারীর প্রতি যেমন গৃহের কর্তৃত্ব, সন্তানের লালন-পালন প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি পুরুষের প্রতি নারীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জীবিকার্জনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, অনুরূপ নারীদের প্রতি যেমন পুরুষের সেবা ও আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তেমনি পুরুষের উপরও তাদের মোহর ও খোরপোশের দায়িত্ব ফরয করা হয়েছে ; মোটকথা এ আয়াতে নারী এবং পুরুষের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য নারী জাতির উপর পুরুষের স্বভাবগত প্রাধান্যও দেওয়া হয়েছে। যার বর্ণনা আয়াতের শেষে এই বলে বর্ণিত হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ স্ত্রীজাতির উপর পুরুষদের এক স্তর প্রাধান্য রয়েছে।

আয়াতে এ প্রাধান্যের বিষয়টিও বিশেষ প্রজ্ঞার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্ত্রী-লোকের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেই তা করা হয়েছে ; নারী জাতিকে খাটো করা কিংবা তাদের কোন অধিকারের সীমা সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আরবী ভাষায় قَيَّامٌ-قَوَّامٌ এবং قَيِّمٌ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কোন কাজ কিংবা বিধানের পরিচালক অথবা দায়িত্বশীল। এ কারণেই আয়াতের তরজমা করা হয় যে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের পরিচালক বা অভিভাবক। এর অর্থ, সাধারণত যে কোন যৌথ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যেমন একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী ; রাষ্ট্র, সমাজ বা কোন গোত্র পরিচালনার জন্য যেমন একজন প্রধান ব্যক্তি থাকা অপরিহার্য, তেমনি পরিবার পরিচালনার জন্যও একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী। পরিবার পরিচালনার সে দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক শিশু বা স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ না করে পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন। কেননা সংসার জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্ত্রীলোক ও শিশুদের চাইতে পুরুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা যে অধিক, এ সত্য বিষয়টি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোন সুস্থ বুদ্ধির লোকই অস্বীকার করতে পারে না।

মোট কথা, সূরা বাকারার وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ আয়াতে এবং সূরা নিসার اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, যদিও নারীদের অধিকার পুরুষের উপর ততটুকু যতটুকু নারীদের উপর পুরুষের অধিকার এবং উভয়ের অধিকার একই পর্যায়ের, তবুও একটি বিষয়ে নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, পুরুষ নারীদের অভিভাবক। তবে কোরআনের অন্য আয়াতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ অভিভাবকত্ব স্বৈরাচারমূলকভাবে প্রয়োগ করার অধিকার পুরুষের নেই ; বরং এ অভিভাবকত্বও শরীয়তের বিধি-বিধান এবং পারস্পরিক পরামর্শের নীতিমালার অধীন। সে তার খেয়াল-খুশি মত যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। বরং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ "স্ত্রীদের সাথে সমীচীন পন্থায় উত্তম আচরণের সাথে জীবন যাপন কর।"

অনুরূপ অন্য এক আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গৃহস্থালী তথা সংসার-যাত্রার ব্যাপারে স্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কর। সুতরাং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্ত্রীদের পক্ষে কোন প্রকার ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও যেহেতু নারীদের অধীনতার গ্লানি বা এ ধরনের কোন প্রতিকূল অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এখানে শুধু নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি বরং এ প্রাধান্যের হিকমত এবং তাৎপর্যও সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, দু'কারণে এ প্রাধান্য

দেওয়া হয়েছে ; একটি হচ্ছে জন্মগতভাবে আল্লাহ্র দান, যাতে মানুষের চেষ্টা সাধনার কোন হাত নেই আর অপরটি হচ্ছে কর্ম ও দায়িত্বপ্রসূত।

প্রথম কারণটি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ হিকমত ও মঙ্গল চিন্তার কারণেই একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন, কাউকে উত্তম এবং কাউকে অনুত্তম করেছেন। যেমন একটা বিশেষ ঘরকে 'বায়তুল্লাহ্' এবং নিখিল বিশ্বের কেবলায় পরিণত করে দিয়েছেন, বায়তুল-মোকাদ্দাসকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তেমনি নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যও আল্লাহ্ তা'আলার একটা বিশেষ বিধান ও অনুগ্রহ। এতে পুরুষ জাতির শ্রমের সাধনা কিংবা স্ত্রী জাতির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন প্রভাব নেই।

দ্বিতীয় কারণ অবশ্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত আমল। যেমন, পুরুষ নারীদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, তাদের মোহর প্রদান এবং ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্বভার বহন করে। এ দু'কারণেই পুরুষকে নারীদের উপর অভিভাবক করা হয়েছে।

এ আয়াতে আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ইবনে হাব্বান বাহ্রে মুহীতে লিখেছেন, নারীদের উপর পুরুষের অভিভাবকত্বের যে দুটি কারণ কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, তদ্দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কারো পক্ষে শুধু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হওয়ার অধিকার নেই। বরং কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতার দ্বারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করার বৈধতা জন্মে।

কোরআনের অনন্য বর্ণনাভঙ্গি ঃ নারীর উপর পুরুষের এ প্রাধান্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন যে অনন্য বর্ণনাশৈলীর আশ্রয় নিয়েছে, তাও প্রণিধানযোগ্য। এখানে সোজাসুজি 'স্ত্রীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে'—এ কথা না বলে "তোমাদের কারো কারো উপর কারো কারো প্রাধান্য রয়েছে" বলা হয়েছে। এরূপ বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বনের তাৎপর্য হলো, এতে নারী ও পুরুষদেরকে 'পরস্পরের অংশ' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন কোন বিষয়ে পুরুষরা নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেও মানুষের মাথা যেমন তার হাতের তুলনায় কিংবা হৃৎপিণ্ড পাকস্থলির তুলনায় উত্তম, পুরুষও নারীর তুলনায় তদনুরূপই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হাতের তুলনায় মস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন হাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে খর্ব করে না, তেমনি নারীর তুলনায় পুরুষের এ শ্রেষ্ঠত্বও নারীর মর্যাদাকে খর্ব করে না। কেননা, উভয়েই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায়। পুরুষকে যদি দেহের মাথা ধরা হয়, তবে স্ত্রী তার শরীর বিশেষ।

কোন কোন তফসীরকারের মতে নারীর উপর পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধু সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ শ্রেণীগত দিক দিয়ে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বটে, কিন্তু ব্যক্তি বিচারে জ্ঞান, মেধা, আমল ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে অনেক স্ত্রীলোকও অনেক পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে পারে।

নারী-পুরুষের কর্মবিভাগ ঃ বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় যে কারণটি বলা হয়েছে, তা মানুষের আয়ত্তাধীন। তা হচ্ছে, যেহেতু পুরুষ নারীদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত।

এতেও আনুষঙ্গিকভাবে কয়েকটি সন্দেহের অপনোদন হয়। যেমন মীরাসের আয়াতে পুরুষদের জন্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারতো, পরোক্ষভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পূর্ণতই পুরুষের কাঁধে অর্পিত। বিয়ের পর স্বামীর উপরই নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বর্তায়। সেমতে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পুরুষের জন্য মীরাসের যে দ্বিগুণ অংশ নির্ধারিত হয়েছে, তা কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কারণ, পরোক্ষভাবে তা আবার নারীদের কাছেই ফিরে আসে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে, প্রকৃতিগতভাবে স্ত্রীলোকেরা যেহেতু রুজিরোজগারের ক্ষেত্রে শ্রম নিয়োগ করার যোগ্যতা রাখে না এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছোটাছুটি করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, সেজন্য তাদেরকে পুরুষের ন্যায় মাঠে-ময়দানে বা দপ্তরে-বাজারে ছোটাছুটির দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে ঘরের দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা-বিধানের যিম্মা দেওয়া হয়েছে। বিশেষত যেহেতু সন্তান প্রসব এবং তাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র নারীরাই দায়িত্বপ্রাপ্তা, পুরুষরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অকেজো সেমতে পুরুষদের জীবিকার্জনে শ্রম নিয়োগ এবং নারীদের বংশবৃদ্ধি এবং শিশুদের যোগ্য লালন-পালন ও শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রম-বিভাজন করা হয়েছে।

অবশ্য এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, নারীদের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে পুরুষের মুখাপেক্ষী করে তাদের মর্যাদা খাটো করা হয়েছে। বরং কর্ম ও দায়িত্ব বিভাজন করে দিয়ে প্রত্যেককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও মর্যাদার অধিকারী করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ কর্মবিভাগের মধ্যে প্রত্যেকেরই দায়িত্বের সাথে সাথে পারস্পরিক যে বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে এসে যায়, এখানেও তা হওয়া স্বাভাবিক।

মোট কথা, দুটি কারণে নারীর উপর পুরুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যেমন পুরুষের তুলনায় নারীদের মর্যাদা হানি করা হয়নি, তেমনি তাদের জীবন-মানকেও খাটো করা হয়নি। বরং সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে উপকারিতার দিক দিয়ে এ নির্দেশের ফল নারী জাতির পক্ষেই অধিকতর কার্যকরী প্রতীয়মান হবে।

নেককার স্ত্রী ঃ এ আয়াতের শুরুতে মূলনীতি হিসাবে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষরা স্ত্রীলোকদের উপর অভিভাবকস্বরূপ। অতঃপর নেক ও বদ স্ত্রীলোকদের কথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ। অর্থাৎ "তারাই নেককার স্ত্রীলোক যারা পুরুষের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের আনুগত্য করতে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতেও নিজেদের ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে।" অর্থাৎ স্বীয় সতীত্ব ও ঘরের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, যা গৃহকর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে পুরুষদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি উভয় অবস্থাই তাদের জন্য সমান। তাদের উপস্থিতিতে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করবে, আর অনুপস্থিতিতে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, তা নয়।

রাসূলে করীম (সা) এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ ইরশাদ করেছেন ঃ

خير النساء امرأة اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها-

অর্থাৎ "উত্তম স্ত্রীলোক সে-ই যখন তাকে দেখবে পুলকিত হবে, যখন তাকে কোন নির্দেশ দেবে, তখন সে আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাকবে, তখন সে নিজের এবং তোমার ধন-সম্পদের হিফাযত করবে।"

আর যেহেতু স্ত্রীলোকদের এ সমস্ত দায়িত্ব অর্থাৎ নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের কোনটিই সহজ কাজ নয় সেজন্যই পরে বলে দেওয়া হয়েছে بما حفظ الله অর্থাৎ এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং স্ত্রীলোকদের সাহায্য করেন। তাঁরই সাহায্য ও সামর্থ্য দানের ফলে তারা এসব দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়। অন্যথায় রিপু ও শয়তানের প্রতারণা সর্বক্ষণই প্রতিটি মানুষ তথা নর-নারীকে পরিবেষ্টন করে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে এসব দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় বেশি দৃঢ় দেখা যায়। এ সবই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সামর্থ্য দানের ফল। সে কারণেই অশ্লীলতাজনিত পাপে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা কম লিপ্ত হয়ে থাকে।

আনুগত্যপরায়ণা স্ত্রীলোকদের ফযীলত যেমন এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তেমনি এ ব্যাপারে বহু হাদীসও বর্ণিত রয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অনুগত তার জন্য আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করে শূন্যে উড়ন্ত পাখিরা, সাগরের মাছেরা, আকাশের ফেরেশতাকুল এবং বনের জীব-জন্তুরা।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় ঃ অতঃপর সেসব স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কোরআনে-করীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ.

অর্থাৎ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে, যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। কোরআন-করীমে এ প্রসঙ্গে في المضاجع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফিকহ্ শাস্ত্রবিদরা এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পার্থক্য শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ি বা থাকার ঘর পৃথক করবে না—যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ, তাতে তার দুঃখও বেশি হবে এবং এতে কোনরকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও আশংকা অধিক।

কোন এক সাহাবী রেওয়ায়েত করেছেন ঃ

قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت–

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের হক কি ? তিনি বললেন, তোমরা খেলে তাদেরও খাওয়াবে, তোমরা পরলে তাদেরও পরাবে। আর তাদের মুখমণ্ডলে মারবে না। তাদের থেকে যদি পৃথক থাকতে চাও, তবে শুধু বিছানা পৃথক করে নেবে—ঘর পৃথক করবে না।

বস্তুত এই ভদ্রজনোচিত শাসন ও শাস্তিতেও যদি কোন ফল না হয়, তবে তাকে সাধারণ মারধর করারও অনুমতি রয়েছে। তবে মুখমণ্ডলে মারতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শাস্তিগুলো যেহেতু একান্তই ভদ্রজনোচিত, তাই সে ব্যাপারে নবী-রাসূল ও বুযুর্গ-মনীষীবৃন্দ তার মৌখিক অনুমতিও দান করেছেন এবং কার্যকরভাবেও তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় শাস্তি অর্থাৎ মারধর করার অনুমতি যদিও অপারকতার পর্যায়ে বিশেষ ভঙ্গিতে পুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাদীসে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ যারা ভাল মানুষ তারা স্ত্রীদেরকে এ শাস্তি দেবে না। সুতরাং নবী-রাসূলদের দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ নেই।

ইবনে সা'আদ ও বায়হাকী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে স্ত্রীদের মারধর করার ব্যাপারে পুরুষদের সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে স্ত্রীরা উদ্ধত হয়ে পড়লে পুনরায় তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতটিও এমনি একটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। এর শানে-নযুল হচ্ছে এই যে, যায়েদ ইবনে যুবায়র (রা) তাঁর কন্যা হাবীবাহ (রা)-কে হযরত সা'দ ইবনে রাবী (রা)-এর নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা বিরোধ দেখা দিলে স্বামী তাকে থাপ্পড় মেরে বসেন। তাতে হাবীবাহ্‌ (রা) তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করে। পিতা যুবায়র (রা) তাঁকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি নির্দেশ দেন যে, যতটা জোরে সা'দ ইবনে রাবী হাবীবাকে থাপ্পড় মেরেছে, তারও অধিকার রয়েছে তাকে ততটা জোরে থাপ্পড় মারার।

তাঁরা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর হুকুম শুনে সেমতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু তখনই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হলো। এতে সর্বশেষ পর্যায়ে স্ত্রীকে মারধর করাও স্বামীর জন্য জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরুষদের বিরুদ্ধে কিসাস কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। যা হোক, আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সা) তাদের উভয়কে ডেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম শুনিয়ে দিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের হুকুমটি নাকচ করে দিলেন।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও ; কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত।

বিষয়-সংক্ষেপ ঃ এ আয়াতের দ্বারা মূলনীতিস্বরূপ যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্যও থাকবে না। বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমত পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়ত নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

প্রথম কারণটি হলো, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। তাছাড়া এ কথাও বলা যেতে পারে যে, একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল ঃ (১) যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা ; (২) তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ, নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোশ মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

সার কথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। তাহলো এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতা বিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হলো পুরুষের শাসিত ও অধীন।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণী রয়েছে। একটি হলো তাদের শ্রেণী যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো সে সমস্ত নারীর, যারা যথার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি। প্রথম শ্রেণীর নারীরা পারিবারিক ও বৈষয়িক শান্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই যিম্মাদার। তাদের কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বাতলানো হচ্ছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে ; তৃতীয় কোন লোকের যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা আনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল। আর পুরুষও মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পেল। এভাবে উভয়েই দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এবং উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হলো এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূলে করীম (সা) পছন্দ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, "ভাল লোক এমন করে না।"

যা হোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا– অর্থাৎ যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষ অনুসন্ধান করতে যেও না; বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আলাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে; তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধান ঃ উল্লিখিত ব্যবস্থাটি ছিল—এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক, এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণত এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদ আরোপ করে বেড়ায়, যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে কোরআনে-করীম এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয় পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী এবং মুসলমান দলকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনাও প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর অপবাদ আরোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপস-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসিত না হ'লেও অন্তত পরিবারের মধ্যেই যেন তা হয় ; আদালতে মামলা- মোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে।

আর তা হলো এই যে, সরকার উভয় পক্ষের মুরব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حكم (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কোরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত, দিয়ানতদারও হবেন।

সার কথা, একজন সালিস পুরুষের (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। সেখানে গিয়ে এতদুভয়ে কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কি হবে—কোরআনে-করীম তা স্থির করে দেয়নি। অবশ্য বর্ণনাশেষে একটি বাক্য ঃ اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেবেন।

এই বাক্যটির দ্বারা দু'টি বিষয় বোঝা যায় ঃ (এক) আপস-মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের গায়েবী সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবেন। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ্ তা'আলা সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদ্বয়ের যে কোন একজনের মনে হয়তো নিস্বার্থতার অভাব ছিল।

(দুই) এ বাক্যের দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, দু'পক্ষের দু'জন সালিসকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকীল, প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং একথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাই মেনে নেব। এ ক্ষেত্রে এই সালিসদ্বয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী

হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হবে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও হযরত আবূ হানীফা (র) প্রমুখেরও এমনি মত।—(রূহুল মা'আনী)

হযরত আলী (রা)-এর সামনে একবার এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপস মীমাংসা ছাড়া উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোন অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয় পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা)-এর খেতমতে হাযির হলো। তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রা) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান ? আর তোমাদেরকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত ? শোন, তোমরা যদি এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপস করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই কর। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপস মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। এ কথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি—এতদুভয় সালিস আল্লাহ্র আইন অনুসারে যে ফয়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি।

কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া কিংবা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোনক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোন রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন।

হযরত আলী (রা) বললেন, না তা হয় না। তোমারও সালিসদেরকে তেমনি অধিকার দেওয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনার দ্বারা কোন কোন মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের অধিকারসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন হযরত আলী (রা) উভয় পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকারসম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র) ও হযরত হাসান বসরী (র) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অধিকারসম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রা) কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদ্বয় অধিকারসম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকারসম্পন্ন হয়ে যায়।

কোরআন-করীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়। তার মাধ্যমে বহু মামলা-মোকদ্দমা আদালতে যাবার পূর্বেই পারিবারিক কিংবা সামাজিক পঞ্চায়েতে মীমাংসা করা যেতে পারে।

অন্যান্য বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রেও সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করা সমীচীন ঃ ফিকহ্‌বিদ মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, দু'জন হাকাম বা সালিস পাঠানোর এ পদ্ধতিটি শুধু স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা উচিত নয়, বরং অন্যান্য বিবাদ-বিসংবাদের বেলায়ও এ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষত বিবাদকারীরা যদি পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়। কারণ, আদালতী সিদ্ধান্তে বিবাদের সাময়িক সমাধান হলেও তার ফলে মনের অভ্যন্তরে এমন কালিমা ও মলিনতার ছাপ থেকে যায়, যা পরবর্তীকালে অত্যন্ত অশোভন আকারে প্রকাশ পায়। হযরত ফারূকে আযম (রা) তাঁর কাযীদের জন্য ফরমান জারি করেছিলেন ঃ

رد واالقضاء بين ذوى الارحام حتى يصطلحوا فان فضل القضاء يورث الضغائن-

অর্থাৎ "আত্মীয়-স্বজনের মধ্যকার মামলা-মোকদ্দমা তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দাও, যাতে তারা পরিবারের সাহায্যে পারস্পরিক মীমাংসার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। কারণ,কাযীর মীমাংসা অনেক ক্ষেত্রে মনের বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

হানাফী মাযহাবের অনুগামী ফকীহ্‌দের মধ্যে কাযী কুদ্‌স, আলাউদ্দীন তারাবলুসী (র) তাঁর 'মুঈনুল আহ্‌কাম' গ্রন্থে এবং ইবনে শাহ্‌না (র) তাঁর 'লিসানুল-আহকাম' গ্রন্থে উল্লিখিত ফারূকী নির্দেশকে এমন পঞ্চায়েতী মীমাংসার ভিত্তিতে পরিণত করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-মীমাংসার কোন পন্থা উদ্ভাবন করা যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও লিখেছেন যে, যদিও হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর নির্দেশনামায় এ হুকুমটি আত্মীয়-স্বজনের বিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু হুকুমনামায় তার যে সব কারণ ও তাৎপর্যের উল্লেখ রয়েছে যে, আদালতী সিদ্ধান্ত মানুষের মনে কালিমা সৃষ্টি করে দেয়—এটা আত্মীয়-স্বজন এবং অনাত্মীয় উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, পারস্পরিক মনোমালিন্য ও বিদ্বেষ থেকে সমস্ত মুসলমানেরই বেঁচে থাকা কর্তব্য। সুতরাং বিচারক ও কর্তৃপক্ষের জন্য কোন মামলার শুনানির প্রাক্কালে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিষয়টি আপস-নিষ্পত্তির চেষ্টা করাই সমীচীন।

যা হোক, উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন এক যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে, যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে সমগ্র বিশ্বের বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সমাধান হয়ে যেতে পারে। নারী-পুরুষ সবাই নিশ্চিন্ত ও নিঃশংক চিত্তে নিজেদের পারিবারিক জীবনকে সাক্ষাৎ স্বর্গীয় জীবনের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে পারে। আর পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদের পরিণতিতে যেসব গোত্রীয়, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত ঘটে, সেসবের মাঝে শান্তি নেমে আসতে পারে।

পরিশেষে আবারও এই বিস্ময়কর কোরআনী বিধি-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা যাক, যা পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তিকল্পে বিশ্বকে দান করেছে—

১. ঘরের বিবাদ ঘরেই ক্রমান্বয়ে মিটিয়ে দিতে হবে।

২. তা সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ পরিবারের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সালিসের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেবেন, যাতে করে ঘরের ব্যাপার ঘরে না হলেও পরিবারের ভেতরেই সীমিত থেকে সমাধান হয়ে যায়।

৩. আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে শেষ পর্যন্ত আদালতের আশ্রয় নেবে এবং আদালত উভয় পক্ষের অবস্থা ও ঘটনা তদন্ত করে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করবে।

আয়াতের শেষাংশে إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا বলে উল্লিখিত সালিসদ্বয়কেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি কোন অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ কর, তবে তোমাদেরকেও যে একজন বিজ্ঞ-অবহিত সত্তার সম্মুখীন হতে হবে, তা মনে রেখো।

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ﴿٣٦﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

(৩৬) আর ইবাদত করো আল্লাহ্‌র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে—(৩৭) যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে—বস্তুত তৈরি করে রেখেছি কাফিরদের জন্য অপমানজনক আযাব। (৩৮) আর সেই সমস্ত লোক, যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা

আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কিয়ামত-দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয়, সে হলো নিকৃষ্টতর সাথী !

যোগসূত্র ঃ সূরা নিসার তফসীর প্রসঙ্গে পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ সূরায় হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের হকের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের হকের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনার পর ইয়াতীম-অনাথ ও নারীদের হক বা অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দান এবং তাতে শৈথিল্য করা হলে তার শাস্তি ও ভীতি, এ পৃথিবীতে এতদুভয় দুর্বল শ্রেণী অর্থাৎ নারী ও শিশুদের প্রতি যে উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং যেসব উৎপীড়নমূলক প্রথা-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর সংস্কার এবং অতঃপর উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের অধিকার সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়ের বিশদ আলোচনা আসছে। আর যেহেতু এ সমস্ত অধিকার বা হক পরিপূর্ণভাবে সেই ব্যক্তিই আদায় করতে পারে, যে আল্লাহ্, রাসূল ও কিয়ামত-আখিরাতের ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস পোষণ করে এবং অধিকন্তু কার্পণ্য, কিবর, অহমিকা ও লোক-দেখানো প্রভৃতি বিষয় থেকে এজন্য বেঁচে থাকে যে, এগুলো অধিকার আদায়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই এ আয়াতসমূহে তওহীদ, অনুপ্রেরণা ও ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। আর শিরক করা, কিয়ামতকে অস্বীকার করা, রাসূলের অবাধ্যতা ও কার্পণ্য প্রভৃতি নৈতিক ত্রুটিসমূহের নিন্দা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর (এতে তওহীদও অন্তর্ভুক্ত) এবং তাঁর সাথে কোন বস্তুকে (তা মানুষই হোক অথবা অন্য কিছু হোক ইবাদতের বেলায় কিংবা তাঁর বিশেষ গুণ–বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিশ্বাসগতভাবে) শরীক করো না। আর (স্বীয়) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর (এবং সদ্ব্যবহার কর) নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতীম-অনাথদের সাথে, গরীব-মিসকীনদের সাথে এবং নিকটবর্তী পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ও দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথে এবং সহাবস্থানকারী বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও (তা সে সহাবস্থান সুদীর্ঘ সফর কিংবা কোন বৈধ কাজের অংশীদার প্রভৃতির মত দীর্ঘস্থায়ী হোক অথবা কোন সংক্ষিপ্ত সফর কিংবা ক্ষণিকের বৈঠক কালেই হোক)। আর পথিক-মুসাফিরের সাথেও (তা সে তোমাদের বিশেষ কোন মেহমান হোক বা না হোক)। এবং সে সমস্ত গোলাম-বাঁদীর সাথেও, যারা (শরীয়তসম্মতভাবে) তোমাদের অধিকারভুক্ত। [সারকথা, এমন সবার সাথেই সদাচরণ কর অন্যান্য স্থানে শরীয়ত যার বিস্তারিত বিবরণ বাতলে দিয়েছে। বস্তুত যেসব লোক এসব হক বা অধিকার আদায় করে না—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কয়েকটি কারণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে ; হয় স্বভাবের দাম্ভিকতার দরুন কাউকে মানুষ বলেই গণ্য করে না এবং কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে

না, কিংবা মনের উপর কার্পণ্যের প্রবল প্রভাব হেতু কাউকে কোন কিছু দান করতে প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। অথবা রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি বিশ্বাসের অভাবের কারণে তাঁর হুকুম-আহ্‌কাম, অন্যের হক আদায় করার জন্য পুণ্য লাভ সংক্রান্ত ওয়াদা এবং অন্যের হক আদায় না করার জন্য আযাব ও ভীতি প্রদর্শনকে যথার্থ বলেই মনে করে না। অথচ এমন করা কুফর। লোক দেখানো ও নামযশের প্রবণতা তাদের মনে চেপে বসে। আর সেজন্য তারা যেখানে যশ-খ্যাতির আশা দেখা যায়, সেখানেই ব্যয় করে– তা ন্যায়সঙ্গত হোক আর নাই হোক। পক্ষান্তরে যেখানে যশ-খ্যাতির সম্ভাবনা নেই, সেখানে ন্যায়সঙ্গত হলেও ব্যয় করবে না। অথবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁদের আদৌ বিশ্বাস থাকে না। কিংবা কিয়ামতের উপরই তাদের বিশ্বাস থাকে না, অথচ এটাও কুফরী। যারা পৃথকভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে এ সমস্ত বিষয় অবলম্বন করে তাদের অবস্থা সম্পর্কেও জেনে নাও–] নিশ্চয়ই আলাহ্ তা'আলা এমন লোকদের সাথে মুহাব্বত রাখেন না, যারা (মনে মনে) নিজেকে বড় বলে মনে করে, (মুখে) দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলে, যারা কার্পণ্য করে এবং অন্যকে কার্পণ্য করার তালীম দেয় (তা মুখে বলার মাধ্যমেই হোক কিংবা তাদের কাজকর্মে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমেই হোক) এবং তারা সে সব বিষয় গোপন করে রাখে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দান করেছেন। (এর মর্ম হলো এই যে, সেই ধন-সম্পদ, যা তারা কোনরকম কল্যাণের তাকীদে নয়, বরং একান্ত কার্পণ্যের দরুন গোপন রাখে, যাতে হকদাররা তাদের কাছে নিজেদের হক বা অধিকার প্রাপ্তির আশা না করে। কিংবা এতে সেই ধর্মীয় জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যা গোপন করা হয়। কারণ, ইহুদীরা জানা সত্ত্বেও রিসালতের বিষয়টি গোপন করছিল। এভাবে কার্পণ্যের বিষয়টি ব্যাপক হয়ে যায়, যাতে কৃপণ ও রিসালতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়)। আর আমি এহেন অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য (যারা ধন-সম্পদ সংক্রান্ত নিয়ামত অথবা রাসূল প্রেরণ সংক্রান্ত নিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করে না) অপমানজনক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না, (তাদের অবস্থাও একই রকম—আল্লাহ্ তাদেরকেও ভালবাসেন না)। আর আসল কথা হলো এই যে, শয়তান যাদের দোসর হবে (যেমন, হয়েছিল উল্লিখিত লোকদের), সে হলো নিকৃষ্টতর দোসর। (সে এমন সব পরামর্শ দেয়, যার পরিণতিতে সাধিত হয় কঠিন ক্ষতি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে তওহীদের আলোচনার কারণ ঃ হক বা অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ইবাদত–বন্দেগী ও তওহীদের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ইবাদতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে ইবাদত-বন্দেগী ও তওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় এবং তার হুকুম-আহ্কামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য অধিকার রক্ষার নিষ্ঠাও আশা করা যায় না। মানব গোষ্ঠী, সমাজের রীতিনীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই হাজারো পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তা হলো আল্লাহ্র ভয় ও পরহিযগারী। আর এই আল্লাহ্-ভীতি ও পরহিযগারী শুধু তওহীদের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তওহীদ ও ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা একান্তই সঙ্গত।

তওহীদের পর পিতা-মাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা ঃ অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইবাদত-বন্দেগী ও হকসমূহের পর পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন ও বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে বাহ্যত পিতা-মাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তাঁর প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কোরআন করীমের অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ

অর্থাৎ আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর।

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لاَتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا-

(অর্থাৎ আর যখন আমি বনী-ইসরাঈলদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে)। আয়াত দু'টিতে পিতা-মাতার ব্যাপারে একথা বলা হয়নি যে, তাদের হকসমূহ আদায় করবে কিংবা তাদের সেবাযত্ন করবে, বরং বলা হয়েছে তাদের প্রতি احسان (ইহসান) করবে। এ শব্দের সাধারণ মর্মে একথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, প্রয়োজনবোধে তাঁদের খোরপোশের জন্য স্বীয় সম্পদ ব্যয় করবে, প্রয়োজনানুপাতে দৈহিক সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং তাদের সাথে কথা বলার সময় কঠোর ভাষায় এবং জোরে কথা বলবে না। এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করবে না,

যাতে তাদের মনে কষ্ট হতে পারে। এমনকি তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সাথেও এমন কোন আচরণ করবে না, যাতে পিতা-মাতা মানসিকভাবে আহত হতে পারেন। বরং তাদেরকে সুখী করার জন্য, তাদের মানসিক শান্তির নিমিত্তে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তা সবই করবে। পিতা-মাতা যদি সন্তান-সন্ততির হক আদায়ের বেলায় শৈথিল্যও প্রদর্শন করে, তথাপি তাদের সাথে কোনরকম অসদাচরণ করার কোন অবকাশ নেই।

হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) দশটি অসিয়ত করে ছিলেন। তন্মধ্যে (১) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদি তোমাদেরকে সেজন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয় ! (২) নিজের পিতা-মাতার নাফরমানী কিংবা তাঁদের মনে কষ্ট দেবে না, যদি তাঁরা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর।—(মসনদে আহমদ)

রাসূলে করীম (সা)-এর বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে লোক নিজের রিযিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার সেলায়ে-রেহমী অর্থাৎ নিজের আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ আদায় করা উচিত।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

'শোয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (র) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতা-মাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি করে মকবুল হজ্জের সওয়াব প্রাপ্ত হয়।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, সমস্ত গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক পিতা-মাতার নাফরমানী এবং তাঁদের মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত করে দেওয়া হয়।

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ ঃ উল্লিখিত আয়াতে পিতা-মাতার পরে পরেই সাধারণ ذى القربى অর্থাৎ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ দেওয়া হয়েছে। কোরআন করীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা হুযূর (সা) প্রায়শই বিভিন্ন ভাষণের পর তিলাওয়াত করতেন। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى .

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য।" এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের কায়িক ও

আর্থিক সেবাযত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সালমান ইবনে 'আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনদের দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দুটি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হলো সেলায়ে-রেহমীর সওয়াব অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।—(মসনদে আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং তার পরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে।

ইয়াতীম-মিসকীনের হক ঃ তৃতীয় পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ ইয়াতীম ও মিসকীনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও সূরার প্রথম ভাগে এসে গেছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লা-ওয়ারিস তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহায়তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-স্বজনদের বেলায় করে থাক।

প্রতিবেশীর হক ঃ চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى (এবং নিকটপ্রতিবেশীর)— পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَالْجَارِ الْجُنُبِ -جَارٌ শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। এ আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে।

(১) جارذى القربى (২) جارالجنب এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে-কিরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ جارذى القربى বলতে সেই সব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর جار جنب বলতে শুধু সেই প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

কোন কোন তফসীরকার মনীষী বলেছেন, 'জারে যিলকোরবা' এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান। আর 'জারে জুনুব' বলা হয় অমুসলমান প্রতিবেশীকে।

কোরআনে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ এটাই সম্ভবত বোঝাতে চায়। তাছাড়া বাস্তবতার দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ থাকাটা একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে। আর প্রতিবেশীদের আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় হওয়ার দিক দিয়েও প্রতিবেশী সে নিকটবর্তী হোক অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান—যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুয়ায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেওয়া কর্তব্য।

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, স্বয়ং হুযূরে আকরাম

(সা) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, "কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে, যাদের হক মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু'টি এবং কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো এমন অমুসলমান, যাদের সাথে কোন আত্মীয়তাই নেই। দুই হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা, যারা একই সঙ্গে প্রতিবেশী, মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়।"—(ইবনে কাসীর)

রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জিবরাঈল (আ) সদাসর্বদাই আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তাদের সাহায্য-সহায়তার তাকীদ করতেন। এমনকি (তাঁর তাকীদের দরুন) আমার ধারণা হতে থাকে হয়তো বা প্রতিবেশীদেরও আত্মীয়দের মতই মীরাসের অংশীদার করে দেওয়া হবে।—(বুখারী)

তিরমিযী ও মসনদে আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হুযূরে আকরাম (আ) ইরশাদ করেছেন, "কোন মহল্লার লোকদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সেই লোকই সবচাইতে উত্তম, যে স্বীয় প্রতিবেশীদের হক আদায়ের ব্যাপারে উত্তম।

মস্নদে আহমদে উদ্ধৃত অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে কোন প্রতিবেশীর জন্য পেট ভরে খাওয়া জায়েয নয়।

সহকর্মীদের হক ঃ ষষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর শাব্দিক অর্থ হলো সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস-মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সেসব লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে।

ইসলামী শরীয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সেই ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান—সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়েত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোনরকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন সিগারেট পান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা, যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি।

কোরআনে-করীমের এ হেদায়েত অনুযায়ী যদি সবাই আমল করতে শুরু করে, তাহলে রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতিতে সফরের সময় সংঘটিত সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আমার শুধু একজনের জায়গারই অধিকার রয়েছে, তার বেশি জায়গা দখল করে রাখার কোন অধিকার নেই। রেলে (বা অন্যান্য যানবাহনে) অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা উচিত যে, এখানে তারও ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই সাহেবে-বিল-জাম্ব-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার ; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস–আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক।—(রূহুল মা'আনী)

পথিকের হক ঃ সপ্তম পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَابْنِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ পথিক। এতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে, যে সফরের অবস্থায় আপনার কাছে এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহ্মান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় সম্পর্কের লোক সেখানে উপস্থিত নেই, তাই কোরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে অর্থাৎ সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

গোলাম-বাঁদী ও কর্মচারীর হক ঃ অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এতে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী খাওয়া-পরার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাদের দ্বারা করাবে না।

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রাসূলে করীম (সা)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে বিলম্ব বা কার্পণ্য করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না।

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে, যাদের মনে দাম্ভিকতা বিদ্যমান ঃ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে।

আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সে সব লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় গর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। আল্লাহ্ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন।

দাম্ভিকতা এবং মূর্খতাজনিত গর্ব সম্পর্কে বহু হাদীসে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এক হাদীসে আছে ঃ

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل النار احد فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ولا يدخل الجنة احد فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সে লোক (চিরকালের জন্য) জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার মনে রাই পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আর এমন কোন লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার মনে রাই পরিমাণ অহংকার বা দাম্ভিকতা রয়েছে।—(মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৩৩)

অন্য এক হাদীসে যাতে দম্ভের সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে—উল্লিখিত আছে ঃ

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا- قال ان الله تعالىٰ جميل يحب الجمال - الكبر بطر الحق وغمط الناس-

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সেই লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার মনে অণু পরিমাণ অহংকার বা দম্ভ বিদ্যমান রয়েছে। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল হোক, জুতা জোড়া সুন্দর হোক, এটা সবাই চায়, তাহলে কি এটাও অহংকার বা তাকাব্বুর হবে ? হুযূর (সা) বললেন, আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। বস্তুত "তাকাব্বুর হলো হককে প্রত্যাখ্যান করার এবং মানুষকে হীন-নিকৃষ্ট মনে করার নাম।" —(মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৩৩)

অতঃপর اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য অবলম্বন করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করে।

আয়াতে যে بُخْلُ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণত অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-নযুল পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে بخل বা 'কার্পণ্য' শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দাম্ভিক ও অসম্ভব রকম কৃপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় যেমন কৃপণতা করত, তেমনি সেই সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের ইলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সেই সমস্ত জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী (সা)-এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও তাঁর লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেওয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত—না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে বলত।

পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং ইল্‌ম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব।

দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقًا خلفًا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكًا تلفًا-

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।—(বুখারী, মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

عن اسماء (رض) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَنْفِقِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فيحصِىْ الله عليكِ ولاَ توعى فيوعى الله عليك وارضخى ما استطعت.

অর্থাৎ হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, হে আসমা ! সৎ ও কল্যাণের পথে ব্যয় করতে থাক আর গুণে গুণে ব্যয় করো না। তাহলে আল্লাহ্ও তোমার বেলায় গুণতে শুরু করবেন। তাছাড়া সৎপথে ব্যয় করা থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে (ধন-সম্পদের) অতিরিক্ত হিফাযত করতে যেও না। তাহলে আল্লাহ্ও হিফাযত করতে শুরু করবেন। আর তোমার দ্বারা যেটুকু দান করা সম্ভব, তা দিতে বিলম্ব করো না।—(বুখারী, মুসলিম)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخىُّ قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار، وجاهل سخى احب الى الله من عابد بخيل-

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটবর্তী, জান্নাতেরও নিকটবর্তী এবং মানুষের দৃষ্টিতেও পছন্দনীয়, আর জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে। পক্ষান্তরে বখীল বা কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছ থেকেও দূরবর্তী, জান্নাত থেকেও দূরবর্তী, মানুষের কাছেও ঘৃণিত এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। বস্তুত একজন জাহিল বা মূর্খ দানশীল (যদি যথাযথভাবে নির্ধারিত ফরযসমূহ সম্পাদন করে এবং হারাম কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে তবে), সে কৃপণ অপেক্ষা উত্তম, যে ইবাদতে নিয়মানুবর্তী।—(তিরমিযী)

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لاتجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق.

অর্থাৎ "হযরত আবূ সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, দুটি অভ্যাস রয়েছে যা কোন মুমিন ব্যক্তির মাঝে সমবেত হতে পারে না—(১) কার্পণ্য (২) অসদাচরণ।—(তিরমিযী)

অতঃপর اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ বাক্যের দ্বারা দাম্ভিকদের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হলো এই যে, এসব লোক আল্লাহ্র পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না, সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নও উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক-দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শিরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اَنَا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً اشرك فيه معى غيرى تركته وَشِرْكَهُ–

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি শিরক বা অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ; যে লোক কোন নেক আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করে, তখন আমি সে আমলটি শরীকের জন্যই ছেড়ে দিই এবং যে লোক সে আমল করে তাকেও বর্জন করি।

عن شداد بن اوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلّى يرائى فقد اشرك ومن صام يرائى فقد اشرك، ومن تصدق يرائى فقد اشرك–

অর্থাৎ শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল, সে শিরকী করল, যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখল, সে শিরকী করল এবং যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করল, সে শিরকী করল।—(মসনদে আহমদ)

عن محمود بن لبيد انّ النبى صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الا صغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر، قال الرّياء–

অর্থাৎ "মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্য আমার সবচেয়ে বেশি আশংকা হয় 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরকী সম্পর্কে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছোট শিরকী কি ? হুযূর (সা) বললেন, তা হলো 'রিয়া' বা লোক-দেখানো।"

বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসে বাড়তি একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন সৎ আমলসমূহের সওয়াব বন্টন করা হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রিয়াকারদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা সে সমস্ত লোকের কাছে যাও, যাদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে তোমরা দুনিয়াতে নেক আমল করতে আর সেখানে গিয়ে দেখ, তাদের কাছে তোমাদের কৃত নেক আমলের জন্য কি সওয়াব এবং কি প্রতিদান রয়েছে।"

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۚ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

(৩৯) আর কিইবা ক্ষতি হতো তাদের, যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে ! অথচ আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত ! (৪০) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কারও প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না ; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন। (৪১) আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং তোমাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারী ! (৪২) সে দিন কামনা করবে সেই সমস্ত লোক, যারা কাফির হয়েছিল এবং রাসূলের নাফরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহ্‌র কাছে কোন বিষয়।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং কার্পণ্য প্রভৃতি বিষয়ের নিন্দাবাদের বিবরণ ছিল। অতঃপর আলোচ্য এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। আর সবশেষে হাশর অনুষ্ঠানের বিবরণ দান পূর্বক সে সমস্ত লোকদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা ঈমান আনে না এবং নেক আমল করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদের উপর কি (এমন) বিপদ নেমে আসবে যদি তারা আল্লাহ্র উপর এবং শেষ বিচার দিবসের উপর (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের উপর) ঈমান নিয়ে আসে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু তাদের দান করেছেন, তা থেকে কিছু (নিঃস্বার্থভাবে) ব্যয় করতে থাকে ? (অর্থাৎ ক্ষতি কিছুই হবে না, বরং সব রকমেই লাভ হবে) বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সৎ-অসৎ কার্যকলাপ) সম্পর্কে সম্যক অবগত (সুতরাং তিনি ঈমান ও সৎকাজে ব্যয়ের জন্য সওয়াব দান করবেন এবং কুফরী প্রভৃতির জন্য আযাব দেবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা একটি অণু পরিমাণও জুলুম করবেন না (কারো প্রাপ্য সওয়াব দেবেন না অথবা অকারণে কাউকে আযাব দিয়ে বসবেন, যা বাহ্যত অন্যায়—তা কখনও হবে না)। আর (বরং তিনি হলেন এমন সদয়-করুণাময় যে,) যদি কেউ একটি নেকী করে, তবে তাকে তিনি দ্বিগুণ করে সওয়াব দান করবেন (যেমন, অন্যান্য আয়াতে ওয়াদা বর্ণিত রয়েছে)। তাছাড়া (প্রতিশ্রুত এই সওয়াব ছাড়াও) নিজের পক্ষ থেকে (আমলের বিনিময় ছাড়াও পুরস্কার-স্বরূপ পৃথকভাবে) মহাদানে বিভূষিত করবেন। সুতরাং তখনই বা কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে একেকজন সাক্ষী উপস্থিত করবেন এবং (আপনার সাথে যাদের মোকাবিলা হয়েছে) সেসব লোকের উপর সাক্ষ্যদানের জন্য আপনাকে উপস্থিত করবেন ? (অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী মান্য করেনি, তাদের বিষয় উপস্থাপনকালে সরকারী সাক্ষী হিসাবে নবী-রাসূলগণের এজহার শ্রবণ করা হবে। যে সমস্ত বিষয় নবী-রাসূলগণের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় তাঁরা প্রকাশ করবেন। এই সাক্ষ্যদানের পর সেসব বিরুদ্ধবাদীদের অপরাধ প্রমাণ করিয়ে তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। উপরে বলা হয়েছিল যে, তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে ? অতঃপর স্বয়ং আল্লাহ্ সে অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন,) সেদিন (অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে,) যে সমস্ত লোক (পৃথিবীতে অবস্থানকালে) কুফরী অবলম্বন করেছে এবং রাসূলগণের কথা অমান্য করেছে, তারা এমন কামনা করবে যে, হায় (এক্ষণই যদি) আমরা মাটির সমান হয়ে মিশে যেতাম ! (যাতে এহেন অপমান ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।) এবং (বাইরের সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াও স্বীকারোক্তিক্রমেও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কারণ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে (এমন) কোন বিষয়ই গোপন করতে পারবে না (যা তারা পৃথিবীতে করে থাকবে। বস্তুত তাদেরকে উভয় প্রকারেই অপরাধী প্রতিপন্ন করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ —অর্থাৎ তাদের ক্ষতিটা কি হবে এবং তাদের এমন কি বিপদই বা হবে, যদি তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে ? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ কাজ। এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনই কষ্টের বিষয় নয়, তবুও কেন নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ থেকে আখিরাতে ধ্বংসের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও কোন সৎকর্মের সওয়াব এবং শুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখিরাতে এগুলোকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তার সওয়াব দান করবেন, বরং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিম্নতম সওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে একটি সৎকাজের জন্য দশ-দশটি সওয়াব লেখা হয় এবং তদুপরি নানা বাহানায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সৎকাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোর সওয়াব বিশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে (সৎকাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ —কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তার কি কল্পনা করা যেতে পারে ?

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ذَرَّةٍ শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, লাল রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিঁপড়েকে ذَرَّةٌ (যার্‌রাতুন) বলা হয়। আরবরা নিকৃষ্টতা ও ওজনহীনতার প্রেক্ষিতে একে উদাহরণস্বরূপ বলে থাকে।

كَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ বলে আখিরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফিরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে।

তাদের কি অবস্থা হবে যখন হাশরের মাঠে প্রত্যেক উম্মতের নবীদের নিজ নিজ উম্মতের নেক-বদ ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আর বিশেষ করে সেই কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্র আদালতে সাক্ষী দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্যে সব মো'জেযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আপনার তওহীদ ও আমার রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কোরআন শোনাও। হযরত আবদুল্লাহ্ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান অথচ কোরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে ? হুযূর বললেন, হ্যাঁ, পড়। হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, অতঃপর আমি সূরা আন্-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। যখন فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ পর্যন্ত পৌছান, তখন তিনি বললেন, এবার থাম।

তারপর যখন আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে।

আল্লামা কুস্তলানী (র) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে হুযূর (সা)-এর সামনে আখিরাতের দৃশ্যাবলী উপস্থিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। আর সে জন্যই তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ هٰؤُلَاءِ -এর দ্বারা রাসূলে করীম (সা)-এর সময়ে উপস্থিত কাফির-মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, হুযূরের উম্মতের যাবতীয় আমল হুযূরের সামনে উপস্থিত করা হতে থাকে।

যা হোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রাসূলরা নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী (সা)-ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদান করবেন। কোরআন-করীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (সা)-এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্যদান করতে পারেন। অন্যথায় কোরআন করীমে তাঁর (অর্থাৎ সে নবীর) এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসাবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুয়তের একটি প্রমাণ।

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا —আয়াতে ময়দানে আখিরাতে কাফিরদের দুরবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায় ! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দু'ফাঁক হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখনকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম !

হাশরের মাঠে কাফিররা যখন দেখবে, সমস্ত জীবজন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং তাঁরা কামনা করবে—হায় ! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। যেমন, সূরা 'নাবা'তে বলা হয়েছে وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا (আর কাফিররা বলবে, কতই না উত্তম হতো যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম)।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا —অর্থাৎ এই কাফিররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রাসূলরা সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, কাফিররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আল্লাহ্র কসম আমরা শিরক করিনি)। বাহ্যত এ দু'টি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি ? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি হবে এমন যে, যখন প্রথমে কাফিররা লক্ষ্য করবে শুধু

মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা এ কথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরও নিজেদের শিরক ও অসৎ কর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয়তো আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে। এ জন্যই বলা হয়েছে وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

(৪৩) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ ; আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, মুসাফিরী অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারীগমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও—তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল !

শানে নযুল ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে একবার হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) কতিপয় সাহাবীকে দাওয়াত করেছিলেন। তাতে মদ্যপানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভ্যাগত মেহমানদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে যায়। নামাযে হযরত আলী (রা)-কে ইমাম নিযুক্ত করা হয়। নামাযের মাঝে নেশার দরুন 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' সূরার তিলাওয়াতে তিনি মারাত্মক ভুল করে বসেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেন নামায পড়া না হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যেও না (অর্থাৎ নামায পড়ো না), যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে সক্ষম হও, যা কিছু তোমরা মুখে উচ্চারণ করছ। (অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়ো না। এর মর্মার্থ এই যে, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া যেহেতু ফরয, আর এমন অবস্থা যেহেতু নামায আদায়ের পথে অন্তরায়; সেহেতু তোমরা নামাযের সময়ে নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার করো না ; নামাযের মাঝে তোমাদের মুখ থেকে যেন কোন শরীয়ত বিরোধী বাক্য বেরিয়ে না পড়ে)। আর অপবিত্র অবস্থায়ও (অর্থাৎ ফরয গোসলের অবস্থায়ও নামাযে যেও না)। অবশ্য তোমাদের মুসাফিরী অবস্থার কথা স্বতন্ত্র (যার হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শীঘ্রই আলোচনা করা হচ্ছে)। যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও (অর্থাৎ ফরয গোসল করে নেওয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। আর নাপাক অবস্থায় গোসল ব্যতীত নামায না পড়ার যে হুকুম, তা হলো কোন ওযর না থাকা অবস্থায়)। পক্ষান্তরে (তোমাদের যদি কোন ওযর থাকে—যেমন,) তোমরা যদি রোগাক্রান্ত হও (এবং তাতে পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হয়,) কিংবা (তোমরা) যদি মুসাফির অবস্থায় থাক। (যার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে হুকুমও পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। অর্থাৎ পানি পাওয়া না গেলে অথবা রুগ্ন থাকলে তায়াম্মুমের অনুমতি দান। তাছাড়া তায়াম্মুমের বৈধতা শুধু এ দু'টি ওযরের জন্যই নয়, বরং তোমাদের বিশেষভাবে যদি এ দু'টি ওযরই থাকে) কিংবা (এই বিশেষ ওযর যদি না থাকে অর্থাৎ তোমরা মুসাফির কিংবা অসুস্থ নাও হও, বরং কারও যদি এমনিতেই ওযূ ভেঙে যায় কিংবা গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়—যেমন,) তোমাদের মধ্যে কেউ যদি (প্রস্রাব-পায়খানা প্রভৃতি) প্রয়োজন সেরে আসে (যাতে ওযূ ভেঙে যায়) কিংবা তোমরা যদি স্ত্রীগমন করে থাক (যাতে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় এবং) অতঃপর (এ সমস্ত অবস্থায় তা রোগ বা সফরের ওযরই হোক কিংবা ওযূ-গোসলের প্রয়োজনই হোক) তোমরা যদি পানি (ব্যবহার করার সুযোগ) না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেবে। (অর্থাৎ মাটিতে দু'হাত চাপড়ে নিয়ে) স্বীয় মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের উপর (হাত) ঘষে নেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা একান্ত ক্ষমাশীল, অনুগ্রহপরায়ণ (বস্তুত এগুলো যাঁর রীতি, তিনি যে নির্দেশ দান করেন, তা হয় সহজ। সেজন্যই আল্লাহ্ তোমাদের এমন সব নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমাদের কোন কষ্ট কিংবা জটিলতা না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শরাব হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলী ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামী শরীয়তকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাঁদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরি করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরনো অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনও এই দুষ্ট বস্তুর ধারে-কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনও মদ্য স্পর্শ

করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদাভ্যাসে লিপ্ত। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে।

মদ্যপান ও নেশা করা হারাম। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেওয়া হলে মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হতো। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কী করণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হলো। সুতরাং আলোচ্য এ আয়াতে শুধু এ হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে-কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, নামাযের সময়ে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলমানরা উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাযে বাধা দান করে। (কাজেই দেখা গেল) অনেকে তখন থেকেই অর্থাৎ এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হলো এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

মাসআলা ঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া যেমন হারাম, তেমনি কোন কোন মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামায পড়া জায়েয নয়, যাতে মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে ঃ

اذا نعس احدكم فى الصلوة فلير قد حتى يذهب عنه النوم فانه لايدرى لعله يستغفر فيسبّ نفسه-

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কারও যদি নামাযের মাঝে তন্দ্রা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে তাকে কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়া উচিত, যাতে ঘুমের প্রভাব কেটে যায়। অন্যথায় ঘুমের ঘোরে সে বুঝতে পারবে না এবং দোয়া-এস্তেগফারের পরিবর্তে হয়তো নিজেই নিজেকে গালি দিতে থাকবে।—(কুরতুবী)

তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার, যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কতইনা অনুগ্রহ যে, তিনি ওযূ-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলা বাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফিকহ্‌র কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা-উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُونَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلٰكِن لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

(৪৪) তুমি কি তাদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (অথচ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। (৪৫) অথচ আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর সমর্থক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৪৬) কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করেছি। তারা আরও বলে, শোন, না শোনার মত মুখ বাঁকিয়ে ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, 'রায়িনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম। আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু তারা অতি অল্পসংখ্যক।

তফসীরের সারা-সংক্ষেপ

(হে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি!) তুমি কি সে সমস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করনি, (অর্থাৎ দেখার মতই বটে ! দেখলে বিস্মিত হবে—) যারা (আল্লাহ্‌র) কিতাব (তওরাতের জ্ঞান) থেকে একটা বিরাট অংশ প্রাপ্ত হয়েছে ! (অর্থাৎ তওরাতের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) তারা গোমরাহী (অর্থাৎ কুফরী) অবলম্বন করে চলছে এবং (নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়ে ছিলই, সাথে সাথে) এমনও কামনা করছে যাতে তোমরাও (সত্যপথ পরিহার করে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (অর্থাৎ সে জন্য তারা নানা রকম ব্যবস্থাও অবলম্বন করে থাকে। যেমন, তৃতীয় পারার শেষ দিকে এবং চতুর্থ পারার প্রথম দিকে

তার কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে।) বস্তুত (তাদের সম্পর্কে যদি তোমরা অবহিত নাও থাক, তাতে কি) আল্লাহ্ (তো) তোমাদের (এ সমস্ত) শত্রু সম্পর্কে যথার্থই অবহিত রয়েছেন। (সে জন্যই তোমাদেরকে বলেও দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের থেকে বাঁচতে থাক।) অবশ্য (তাদের বিরোধিতার বিষয় শুনে খুব বেশি অস্থির হয়ে পড়ারও কোন কারণ নেই। কারণ) আল্লাহ্ (যে) তোমাদের পক্ষ সমর্থনকারী হিসাবে যথেষ্ট, (তিনিই তোমাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন) তাছাড়া আল্লাহ্ই তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট—(তাদের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন)। এসব লোক (যাদের কথা বলা হচ্ছে, এরা) হচ্ছে ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত। (আর এদের পথভ্রষ্টতা অবলম্বন সম্পর্কে যে কথা উপরে বলা হলো, তা হলো এই যে, তারা আল্লাহ্‌র) কালাম (তওরাত)-কে তার নির্ধারিত লক্ষ্য (ও স্থান) থেকে (শব্দগত বা অর্থগতভাবে) অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। তাছাড়া (এদের আরেকটি গোমরাহী যাতে প্রতারিত হয়ে সরলপ্রাণ মানুষের ফেঁসে পড়াও অসম্ভব নয়, তাহলো এই যে, এরা রাসূলে-করীম [সা]-এর সাথে কথা বলার সময়) এমন বাক্য ব্যবহার করে যার ভাল ও মন্দ দু'রকম অর্থই হতে পারে। এরা অবশ্য মন্দ অর্থেই তা ব্যবহার করত। অথচ প্রকাশ করত—যেন ভাল অর্থেই ব্যবহার করছে। আর এভাবে প্রতারিত হয়ে কোন কোন মুসলমানের পক্ষেও রাসূলে-করীম (সা)-কে এ সমস্ত বাক্যে সম্বোধন করে ফেলা বিচিত্র ছিল না। অতএব সূরা-বাকারার দ্বাদশ রুকূতে 'রায়িনা' শব্দে রাসূলকে সম্বোধন করতে মু'মিনগণকে বারণ করা হয়েছে। কাজেই এ হিসাবে ইহুদীদের এসব বাক্য বা শব্দের ব্যবহার অন্যদের জন্য একরকম গোমরাহীরও কারণ হতে পারত। তা একান্ত মৌখিকই হোক না কেন। অতএব, يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا —বাক্যে সে কথাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, مِنَ الَّذِينَ هَادُوا বাক্যটিতে বিশ্লেষণ ছিল الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا —বাক্যের। আর يُحَرِّفُونَ -তে বিশ্লেষণ ছিল يَشْتَرُونَ-এর। সে সমস্ত বাক্যের মধ্যে একটি ছিল— سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (অর্থাৎ আমরা শুনেছি এবং তা অমান্য করেছি)। এর ভাল অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা আপনার বাণী শুনে নিয়েছি এবং আপনার কোন বিরোধী লোকের বক্তব্য যা আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারত, মান্য করিনি। (এছাড়া আরও একটি মন্দ দিক ছিল এই যে, আমরা আপনার কথা শুনেছি সত্য কিন্তু আমরা তাতে আমল করব না)। আর (দ্বিতীয় বাক্য ছিল— اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর শাব্দিক অর্থ হলো এই যে, তোমরা আমার কথা শোন এবং আল্লাহ্ করুন, তোমাদের তিনি যেন কোন কথাই না শোনান। এর ভাল অর্থ এই যে, কোন বিরোধী ও কষ্টদায়ক কথা যেন শোনানো না হয়, বরং আপনার ভাগ্য যেন এমন সুপ্রসন্ন থাকে যে, আপনি যাই কিছু বলেন, তার প্রতি-উত্তরে যেন আপনাকে কোন প্রতিকূল বাক্য শুনতে না হয়; সব সময়ই যেন অনুকূল উত্তর শোনেন। আর মন্দ অর্থে এই দাঁড়ায় যে, আপনাকে যেন অনুকূল ও আনন্দজনক কোন কথাই শোনানো না হয়। বরং আপনি যাই কিছু বললেন, তারই উত্তরে যেন প্রতিকূল বাক্য আপনার কানে এসে পৌঁছায়)। আর (তৃতীয় বাক্য হলো) رَاعِنَا (এর ভাল ও মন্দ উভয় অর্থই সূরা-বাকারার তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ভাল অর্থ হলো এই যে, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আর মন্দ অর্থ এই যে, ইহুদীদের ভাষায় এটি ছিল একটি

গাল। যা হোক, এ সমস্ত বাক্য) এমনভাবে (তারা বলে) যে, তাদের মুখ (প্রশংসার ভঙ্গি থেকে হীনতার দিকে) ঘুরিয়ে নেয় এবং (মনের মধ্যেও থাকে) ধর্মের প্রতি কটাক্ষের (ও অসম্মানের) নিয়ত (তার কারণ, নবীর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাটাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মের প্রতি কটাক্ষ বিদ্রূপ)। বস্তুত এরা যদি (দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার না করে) এসব বাক্য বলত (অর্থাৎ যদি سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا-এর স্থলে) سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا (অর্থাৎ আমরা শুনে নিয়েছি এবং মান্যও করেছি।) এবং (اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ-এর স্থলে শুধু) اِسْمَعْ (অর্থাৎ আপনি শুনে নিন) আর (رَاعِنَا-এর স্থলে) اُنْظُرْنَا (অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখুন প্রভৃতি বাক্য বলত যাতে কুটিলতার কোন অবকাশ নেই), তাহলে সেটিই ছিল তাদের জন্য মঙ্গলকর (ও লাভজনক)। তাছাড়া (প্রকৃতপক্ষে এগুলোই ছিল) সময়োচিতও বটে। কিন্তু (তারা তো এমন লাভজনক এবং যথোচিত কথা বললোই না তদুপরি উল্লিখিত বাজে প্রলাপ বকতে থাকল। আর তাতে তাঁর মনে কষ্ট হলো, ফলে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কুফরীর দরুন (যাতে তাদের এ সমস্ত বাক্য এবং অন্যান্য কাফিরী কার্যকলাপ সবই অন্তর্ভুক্ত) স্বীয় (খাস) রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। কাজেই এখন আর তারা ঈমান আনবে না। অবশ্য সামান্য কতিপয় লোক (ছাড়া যারা এ সমস্ত বাজে কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে ছিলেন তাঁরা ঈমানও এনেছেন এবং খাস রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিশাপ থেকেও মুক্ত রয়েছেন। যেমন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাকওয়া ও পরহিযগারীর বিষয় আলোচনা করা হয় এবং তাতে অধিকাংশই ছিল পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত। এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামায ও তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুকুম-আহকামও বলে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় ও আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি করে এবং তাতে করে পারস্পরিক লেন-দেনের সুষ্ঠুতা সূচিত হয়। উল্লিখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইহুদীদের দুষ্কর্মের প্রতিকার এবং বাক্য প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن

قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ

أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

---

(৪৭) হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের কাছে আছে পূর্ব

থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি, যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আস্‌হাবে সাব্‌তের উপর। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে (তওরাত) গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ, তোমরা এই গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের) উপর ঈমান আন, যা আমি নাযিল করেছি (এতে ঈমান আনতে গিয়ে তোমাদের ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি একে) এমনি অবস্থায় নাযিল করেছি যে, এটি তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহকেও সত্য বলে অভিহিত করে। (অর্থাৎ তোমাদের আসল কিতাবের জন্যও) এটি সত্যায়নকারী! (অবশ্য বিকৃত অংশ তা থেকে আলাদা।) কাজেই তোমরা (সেই অনিশ্চিত বিষয়টি প্রকাশ পাবার) পূর্বেই (কোরআনের উপর) বিশ্বাস স্থাপন করে ফেল যে, আমি (তোমাদের) মুখমণ্ডল (-এর উপর অঙ্কিত চিত্র অর্থাৎ কান-চোখগুলো)-কে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে এবং সেগুলোকে (অর্থাৎ সে সমস্ত মুখমণ্ডলকে) উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেই কিংবা (যারা ঈমান আনবে না) তাদের উপর এমন (বিশেষ ধরনের) অভিসম্পাত করি, যেমন হয়েছিল আসহাবে সাব্‌তের উপর। (ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বিগত হয়ে গেছে এবং যাদের আলোচনা সূরা-বাকারায় এসে গেছে অর্থাৎ এদেরকেও বাঁদরে রূপান্তরিত করার পূর্বে ঈমান আনা কর্তব্য।) বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার (যে) হুকুম একবার এসে যায়, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান না আনার কারণে যদি বিকৃতির হুকুম দিয়েই দেন, তাহলে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে (কাজেই এ ব্যাপারে তোমাদের ভীত হয়ে ঈমান নিয়ে আসা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র বাণী فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا (অর্থাৎ তাদের ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্দিকে)। ঘুরিয়ে দেওয়া বা উল্টে দেওয়ার মাঝে দু'টি আশংকাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেওয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেওয়াও হতে পারে অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে, বরং গর্দানের মত পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেওয়া।—(মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আযাব কিয়ামতের প্রাক্কালে ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আযাব সংঘটিত হবার নয়। কারণ, তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (র) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ, কোরআনে এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই, যাতে বোঝা যায় যে, ঈমান যদি না আন, তবে অবশ্যই এ আযাব আসবে। বরং আশংকার উল্লেখ রয়েছে মাত্র অর্থাৎ যদি তাদের অপরাধের

প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয়, তারা এমনি আযাবের যোগ্য। যদি আযাব দেওয়া না হয়, তবে সেটা তাঁর একান্ত অনুগ্রহের ব্যাপার।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى إِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ
يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۭ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾
اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ وَكَفٰى بِهٖٓ إِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

(৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (৪৯) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে ; অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই। বস্তুত তাদের উপর সূতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা (শাস্তিদানের পরেও) তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করার পাপকে ক্ষমা করবেন না (বরং তাদেরকে অনন্তকালের জন্য আযাবে নিপতিত করে রাখবেন)। আর এছাড়া অন্যান্য যত পাপ-তাপ রয়েছে (তা সগীরা গোনাহ্ই হোক, আর কবীরা গোনাহ্ই হোক) যাকে ইচ্ছা (বিনা শাস্তিতেই) ক্ষমা করে দেবেন (অবশ্য সে মুশরিক যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে যেহেতু শিরকীরই অস্তিত্ব থাকে না, সেহেতু তাঁর সে শাস্তির অন্তহীনতাও থাকবে না)। আর (এই শিরকীকে ক্ষমা না করার কারণ হলো এই যে,) আল্লাহ্র সাথে যে লোক (অন্যকে) শরীক (অংশীদার) সাব্যস্ত করে, সে (এমন) মহা অপরাধে অপরাধী হয়ে যায় (যা বিরাটত্বের কারণে ক্ষমাযোগ্যই নয়)।

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে অথচ (এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার। অবশ্য তাদের বলাতে কিছুই এসে যায় না,) বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, তাকেই পূত-পবিত্র বলে ঘোষণা করে দিতে পারেন। (এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া আল্লাহ্ কোরআনের মাধ্যমে মু'মিনগণকে পূত-পবিত্র বলে উল্লেখও করেছেন। যেমন, সূরা আ'রা-তে اَشْقٰى [অর্থাৎ কাফির]-দের তুলনায় মু'মিনদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ

تَزَكّٰى —কাজেই তারাই হবেন পবিত্র ; ইহুদীদের মত অকৃতজ্ঞ কাফিররা নয়)। আর (কুফরীকে ঈমান জ্ঞান করার দরুন এসব ইহুদীর এ মিথ্যা দাবির জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য হবে, সে শাস্তির ব্যাপারে) তাদের প্রতি এক সূতা পরিমাণ অন্যায়ও করা হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা তাদের অপরাধের তুলনায় একটুও বেশি হবে না। বরং এমন অপরাধের জন্য এমন শাস্তিই হবে যা যথার্থ। একটু লক্ষ্য করে) দেখ দেখি, (নিজেদের পবিত্রতা সংক্রান্ত দাবির ক্ষেত্রে) এরা আল্লাহ্‌র প্রতি কেমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে! (কারণ, যখন তারা তাদের কাফির হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত বলে দাবি করে, তখন তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কুফরীও আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দের বিষয়। অথচ এটা একান্তই অপবাদ। কারণ, সমস্ত শরীয়তে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, 'কুফর' আমার নিকট অত্যন্ত না-পছন্দ ও প্রত্যাখ্যাত বিষয়) আর (আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করার) এ বিষয়টি প্রকৃষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (সুতরাং এহেন কঠিন অপরাধের পরেও কি এমন শাস্তি দেওয়া কোন বাড়াবাড়ি বা অন্যায় হবে?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শিরকের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যে সব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হলো শিরক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা : অর্থাৎ (১) কোন বুযুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। (২) কোন জ্যোতিষ-পণ্ডিতের কাছে গায়েবের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোন বুযুর্গের বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেওয়া অথবা (৪) কাউকে দূরে থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা (৫) কারো নামে রোযা রাখা।

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করা : অর্থাৎ কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্য যাচ্ঞা করা। কারো কাছে রুজিরোজগারের বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা।

ইবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা : কাউকে সিজদা করা, কারো নামে কোন পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ি-ঘরের তাওয়াফ করা, আল্লাহ্ তা'আলার কোন হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোন প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া, কারো সামনে রুকূ করার মত অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কোরবানী করা, পার্থিব কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোন কোন মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ। ইহুদীরা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে—

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কিবর তথা অহমিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলত এই নিষিদ্ধতাও কিবরেরই জন্য হয়ে থাকে।

(২) দ্বিতীয়ত শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধু আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহিযগারীর মধ্যেই হবে কি না। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা আল্লাহ্-ভীতির পরিপন্থী। এক রেওয়ায়েতে হযরত সালমা বিনতে যয়নব (রা) বলেছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সা) একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল برة (বাররাহ্ অর্থাৎ পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে হুযূর (সা) বললেন ঃ لاتزكوا انفسكم، الله اعلم باهل البر منكم، سموها زينب অর্থাৎ তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।—(মাযহারী)

(৩) নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হলো এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবি করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সে লোক আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে।—(বয়ানুল কোরআন)

মাসআলা ঃ যদি উল্লিখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নিয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে।—(বয়ানুল কোরআন)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

---

(৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে জিব্‌ত ও শয়তানকে এবং কাফিরদের বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল-সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরা হলো সেই সমস্ত লোক, যাদের উপর লানত করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুত আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত জন!) তুমি কি সেই সমস্ত লোককে দেখনি, যারা (আসমানী) গ্রন্থ (তাওরাত)-এর জ্ঞানের একটি অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (কিন্তু তা সত্ত্বেও) তারা বুত ও শয়তানকে মান্য করে। (কারণ, অংশীবাদী মুশরিকদের ধর্ম ছিল পৌত্তলিকতা এবং শয়তানের আনুগত্য করা। এমনি ধর্মকে যখন ভাল বলা হয়, তখন মূর্তি ও শয়তানের সমর্থনই প্রতীয়মান হয়ে যায়।) আর তারা (অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাবরা) কাফির (অর্থাৎ মুশরিকদের) সম্পর্কে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক সরল পথে রয়েছে। (এ কথাটি তারা পরিষ্কারভাবেই বলত)। এরা (যারা কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থার তুলনায় উত্তম বলে অভিহিত করে) ঐ সমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিশপ্ত করেছেন (এই অভিশপ্ততার কারণেই তো তারা এমন নিঃশঙ্কচিত্তে কুফরী বিষয় বলে চলেছে)। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অভিসম্পাতগ্রস্ত করে দেন, (আযাবের সময়) তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কঠোর শাস্তি হবে। কাজেই পৃথিবীতে তাদের কেউ নিহত হয়েছে, কেউ হয়েছে বন্দী, আবার কেউ হয়েছে লাঞ্ছিত প্রজা। আর আখিরাতে যা হবার তা তো রয়েই গেছে)।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াত أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ—থেকে ইহুদীদের দুষ্কৃতি ও বদাভ্যাসসমূহের আলোচনা চলে আসছে এবং আলোচ্য আয়াতগুলোও তাদের সে সব দুষ্কর্মের সাথেই সম্পৃক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'জিবত' ও 'তাগূত'-এর মর্ম ঃ উল্লিখিত একান্নতম আয়াতে 'জিবত' ও 'তাগূত' দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় 'জিবত' বলা হয় যাদুকরকে। আর 'তাগূত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষকে।

হযরত উমর (রা) বলেন যে, 'জিবত' অর্থ যাদু এবং 'তাগূত' অর্থ শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা) বলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই 'তাগূত' বলে অভিহিত হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবনে আনাস (রা)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং 'তাগূত' থেকে বেঁচে থাক)। কিন্তু উল্লিখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'জিবত' বুতেরই নাম ছিল, পরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে।—(রূহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতের শানে নযুল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনে আখতার ও কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের

একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইহুদী সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ আবূ সুফিয়ানের কাছে এসে হুযূরে আকরাম (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবনে আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জিব্ত ও তাগূতের) সামনে সিজ্দা কর।

সুতরাং সে কুরাইশদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাই করল। তারপর কা'ব কুরাইশদেরকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশজন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশজন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা'বার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কা'বের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবূ সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক ; তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ (সা) ন্যায়ের উপর রয়েছেন।

তখন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দীন কি ? আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজ্জের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদের দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর তওয়াফ করি, ওমরাহ্ আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সা) তাঁর পৈতৃক ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ (সা) গোমরাহ্ হয়ে গেছেন—(নাউযুবিল্লাহ্)।

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে তাদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন।—(রূহুল-মা'আনী)

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে ধর্ম ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয় ঃ কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত। সে আল্লাহ্‌তেই বিশ্বাস পোষণ করত এবং তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিষ্কে যখন রিপুরূপ কামনা-বাসনার পিশাচ চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে। কুরাইশরা তার সাথে ঐক্যজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের দেবদেবীর সামনে সিজ্দা করতে হবে। সে তাই মেনে নিল যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কুরাইশদের শর্ত বাস্তবায়ন করলো বটে কিন্তু স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করলো না। কোরআনে-করীম অন্য জায়গায় বাল্আম-বাউরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত ইল্‌ম বা জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণ ও মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ তার ধর্ম হেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রিপুরূপ কামনা-বাসনার বলিতে পরিণত করা থেকে বাঁচতে পারে না। ইদানীং কোন কোন লোক জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বীয় সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম-বিবর্জিত বিশ্বাস ও মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। না তাদের মনে আল্লাহ্‌র সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন পরোয়া থাকে, আর না থাকে আখিরাতের কোন রকম ভয়ভীতি। বস্তুত এ সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি।

তফসীরকাররা লিখেছেন যে, বাল্‌আম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদী আলিম ও উচ্চস্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করতে আরম্ভ করল, তখন মূসা (আ)-এর কোনই ক্ষতি হলো না, কিন্তু সে নিজে গোমরাহ্ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হলো।

আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ ঃ লা'নত বা অভিসম্পাত-এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া অর্থাৎ চরম অপমান-অপদস্থতা অর্জন করা। যার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পতিত হয় সে কখনো আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে আছে ঃ مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا –

অর্থাৎ "যাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হয়েছে, তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত কর।" এই তো গেল তাদের পার্থিব অপমান। আখিরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

আল্লাহ্‌র লা'নতের অধিকারী কারা ? وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا —আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে. যার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র লা'নতের যোগ্য কারা ?

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলে করীম (সা) সুদগ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।—(মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ অর্থাৎ "যে লোক লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।" অতঃপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুর চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্ত কর্তন করা হয়।—(মিশকাত)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لعن الله اكل الربو ومؤكله والواشمة والمستوشمة والمصور অর্থাৎ সুদগ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত এবং সেই সমস্ত নারীর উপর, যারা নিজের শরীর খোদাই করে এবং যে অন্যের শরীরও খুদিয়ে দেয়। তেমনিভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত।

অপর এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি। যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।—(মিশকাত)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ ছয় প্রকার লোক আছে, যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুস্তাজাযুদ্দাওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ্‌র কিতাবে যারা কাটছাঁট করে। (২) যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে এবং এমন সব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ্ অপদস্থ করেছেন আর এমন সব লোককে অপমানিত করে যাদেরকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন। (৩) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে। (৪) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু সামগ্রীকে হালাল মনে করে। (৫) বিশেষত আমার বংশধরদের মধ্যে সে-সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং (৬) যে লোক আমার সুন্নতকে বর্জন করে।—(বায়হাকী)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرءة والمرءة تلبس لبسة الرجل-

অর্থাৎ রাসূলে করীম (সা) এমন পুরুষের প্রতি লা'নত করেছেন, যে স্ত্রীলোকের পোশাক পরে এবং এমন স্ত্রীলোকের উপরও লা'নত করেছেন, যে পুরুষের পোশাক পরে। —(মিশকাত)

عن عائشة رضى الله عنها ان امرءة تلبس النعل قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجله من النساء-

"হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট কোন এক স্ত্রীলোক পুরুষালি জুতা পরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এহেন মহিলার উপর লা'নত করেছেন, যে পুরুষদের মত চালচলন অবলম্বন করে।—(আবূ দাউদ)

عن ابن عباس رضى الله عنه قال لعن النبى صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيو تكم-

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) সেই সমস্ত পুরুষের উপর লা'নত করেছেন, যারা নারীদের মত আকার-আকৃতি ধারণ করে হিজড়া সাজে এবং সেই সমস্ত নারীর উপরও লা'নত করেছেন যারা পুরুষালি আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর তিনি বলেছেন, এদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও।—(বুখারী)

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ

لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله-

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন তাদের উপর যারা শরীর উৎকীর্ণ করে, যারা উৎকীর্ণ করায়, যারা ভ্রূকে সরু করার উদ্দেশ্যে ভ্রূর লোম উপড়ে ফেলে দেয় এবং তাদের উপর যারা সৌন্দর্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করে।

লা'নতের বিধান ঃ লা'নত ও অভিসম্পাত করা যেমন কঠিন ও মন্দ কাজ তেমনি লা'নত করার ব্যাপারে কঠোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। কোন মুসলমানের উপর লা'নত করা হারাম। আর কোন কাফিরের প্রতি শুধু তখনই লা'নত করা যেতে পারে, যখন কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এ ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولاالبذى-

"হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে বিদ্রূপকারী, লা'নতকারী এবং অশ্লীলভাষী সে মু'মিন নয়। —(তিরমিযী)

عن ابى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت اللعنةُ الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينًا وشمالاً فاذا لم تجد مساغًا رجعت الى الذى لَعَنَ فَاِنْ كَانَ لذلك اهلاً والا رجعت الى قائلها-

"হযরত আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দা যখন কোন কিছুর উপর লা'নত করে, তখন লা'নত আকাশের দিকে উঠে যায় কিন্তু আকাশের দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন সে পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে থাকে, তখন পৃথিবীর দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয় (অর্থাৎ পৃথিবী সে লা'নত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে), তখন তা ডানে-বামে ঘুরতে থাকে এবং যখন কোথাও কোন পথ খুঁজে পায় না, তখন তা সে বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়, যার প্রতি লা'নত করা হয়েছিল। সত্য সত্যই যদি সেটি লা'নতের যোগ্য হয়ে থাকে, তবে তাতে গিয়ে পড়ে। অন্যথায় তা লা'নতকারীর উপরই এসে পতিত হয়।"

عن ابن عباس رضى الله عنه ان رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتلعنها فانها مأمورة وانه من لعن شيئًا ليس له باهل رجعت اللعنة عليه-

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার বাতাস এক ব্যক্তির চাদর উড়িয়ে নিয়ে গেলে সে বাতাসের উপর লা'নত করতে লাগল। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি এর উপর লা'নত করো না। কারণ, সে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত। আর স্মরণ রেখো যে লোক এমন বস্তুর উপর লা'নত করবে, যা তার যোগ্য নয়, তখন সে লা'নত ফিরে এসে লা'নতকারীর উপর পড়ে।"

মাসআলা ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে, যদি সে ফাসিকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েয নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী ইয়াযীদের উপর লা'নত করতে বারণ করেছেন। তবে কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েয। যেমন, আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব প্রমুখ।—(শামী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩৬)

মাসআলা ঃ কারও নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, জালিমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক।

মাসআলা ঃ লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্র রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফিরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মু'মিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী (সৎকর্মশীলদের) মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া। সে জন্যই কোন মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েয নয়।—(কাহ্তানী থেকে শামী কর্তৃক উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩৬)

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ

آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

---

(৫৩) তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে ? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৫৪) না কি যা কিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। (৫৫) অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুত (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হ্যাঁ, তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে ? এমতাবস্থায় তারা যে অন্য কাউকে কোন কিছুই দিত না। অথবা (তারা কি) সেসব লোকের সাথে [যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে] এ সমস্ত বিষয়ের কারণে ঈর্ষা পোষণ করে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে ? সুতরাং (আপনার পক্ষে এমন বিষয় প্রাপ্ত হওয়াটা মোটেই নতুন কথা নয়। কারণ) আমি (পূর্ব থেকেই) হযরত ইবরাহীমের বংশধরদেরকে আসমানী কিতাবও দান করেছি এবং জ্ঞান ও হিকমত দান করেছি। (এ ছাড়া) আমি তাদেরকে বিশাল-বিপুল রাজ্যও দিয়েছি। [সুতরাং বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে বহু নবী হয়েছেন। যেমন—হযরত ইউসুফ (আ), হযরত দাউদ (আ) প্রমুখ। হযরত দাউদ (আ) বহু বিবাহিত ছিলেন বলেও জানা যায়। আর এরা সবাই ছিলেন হযরত ইবরাহীমেরই বংশধর। বস্তুত মহানবী (সা)-ও যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর, তখন তিনিও যদি এ সমস্ত নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে]। যা হোক (হযরত ইবরাহীমের বংশধর নবী-রাসূলদের যুগে যারা উপস্থিত ছিল) তাদের কেউ কেউ তো এই কিতাব ও হিকমতের উপর ঈমান এনেছিল। আবার অনেক এমনও ছিল, যারা তা থেকে বহু দূরে নিপতিত রয়ে গিয়েছিল। (সুতরাং আপনার রিসালত ও কিতাবের উপরও যদি আপনার আমলে কোন কোন লোক ঈমান না আনে, তাহলে তা কোন দুঃখ করার বিষয় নয়।) আর (এই কাফির ও বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের উপর যদি এ পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণ শাস্তি আরোপিত হয় অথবা নাও হয়, তবে তাতে কি আসে যায়, তাদের জন্য যে আখিরাতে) দোযখের শিখায়িত আগুন (-এর শাস্তিই) যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা : আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা)-কে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরতো। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য ৫৩ ও ৫৪তম আয়াতে তাদের সে হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দুটির মর্ম মূলত একই। তা হলো এই যে, আল্লাহ্ বলেছেন যে, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ—এর কারণটা কি ? যদি তা এ কারণে হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ, এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না হয় আমরা নাই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে কেন যাবে—রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। তাহলে তার উত্তর হলো এই যে, তিনিও নবীদেরই বংশধর, যাদের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

ঈর্ষার সংজ্ঞা, তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ ঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নদভী (র) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

الحسد تمنى زوال النعمة

অর্থাৎ "অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা।" আর এটি হারাম।

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانًا ولايحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث.

অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশি সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।—(মুসলিম, ২য় খণ্ড)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

"তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।"—(আবূ দাউদ)

عن الزبير رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب اليكم داءُ الامم قبلكم الحسد والبغضاء هى الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولٰكن تحلق الدين.

"হযরত যুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—তোমাদের দিকেও পূর্ববর্তী উম্মতদের ব্যাধি চুপিসারে ধেয়ে আসছে। আর তা হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। এটা এমন এক অভ্যাস, যা মুড়ে দেয়। আমি চুল মুড়ে দেওয়ার কথা বলছি না বরং দীনকে মুড়ে দেয়।"—(তিরমিযী)

ঈর্ষা বা হাসাদ পার্থিব পরাকাষ্ঠার জন্য হোক অথবা ধর্মীয় পরাকাষ্ঠার জন্য হোক, হারাম। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ এর দ্বারা প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রতি এবং اَلْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ -এর দ্বারা দ্বিতীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বোঝায়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيْهَآ أَزْوٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

(৫৬) এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যে সব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্‌টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, হিকমতের অধিকারী। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব ঘন ছায়ানীড়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আমার আয়াত (ও আহ্‌কাম) সমূহকে অস্বীকার করবে, (আমি) যথাশীঘ্র (তাদেরকে) কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করব। (সেখানে তাদের অবস্থা এমন থাকবে যে,) যখন একবার তাদের শরীরের চামড়া (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন (পুনর্বার) আমি সে চামড়ার জায়গায় তৎক্ষণাৎ (নতুন) চামড়া তৈরি করে দেব, যাতে (তারা অনন্তকাল) আযাবই ভুগতে থাকে। (কারণ, প্রথম চামড়া জ্বলে যাবার পর সন্দেহ হতে পারত যে, হয়তো তাতে আর কোন অনুভূতিই থাকবে না, কাজেই এই সন্দেহও অপনোদন করে দেওয়া হয়েছে।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরাক্রমশালী (তিনি এসব শাস্তি দিতে সক্ষম এবং) হিকমতের অধিকারী। (কাজেই জ্বলে যাওয়া চামড়ার মধ্যে কষ্টের অনুভূতি বজায় রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ হিকমত বা তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে চামড়া পাল্টিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন।) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম (সম্পাদন) করেছে, আমি শীঘ্রই তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাব যে, সেগুলোর (মাঝে নির্মিত প্রাসাদসমূহের) তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা সেগুলোতে বাস করবে অনন্তকাল। তাদের জন্য এ জান্নাতসমূহে পূত-পবিত্র পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ থাকবে এবং আমি তাদেরকে অতি ঘন ছায়াপূর্ণ (স্থানে) প্রবেশ করাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كلما نضجت جلودهم بدلنهم—আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত মু'আয (রা) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেওয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

تاكل النّار كل يوم سبعين الف مرة كلما اكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا-

"আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان اهون اهل النار عذابا رجل فى اخمص قد ميه جمرتان يغلى منهما دما غه كما يغلى المرجل بالقمقم-

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচাইতে কম আযাব হবে সে লোকের যার পায়ের তালুতে দু'টি আগুনের অঙ্গার থাকবে, যার ফলে তার মগজ (চুলার উপর চাপানো) হাঁড়ির মত উথলাতে থাকবে।—(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯)

পূত-পবিত্রা স্ত্রী ঃ হাকিম আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের রমণীরা হবে পবিত্র পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ তারা প্রস্রাব, পায়খানা, ঋতুস্রাব এবং নাক-মুখ দিয়ে প্রবাহিত হয়—এমন যাবতীয় জঞ্জাল থেকে মুক্ত হবে।

হযরত মুজাহিদ উল্লিখিত বিষয়গুলোর চাইতে আরো কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন যে, তারা সন্তান প্রসব ও বীর্যস্খলন থেকেও পবিত্র হবে।—(মাযহারী)

ظِلٌّ-ظِلاًّ ظَلِيْلاً শব্দের পর ظَلِيْلٌ শব্দ প্রয়োগে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে ছায়ানীড় তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে, তা হবে স্থায়ী এবং অত্যন্ত ঘন। যেমন, আরবীতে বলা হয়—شَمْسٌ شَامِسٌ এবং لَيْلٌ لَيْلٌ -এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী।

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام مايقطعها اقرئوا وان شئتم وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ-

—হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়া কোন অশ্বারোহী একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা ইচ্ছা করলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ আয়াতটি পাঠ করতে পার।—(মাযহারী)

হযরত রা'বী ইবনে আনাস ظِلاًّ ظَلِيْلاً -এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সে ছায়াটি হচ্ছে আরশের ছায়া, যা কখনো শেষ হবার নয়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

(৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের বলেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শাসন ক্ষমতার অধিকারীবৃন্দ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের) এ বিষয়ে নির্দেশ দান করেছেন যে, (তোমাদের দায়িত্বে) হকদারদের যেসব হক রয়েছে, তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দাও। আর (তোমাদের) এ নির্দেশও দিচ্ছেন যে, তোমরা যখন (আওতাভুক্ত) লোকদের (কোন বিষয়ের) মীমাংসা করবে (এমন কোন অধিকারের ব্যাপারে, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিতর্কিত), তখন মীসাংসা করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের যে বিষয়ে উপদেশ দান করেন তা (পার্থিব দিক দিয়েও) যথার্থই উত্তম। (এতে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা আর পারলৌকিক দিক দিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও পুণ্য লাভের কারণ।) এতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের কথাবার্তা যা তোমরা মীমাংসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বলে থাক) ভালভাবেই শোনেন (আর তোমাদের কার্যকলাপ, যা এ ব্যাপারে তোমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়) ভালভাবেই দেখেন। (অতএব, তোমরা যদি কোন কারণে হেরফের কর, তবে তিনি তা জেনে নিয়ে তোমাদের তদনুসারে শাস্তিদান করবেন। এই তো গেল শাসকদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ। পরবর্তীতে যারা আজ্ঞাবহ তাদের প্রতি বলা হচ্ছে—) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র কথা মান্য কর এবং রাসূল (সা)-এর কথা মান্য কর। (এ

নির্দেশটি হলো শাসক-শাসিত সবার জন্য ব্যাপক।) আর তোমাদের মধ্যে যারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদের কথাও (মান্য কর।) (এ নির্দেশটি হলো বিশেষভাবে শাসনাধীন লোকদের জন্য।) অতঃপর (তাদের নির্দেশ যদি শাসক-শাসিতের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুমের বিরোধী না হয়, তবে তো ভাল ; তাদের কথা মান্য করবে, কিন্তু) যদি (তাদের নির্দেশের মধ্যে) কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয় যে, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্যের বিরোধী কি নয় তাহলে (তা রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর বর্তমান হলে তাঁরই কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁর ওফাতের পরে হয়, তবে মুজতাহিদ ইমাম ও ওলামাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এবং) সে বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্র হাওয়ালা করবে (এবং ওলামারা যে ফতোয়া দেবেন, সে সবাই আমল করবে) যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়ে থাক। (কারণ, বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে জবাবদিহির ভয় করা ঈমানেরই তাকীদ।) এসব বিষয় (যা বলা হলো) অর্থাৎ আল্লাহ্, রাসূল ও শাসকদের আনুগত্য করা (এবং বিতর্কিত বিষয়সমূহ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্র সমর্পণ করা পার্থিব জীবনেও) উত্তম এবং (পরকালের জন্যও) এর পরিণতি অত্যন্ত কল্যাণকর। (কারণ, এতে পার্থিব শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং পারলৌকিক মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভ হয়)।

আয়াতের শানে নযুল ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা হলো এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হতো। খানায়ে-কা'বার কোন বিশেষ খিদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হতো, তারা গোটা সমাজে তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হতো। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্র বিশেষ বিশেষ খিদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হতো। জাহিলিয়াত আমল থেকেই হজ্জের মওসুমে হাজীদের 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা মহানবী (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হতো 'সাকায়া'। এমনি করে অন্যান্য আরো কিছু সেবার দায়িত্ব হুযূর (সা)-এর অন্য পিতৃব্য আবূ তালিবের উপর এবং কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেওয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবনে তালহার উপর।

এ ব্যাপারে স্বয়ং উসমান ইবনে তালহা (রা)-এর ভাষ্য হলো এই যে, জাহিলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহ্র দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশলাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সা) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহ্য় প্রবেশের উদ্দেশ্যে তশরীফ নিয়ে গেলে উসমান (যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাঁকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু মহানবী (সা) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে উসমানের কটূক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে উসমান ! হয়তো তুমি এক সময় বায়তুল্লাহ্র এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। উসমান ইবনে তালহা (রা) বলল, তাই যদি হয়, তবে কুরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। হুযূর

(সা) বললেন, না, তা নয়। তখন কুরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র ভেতরে তশরীফ নিলেন। (উসমান বলেন,) তারপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই হবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের গতিবিধি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হওয়ার পর রাসূলে করীম (সা) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, উসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র উপরে উঠে গেলেন এবং হযরত আলী (রা) মহানবীর নির্দেশ পালনকল্পে তার কাছ থেকে বলপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুযূরের হাতে অর্পণ করলেন। যা হোক, বায়তুল্লাহ্‌য় প্রবেশ এবং সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সা) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য কেউ যদি তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চায় সে হবে জালিম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই হেদায়েত করলেন যে, বায়তুল্লাহ্‌র এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের রীতি মোতাবেক ব্যবহার করবে।

উসমান ইবনে তালহা (রা) বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, উসমান, আমি যা বলেছিলাম তাই হলো নাকি? তৎক্ষণাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন, "একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে।" তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে আর তৎক্ষণাৎ আমিও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।—(মাযহারী)

হযরত ফারূক আযম উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সা) বায়তুল্লাহ্ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি আবৃত্ত হচ্ছিল।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا۔

এর আগে আমি কখনো এ আয়াত তাঁর মুখে শুনিনি। বলা বাহুল্য, এ আয়াতটি তখনই কা'বার অভ্যন্তরে নাযিল হয়েছিল। এ আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ পালনকল্পেই তিনি পুনরায় উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে কা'বার চাবি তাঁর হাতে অর্পণ করেন। কারণ, উসমান ইবনে তালহা যখন এ চাবি মহানবী (সা)-এর নিকট অর্পণ করেছিলেন, তখন বলেই দিয়েছিলেন যে, এ আমানত আমি আপনার হাতে অর্পণ করছি। যদিও নিয়মানুযায়ী তাঁর একথা যথার্থ ছিল না, বরং তখন যাবতীয় অধিকার রাসূলে করীম (সা)-এরই ছিল। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারতেন, কিন্তু কোরআনে করীম এক্ষেত্রেও আমানতের বাহ্যিক রূপের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মহানবী (সা)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, উসমানকেই চাবি ফিরিয়ে দাও। অথচ তখন হযরত

আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-ও হুযূরের কাছে এ নিবেদন করেছিলেন যে, যেভাবে 'সাকায়াহ' ও 'সাদানাহ'-এর দায়িত্ব আমাদের হাতে রয়েছে, এই চাবি বহনের খেদমতও আমাদেরকেই দিয়ে দিন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের হেদায়েত অনুযায়ী তিনি তাঁদের সে নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং চাবি উসমান ইবনে তালহাকেই ফিরিয়ে দেন।—(তফসীরে মাযহারী)

এ পর্যন্ত আয়াতের শানেনযুল সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কোন আয়াতের শানেনযুল কোন বিশেষ ঘটনা হলেও তার হুকুম হয়ে থাকে ব্যাপক। সমগ্র উম্মতের জন্যই তার অনুবর্তিতা অপরিহার্য হয়ে থাকে।

এবারে এর অর্থ ও মর্মের প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার অধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও।" এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হলো এই যে, এমন সবাই এর লক্ষ্য, যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত।

আমানত পরিশোধের তাকীদ ঃ বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সেই আমানত প্রাপককে পৌঁছিয়ে দেওয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূলে করীম (সা) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, এমন খুব কমই হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি ঃ

لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لاعهد له ٠

অর্থাৎ "যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই!"-(শোয়াবুল ঈমান)

খেয়ানত মুনাফিকীর লক্ষণ ঃ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মুনাফিকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে।

আমানতের প্রকারভেদ ঃ এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম আমানতের বিষয়টিকে امانات। বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যে কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধু 'আমানত' নয়, যাকে সাধারণত আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয় বরং আমানতের আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানেনযুল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্র খেদমতের একটা পদের নিদর্শন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার আমানত ঃ এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সেসব কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়। বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্য ঃ যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি সে কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত হবে। না তার ফরয (ইবাদত) কবূল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।—(জমউল-ফাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা ৩২৫)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কোন লোক যদি জেনেশুনে কোন যোগ্যলোকের পরিবর্তে অযোগ্য লোক কোন পদে নিয়োগ করে, তাহলে সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং জনগণের গচ্ছিত আমানতের খেয়ানত করার মত কাজ করে। ইদানীং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তা সবই এই কোরআনী শিক্ষাকে উপেক্ষা করার পরিণতি। বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আত্মীয়তা কিংবা সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী পদ ও পদমর্যাদা বণ্টন করা হয়। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই অযোগ্য, অসমর্থ লোক বিভিন্ন পদ কব্জা করে বসে মানুষকে অতিষ্ঠ করে থাকে এবং গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়।

সেজন্যই মহানবী (সা) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ

اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة •

অর্থাৎ "যখন দেখবে কাজের দায়িত্ব এমন লোকের হাতে অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে, যে সে কাজের যোগ্য নয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর (এর কোন প্রতিকার নেই)।—(বুখারী কিতাবুল-ইল্ম)

কোরআন করীম امانات। শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, আমানত শুধু একজনের মাল অপর কারো নিকট গচ্ছিত রাখার নামই নয়, বরং আমানতের বহু প্রকারভেদ রয়েছে, যাতে সরকারী পদও অন্তর্ভুক্ত।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ المجالس بالامانة। অর্থাৎ ওঠা-বসাও আমানতদারীর সাথে হওয়া উচিত।

অর্থাৎ বৈঠকে যেসব কথাবার্তা বলা হয়, তা সে মজলিসেরই আমানত। মজলিসের অনুমতি ছাড়া তার আলোচনা অন্য কারো সাথে করা কিংবা ছড়ানো জায়েয নয়।

এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে— الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ। অর্থাৎ যার কাছ থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তিনি সে ব্যাপারে আমানতদার। তিনি এমন পরামর্শই দেবেন, যা পরামর্শ গ্রহীতার জন্য কল্যাণকর হবে। জানা সত্ত্বেও কাউকে কোন রকম কুপরামর্শ দান করলে পরামর্শদাতা আমানত খেয়ানতের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। তেমনিভাবে কেউ কারো কাছে নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করলে, তা তার অনুমতি ছাড়া অপর কারো নিকট প্রকাশ করাও খিয়ানত। উল্লিখিত আয়াতে এ সমুদয় আমানত রক্ষা করারই তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

এই ছিল প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যের তফসীর। পরবর্তীতে প্রথম আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের তফসীর। وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ অর্থাৎ তোমরা যখন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে যাবে, তখন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে। এতে প্রকাশ্যত বোঝা যায় যে, শাসকবর্গ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গই হলেন এই সম্বোধনের লক্ষ্য—যারা মামলা-মোকদ্দমা বা কোন বিষয়ের মীমাংসা করে থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে কোন কোন মনীষী প্রথমোক্ত বাক্যটির লক্ষ্যও শাসক শ্রেণী বলেই সাব্যস্ত করেছেন। যদিও প্রথম বাক্যের মত এ বাক্যেও সে সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, এর সম্বোধনের লক্ষ্যও হবে শাসক ও সাধারণ মানুষ উভয়ই। কারণ, সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিবদমান দুই পক্ষ তৃতীয় কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করে মীমাংসা করে থাকে। এ ভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রাথমিক দৃষ্টিতে উভয় বাক্যের দ্বারাই শাসক ও কর্তৃপক্ষীয় শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে বোঝা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, দুটি বাক্যেরই প্রাথমিক লক্ষ্য হলো শাসকবর্গ ও কর্তৃপক্ষ। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এর লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক যাদের কাছে মানুষ নিজেদের আমানত গচ্ছিত রাখে এবং যাদেরকে কোন বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিস সাব্যস্ত করা হয়।

এ বাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন বলেছেন ঃ بَيْنَ النَّاسِ (মানুষের মাঝে) بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ (মুসলমানদের মাঝে) বলেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মামলা-মোকদ্দমা অথবা যে-কোন বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে সব মানুষই সমান। সে মানুষ মুসলমান হোক কি অমুসলমান, মিত্র হোক কি শত্রু, স্বদেশী হোক কি বিদেশী, স্ববর্ণ হোক বা অন্য বর্ণের, একই ভাষাভাষী হোক কি ভিন্নভাষী, মীমাংসাকারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো এই যে, কোন সম্পর্কের উর্ধ্বে থেকে যা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হবে, তাই ফয়সালা করে দেবে।

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শান্তির জামিন ঃ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী পদসমূহে সেসব লোককেই নিয়োগ করতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘুষ-উৎকোচ যেন কোনক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না

পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য অথর্ব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের অধিকারী হয়ে আসবে। অতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তবুও তাঁদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এসব সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কি উপায় থাকবে।

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, এতে মহান পরওয়ারদিগার সরকারী পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধু তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক; কোন ফকীর-মিসকীনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেওয়া কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেওয়া জায়েয নয়, তেমনিভাবে সরকারী পদ যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র সেসব লোকই এসব আমানতের অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যের তুলনায় অগ্রগণ্য। এদের ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবে না।

এলাকার ভিত্তিতে সরকারী পদ বন্টন ঃ এতদসঙ্গে কোরআনে হাকীম উল্লিখিত বাক্যের দ্বারা সেই সাধারণ ভুলেরও অপনোদন করে দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবিধানেই প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারী পদসমূহকে দেশের অধিবাসীবৃন্দের হক বা অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বস্তুত এই মূলনীতিগত ভুলের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে হয়েছে যে, সরকারী পদসমূহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। দেশের প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারিত থাকবে। এক এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তা প্রার্থী যতই যোগ্য হোক। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অকর্মণ্য হোক, তাকেই নিয়োগ করতে হবে। কোরআনে হাকীম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এসব পদ কারোই ব্যক্তিগত বা এলাকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা শুধু এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে, তা সে যে এলাকারই হোক। অবশ্য কোন বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের শাসনকল্পে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে যাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, তার কাজের যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি ঃ এভাবে এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রথমত আয়াতের প্রথম বাক্য إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ। এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই।

(২) দ্বিতীয়ত সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে। বরং এগুলো হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, যা শুধু সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোকদেরই দেওয়া যেতে পারে।

(৩) তৃতীয়ত পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধু একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসাবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সেই সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেওয়া হয়েছে।

(৪) চতুর্থত তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয।

এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের এসব মূলনীতি বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করারও সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তাঁর রচিত নীতিমালা সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত নীতিমালা ও সংবিধান শুধু নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, রাসূল এবং তোমাদের সচেতন নেতাদের অনুসরণ কর।

'উলিল-আমর' কাকে বলা হয় ঃ 'উলিল-আমর' আভিধানিক অর্থে সেই সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ মুফাস্সির ওলামা ও ফুকাহা সম্প্রদায়কে 'উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী (সা)-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত।

মুফাসসিরীনের অপর এক জামা'আত—যাঁদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামও রয়েছেন—বলেছেন যে, 'উলিল-আমর'-এর মর্ম হচ্ছে সেসব লোক যাঁদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

এছাড়া তফসীরে ইবনে কাসীর এবং তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

এ আয়াতে বাহ্যত তিনের আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে। (১) আল্লাহ্ (২) রাসূল এবং (৩) উলিল-আমর। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, নির্দেশ ও আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে শুধু এক আল্লাহ্রই জন্য নির্ধারিত। বলা হয়েছে اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ। তবে তাঁর হুকুম ও তাঁর আনুগত্যের বাস্তবায়ন পদ্ধতি চারভাগে বিভক্ত।

(১) সে সমস্ত বিষয়ের হুকুম বা নির্দেশ যা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সরাসরি কোরআনে অবতীর্ণ করে দিয়েছেন এবং যাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ বা প্রয়োজন নেই। যেমন, শিরক ও কুফরীর চরম পাপ হওয়া, একমাত্র আল্লাহ্ ওয়াহ্দাহু লা-শারীকের ইবাদত করা, আখিরাত ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্র সর্বশেষ সত্য নবী বলে মান্য করা এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে ফরয মনে করা। এগুলো এমন বিষয়, যা সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং এগুলোর সম্পাদন সরাসরিভাবে আল্লাহ্রই আনুগত্য।

(২) দ্বিতীয়ত আহ্কাম ও বিধি-বিধানের সেই অংশ যাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রায়ই কোরআন করীম এসবের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিংবা আংশিক নির্দেশ দিয়েছে এবং মহানবী (সা)-এর উপর সেগুলোর বিশ্লেষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাদীসের মাধ্যমে দিয়েছেন, সেগুলোও এক প্রকার ওহীই বটে। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কোন রকম দ্ব্যর্থতা থেকে গিয়ে থাকলে, সেগুলোও ওহীরই মাধ্যমে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা)-এর বিশেষ বাণী ও কাজ-কর্মসমূহও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমসমূহেরই পরিপূরক হয়ে গেছে।

এ সমস্ত হুকুম-আহকামের আনুগত্য করা যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য, কিন্তু যেহেতু প্রকাশ্যভাবে এসব হুকুম-আহ্কাম সরাসরিভাবে কোরআন নয়, মহানবীর বাণীর মাধ্যমে উম্মতের নিকট এসে পৌঁছেছে, সেহেতু সেগুলোর আনুগত্যকে বাহ্যত রাসূলের আনুগত্য বলেই অভিহিত করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্যের অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটা পৃথক মর্যাদার অধিকারী। সে জন্যই সমগ্র কোরআনে আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের আনুগত্যের কথাটিও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ে সেসব আহ্কাম ও নির্দেশ যেগুলো পরিষ্কারভাবে না কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, না হাদীসে। এগুলোর ব্যাপারে আবার পরস্পরবিরোধী বর্ণনাও দেখা যায়। এমন সমস্ত হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারে মুজতাহিদ ও গবেষক আলিমগণ কোরআন ও সুন্নাহ্র প্রকৃষ্ট বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়ের নযীর—উদাহরণের উপর চিন্তা-ভাবনা করে তার হুকুম অনুসন্ধান করে নেন। প্রকৃতপক্ষে সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ না হলেও যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহই এসব আহকামের মূল উৎস, সেহেতু এগুলোর আনুগত্য করাও আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যেরই নামান্তর। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলোকে ফিকহী ফতোয়া বলা হয় এবং এগুলোকে আলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ের এসব হুকুম-আহকামের মধ্যে এমন হুকুম-আহকামও রয়েছে, যাতে কোরআন-সুন্নাহ্র দিক দিয়ে কোন রকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। বরং এসবে যারা আমল করবে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী যেভাবে খুশি আমল করতে পারে। পরিভাষাগতভাবে এগুলোকেই বলা হয় 'মোবাহ'। এ ধরনের হুকুম-আহকামের সম্পাদন ব্যবস্থার দায়িত্ব শাসক শ্রেণী ও কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে। তারা অবস্থা ও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রেক্ষাপটে বিচার-বিবেচনা করে সবাইকে তদনুরূপ পরিচালনা করবেন। যেমন, কোন একটি শহরে ডাকঘরের সংখ্যা

পঞ্চাশ হবে কি একশ, পুলিশ স্টেশন বা থানা কয়টি হবে, রেলওয়ে ব্যবস্থা কিভাবে চলবে, পুনর্বাসন ব্যবস্থা কোন্ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে—এসব বিষয়ই হলো 'মোবাহ' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর কোন দিকই ওয়াজিব অথবা হারাম নয়, বরং ঐচ্ছিক। কিন্তু যেহেতু এসব বিষয়ের স্বাধীনতা জনসাধারণকে দিয়ে দেওয়া হলে তাতে শাসনকার্য চলতে পারে না, কাজেই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের হাতেই থাকে।

উল্লিখিত আয়াতে 'উলূল-আমরের' আনুগত্যের মর্ম ওলামা ও শাসন কর্তৃপক্ষ উভয়েরই আনুগত্য করা। অতএব, আয়াতের প্রেক্ষিতে ফিকহ্ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে ফিকহ্‌বিদগণের আনুগত্য এবং শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করাও অপরিহার্য হয়ে গেছে।

এ আনুগত্যও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কামেরই আনুগত্য। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব নির্দেশ বা হুকুম-আহ্কাম না আছে কোরআনে আর না আছে সুন্নাহ্য়। বরং এগুলোর বিশ্লেষণ হবে ওলামাদের পক্ষ থেকে কিংবা শাসনকর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। সেজন্যই এসবের আনুগত্যের বিষয়টিকে তৃতীয় পর্যায়ে পৃথকভাবে সাব্যস্ত করে 'উলূল্-আমর'-এর আনুগত্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর যেভাবে কোরআনের 'নছ' বা সরাসরি আহ্কামের ক্ষেত্রে কোরআন এবং রাসূলের সরাসরি নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে যেসব বিষয়ে কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন হুকুম নেই, সেগুলোতে ফিকহ্‌বিদ ওলামা এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অনুসরণ করাও ওয়াজিব। আর এটাই হলো উলিল-আমর-এর প্রতি আনুগত্যের মর্ম।

শরীয়ত বিরোধী কাজে শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا —আয়াতে আল্লাহ্ যে কাজটির কথা বলেছেন তা হলো এই যে, তোমরা যখন মানুষের কোন বিষয়ের মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে। আর এরই পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা 'উলিল্-আমর'-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শাসক যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তার আনুগত্য করাও প্রজাদের পক্ষে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি ন্যায় ও সুবিচার পরিহার করে তারা শরীয়ত বিরোধী হুকুম জারি করতে আরম্ভ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য জায়েয নয়। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

অর্থাৎ "এমন কোন বিষয়ে কারো আনুগত্য জায়েয নয়, যাতে স্রষ্টার নাফরমানীর কারণ হয়।"

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ –আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যদি মানুষের মাঝে কোন বিষয়ের মীমাংসা কর, তবে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা ও যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না এমন লোকের পক্ষে কাযী বা বিচারক হওয়া উচিত নয়। কারণ, حكم با لعدل (ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা)-ও একটি আমানত। অথচ কোন দুর্বলচিত্ত অযোগ্য লোকের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে

না। কাজেই হযরত আবূ যর (রা) যখন হুযূরে আকরাম (সা)-এর নিকট আবেদন করেছিলেন যে, আমাকে কোনখানে শাসক নিযুক্ত করে দিন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

يا اباذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزى وندامة الامن اخذ بحقها وادى الذى عليه فيها-

অর্থাৎ হে আবূ যর! তুমি হলে একজন দুর্বল লোক। আর এ পদটি হলো একটি আমানত। যার জন্য কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান-অপদস্থতার সম্মুখীন হতে হবে। তবে যে লোক আমানতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারবে সেই এ অপদস্থতা থেকে রক্ষা পাবে।

ন্যায়ানুগ লোক আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ঃ এক হাদীসে হুযূরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, যারা ন্যায়ানুগ তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম ও নিকটতম ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যারা জালিম, অত্যাচারী, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, সর্বাগ্রে আল্লাহ্ তা'আলার ছায়ায় (রহমতে) কে যাবে, তোমরা কি তা জান? তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তারপর রাসূলে করীম (সা) বললেন, এরা হলো সেই সব লোক, যাদের সামনে সত্য উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তা গ্রহণ করে নেয়, যখন তাদের কাছে চাওয়া হয় তখন তারা সম্পদ ব্যয় করে এবং যখন তারা কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তখন তারা এমন ন্যায়সঙ্গত পন্থায় তার মীমাংসা করে যেমনটি নিজের জন্য করে থাকে।

ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রমাণ ঃ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ- আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর।

কিতাব ও সুন্নাহ্‌র (বা আল্লাহ্ ও রাসূলের) প্রতি প্রত্যাবর্তন করার দুটি দিক রয়েছে ঃ (১) তোমরা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সরাসরি হুকুম-আহ্‌কামের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। (২) দ্বিতীয়ত কোন বিষয়ে যদি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র কোন সরাসরি নির্দেশ না থাকে, তবে (সেসব সরাসরি 'নছ'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) উদাহরণসমূহের উপর কিয়াস করে সে দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এখানে فَرُدُّوْهُ শব্দটি দু'টি দিকেই ব্যাপক।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ

رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ
مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ
اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ
قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ
بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ
اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ
لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

(৬০) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (৬১) আর যখন তুমি তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে এসো যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে, তারা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। (৬২) এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হলো ! অতঃপর তারা তোমার কাছে আল্লাহ্র কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। (৬৩) এরা হলো সেই সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা অবগত। অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং তাদের সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বল যা তাদের জন্য কল্যাণকর। (৬৪) বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তাদের নির্দেশ মান্য করা হয়। আর সেইসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন তোমার কাছে আসত ; অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্কে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি কি সেই সমস্ত লোককে দেখেননি যারা (মুখে মুখে) দাবি করে যে, আমরা এ কিতাবের উপরও ঈমান রাখি যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ

কোরআন) এবং সেই সব কিতাবের প্রতিও (ঈমান রাখি) যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ তাতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আর অধিকাংশ মুনাফিকই ছিল ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা মুখে মুখে দাবি করে যে, আমরা যেমন তওরাতকে মান্য করি, তেমনি কোরআনকেও মানি। অর্থাৎ তারা মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু তার পরেও তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা) নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে শয়তানের কাছে উপস্থিত হতে চায়। (কারণ, যা শরীয়ত নয়, সেদিকে মোকদ্দমা নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তানই শিক্ষা দেয়। কাজেই এতে আমল করাটাই এমন, যেন শয়তানের কাছে মামলা নিয়ে উপস্থিত হলো)। অথচ (দুটি বিষয় এর অন্তরায়। একটি এই যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে) তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন শয়তানকে মান্য না করে (অর্থাৎ বিশ্বাসগত ও কার্যগতভাবে যেন তার বিরোধিতা করা হয়)। আর (দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা এই যে,) শয়তান (তাদের এমন শত্রু যে অকল্যাণ কামনা করে) তাদেরকে (সত্যপথ থেকে) প্রতারিত করে বহুদূর নিয়ে যেতে চায় (এ দুটি অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও তারা শয়তানেরই আনুগত্য করে, অথচ এগুলোর তাকাদাই হলো শয়তানের কথামত আমল না করা)। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা এসো সেই নির্দেশের দিকে, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং (এসো) রাসূলের দিকে (তিনি তোমাদের আল্লাহ্র নির্দেশ মতই সিদ্ধান্ত দান করবেন), তখন আপনি তাদের অবস্থা এমন দেখবেন যে, মুনাফিকরা আপনার কাছ থেকে গা-বাঁচিয়ে চলছে। এমতাবস্থায় তাদেরই পূর্বকৃত সে কর্মের দরুন তাদের উপর বিপদাপদ এলে কেমন দশাটা হবে যা তারা করেছিল (এই বিপদের) পূর্বে। (তাদের এই কার্যকলাপ বলতে নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে শয়তানের কাছে যাওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। আর বিপদ অর্থ, তাদের নিহত হওয়া, কিংবা তাদের খিয়ানত ও মুনাফিকীর বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়া এবং এসব কাজের জন্য জওয়াবদিহির সম্মুখীন হওয়া। তখন তারা ভাবতে আরম্ভ করে যে, এ সমস্ত অপকর্মের কি ব্যাখ্যা তৈরি করা যায়, যাতে সম্মান অর্জন করা যেতে পারে?) তারপর (কোন একটি ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে) তারা আপনার কাছে উপস্থিত হয় (এবং) আল্লাহ্র কসম খেয়ে খেয়ে বলতে থাকে যে, (আমরা যে আপনার কাছ থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম, তাতে) আমাদের উভয় পক্ষের (অর্থাৎ আপনাদের ও আমাদের) মঙ্গল (চিন্তা) ছাড়া অন্য কোন কিছুই উদ্দেশ্য ছিল না। [যাতে হয়তোবা এভাবে উভয়ের মঙ্গলের কোন একটা উপায় বেরিয়ে আসে এবং তাদের পরস্পর ঐক্য ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এই যে আইন-কানুন, তা একমাত্র শরীয়তেরই অধিকার, আমরা শরীয়তকে নাহক মনে করে যাইনি। তবে কথা হলো এই যে, আইনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিচারক তো আর রেয়াত-মরুওতের কথা বলতে পারেন না। অথচ এতে প্রায়ই রেয়াত-মরুওত করিয়ে দেওয়া হয়। এটাই ছিল আমাদের অন্যত্র যাবার আসল কারণ। আর হত্যার ঘটনার যে অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা হয়তো ছিল সেই নিহত ব্যক্তির কর্ম সম্পর্কিত, যার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করে মুক্ত করিয়ে নেওয়া কিংবা হত্যার দায় হযরত উমর (রা)-এর উপর চাপানো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এসব অপব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন,] এরা হলো এমন লোক যাদের মনের (কুফরী ও মুনাফিকী) সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন (যে, তাদের এসব কুফরী ও মুনাফিকী এবং শরীয়তের হুকুমের প্রতি অসন্তুষ্টির দরুনই এরা অন্যত্র চলে যায়। অবশ্য নির্ধারিত সময়ে তারা এসব কার্যকলাপের শাস্তিও পাবে)। অতএব, আপনি (আল্লাহ্র

অবগতি ও বিচারের উপর ভরসা করে) তাদের (এসব বিষয়ের) প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করুন। (অর্থাৎ এসব বিষয়ে তাদেরকে ধর-পাকড় করবেন না।) তাছাড়া (আপনার রিসালতের দায়িত্ব অনুযায়ী) তাদেরকে হেদায়েত করতে থাকুন (যাতে তারা এসব কাজ পরিহার করে) তাদেরকে তাদের নিজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সংশোধনমূলক কথা বলে দিন (যাতে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর পরেও যদি তারা না মানে, তবে তারাই বুঝবে)। আর আমি সমস্ত নবীকে বিশেষত এ কারণেই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মোতাবেক (যেমন, নবী-রাসূলদের আনুগত্য সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে) তাদের আনুগত্য করে। (অতএব, প্রথমত শুরু থেকেই তাদের পক্ষে আনুগত্য করা উচিত ছিল)। আর যদি (দুর্ভাগ্যবশত ভুল হয়েই গিয়ে থাকে, তবে) যখন (এ পাপের বশবর্তী হয়ে) সে নিজের ক্ষতি করেছিল তখন (অনুতপ্ত হয়ে) আপনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর নিকট (নিজেদের পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও যদি তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ তা'আলাকে তওবা কবূলকারী, দয়াশীল পেত (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজের দয়ায় তাদের তওবা কবূল করে নিতেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যাবতীয় ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশের আনুগত্য করার হুকুম ছিল। পরবর্তী আয়াতে শরীয়ত বিরোধী বিধি-বিধানের দিকে ধাবিত হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে।

আয়াতসমূহের শানে নযুল ঃ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা এই যে, বিশ্‌র নামক এক মুনাফিক ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করে নিই। কিন্তু মুনাফিক বিশ্‌র এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না। বরং সে কা'ব ইবনে আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে গিয়ে মীমাংসা করাবার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের একজন সর্দার এবং রাসূলে করীম (সা) ও মুসলমানদের কঠিন শত্রু। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইহুদী নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সা)-এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিল, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয়দানকারী বিশর হুযূরের স্থলে ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রাসূলে করীম (সা) যে মীমাংসা করবেন, তা একান্তই ন্যায়সংগত করবেন। আর তাতে কারোই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিরোধীয় বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজেদের সর্দার অপেক্ষাও বেশি বিশ্বাস ছিল মহানবী (সা)-এর উপর। পক্ষান্তরে মুনাফিক বিশ্‌র ছিল অন্যায়ের উপর। সেজন্য সে জানত যে, মহানবীর মীমাংসা তার বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও আমি মুসলমান বলে পরিচিত এবং সে ইহুদী।

যা হোক, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তারই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হলো। অতঃপর তারা তাঁরই কাছে

হাযির হয়। মহানবী (সা) মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান বিশ্‌রকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে এই মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হলো এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইহুদীকে রাযী করিয়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, বিশ্‌র মনে করেছিল, যেহেতু হযরত উমর কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেওয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু'জনই হযরত উমর ফারূকের কাছে গেল। ইহুদী লোকটি ফারূকে আযমের কাছে সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে বলল যে, এ মোকদ্দমার ফয়সালা হুযূর (সা)-ও করেছেন, কিন্তু এ লোকটি প্রথম রায় মেনে নিতে পারেনি। ফলে মোকদ্দমা নিয়ে সে আপনার কাছে এসেছে।

হযরত উমর বিশ্‌রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই ? সে স্বীকার করল। তখন হযরত ফারূকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফিক লোকটিকে সাবাড় করে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রাসূল (সা)-এর ফয়সালা মানতে রাযী নয়, এই হলো তার মীমাংসা। (ঘটনাটি ছা'লাবী, ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতক্রমে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে।)

সাধারণ তফসীরকাররা এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরপর নিহত মুনাফিকের ওয়ারিসরা হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়ত- সিদ্ধ কোন দলীল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটি মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত উমরকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি ঘটনার কথা বর্ণিত রয়েছে, যাতে কিছু লোক শরীয়তের মীমাংসা ছেড়ে কোন এক গণকের মীমাংসা গ্রহণ করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। হয়তো বা আয়াতটি সেই সব ঘটনার প্রেক্ষিতেও অবতীর্ণ হয়ে থাকবে।

এবার আয়াতের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সেই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, যে লোক দাবি করে যে, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থরাজি—যেমন তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) আপনার উপর নাযিল হয়েছে, তার উপরও ঈমান এনেছি। অর্থাৎ পূর্বে ছিলাম আহলে কিতাব আর এখন হলাম মুসলমান। কিন্তু তার মুসলমান হওয়া সংক্রান্ত এ দাবিটি ছিল একান্তই মৌখিক; মনের দিক দিয়ে সে ছিল কুফরে পরিপূর্ণ। বিবাদ করতে গিয়ে সে বিষয়টি এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা)-কে বর্জন করে সে ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট যাওয়ার প্রস্তাব করে এবং মহানবী (সা) যখন ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেন, তখন তা মানতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

طاغوت শব্দের অর্থ ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 'তাগূত' বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা হয় এই কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক শয়তান কিংবা এই কারণে যে, শরীয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরীয়তবিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া, শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুত যে লোক সেই শিক্ষার অনুসরণ করেছে, সে শয়তানের কাছেই যেন নিজের মোকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে পথভ্রষ্টতার সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের সময় রাসূলে করীম (সা) কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফিকের কাফির হওয়া কার্যত এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সা)-এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারূককে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর সে মুনাফিক থাকেনি, বরং প্রকাশ্য মুর্তাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে—এরা এমন লোক, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রাসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফিক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

তৃতীয় আয়াতে ওয়ারিশানের সে সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভ্রান্ততা প্রকাশ করা হয়েছে, যা শরীয়তসম্মত মীমাংসা পরিহার করে শরীয়তবিরোধী মীমাংসার প্রতি ধাবিত লোকদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সংক্ষেপে তা ছিল এই যে, আমরা রাসূলে করীম (সা)-কে না-হক বা ন্যায়বিরোধী মনে করে বর্জন করিনি এবং তাঁর মীমাংসার মোকাবিলায় অন্যের মীমাংসাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে গ্রহণ করিনি, বরং কোন কোন বিশেষ কল্যাণের ভিত্তিতে এমনটি করেছি, যেমন আপনার নিকট হয়ে থাকে একান্ত আইনের মীমাংসা; কারো পক্ষপাতিত্বের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু আমরা বিষয়টি অপরের কাছে নিয়ে গিয়েছি, যাতে সে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন একটা আপস-নিষ্পত্তির পথ বের করে একটা আপস করিয়ে দেয়।

এ সমস্ত ব্যাখ্যা তারা তখন উপস্থাপন করেছিল, যখন তাদের রহস্য প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মনের গোপন মুনাফিকী ও দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে পড়ে এবং তাদের লোক হযরত উমর (রা)-এর হাতে নিহত হয়। সারকথা, তাদের দুষ্কর্মের ফলে যখন তাদের উপর অপমান ও হত্যাজনিত বিপদ এসে উপস্থিত হলো, তখনই তারা কসম খেয়ে নানারকম ব্যাখ্যা-বিশ্লষণ দিতে আরম্ভ করে। সুতরাং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, এরা নিজেদের কসম ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। এরা যা কিছু করেছে, তা একান্তই নিজের কুফরী ও মুনাফিকীর দরুন করেছে। বলা হয়েছে—যখন তাদের উপর নিজেদের অপকর্মের পরিণতিতে কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয় (যেমন, মুনাফিকীর বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ার দরুন অপদস্থতা কিংবা তার ফলে হত্যার ঘটনা ঘটে যাওয়া), এখন

এরা আপনার নিকট এসে কসম খেয়ে বলে যে, মহানবী (সা) ব্যতীত অন্য কারো কাছে মোকদ্দমার বিষয় নিয়ে হাযির হওয়া কুফরীর দরুন কিংবা হুযূর (সা)-এর মীমাংসাকে অন্যায় মনে করার কারণে ছিল না, বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অনুগ্রহ ও কল্যাণ কামনা অর্থাৎ উভয় পক্ষের জন্য কোন কল্যাণের পথ অনুসন্ধান করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

চতুর্থ আয়াতে এরই উত্তর এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মনে যে কুফরী ও মুনাফিকী রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ভালভাবেই অবহিত। তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কসম সর্বৈব মিথ্যা। কাজেই আপনি তাদের কোন আপত্তিই গ্রহণ করবেন না। হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে যারা দাবি উত্থাপন করছে, তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে দিন। কারণ, মুনাফিকের মুনাফিকী সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, এসব মুনাফিককেও আপনি সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশ দান করুন, যা তাদের অন্তরে কার্যকর হতে পারে। অর্থাৎ তাদেরকে আখিরাতের ভীতি প্রদর্শনপূর্বক নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের আমন্ত্রণ জানান কিংবা পার্থিব শাস্তির কথা বলুন যে, তোমরা যদি মুনাফিকী বর্জন না কর, তাহলে কোন সময় এ মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তাতে তোমাদের পরিণতিও তাই হবে যা হয়েছে বিশ্‌রের।

পঞ্চম আয়াতে প্রথমত একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে রাসূল পাঠিয়েছি, তা এজন্য পাঠিয়েছি, যাতে সমস্ত মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তাঁর হুকুমের আনুগত্য করে। অন্যথায় কেউ যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তার সাথে কাফিরসুলভ আচরণই করা হবে। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা) যে আচরণ করেছেন, তা সুস্পষ্ট। অতঃপর তাদেরকে সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি অপব্যাখ্যা ও কসমের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিত এবং আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেরাও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং যদি রাসূলে করীম (সা)-ও তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করে নিতেন।

এখানে তওবা কবূল হওয়ার জন্য হুযূর (সা)-এর নিকট হাযির হওয়া এবং মহানবী (সা) কর্তৃক মাগফিরাতের দোয়া করার শর্ত সম্ভবত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, তারা মহানবী (সা)-এর নবুয়তী পদমর্যাদায়ও আঘাত হেনেছিল এবং তাঁর মীমাংসাকে উপেক্ষা করে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। কাজেই তাদের তওবার জন্য হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিতি এবং হুযূর কর্তৃক তাদের মাগফিরাতের দোয়া শর্ত হিসেবে আরোপ করা হয়েছে।

এ আয়াতটি যদিও মুনাফিকদের বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর শব্দাবলীর ভেতর একটি সাধারণ নিয়ম নির্গত হয়। তা হলো, যে লোক রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হবে এবং তিনি তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন, আর মাগফিরাত অবধারিত। বস্তুত রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিতি যেমন তাঁর পার্থিব জীবনে হতে পারত, তেমনিভাবে বর্তমানে তাঁর রওযা মোবারকে উপস্থিতির হুকুমও একই রকম।

হযরত আলী (রা) বলেন, যখন আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর দাফন কার্য সমাপ্ত করে নিলাম, তার তিনদিন পর জনৈক গ্রামবাসী এলেন এবং কবরের নিকট এসেই পড়ে গেলেন এবং কেঁদে জার-জার হয়ে উল্লিখিত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ওয়াদা করেছেন, যদি কোন গোনাহ্গার রাসূলের খিদমতে হাযির হয় এবং রাসূল যদি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন, তবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। সেজন্যই আমি আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন।" তখন যেসব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বর্ণনা হলো এই যে, সে লোকের প্রার্থনার উত্তরে রওযা মোবারকের ভেতর থেকে একটি শব্দ বের হলো قَدْ غُفِرَلَكَ অর্থাৎ তোমাকে ক্ষমা করা হলো।—(বাহরে মুহীত)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

(৬৫) অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম ; সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবূল করে নেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর আপনার পালনকর্তার কসম (যারা শুধু মুখে-মুখে ঈমান প্রকাশ করে, আল্লাহ্র নিকট) এরা ঈমানদার (বলে গণ্য) হবে না, যতক্ষণ না তাদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ-বিসংবাদের বিষয়ে এরা আপনার মাধ্যমে (এবং আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার শরীয়তের মাধ্যমে) মীমাংসা করবে। অতঃপর (আপনি যখন কোন মীমাংসা করে দেবেন, তখন) সে মীমাংসায় নিজের মনে (অস্বীকারজনিত) কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না, (এবং) এ মীমাংসাকে পরিপূর্ণভাবে (প্রকাশ্য ও গোপনে) মেনে নেবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রাসূল করীম (সা)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর : এ আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সা)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী (সা)-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে তাঁর কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে।

মহানবী (সা) রাসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে-কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানদের বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী (সা) শুধু একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রাসূল, রাহমাতুল্-লিল আলামীন ও উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন। কাজেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রাসূলে মকবুল (সা)-কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেওয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা ঃ কোরআনের তাফসীরকাররা বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (সা)-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরীয়তের মীমাংসাই হলো তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কিয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে) তাঁর কাছে উপস্থিত করা হতো, তেমনি তাঁর পরে তাঁর শরীয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমত সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রাসূলে করীম (সা)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারুকে আযম (রা) সেই লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী (সা)-এর মীমাংসায় রাযী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারুকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা রাসূলে করীম (সা)-এর আদালতে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুযূরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ماكنت اظن ان عمر يجترء على قتل رجل مؤمن (অর্থাৎ আমার ধারণা ছিল না যে, উমর কোন মুমিনকে হত্যার সাহস করতে পারবে)। এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের কাছে যদি কোন অধঃস্তন মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে তাঁকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পবিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা) হযরত উমর (রা)-এর মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, فِيمَا شَجَرَ বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক।—(বাহরে মুহীত) অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে পরস্পর বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূলে করীম (সা)-এর

নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।

তৃতীয় মাসআলা ঃ এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী (সা) কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণত যে ক্ষেত্রে শরীয়ত তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহিযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রাসূলে করীম (সা) অপেক্ষা কেউ বেশি পরহিযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী (সা) বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামায আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়। সেজন্যই রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

"আল্লাহ্ তা'আলা যেমন আযীমতের উপর আমল করায় খুশি হন, তেমনিভাবে রুখসত বা অব্যাহতির উপর আমল করলেও খুশি হন।"

সাধারণ ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, দরূদ-তসবীহ্র ক্ষেত্রে সেই পন্থাই সর্বোত্তম, যা স্বয়ং হুযূর আকরাম (সা)-এর নিয়ম ছিল এবং তাঁর পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম যার উপর আমল করেছেন। হাদীসের প্রামাণ্য রেওয়ায়েতসমূহের মাধ্যমে সেগুলো জেনে নিয়ে সেই ভাবে আমল করাই মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাসূলে করীম (সা) তাঁর উম্মতের জন্য শুধু একজন সংস্কারক এবং একজন নৈতিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যার সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফিক বিশ্‌রের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলে করীম (সা)-এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ اطيعو الله واطيعو الرسول

"তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর।"

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ من يطع الرسول فقد اطاع الله

"যে রাসূলের আনুগত্য করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে।"

এ আয়াতগুলোতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মহানবী (সা)-এর শাসকোচিত মহত্ত্বও সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে যায়, যার কার্যকর দিক প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর নিকট স্বীয় সংবিধান

পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি উপস্থিত মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসা তারই ভিত্তিতে করতে পারেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি ন্যায়পূর্ণ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মাঝে এমন মীমাংসা করে দিতে পারেন, যেমন আল্লাহ্ আপনাকে দেখান এবং বুঝান।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّاٰتَيْنٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنٰهُمْ صِرٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

(৬৬) আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। (৬৭) আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব। (৬৮) আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি যদি (উদ্দিষ্ট হুকুম হিসাবে) মানুষের উপর এ বিষয়টি ফরয করে দিতাম যে, তোমরা আত্মহত্যা কর অথবা নিজেদের দেশ থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে গোনা কয়েকজন (পরিপূর্ণ মু'মিন ছাড়া) কেউই এ নির্দেশ পালন করত না। (এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনকারীর সংখ্যা অল্পই হয়)। আর যদি এসব (মুনাফিক) লোক (মনেপ্রাণে রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে) তাদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার উপর আমল করতে থাকত, তবে তাদের জন্য তা (পার্থিব জীবনে সওয়াবের যোগ্য হওয়ার দরুন তো) উত্তম হতোই এবং (তদুপরি তা দীনের পরিপূর্ণতার দিক দিয়েও তাদের) ঈমানের পরিপক্বতা সাধনকারীও হতো। (কারণ, অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা সপ্রমাণিত যে, দীনের কাজ করলে আত্মিক অবস্থা, বিশ্বাস ও ঈমানের উন্নতি সাধিত হয়)। আর এমতাবস্থায় (সৎকর্ম ও ধর্মের উপর দৃঢ়তা লাভ হয়ে গেলে পর আখিরাতে) আমি তাদেরকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করতাম এবং তাদেরকে আমি (জান্নাতের) সরল পথ প্রদর্শন করতাম (যাতে তারা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, যা মহান প্রতিদান অর্জনের স্থান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযুল ঃ যে ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, তা ছিল মুনাফিক বিশ্‌র-এর ঘটনা। সে তার বিবাদের মীমাংসার জন্য কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। আর হুযূরে আকরাম (সা)-এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশ্বস্ত না হয়ে বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত উমর (রা)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো। এ ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানগণকে ধিক্কার দিতে লাগল যে, তোমরা কেমন মানুষ ; যাকে তোমরা রাসূল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবি কর, তাঁর মীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না! ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গোনাহের তওবাকল্পে তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদের যদি এমন কোন হুকুম দেওয়া হতো, তবে তোমরা কি করতে ? এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ—অর্থাৎ এ সমস্ত মুনাফিক কিংবা কাফির ও মু'মিন নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের এমনি অবস্থা যে, তাদেরকে যদি বনী ইসরাঈলের মত আত্মহত্যা কিংবা দেশত্যাগের কঠিন কোন নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে তাদের খুব অল্প লোকই তা পালন করত।

এতে সেসব লোকের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা আল্লাহ্‌র রাসূল কিংবা শরীয়তকে ত্যাগ করে অন্য কোন দিকে নিয়ে যায়।

তাছাড়া এতে উল্লিখিত ঘটনা প্রসঙ্গে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে যে ধিক্কার দিয়েছিল, তারও উত্তর দেওয়া হয়েছে। তা এভাবে যে, এই অবস্থা মুনাফিকদেরই হতে পারে, খাঁটি মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে কিরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে এহেন (কঠিন) পরীক্ষার সম্মুখীন করেন না। সাহাবীর এ বাক্যটি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে পাহাড়ের মত সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।" ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, এ হুকুম নাযিল হলে আমি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কোরবান করে দিতাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আয়াত নাযিল হলে রাসূলে করীম (সা) বললেন, যদি আত্মহত্যা কিংবা দেশ ত্যাগের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েই যেত, তবে 'উম্মে আব্‌দ' অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) অবশ্যই এর উপর আমল করতেন। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, এ কাজটি যদিও কঠিন, কিন্তু যদি তারা আমার নির্দেশানুযায়ী তা মেনে নেয়, তবে ফলত এটাই হবে তাদের জন্য উত্তম। আর এ আমলটি তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেবে। বস্তুত এতে আমি তাদেরকে মহা সওয়াব দান করব এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। আর তার সবিস্তার বিশ্লেষণ হলো আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের চারটি স্তর, যাঁদের সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এবং জান্নাতে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে আলোচনা হবে।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। (৭০) এটা হলো আল্লাহ্-প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যে লোক (প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রেও) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য করবে (পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে পরাকাষ্ঠা অর্জন করতে না পারলেও) এ ধরনের লোক (জান্নাতের মাঝে) যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা (ধর্মীয়) নেয়ামত (স্বীয় সান্নিধ্য ও নৈকট্য) দান করেছেন সেই সব মহান ব্যক্তির সাথে থাকবে অর্থাৎ আম্বিয়া (আ), সিদ্দিকীন, (যারা নবী-রাসূলদের উম্মতের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন; যাদের মধ্যে থাকে যথার্থ আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠা এবং পরিভাষাগতভাবে যাদেরকে বলা হয় আউলিয়া) এবং শহীদ (যারা দীনের মুহাব্বতে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন) আর সালেহীন (যারা পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের অনুসারী ওয়াজেবাতের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা মুস্তাহাব বিষয়েই হোক এবং যাদেরকে বলা হয় নেককার দীনদার) বস্তুত এসব মহান লোক (যাদের সঙ্গী হবেন) অতি উত্তম সঙ্গী। (তাদের সাথে অনুগত ভক্তদের সান্নিধ্য প্রমাণিতও রয়েছে) কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এহেন সঙ্গী পাওয়াটাই হলো ইবাদতের ফসল। সেই সব মহান ব্যক্তির এই সান্নিধ্য লাভ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। (অর্থাৎ এটা কোন আমলের প্রতিদান নয়। কারণ, মর্যাদার দিক দিয়ে

সৎকর্মের মর্যাদাই ছিল এর চাহিদা, যাকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ।) আর আল্লাহ্ প্রতিটি আমলের চাহিদা এবং সে চাহিদার অতিরিক্ত অনুগ্রহের যোগ্য (পরিমাণ সম্পর্কে) উত্তম ভাবেই পরিজ্ঞাত। (কারণ এ অনুগ্রহের মাঝেও পার্থক্য বিদ্যমান—অনেকে বারবার তাঁদের সান্নিধ্য অর্জন করবে আবার অনেকে কদাচ সান্নিধ্যে আসবে।)

যোগসূত্র ঃ উপরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের দরুন বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে। এখন বর্তমান আয়াতগুলোতে একটি সাধারণ মূলনীতি হিসেবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য সাধারণ প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে ঃ সেই সমস্ত লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলদের সাথে জান্নাতের উচ্চতর জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের নবীদের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাঁদেরকেই বলা হয় সিদ্দিকীন অর্থাৎ তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা কোনরকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবূ বকর (রা) প্রমুখ। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সেই সমস্ত লোককে বলা হয়, যারা আল্লাহ্র রাহে নিজেদের জানমাল কোরবান করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুত সালেহীন হলেন সেই সব লোক, যারা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী।

সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দারা সে সমস্ত মহান ব্যক্তির সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল। তাঁরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (১) আম্বিয়া (আ) (২) সিদ্দিকীন (৩) শুহাদা (৪) সালেহীন।

শানে নযুল ঃ এ আয়াত বিশেষ একটি ঘটনার ভিত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমামে-তফসীর হাফেয ইবনে কাসীর একাধিক সনদে তা উদ্ধৃত করেছেন।

ঘটনা এই যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন জনৈক সাহাবী রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার অন্তরে আপনার মুহাব্বত আমার নিজের জান, নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তান-সন্ততির চাইতেও অধিক। অনেক সময় আমি নিজের ঘরে অস্থির হয়ে পড়ি। যতক্ষণ না আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আপনাকে দেখে নেই ততক্ষণ স্বস্তি লাভ করতে পারি না। কাজেই আমার চিন্তা হয়, আপনি যখন এ পৃথিবী থেকে তিরোহিত হয়ে যাবেন এবং আমিও যখন মরে যাব, তখন আমি জানি,

আপনি নবী-রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চ স্থানে অবস্থান করবেন অথচ প্রথমত আমি জানি না, আমি জান্নাতে পৌঁছাব কিনা। আর যদি পৌঁছাইও, তবে আমার মর্যাদা আপনার চাইতে বহু নীচে হবে, সেখানে আমি আপনার সান্নিধ্য হয়তো পাব না। তখন কেমন করে আমি সবর করব ?

তাঁর কথা শোনার পর রাসূলে করীম (সা) কোন উত্তর দিলেন না। ইতিমধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

অতঃপর মহানবী (সা) তাঁকে (উল্লিখিত সাহাবীকে) সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, যারা আনুগত্যশীল তাঁরা জান্নাতের মধ্যে নবী-রাসূল, সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালেহীনগণের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ জান্নাতের উচ্চতর মর্যাদা ও সম্মানের পার্থক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসার সুযোগ লাভ হবে।

জান্নাতে দেখা-সাক্ষাতের কয়েকটি দিক ঃ (১) নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ।

(২) উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে এসেও সাক্ষাত করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জারীর (রা) হযরত রাবী (রা) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও উঠা-বসা হবে।

তাছাড়া নীচের শ্রেণীর অধিবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণীতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (সা) বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত কা'ব ইবনে আসলামী রাতের বেলায় মহানবী (সা)-এর সঙ্গে থাকতেন। কোন এক রাতে তাহাজ্জুদের সময় কা'ব আসলামী (রা) হুযূর (সা)-এর জন্য ওযূর পানি ও মিসওয়াক প্রভৃতি দরকারী জিনিস তৈরি করে রাখলে তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'বল, কি তুমি কামনা কর ?' কা'ব নিবেদন করলেন, 'আমি বেহেশতে আপনার সান্নিধ্য কামনা করি।' হুযূর (সা) বললেন, আর কিছু ? তখন তিনি নিবেদন করলেন, আর কিছু নয়। এতে মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, তুমি যদি জান্নাতে আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে اعنى على نفسك بكثرة السجود অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তুমিও সর্বাধিক সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো ; অর্থাৎ বেশি করে নফল নামায আদায় করো।

মসনদে আহমদে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট একটি লোক এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্র সত্য রাসূল আর আমি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযও নিয়মিত পড়ি, যাকাতও দেই এবং রমযানের রোযাও রাখি। এ কথা শুনে হুযূরে আকরাম (সা) বললেন, 'যে লোক এমনি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। তবে শর্ত হলো, সে যদি নিজের পিতা-মাতার সাথে নাফরমানী না করে।'

তেমনিভাবে তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء.

অর্থাৎ সত্যবাদী আমানতদার এবং ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।

প্রেম নৈকট্যের শর্ত ঃ হুযূরে আকরাম (সা)-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য তাঁর সাথে প্রেম ও মুহাব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ্ বুখারীতে হাদীসে মুতাওয়াতির-এ সাহাবায়ে কিরামের এক বিপুল জামা'আত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে ঃ রাসূলে করীম (সা)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো যে, "সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন জামা'আত বা দলের সাথে ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি ? হুযূর (সা) বললেন, المرأ مع من احب। অর্থাৎ হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি, যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ এ হাদীসে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাঁদের গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও হুযূরের সাথেই থাকবেন।

রাসূলে করীম (সা)-এর সান্নিধ্য লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় ঃ তিবরানী (র) 'মু'জামে কবীর' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি ও রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব ?'

মহানবী (সা) বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সেই সত্তার কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রঙের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (কলেমা)-য় বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্র দায়িত্বে

এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী' পড়ে তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।"

একথা শুনে মজলিসের ভেতর থেকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যখন কল্যাণ দানের এমন উদারতা, তখন আমরা কেমন করে ধ্বংস হতে পারি! অথবা আযাবেই বা কেমন করে গেরেফতার হতে পারি ? মহানবী (সা) বললেন, (কথা তা নয়) কিয়ামতের দিন কোন কোন লোক এত অধিক আমল ও নেকী নিয়ে আসবে যে, সেগুলোকে যদি পাহাড়ের উপরে রেখে দেওয়া হয়, তবে পাহাড়ও তার চাপ সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু এগুলোর সাথে যখন আল্লাহ্র করুণা ও নিয়ামতসমূহের তুলনা করা হয়, তখন সব আমলই নিঃশেষিত হয়ে যায় যদি না আল্লাহ্ তাকে স্বীয় রহমতে আশ্রয় দান করেন।

এই হাবশীর সওয়াল-জওয়াবের ভিত্তিতেই সূরা 'দাহর'-এর আয়াত : هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـئًا مَّذْكُوْرًا– নাযিল হয়। হাবশী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার চোখ যেসব নিয়ামত দেখবে, আমার চোখও কি সেগুলো দেখতে পাবে ?

হুযূর (সা) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই দেখবে। একথা শুনে নও-মুসলিম এই হাবশী কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং হুযূরে আকরাম (সা) স্বহস্তে তাঁর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন।

মর্যাদার বিশ্লেষণ : শানেনযুলসহ আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় থেকে যাচ্ছে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের মর্যাদার যে চারটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোন্ দিক দিয়ে এবং এগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য কি এবং এ চারটি স্তরই কোন এক ব্যক্তিত্বে একত্রিত হতে পারে কি না ?

মুফাসসিরীন মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করেছেন। কোন কোন মনীষী বলেছেন, এ চারটি বৈশিষ্ট্য একজনের মধ্যেও একত্রিত হতে পারে এবং এ সবগুলোই পারস্পরিক অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য। কারণ, কোরআনে যাঁকে নবী বলা হয়েছে তাঁকে সিদ্দীক প্রভৃতি পদবীও দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই সত্যবাদী নবী ছিলেন)।

তেমনিভাবে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (আর তিনি ছিলেন সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত নবী)। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (অর্থাৎ তিনিও সালেহীনগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)।

এর মর্ম এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যদিও এই চারটি গুণ-নৈশিষ্ট্য এবং স্তরই পৃথক পৃথক, কিন্তু এ চারটি গুণই এক ব্যক্তিতে একত্রিত হতে পারে। যেমন মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ্, মুওয়াররিখ ও মুতাকাল্লিম প্রমুখ ওলামার পৃথক পৃথক গুণ-নৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোন একজন আলিম এমনও হতে পারেন যিনি মুফাসস্রি, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুওয়াররিখ ও মুতাকাল্লিমও হবেন। অথবা যেমন, ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈমানিকতা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা দিক। কিন্তু এ সবগুলোই কোন একজনের মধ্যেও একত্রিত হতে পারে।

অবশ্য সাধারণ রীতি অনুযায়ী যার মধ্যে যে গুণের প্রবলতা বিদ্যমান থাকবে, তাকে সে নামেই অভিহিত করা হয় এবং তিনি সে বৈশিষ্ট্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যারা গ্রন্থ রচনা করেন তারা তাঁকে সে মানের আওতায়ই গণ্য করেন। সে কারণেই তফসীরবিদ আলিমগণ বলেছেন, 'সিদ্দিকীন'-এর অর্থ হলো অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সাহাবী আর শুহাদা অর্থ হলো, সেই সব সাহাবী যাঁরা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর 'সালেহীন' অর্থ সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান।

ইমাম রাগেব (র) এই শ্রেণী চতুষ্টয়কে পৃথক পৃথক শ্রেণী বা মর্যাদার পৃথক পৃথক স্তর হিসাবে গণ্য করেছেন। তফসীরে বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মা'আনী ও মাযহারীতেও তা-ই উল্লিখিত রয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'মুমিনদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য উচ্চ ও নিম্ন মর্যাদা স্থির করে দিয়েছেন। আর সাধারণ মুসলমানদের উৎসাহদান করা হয়েছে, তারা যেন মর্যাদায় কোনক্রমেই পেছনে না থাকে। ইল্‌ম ও আমল তথা জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে যেন এসব স্তরে গিয়ে পৌঁছার চেষ্টা করে। তবে নবুয়ত এমন একটি স্তর যা চেষ্টার মাধ্যমে কেউ লাভ করতে পারে না, তবে নবীদের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হতে পারে। ইমাম রাগেব (র) বলেছেন, এসব স্তরের মধ্যে সর্বপ্রথম স্তর হলো ঐশী শক্তির সাহায্যপ্রাপ্ত নবী-রাসূলদের স্তর। তাদের উদাহরণ হলো এমন, যেন কোন লোক কাছে থেকে দেখছে। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা ঃ দ্বিতীয় স্তর হলো সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সেই সমস্ত লোক, যারা মা'রেফত বা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীদের কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোন লোক যেন কোন বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রা)-এর কাছে কোন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, "আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন ?" তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন কোন কিছুর ইবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।" অতঃপর আরো বললেন, "আল্লাহ্‌কে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাকে উপলব্ধি করে নেয়।" এখানে দেখা বলতে হযরত আলী (রা)-এর উদ্দেশ্য হলো স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সূক্ষ্মতার মাধ্যমে দেখারই মত উপলব্ধি করে নেওয়া।

শহীদের সংজ্ঞা ঃ তৃতীয় স্তর হলো শহীদের। আর শহীদ হলেন সেই সমস্ত লোক, যারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁদের উদাহরণ হলো এমন, যেন কোন লোক কোন বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন করছে। যেমন হযরত হারিসা (রা) বলেছেন, "আমার মনে হয় আমি যেন আমার মহান পরওয়ারদিগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।" তাছাড়া اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ হাদীসটিতেও এমনি ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে।

সালেহীনের সংজ্ঞা ঃ চতুর্থ স্তর হলো সালেহীনের যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কোন বস্তুকে দূরে

থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। আর হাদীসে যে وَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ বলা হয়েছে, তাতেও দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর এই পর্যালোচনার সারনির্যাস হচ্ছে এগুলোই হলো 'মা'রেফতে রব' বা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুত এই মা'রেফতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদাও বিভিন্ন। যা হোক, আয়াতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট যে, এতে মুসলমানদের এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীরা তাঁদেরই সাথে থাকবে যারা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালবাসা লাভের তওফীক দান কর। আমীন !

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾
وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ
لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ
فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ
اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

(৭১) হে ঈমানদারগণ ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদল কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ এলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে,) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম। (৭৪) কাজেই আল্লাহ্র কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত যারা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ ! (কাফিরদের মুকাবিলায়) নিজেদেরকে সতর্ক রাখ (অর্থাৎ তাঁদের আক্রমণ বা ষড়যন্ত্র থেকেও সতর্ক থাকবে এবং মোকাবিলার সময় আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি নিয়েও তৈরি থাকবে)। অতঃপর (তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য) পৃথক পৃথকভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে (যেমনি সুযোগ পাওয়া যায়) বেরিয়ে যাও এবং তোমাদের দলে (যেমন কিছু কিছু মুনাফিকও এসে ঢুকছে তেমনি) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা (জিহাদে অংশগ্রহণ করে না) সরে থাকছে (এতে মুনাফিকদেরই বোঝানো হয়েছে)। তোমরা যদি (পরাজয় প্রভৃতি) কোনরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হও, তবে তারা (নিজেদের অজ্ঞতার দরুন আনন্দিত হয়ে) বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে) উপস্থিত হইনি। (তা না হলে যে আমার উপরও এমনি বিপদ আসত)। পক্ষান্তরে তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হয় (অর্থাৎ তোমরা যদি বিজয় ও গনীমত অর্জন কর, তবে তারা) এমন (স্বার্থপর) ভাবে (আক্ষেপ করতে আরম্ভ করে,) যেন তোমাদের ও তাদের মাঝে কোন সম্পর্কই নেই। (বিজিত জিহাদে অংশগ্রহণ না করার দরুন গনীমতের মাল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় আক্ষেপ করে) বলে, হায়, কতই না ভাল হতো যদি আমিও সে লোকদের সাথে (জিহাদে গিয়ে) অংশীদার হয়ে পড়তাম ! তাহলে আমিও যে বড়ই কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারতাম। (ধন-সম্পদ আমারও হস্তগত হতো। এহেন উক্তিতে তাদের স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়। তা না হলে যার সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে মানুষ তার কৃতকার্যতায়ও খুশি হয়। পাল্টা আফসোস-অনুতাপে প্রবৃত্ত হবে এবং এতটুকু আনন্দ প্রকাশ করবে না—তা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এমনি ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, মহান কোন সফলতা সহজেই আসে না। যদি কেউ তার অন্বেষণকারী হয়ে থাকে,) তবে তাঁর উচিত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রাহে (আল্লাহ্‌র বাণীর প্রচার প্রসারের নিয়তে, যা ঈমান ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ নিঃস্বার্থে মুসলমান হয়ে) সে সমস্ত (কাফির) লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা আখিরাতকে পরিহার করে তার পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে অবলম্বন করেছে অর্থাৎ কারও যদি মহান কৃতকার্যতার সাধ থাকে, তাহলে তাকে বিশুদ্ধ মানসিকতার সাথে হস্তপদ সঞ্চালন তথা কষ্ট সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে এবং তলোয়ার ও বর্শার সামনে বুক টান করে দাঁড়াতে হবে। আর তাহলেই দেখবে সফলতা তার পদ চুম্বন করছে। বস্তুত এটা কি কোন খেলার কথা? যে লোক এমনি বিপদাপদের সম্মুখীন হতে পারবে, সে-ই পাবে মহান সফলতা। কারণ, পার্থিব কৃতকার্যতা তো একান্তই তুচ্ছ বিষয় ! কখনও আছে তো কখনও নেই। বিজয় অর্জন করতে পারলেই তা হাতে আসে আর পরাজিত হলেই তা চলে যায়। পক্ষান্তরে আখিরাতের সফলতা উল্লিখিত বিশিষ্ট লোকদের জন্যই প্রতিশ্রুত ! তা যেমনি মহান, তেমনি চিরস্থায়ী। কারণ, তাঁর রীতি হলো এই যে, যে লোক আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে, তাতে সে (পরাজিত হয়ে) নিহতই হোক অথবা বিজয়ই অর্জন করুক, আমি সর্বাবস্থায় তাকে (আখিরাতের) সুফল দান করব (যা যথার্থই মহান কৃতকার্যতা বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য)।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে ছিল আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ বিষয়ক আলোচনা। অতঃপর পরবর্তী এ আয়াতসমূহে অনুগত বান্দাদের প্রতি দীনের প্রসার ও আল্লাহ্র বাণী প্রচারের জন্য জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। —(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ

কতিপয় অতীত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য

আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বোঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলত মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا-

অর্থাৎ "হে নবী ! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ্ আমাদের তকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারণ করে দেননি।"

১. এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ এবং অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি বাক্য فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ব্যবহার করা হয়েছে ثبات শব্দটি ثبة-এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবে, তখন একা একা বেরোবে না, বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে জিহাদ চলাকালীন সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু স্বাভাবিক সময়ের জন্যও ইসলামের শিক্ষা হলো এই যে, সফর করতে হলে একা সফর করবে না। সুতরাং এক হাদীসে একা সফরকারীকে একটি শয়তান, দু'জন সফরকারীকে দু'টি শয়তান এবং তিনজন মুসাফিরকে একটি দল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

خير الصحابة اربعة وخير السرايا اربع مائة وخير الجيوش اربعة الاف .

অর্থাৎ "উত্তম সাথী হলো চারজন, উত্তম সৈন্যদল হলো চারশ জনের এবং উত্তম সৈন্যবাহিনী হলো চার হাজারের বাহিনী।

২. وَاِنَّ مِنْكُمْ আয়াতের দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানেও মু'মিনদেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথচ এ প্রসঙ্গে যেসব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা মু'মিনদের গুণাবলী হতে পারে না। কাজেই আল্লামা কুরতুবী বলেছেন যে, এতে মুনাফিকদের উদ্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু তারাও প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবি করছিল, সেহেতু তাদেরকেও মু'মিনদেরই একটি দল বা জামা'আত বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

(৭৫) আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর ; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (৭৬) যারা ঈমানদার তারা যে জিহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে—(দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

● তোমাদের এমন কি অজুহাত থাকতে পারে যার কারণে তোমরা জিহাদ করবে না (পক্ষান্তরে এর জন্য বলিষ্ঠ যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, এ জিহাদ হবে) আল্লাহ্‌র রাহে (আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য)। আর

(আল্লাহ্র এই বিধান প্রতিষ্ঠার নিদর্শনসমূহের একটি বিশেষ নিদর্শনও এইক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। আর তা হলো এই যে,) যারা দুর্বল, (ঈমানদার) তাদের পক্ষে (লড়াই করাও কর্তব্য, যাতে তারা কাফিরদের অত্যাচারের কবল থেকে রেহাই পেতে পারে) যাদের মাঝে রয়েছে কিছু পুরুষ, কিছু নারী এবং কিছু শিশু যারা (কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! আমাদের (কোন প্রকারে) এই জনপদ থেকে (অর্থাৎ মক্কা নগরী থেকে, যা আমাদের জন্য কারাগারে পরিণত হয়ে পড়েছে) বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা অতি নিষ্ঠুর— অত্যাচারী। (এরা যে আমাদেরকে জর্জরিত করে তুলছে)। আর (হে আমাদের পরওয়ারদিগার,) আমাদের জন্য গায়েবী কোন পক্ষাবলম্বনকারী পাঠাও (যিনি এই অত্যাচারী জালিমদের কবল থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবেন)। যারা যথার্থই পূর্ণ ঈমানদার (তারা তো এসব বিধান শোনে) আল্লাহ্র রাহে (অর্থাৎ ইসলামের বিজয়কল্পে) জিহাদে ব্রতী হয়, পক্ষান্তরে (তাদের বিপরীতে) যেসব কাফির রয়েছে, তারা লড়াই করে শয়তানের পথে। (অর্থাৎ কুফরীকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, এতদুভয় দলের মধ্যে তারাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, যারা হবে ঈমানদার। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষেই যখন আল্লাহ্র সাহায্য রয়েছে,) তখন (হে ঈমানদারগণ,) তোমরা শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য হতে বঞ্চিত কাফিরদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করে যাও। (আর তারাও অজস্র বিজয় অর্জনের নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিন্তু) প্রকৃতপক্ষে (সেগুলো হলো শয়তানী ব্যবস্থা। শয়তানই যে তাদেরকে কাফিরী ব্যবস্থার নির্দেশ দিচ্ছে)। বস্তুত শয়তানী ব্যবস্থাবলী সবই হয়ে থাকে দুর্বল (কারণ, এতে খোদায়ী কোন সাহায্য-সহায়তা থাকে না। অবশ্য সামান্য কয়েক দিনের জন্য তাদের বিজয় হয়ে গেলেও প্রকৃতপক্ষে তা সাময়িকভাবে তাদেরকে অবকাশ দেওয়ারই নামান্তর। কাজেই যারা খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্ত মু'মিন, তাদের সাথে তারা কি মোকাবিলা করতে পারে ?)

সারমর্ম হলো এই যে, জিহাদ করার পক্ষে যখন যথার্থ কারণও রয়েছে এবং খোদায়ী সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, তার পরেও তোমাদের জিহাদ করতে কি এমন আপত্তি থাকতে পারে ? কাজেই এখানে পুনরায় তাকীদ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ঃ মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফিররাও তাঁদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করছিল, যাতে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সাল্লামাহ্ ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবূ জানদাল ইবনে সাহ্ল প্রমুখ। —(কুরতুবী) এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফিরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে

অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদের নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদের কাফিরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

এ আয়াতে বোঝা যায়, মু'মিনরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দুটি বিষয়ের দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদের এই (মক্কা) নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ্ তাঁদের দুটি প্রার্থনাই কবূল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রাসূলে মকবুল (সা) ইতাব ইবনে উসায়েদ (রা)-কে ঐসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি ঐসব উৎপীড়িতের ও অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জিহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোন ভাল মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা সর্ব বিপদের অমোঘ প্রতিকার ঃ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পেছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলমানদের জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্র তাদের বিপদাপদ শেষ হয়ে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা ঃ اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মু'মিন বা ঈমানদার, তারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যত মু'মিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহ্ই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বশান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য যাকে আল্লাহ্‌র কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মু'মিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফির তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফিররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা ঃ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল ও ভঙ্গুর। ফলে তা মু'মিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোনরকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফিরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

বস্তুত 'বদর' যুদ্ধে তাই হয়েছে। প্রথমে শয়তান কাফিরদের সামনে দীর্ঘ বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে তাদেরকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ (অর্থাৎ আজকের দিনে তোমাদের কোন শক্তিই পরাজিত করতে পারবে না ! কারণ, اِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ আমি তোমাদের সাহায্যকারী)। আমি আমার সমস্ত বাহিনী নিয়ে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসব। —যুদ্ধ আরম্ভ হলে শয়তান নিজের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এলোও বটে, কিন্তু যখন সে দেখতে পেল, মুসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা (বাহিনী) এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন সে যাবতীয় কলাকৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে দেখেই পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল এবং স্বীয় বন্ধু কাফিরদের লক্ষ্য করে বলল ঃ

اِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

(আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। কারণ আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখতে পাও না অর্থাৎ ফেরেশতাবাহিনী) ! আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। তার নিগড় (অত্যন্ত) কঠিন। —(মাযহারী)

এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দুটি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে তাকে মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্র জন্য হতে হবে ; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না ! প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "তোমরা যদি শয়তানকে দেখ, তাহলে নির্দ্বিধায় তাকে আক্রমণ কর।" অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا (আহ্কামুল-কুরআন, সুয়ূতী)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا

الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ

لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ

اتَّقٰى ۟ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ

وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ

عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ

مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

(৭৭) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক ? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল যেমন করে ভয় করে আল্লাহ্‌কে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে ! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না ! (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখিরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন ; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই—যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও ! বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ; আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও ; এসবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে ; যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না ! (৭৯) আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই যথেষ্ট—সব বিষয়ই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কি সে সমস্ত লোককে দেখনি, (জিহাদের হুকুম আসার পূর্বে যাদের মাঝে যুদ্ধের বিপুল আগ্রহ ছিল যে,) তাদেরকে (যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য) বলতে হয়েছিল, (এ মুহূর্তে) নিজের হাতকে সংযত রাখ এবং নামাযের অনুবর্তিতা করতে থাক এবং যাকাত (প্রভৃতি বিষয়ে যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো) সম্পাদন করতে থাক। (যাদের অবস্থা এই ছিল,) তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হলে অবস্থা এমন হলো যে, তাদের মধ্যে অনেকে (বিরোধী) লোকদেরকে (স্বভাবত) এমনভাবে ভয় করতে লাগল (যেন তারা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে), যেমন ভয় করা হয় আল্লাহ্কে। বরং তারও চাইতে অধিক ভয়। (অধিক ভয়ের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. সাধারণত আল্লাহ্কে যে ভয় করা হয়, তা হয় যুক্তিগত। আর শত্রুর যে ভয়, তা হয় প্রকৃতিগত। আর প্রকৃতিগত অবস্থা যুক্তিগত অবস্থার তুলনায় কঠিন হওয়াটাই হলো সাধারণ নিয়ম। দুই. আল্লাহ্র প্রতি যেমন ভয় থাকে, তেমনি থাকে রহমতের আশা। পক্ষান্তরে কাফির শত্রুর কাছে শুধু অনিষ্টের ভয় ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর যেহেতু তাদের এই ভয়টি ছিল প্রকৃতিগত, কাজেই তাতে কোন পাপের কারণ ছিল না।) আর (তারা জিহাদের এ নির্দেশ মুলতবি করার আশায়) বলতে লাগল, (তা একথা বলা মুখেই হোক কিংবা মনে মনেই হোক, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে মৌখিক ও আন্তরিক কথা একই সমান) হে আমাদের পালনকর্তা ! এখন থেকেই কেন আপনি আমাদের উপর জিহাদ ফরয করলেন, আমাদেরকে (স্বীয় অনুগ্রহে) আরও কিছুটা সময়ের জন্য অবকাশ দিতে পারতেন। (তাতে আমরা নিশ্চিন্তে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করে নিতে পারতাম বস্তুত এই নিবেদন করাটা যেহেতু আপত্তি কিংবা অস্বীকৃতিমূলক নয়, কাজেই এতে কোন পাপের কারণ নেই। পরবর্তীতে উত্তর দেওয়া হচ্ছে যে, হে মুহাম্মদ) আপনি (তাদের কে) বলে দিন, যে পার্থিব কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে (তোমরা অবকাশ কামনা করছ,) তা একান্তই ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাত হলো সর্বপ্রকারেই উত্তম (যা অর্জন করার উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে জিহাদ। কিন্তু তা) সে সমস্ত লোকের জন্যই (নির্ধারিত), যারা আল্লাহ্ তা'আলার আহ্কামের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকবে। (ফলে, কুফরীর মাধ্যমে যদি বিরোধিতা করা হয়, তাহলে তার জন্য আখিরাতের কোন উপকরণই থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি পাপের মাধ্যমে বিরোধিতা হয়ে থাকে, তাহলে আখিরাতে উচ্চমর্যাদালাভে বঞ্চিত হতে হবে)। আর তোমাদের প্রতি সামান্যতম অন্যায়ও করা হবে না। (অর্থাৎ যে পরিমাণ আমল থাকবে তদনুপাতে সওয়াব বা পুণ্য দান করা হবে। কাজেই পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। অথচ জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও কি নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে ? কখনও নয় ! কারণ, মৃত্যুর অবস্থা হলো এই যে,) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু সেখানেই এসে চেপে বসবে। (এমন কি) যদি (কোন) সুদৃঢ় দুর্গের মাঝেও অবস্থান কর (তবুও তা থেকে অব্যাহতি পাবে না) সারকথা, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে এবং মরে গিয়ে যখন পৃথিবীকে ছাড়তেই হবে, তখন আর আখিরাতে শূন্য হাতে যাবে কেন। বরং বুদ্ধির কথা হলো এই যে—چند روزے جہد کن باقی بخند

(সামান্য কয়দিন কষ্ট করে বাকি সময় আনন্দের ব্যবস্থা কর) আর যদি এসব (মুনাফিক) লোকের (যুদ্ধে বিজয় প্রভৃতি) কোন কল্যাণ সাধিত হয়, তবে বল যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (দৈবাত) হয়ে গেছে। (তা না হলে মুসলমানদের বিশৃঙ্খলায় কোন কমতিই ছিল না।) আর যদি তারা কোন অকল্যাণের সম্মুখীন হয় (যেমন যুদ্ধে পরাজয় বরণ প্রভৃতি), তবে (হে মুহাম্মদ, আপনাকে লক্ষ্য করে) বলে যে, এমনটি আপনার (এবং মুসলমানদের বিশৃঙ্খলার) কারণেই ঘটেছে। (শান্তিমত ঘরে বসে থাকলে কি আর এহেন বিপদে পড়তে হতো ?) আপনি বলে দিন, (এ ব্যাপারে আমার যে সামান্যও হাত নেই। নিয়ামতই হোক, আর বিপদাপদই হোক সবই যে) আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। (অবশ্য একটা আসে প্রত্যক্ষ এবং আরেকটা আসে পরোক্ষ। এর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, নিয়ামত আসে সরাসরি আল্লাহ্র অনুগ্রহে। কোন আমলের মাধ্যমে নয়। আর বিপদাপদ আসে মানুষের অসৎ কর্মের বিনিময়ে আল্লাহ্র ন্যায়-বিচারালয় থেকে। সুতরাং তোমরা যে বিপদাপদে আমার হাত রয়েছে বলে মনে করছ, প্রকৃতপক্ষে তাতে তোমাদের কর্মেরই দখল রয়েছে। যেমন, ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ-উপকরণ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর এ আয়াতটি একান্তই সুস্পষ্ট—মানুষ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, যে কোন মঙ্গলাবস্থার পূর্বে সে পর্যায়ের কোন নেক আমল সে খুঁজে পাবে না যাতে এহেন মঙ্গল লাভ হতে পারে। কাজেই মঙ্গল লাভ যে একান্তই আল্লাহ্র অনুগ্রহ তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষের অমঙ্গল কিংবা কোন দুরবস্থার পূর্বে এমন কোন অসৎ কর্ম অবশ্যই থাকবে, যার শাস্তি তদপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত ছিল। কাজেই এটা যখন অতি স্পষ্ট বিষয়) তখন সে (নির্বোধ) লোকগুলির কি হলো যে, তারা বিষয়টি উপলব্ধি করার ধারেকাছেও যাচ্ছে না ! (তা ছাড়া বুঝবে যে কি—তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে,) তা সবই একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (তারই অনুগ্রহে) সাধিত হয়েছে। আর তোমাদের যেসব অকল্যাণ ও দুরবস্থা উপস্থিত হয়, সেগুলো (তোমাদেরই অসৎ কর্মের) কারণে হয়ে থাকে। (অতএব, এ সমস্ত অমঙ্গল ও দুরবস্থাকে শরীয়ত নির্ধারিত বিধি-বিধানের উপর আমল করার ফল বলে অভিহিত করা কিংবা শরীয়ত নির্ধারকের পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করা সম্পূর্ণভাবে মূর্খতা। যেমন, মুনাফিকরা এসব অমঙ্গলকে জিহাদ অথবা জিহাদের আমীরের প্রতি সম্পৃক্ত করত)। আর আমি আপনাকে মানুষের জন্য পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। (কোন মুনাফিক ও কাফির যদি অস্বীকারও করে তাতে নবুয়ত কেমন করে অস্তিত্বহীন হয়ে যেতে পারে। কারণ) আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য (রিসালতের সাক্ষী হিসাবে) যথেষ্ট। যিনি কার্যকরভাবে এবং কথার মাধ্যমে সাক্ষ্য দিয়েছেন বাচনিক সাক্ষীর উদাহরণ হলো وَاَرْسَلْنٰكَ বলা। আর কার্যকর সাক্ষ্য হলো রাসূলের মু'জিযাসমূহ, যা নবুয়তের দলীলস্বরূপ আপনাকে দান করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযুল ঃ اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ ... মক্কায় হিজরত করার পূর্বে কাফিররা মুসলমানদের প্রতি কঠিন নিপীড়ন চালাচ্ছিল। এতে মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর

নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করতেন এবং কাফিরদের মোকাবিলা করার অনুমতি চাইতেন অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু হুযূর (সা) তাদেরকে এই বলে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতেন যে, 'আমার প্রতি মোকাবিলা করার কোন নির্দেশ হয়নি। বরং ধৈর্য ধারণ করার এবং ক্ষমা করার নির্দেশ রয়েছে।' তিনি আরও বলতেন, "নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার যে নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই যথারীতি সম্পাদন করতে থাক। কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য নিজেদের মনের সাথে জিহাদ করতে এবং দৈহিক কষ্ট সহিষ্ণুতায় আল্লাহ্র রাহে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করা এবং আল্লাহ্র রাহে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়।" মুসলমানরা হুযূর (সা)-এর এ কথাগুলো হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই অতঃপর হিজরতোত্তরকালে যখন জিহাদের নির্দেশ হলো, তখন তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল যে, আমাদের আবেদন এবার গৃহীত হলো। কিন্তু কোন কোন অপরিপক্ব মুসলমান কাফিরদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে এমন ভয় করতে লাগলেন, যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহ্র আযাবের ব্যাপারে বরং তাদের ভয় ছিল ততোধিক। আর তারা এমন বাসনাও পোষণ করতে লাগলেন যে, আরো কয়েকটি দিন যদি জিহাদের হুকুম না আসত এবং আমরা আরও কিছু সময় বেঁচে থাকতাম, তবে কতই না ভাল হতো ! এসব কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। —(রূহুল মা'আনী)

জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমান কর্তৃক তা মুলতবির আকাঙ্ক্ষার কারণ : জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হবার পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোন আপত্তির কারণে ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, স্বভাবত মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার উত্তেজনা হঠাৎ উথলে ওঠে এবং তখন কোন বিষয়ের প্রতিশোধ নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আরাম-আয়েশের সময়ে তাদের মন-মানস কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না। এটা হলো মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি সুতরাং এসব মুসলিম যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে জিহাদের নির্দেশ কামনা করতেন কিন্তু মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধস্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, তখনই যদি জিহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভাল হতো। এই বাসনাকে আপত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানরা যদি উল্লিখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লিখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লিখিত قالوا শব্দের দ্বারা এমন কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়তো

মনে মনেই বলে থাকবেন। —(বয়ানুল-কোরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলিমদের সাথে নয়, বরং মুনাফিকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না। —(তফসীরে-কবীর)

রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী ঃ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন প্রথমে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশুদ্ধির উপকরণ। অর্থাৎ এতে অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুত মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হলো ফরযে-আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরযে-কিফায়া। এতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই প্রতীয়মান হয়। —(মাযহারী)

দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামতের পার্থক্য ঃ আয়াতে দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখিরাতের নিয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হলো এই ঃ

(১) দুনিয়ার নিয়ামত অল্প এবং আখিরাতের নিয়ামত অধিক।

(২) দুনিয়ার নিয়ামত অনিত্য এবং আখিরাতের নিয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।

(৩) দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের সাথে সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।

(৪) দুনিয়ার নিয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত।—(তফসীরে-কবীর) কবি বলেছেন ঃ

ولاخيرفى الدنيا لمن لم يكن له
من الله فى دار المقام نصيب
فان تعجب الدنيا رجا لا فانها
متاع قليل والزوال قريب

অর্থাৎ "অনিত্য এই দুনিয়ায় এমন লোকের জন্য কোনই কল্যাণ নেই, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনন্ত স্থিতিসম্পন্ন আখিরাতে কোন স্থান নেই। তার পরেও যদি দুনিয়া কাউকে আকৃষ্ট করে, তবে তাদের জেনে রাখা কর্তব্য যে, পার্থিব ধন-সম্পদ একান্তই অল্প এবং তার পতন ও ধ্বংস খুবই নিকটবর্তী। অর্থাৎ চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আখিরাত আরম্ভ হয়ে যাবে, যা আর কখনও শেষ হবে না।"

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা ঃ . . . اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের হুকুম সম্বলিত এ আয়াতের মাধ্যমে জিহাদ থেকে বিরত লোকদের সে সন্দেহের অপনোদন করে দিয়েছেন যে, হয়তো জিহাদ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে পারলে মৃত্যু থেকেও আত্মরক্ষা করা যাবে। সেজন্যই বলা হয়েছে, এক দিন না একদিন মৃত্যু

অবশ্যই আসবে। তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হবে। কাজেই বিষয়টি যখন এমনি অবধারিত, তখন জিহাদ থেকে তোমাদের আত্মগোপনের প্রয়াস সম্পূর্ণ অর্থহীন।

হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনার উল্লেখ করেন, যা ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম মুজাহিদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনাটি এই ঃ

বিগত উম্মতদের কোন এক উম্মতের জনৈকা মহিলার প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে এবং কতক্ষণের মধ্যেই সে এক কন্যা সন্তান প্রসব করে। তখন সে নিজের ভৃত্যকে আগুন আনার জন্য পাঠায়। ভৃত্য দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, অমনি হঠাৎ এক লোক তার সামনে পড়ল এবং জিজ্ঞেস করল, এ স্ত্রীলোকটি কি প্রসব করেছে? ভৃত্য বলল, একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছে। তখন সে লোকটি বলল, আপনি মনে রাখবেন, এ কন্যা একশ পুরুষের সাথে যিনা (ব্যভিচার) করবে এবং শেষ পর্যন্ত মাকড়সার দ্বারা তার মৃত্যু হবে। একথা শুনে ভৃত্য ফিরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুরি নিয়ে সে মেয়ের পেটটি ফেড়ে ফেলল এবং মনে মনে ভাবল, নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে। তারপর সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু এ মেয়ের মা সঙ্গে সঙ্গে তার পেট সেলাই করে দিল। শেষ পর্যন্ত সে সুস্থ হয়ে উঠল এবং যৌবনে পদার্পণ করল। এ মেয়েটি এতই সুন্দরী ছিল যে, তখনকার সময়ে তদঞ্চলে এমন রূপসী দ্বিতীয়টি ছিল না।

যা হোক, সে ভৃত্য পালিয়ে সাগর পথে চলতে লাগল এবং দীর্ঘদিন যাবত রুযী-রোযগার করে বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করল। অতঃপর বিয়ে করার উদ্দেশ্যে শহরে ফিরে এল। এখানে এসেই সে এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ পেল। প্রসঙ্গত সে তার অভিপ্রায় বৃদ্ধাকে জানিয়ে বলল যে, আমি এক অনুপমা রূপসীকে বিয়ে করব, যার তুলনা এ শহরে আরেকটি থাকবে না। তখন সে বৃদ্ধা জানাল যে, এ শহরে অমুক মেয়ের চাইতে রূপসী আর কেউ নেই। আপনি বরং তাকেই বিয়ে করে ফেলুন। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা-চরিত্র করে সে তাকেই বিয়ে করে নিল। বিয়ের পর যুবতী তার এই স্বামীর পরিচয় জানতে চাইল যে, তুমি কে? কোথায় থাক? সে বলল, আমি এ শহরেরই অধিবাসী। কিন্তু এক শিশু কন্যার পেট ফেড়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। অতঃপর সে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনাল। সব কাহিনী শুনে যুবতী বলল, সে কন্যাটি আমিই। একথা বলে নিজের পেট খুলে দেখাল, যাতে তখনও দাগ বিদ্যমান ছিল। এটি দেখে পুরুষটি বলল, তুমি যদি সত্যি সে মেয়ে হয়ে থাক, তাহলে তোমার ব্যাপারে দুটি কথা বলছি—একটি হলো এই যে, তুমি একশ পুরুষের সাথে যিনা করবে। যুবতী স্বীকার করল এবং বলল যে, তাই হয়েছে, তবে আমার সংখ্যা মনে নেই। পুরুষটি বলল, সংখ্যা একশ। তারপর বলল, দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে, তুমি মাকড়সার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।

পুরুষ তার জন্য অর্থাৎ তার এই স্ত্রীর জন্য একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করল। তাতে মাকড়সার জালের চিহ্নমাত্রও ছিল না। একদিন সে প্রাসাদে শুয়ে শুয়েই দেয়ালে একটি মাকড়সা দেখতে পেল। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, এটাই কি সে মাকড়সা তুমি আমাকে যার ভয় দেখাও? পুরুষ বলল, হ্যাঁ এটাই। কথা শুনে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে গেল এবং

বলল যে, একে তো এক্ষণেই আমি মেরে ফেলব। একথা বলে মাকড়সাটিকে নিচে ফেলে দিল এবং পায়ে পিষে মেরে ফেলল।

মাকড়সাটি মরে গেল সত্য কিন্তু মেয়েটির পায়ে এবং আঙ্গুলে তার বিষের ছিটা গিয়ে পড়ল যা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।—(ইবনে কাসীর)

এ মহিলাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট প্রাসাদে বাস করেও সহসা একটি মাকড়সার দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কিন্তু তার বিপরীতে এমন বহু লোক রয়েছে যারা গোটা জীবনই অতিবাহিত করেছে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে। অথচ সেখানেও তাদের মৃত্যু আসেনি। ইসলামের প্রখ্যাত সৈনিক, সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সারা জীবন শাহাদাত লাভের আশায় জিহাদে নিয়োজিত থাকেন এবং শত-সহস্র কাফিরকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেন। প্রতিটি ভয়সঙ্কুল উপত্যকা তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে অতিক্রম করতে থাকেন এবং সর্বদা এ প্রার্থনাই করতে থাকেন, যেন তাঁর মৃত্যু নারীদের মত ঘরের কোণে না হয়ে বরং নির্ভীক সৈনিকের মত জিহাদের ময়দানেই হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু শয্যার উপর হলো। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবস্থাটি একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ নিজের হাতেই রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে শান্তির নীড়ে মাকড়সার মাধ্যমেই মৃত্যুদান করেন আর যখন তিনি বাঁচতে ইচ্ছা করেন, তখন তলোয়ারের নিচ থেকেও বাঁচিয়ে রাখেন।

পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ —আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে করা হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হিফাযতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী ও শরীয়তবিরুদ্ধ নয়।—(কুরতুবী)

মানুষ শুধু আল্লাহ্র অনুগ্রহেই নিয়ামত লাভ করে ঃ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ এখানে حسنة (হাসানাতিন)-এর দ্বারা নিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত ইবাদত-বন্দেগীই করুক, তাতে সে নিয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ ইবাদত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নিয়ামত সীমিত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব ? বিশেষ করে আমাদের ইবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্ তা'আলার শান মোতাবেক না হয় ?

অতএব মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما احد يدخل الجنة الا برحمة الله قيل و لا انت قال ولانا-

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না," বলা হলো, "আপনিও কি যেতে পারবেন না ?" তিনি বললেন, "না, আমিও না।" —(মাযহারী)

বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল ঃ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ এখানে سَيِّئَةٌ অর্থ হলো বিপদাপদ। —(মাযহারী)

বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফির হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ, তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে, যা আখিরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত আখিরাতের আযাব এর চাইতে বহুগুণ বেশি। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখিরাতে তার মুক্তির কারণ হবে। অতএব এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفّر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها–

অর্থাৎ "কোন বিপদ এমন নেই যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ্ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমনকি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।"—(মাযহারী)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن ابى موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتصيب عبداً نكبة فما فوقها ومادونها الابذنب وما يعفو اكثر—

অর্থাৎ হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সেসবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেওয়া হয়। —(মাযহারী)

মহানবী (সা)-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক ঃ وَأَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً—আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা)-কে সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রাসূল নন, বরং তাঁর রিসালত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। তা তারা তখন উপস্থিত থাক অথবা নাই থাক ; কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

(৮০) যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহ্রই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে লোক রাসূল (সা)-এর (প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ করে (প্রকৃতপক্ষে) সে আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করে। আর (হে মুহাম্মদ!) যে লোক আপনার অবাধ্যতা করছে (সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই অবাধ্য হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা যৌক্তিকভাবেও যেহেতু ওয়াজিব, সুতরাং আপনার আনুগত্য করাও ওয়াজিব হয়েছে) আপনাকে (দায়িত্ব হিসাবে) তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী করে পাঠানো হয়নি (যে আপনি তাদেরকে কুফরী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখবেন। বরং আপনার উপর যে কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে, তা পয়গাম পৌঁছে দিলেই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়ে যায়। এর পরেও যদি তারা কুফরী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, তাহলে সেজন্য আপনাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। আপনি সেজন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন)।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ز فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ط وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ج فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

(৮১) আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ্ লিখে নেন, যে সব পরামর্শ তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর, আল্লাহ্ হলেন যথেষ্ট ও কার্য সম্পাদনকারী। (৮২) এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি ? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর এসব (মুনাফিক) লোকেরা (আপনার হুকুম-আহ্কাম শুনে আপনার সামনে মুখে মুখে যদি) বলে; (আপনার) আনুগত্য করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আপনার নিকট থেকে (উঠে) যখন তারা বাইরে চলে যায়, তখন রাতের বেলায় (গোপনে গোপনে) তাদের কোন কোন দল (অর্থাৎ তাদের সর্দারদের দল) পরামর্শ করে সেসব কথার পরিপন্থী, যা তারা (আপনার সামনে) বলেছিল। (আর যেহেতু তারা সর্দার সেহেতু মূলত তারাই পরামর্শ করে থাকে এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ থাকে তাদেরই অনুগত। অতএব, বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সবাই

সমান।) বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের আমলনামায়) সে সমস্তই লিখে রাখেন, যা (তারা রাতের বেলায়) পরামর্শ করে থাকে। (সময়মত এসবের শাস্তি তিনি দেবেন।) কাজেই আপনি তাদের (এ সমস্ত বেকার বিষয়ের) প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না (এবং সেদিকে লক্ষ্যও করবেন না)। তাছাড়া (এসব ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনাও করবেন না, বরং এ সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিন।) বস্তুত তিনিই যথেষ্ট ও কার্য সম্পাদনকারী (তিনিই তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের যথাযথ প্রতিরোধ করবেন)। সুতরাং (তাদের দুষ্টুমিতে কখনও মহানবীর কোন অনিষ্ট সাধিত হতে পারেনি।) তারা কি (কোরআনের অকাট্যতা, তার অলংকারপূর্ণ বর্ণনা এবং গায়েবী বিষয়ে সঠিক ও যথার্থ সংবাদ দান প্রভৃতি বিষয় দেখেও) কোরআনের উপর লক্ষ্য করে না (যাতে এর ঐশী কালাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে) ? এটা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কালাম হতো, তাহলে এর (বিষয়গুলোর) মধ্যে (সেগুলোর আধিক্যের দরুন ঘটনার বিবরণ ও অকাট্যতার দিক দিয়ে) বহু পার্থক্য দেখতে পেত। (কারণ, প্রত্যেকটি বিষয়ে একেকটি পার্থক্য হলেই অধিক বিষয়ে অধিক পার্থক্য দেখা দিত। অথচ এতে বিষয়বস্তুর মাঝেও কোন বৈপরীত্য বিদ্যমান নেই। সুতরাং এটা আল্লাহ্র কালাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ-

আয়াতে সেসব লোকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে ; মুখে এক কথা এবং মনে অন্য কথা পোষণ করে। অতঃপর এসব লোকের ব্যাপারে রাসূলে-করীম (সা)-এর কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষ হেদায়েত দান করা হয়েছে।

নেতৃত্ব দানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ঃ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا – মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবূল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা আপনার নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রাসূলে করীম (সা)-এর বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টাসিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদ চুম্বন করবে।

কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা ঃ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুলকে আহবান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা أَفَلَا يَقْرَؤُنَ না বলে বলেছেন أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ এতে বাহ্যত একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। তা'হলো এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধু তিলাওয়াত বা আবৃত্তির দ্বারা—যাতে তাদাব্বুর বা চিন্তা-গবেষণার কোন অস্তিত্ব নেই—অর্জিত হবে না, যা বাস্তবের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ কোরআনের উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হলো কোরআনের চাহিদা। কাজেই কোরআন-সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধু ইমাম-মুজতাহিদদেরই একক দায়িত্ব—এমন মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতই অবশ্য চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম-মুজতাহিদদের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্বের ধারণা ও ভালবাসা। এটাই হলো কৃতকার্য হওয়ার মূল চাবিকাঠি। অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে কোন বিজ্ঞ আলিমের কাছে কোরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোন নির্ভরযোগ্য তফসীর অধ্যয়ন করবে এবং কোন জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মনমতো তার কোন সমাধান করবে না, বরং বিজ্ঞ কোন আলিমের সাহায্য নেবে।

কোরআন ও সুন্নাহ্র তফসীরের কয়েকটি শর্ত ঃ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ রয়েছে, সেমতে প্রতিটি স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদসুলভ গবেষণার দ্বারা কোরআনে-হাকীমের ভিতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই না থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, একজন মুজতাহিদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলা বাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় আলিম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

যে লোক কোনদিন কোন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রে সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেওয়া হলো ? একজন মানুষ হিসাবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোন নির্বোধ যদি বলতে শুরু করে যে, দেশে নদী-নালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের ঠিকাদারী শুধু বিজ্ঞ প্রকৌশলীদের কেন দেওয়া হবে ? আমিও তো একজন নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিকৃত-বুদ্ধির কোন লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে কেন ? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসাবে এ কাজ সম্পাদন করতে পারি! তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের নাগরিক হিসাবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমারও রয়েছে কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যে সব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমাদেরও প্রথমে সে কষ্টটুকু স্বীকার করতে হবে। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে। কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তখন আলিম সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান ওঠে। তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে শুধু কোরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিস রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে ! যদি সে লোক কোরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি ?

কিয়াস একটি দলিল ঃ এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন মাসআলার বিশ্লেষণ যদি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে তার সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় 'কিয়াস' বলা হয়।

বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা ঃ لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا এ আয়াতে উল্লিখিত اختلاف كثير (বা বহু মতবিরোধ) এর মর্ম এই যে, যদি কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে। —(বয়ানুল-কোরআন) কিন্তু এখানে (অর্থাৎ কোরআনে কোন একটি বিষয়েও কোন মতবিরোধ বা মত-পার্থক্য নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ত্রুটি, না আছে তওহীদ, কুফরী কিংবা হারাম-হালালের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়েবী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কোরআনের ধারাবাহিকতায় কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা-সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশি প্রভাব অবশ্যই থাকে—আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শান্তিপূর্ণ

পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে অন্য রকম। কিন্তু কোরআন এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। আর এটাই হলো কালামে-ইলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

(৮৩) আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন কোন (নতুন) বিষয় সম্পর্কিত সংবাদ এসে পৌঁছে, চাই (সে সংবাদ) শান্তির হোক কিংবা ভীতিজনক হোক, (যেমন, মুসলমানদের কোন বাহিনীর কোন জিহাদে গমন এবং তাদের বিজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছান ; এটা শান্তির সংবাদ। কিংবা তাদের পরাজিত হওয়ার যদি খবর আসে ; যেটা দুঃখের সংবাদ) তাহলে সে সংবাদটিকে (সঙ্গে সঙ্গে) রটিয়ে দেয়। (অথচ দেখা যায়, সেটি ছিল ভুল। আর যদি সঠিকও হয়ে থাকে, তথাপি অনেক সময় তার রটনা প্রশাসনিক কল্যাণের বিরোধী হয়ে থাকে)। পক্ষান্তরে (নিজের ভাবে প্রচার করার পরিবর্তে) যদি এরা এ সংবাদটি রাসূলে-করীম (সা)-এর উপর এবং বিচক্ষণ সাহাবায়ে কিরামের মতামতের উপর অর্পণ করত (এবং নিজেরা যদি এসব ব্যাপারে কোন রকম দখল না দিত), তাহলে এ সমস্ত খবরাখবরের (যথার্থতা কিংবা ভ্রান্ততা এবং এগুলো প্রচারযোগ্য কি নয় সে) বিষয়ে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন যারা এসব বিষয় অনুসন্ধান করে থাকেন। (যেমন করে সাধারণত উপলব্ধি করে থাকেন। অতঃপর তাঁরা যে ব্যবস্থা করতে চান, সেমতেই এসব রটনাকারীর কাজ করা উচিত ছিল। এসব ব্যাপারে তারা যদি কোনরকম হস্তক্ষেপ না করত, তা হলে এমন কি বিগড়ে যেত ? সুতরাং উল্লিখিত বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করার পর যা আপাদমস্তক দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে পরিপূর্ণ অনুগ্রহস্বরূপ মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে—) আর যদি তোমাদের প্রতি (কোরআন ও রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র (বিশেষ) রহমত ও

অনুগ্রহ না হতো, তবে তোমরা সবাই (দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণকর বিষয়গুলো অবলম্বন করে) শয়তানের অনুগামী হয়ে পড়তে, সামান্য কতিপয় লোক ব্যতীত (যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহের দান, সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধির দৌলতে তা থেকে বেঁচে থাকেন। অন্যথায় তারাও বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। সুতরাং এমন মহান পয়গম্বর এবং এমন মহান গ্রন্থ কোরআনকে মুনাফিকদের বিপরীতে একান্ত অনুগ্রহের দান মনে করে তার অনুসরণ ও আনুগত্য করা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযুল ঃ وَاِذَا جَاۤءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ হযরত ইবনে আব্বাস, যাহহাক ও আবূ মা'আয (রা)-এর মতে এ আয়াতটি মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর হযরত হাসান (রা)-সহ অধিকাংশের মতে এ আয়াতটি দুর্বল ও কমজোর মুসলমানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।

আল্লামা ইবনে-কাসীর এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এ আয়াতের শানে নযুল প্রসঙ্গে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর হাদীসটি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। তা হলো এই যে, হযরত উমরের নিকট একবার খবর পৌঁছাল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিবিগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এ খবর শুনে তিনি নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে এলেন এবং মসজিদের কাছাকাছি এসে শুনতে পারলেন যে, মসজিদের ভেতরেও লোকদের মধ্যে এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। এসব লক্ষ্য করে তিনি বললেন, এ সংবাদটি অনুসন্ধান করে যাচাই করা দরকার। সেমতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! "আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন ?" হুযূর (সা) বললেন, 'না তো' ! হযরত উমর (রা) বলেন, বিষয়টি অনুসন্ধান করার পর আমি মসজিদের দিকে ফিরে এলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিবিগণকে তালাক দেননি। আপনারা যা বলছেন, তা ভুল।" এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। —(ইবনে-কাসীর)

যাচাই না করে কোন কথা রটনা করা মহাপাপ ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যে কোন শোনা কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রাসূলে করীম (সা)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ — অর্থাৎ কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين ◦

অর্থাৎ যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী। —(ইবনে-কাসীর)

উলুল-আমর কারা ঃ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ — আয়াতে উল্লিখিত استنباط। শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা। সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরোয় তাকে আরবীতে ماء مستنبط বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।—(কুরতুবী)

'উলুল-আমর' বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত হাসান, কাতাদাহ ও ইবনে আবী লায়লা (র) প্রমুখের মতে দায়িত্বশীল লোক বলতে ওলামা ও ফকীহ্গণকে বোঝায়। হযরত সুদ্দী (র) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। আল্লামা আবূ বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, দু'টি অর্থই ঠিক। কারণ, 'উলুল-আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল-আমর' বলতে ফকীহ্দের বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, اولو الامر। (উলুল-আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সেসব লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলা বাহুল্য, এ কাজটি ফকীহ্দের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দুটি প্রেক্ষিত রয়েছে। এক. জবরদস্তিমূলক। এটা শুধু শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। দুই. বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্রা অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানরা নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলিম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্যপালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলিমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রেও 'উলুল-আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে। —(আহকামুল কোরআন, জাসসাস)

আলোচ্য বিষয়ের অধিকতর সবিস্তার বর্ণনা أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতের আওতায় ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে কিয়াস ও ইজতিহাদ ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, যেসব বিষয়ে কোন 'নস' তথা কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম 'ইজতিহাদ' ও কিয়াসের রীতি অনুযায়ী কোরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোন বিষয়ের সমাধানকল্পে রাসূল করীম (সা)-এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকীহ্দের নিকট যাও। কারণ, তাঁদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মত পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, 'নস' বা কোরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে ওলামাদের কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র নির্দেশ দু'রকম। কিছু হলো সরাসরি 'নস' বা কোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক এবং কিছু হলো পরোক্ষ ও অস্পষ্ট যা আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন।

তৃতীয়ত, এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলিম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব।

চতুর্থত, এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলিম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্যকর্তব্য।—(আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

রাসূলে করীম (সা)-ও উদ্ভাবন ও প্রমাণ সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত ঃ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলে-করীম (সা)-ও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূলে-আকরাম (সা) এবং অপরজন হচ্ছেন 'উলুল-আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ —আর এই নির্দেশটি হলো ব্যাপক। এতে উল্লিখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাউকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুযূর নিজেও আহকাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত।—(আহ্‌কামামুল-কোরআন, জাসসাস)

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (১) কারও মনে যদি এমন কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধু এতটুকুই বোঝা যায় যে, শত্রুর ভয় শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোন রটনা করো না, বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে অনুসারেই কাজ করবে। বলা বাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

তাহলে তার উত্তর এই যে, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ বাক্যে শত্রুর কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শত্রুর সাথে তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ, যখন কোন নতুন বিষয় বা মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ভব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কোরআন বা হাদীসের কোন নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন্ দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অথচ উভয় দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরীয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছে। তাহলো উদ্ভাবন (استنباط) করা। উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তারই উপর আমল করবে। (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস নয় ঃ (২) ইস্তিম্বাত-এর মাধ্যমে আলিমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক। বরং এই নির্দেশ বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট। (আহ্‌কামুল-কোরআন, জাসসাস)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ
عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

(৮৪) আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন ; আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ্ কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ্ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)! যখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখবেন, তখন] আপনি (আল্লাহ্‌র রাহে কাফিরদের সাথে) যুদ্ধ করুন। (আর যদি মনে হয় যে, আপনার সাথে কেউ নেই তবুও সেজন্য চিন্তা করবেন না। কারণ,) আপনি আপনার নিজস্ব কাজকর্ম ছাড়া (অন্য কারও কাজ-কর্মের জন্য) দায়ী নন। আর (যুদ্ধ করার সাথে সাথে) মুসলমানদের (শুধু) উৎসাহ দান করুন। (এর পরেও যদি কেউ আপনার সমর্থন না করে, তবে আপনি দায়িত্বমুক্ত। তখন আর আপনি জবাবদিহির ব্যাপারেও চিন্তা করবেন না এবং একাকিত্বের জন্যও দুঃখ করবেন না। তার কারণ,) আল্লাহ্‌র প্রতি এই আশা রয়েছে যে, তিনি শীঘ্রই কাফিরদের যুদ্ধবল রহিত করে দেবেন (এবং তাদেরকে পরাজিত করে দেবেন)। আর (যদিও এরা যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে হয়, কিন্তু) আল্লাহ্ সমরশক্তিতে (তাদের তুলনায় অসংখ্য গুণ) বেশি কঠিন (ও শক্তিশালী)। তিনি বিরোধীদের অতি কঠিন শাস্তি দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযুল : শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবার পর পরবর্তী যিলকদ মাসে কাফিরদের ওয়াদা অনুযায়ী রাসূলে আকরাম (সা) কাফিরদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য বদরে যেতে চাইলেন। (একেই ঐতিহাসিকগণ 'বদ্‌রে ছোগ্‌রা' বা 'ছোট বদর' বলে অভিহিত করেন।) তখন কেউ কেউ আহত হওয়ার কারণে, আবার অনেকে গুজবের দরুন সেখানে যেতে কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে রাসূলে-করীম (সা)-কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, এসব অপরিপক্ব মুসলমান যদি যুদ্ধে যেতে ভয় করে, তবে হে রাসূল (সা) একাই যুদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আল্লাহ্ হবেন আপনার সাহায্যকারী। এ হেদায়েত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সত্তরজন সঙ্গী নিয়ে 'বদরে-ছোগরা' অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ওহুদ যুদ্ধের পর আবূ সুফিয়ানের সাথে এরই ওয়াদা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ সুফিয়ান ও কোরায়শ কাফিরদের মনে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে দিলেন। তাদের কেউই মোকাবিলা করতে এলো না। ফলে তারা কৃত ওয়াদার মিথ্যা প্রতিপন্ন

হলো। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কথামত কাফিরদের যুদ্ধ এভাবেই বন্ধ করে দিলেন। আর এদিকে রাসূলে করীম (সা) স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন। (কুরতুবী, মাযহারী)

কোরআনী বিধানের বর্ণনাশৈলী ঃ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূলে করীম (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে পড়ুন ; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানের এ ব্যাপারে উৎসাহদানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল, তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে—'আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফিরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন। অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্ তা'আলার সমর্থন রয়েছে যার সমরশক্তি কাফিরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্য গুণ বেশি, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কিয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তিদানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

(৮৫) যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। (৮৬) আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর ; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহ্ ব্যতীত

আর কোনই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র চাইতে বেশি সত্য কথা আর কার হবে!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে লোক ভাল সুপারিশ করবে (অর্থাৎ যার নিয়ম-পন্থা ও উদ্দেশ্য দু'টোই শরীয়তসম্মত হবে) তাকে সে সুপারিশের বিনিময়ে (পুণ্যের) একটি অংশ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে লোক মন্দ বিষয়ে সুপারিশ করবে (অর্থাৎ যার পন্থা ও উদ্দেশ্য অবৈধ হবে) সেও (এই সুপারিশের) দরুন (পাপের একটা) অংশ প্রাপ্ত হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। (তিনি স্বীয় কুদরতের দ্বারা সৎকর্মের জন্য সওয়াব এবং অসৎকর্মের জন্য আযাব দিতে পারেন।) আর তোমাদেরকে যখন কেউ (শরীয়তানুযায়ী বৈধ পন্থায়) সালাম করবে, তখন তোমরা সে সালামের চেয়ে উত্তম বাক্যের মাধ্যমে উত্তর দান কর। অথবা উত্তর দিতে গিয়ে তেমনি বাক্য উচ্চারণ কর। (এতদুভয় ব্যাপারেই তোমাদেরকে অধিকার দেওয়া হচ্ছে।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে (অর্থাৎ যাবতীয় কাজ-কর্মের) হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। (অর্থাৎ এটাই হলো তাঁর আইন ও রীতি। তবে কৃপাবশত ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন কথা।) তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'আলার চাইতে কার উক্তি অধিক সত্য হবে ? (তিনি যখন এ সংবাদ দিচ্ছেন, তখন তা সম্পূর্ণ সত্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুপারিশের স্বরূপ, বিধি ও প্রকারভেদ ঃ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً-এ আয়াতে শাফা'আত অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ--দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। আয়াতে ভাল সুপারিশের সাথে نصيب শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে كفل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক ; অর্থাৎ কোন কিছুর অংশ বিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় نصيب শব্দটি ভাল অংশ এবং كفل শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; যদিও কখনো ভাল অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (তাঁর রহমতের দুটি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

شَفَاعَةً-এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই আরবী شَفْعٌ ভাষায় শব্দ জোড় অর্থে এবং এর বিপরীতে وِتْرٌ শব্দ বেজোড় অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব شَفَاعَةً-এর শাব্দিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেওয়া কিংবা অসহায় একা ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয়ে তাকে জোড় করে দেওয়া।

এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফা'আত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবি সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবি প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বোঝা গেল যে, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত।

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে সেও সওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে।

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে।

এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহ্গার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে।

রাসূলে-করীম (সা) বলেন : الدال على الخير كفاعله অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী নিজে পায়। (মাযহারী)

ইবনে মাজায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه ائس من رحمة الله –

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কিয়ামতে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে : "এ ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।" (মাযহারী)

এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ এবং এতে সমান সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি অসৎ ও পাপকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا আভিধানিক দিক দিয়ে مُقِيْت শব্দের অর্থ তিনটি : এক. শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, দুই. উপস্থিত ও দর্শক এবং তিন. রুযী বন্টনকারী। উল্লিখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে—আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কোন্ নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলমান

ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসাবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে করে, তিনি সে সবই জানেন।

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুযী বন্টনের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার। যার জন্য যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারও সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি খামখাব থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ اللّٰهُ فِىْ عَوْنِ عَبْدِهٖ مَادَامَ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে।

সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اشفعوا فلتوجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء অর্থাৎ তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন, তাতে সন্তুষ্ট থাক।

এ হাদীসে একদিকে বলা হয়েছে যে, সুপারিশ করলে সওয়াব পাওয়া যায়। অপরদিকে সুপারিশের সংজ্ঞাও বর্ণিত হয়েছে যে, যে দুর্বল ব্যক্তি নিজের কথা কোন উর্ধ্বতন লোকের কাছে পৌঁছাতে এবং সঠিকভাবে প্রয়োজন ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়, তুমি তার কথা সেখানে পৌঁছিয়ে দেবে। অতঃপর তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হোক বা না হোক, অভীষ্ট কাজ পূর্ণ হোক বা না হোক, সে বিষয়ে তোমার কোন দখল থাকা উচিত নয় এবং সুপারিশের বিরুদ্ধাচরণ তোমার কাছে অপ্রীতিকর না হওয়া উচিত। হাদীসের শেষ বাক্য ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء-এর অর্থ তাই। এ কারণেই কোরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন--আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক।

তফসীরে বাহরে মুহীত, বয়ানুল-কোরআন প্রভৃতি গ্রন্থে مَنْ يَشْفَعْ বাক্যে مِنْهَا শব্দটিকে سبب সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। তফসীরে-মাযহারীতে তফসীরবিদ মুজাহিদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের সওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় ; বরং অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাঁদী বরীরা স্বীয় স্বামী মুগীছের কাছ থেকে তালাক নিয়েছিলেন। তালাক দেওয়ার পর মুগীছ বরীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুগীছকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য বরীরার

কাছে সুপারিশ করেন। বরীরা আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরয করলেন ঃ তা হলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল বিকৃত আকারের যে সুপারিশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুপারিশ নয় ; বরং এ হচ্ছে সতর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। এ কারণেই আজকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়; বরং শত্রুতা সাধনে উদ্যত হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাপ সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর গোনাহ। এটি কারও অর্থ-সম্পদ কিংবা কারও অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে নেওয়ার মতই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপনি জোর-জবরদস্তি করে তার স্বাধীনতা হরণ করেন। সুতরাং এ হচ্ছে একজনের অভাব দূর করার জন্য অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে তাকে বিলিয়ে দেওয়ার অনুরূপ।

সুপারিশ করে বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ এবং হারাম ঃ সুপারিশ করে কোন বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ। হাদীসে একে سحت বা হারাম বলা হয়েছে। আর্থিক ঘুষ হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজের বিনিময়ে নিজের কোন কাজ হাসিল করা হোক—সর্বপ্রকার ঘুষই এর অন্তর্ভুক্ত।

কাশ্শাফ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ঐ সুপারিশ ভাল, যার উদ্দেশ্য কোন মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করা অথবা তার কোন বৈধ উপকার করা অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও এ সুপারিশটি যেন কোন জাগতিক লাভালাভ অর্জনের জন্য না হয় ; বরং আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ করে কোন আর্থিক অথবা কায়িক ঘুষ যেন না নেওয়া হয়। এ সুপারিশ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না হয় এবং যে অপরাধের শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে এরূপ কোন অপরাধ মাফ করাবার জন্যও যেন না হয়।

বাহরে মুহীত, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ কোন মুসলমানের অভাব-অনটন দূর করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করাও ভাল সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত। এতে দোয়াকারীও সওয়াব পায়। এক হাদীসে আছে, যখন কেউ মুসলমান ভাইয়ের জন্য নেক দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ ولك بمثل, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকেও অনুরূপ দান করুন।

সালাম ও ইসলাম ঃ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

—এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تحية শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ تحية-এর শাব্দিক অর্থ কাউকে حياك الله বলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে জীবিত রাখুন! ইসলাম-পূর্ব কালে আরবরা পরস্পরের

সাক্ষাতকালে একে অন্যকে حَيَّاكَ اللّٰهُ কিংবা اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا কিংবা اَنْعِمْ صَبَاحًا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করত। ইসলাম এ সালামপদ্ধতি পরিবর্তন করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার রীতি প্রচলন করেছে। এর অর্থ তুমি সর্ব প্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ 'সালাম' শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর অর্থ এই যে, الله رقيب عليكم। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষক।

ইসলামী সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম ঃ জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থ কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এ দোয়াটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয় ; বরং পবিত্র জীবনের দোয়া। অর্থাৎ সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা—সবাই আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ইবাদত এবং মুসলমান ভাইকে খোদার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার উপায়ও বটে।

এতদ্সঙ্গে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে মুসলমান ভাইকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখার দোয়া করে, সে যেন এ ওয়াদাও করে যে, তুমি আমার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ, তোমার জানমাল ও ইজ্জত আবরুর আমি সংরক্ষক।

ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন গ্রন্থে ইমাম ইবনে উয়ায়নার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اتدرى ما السلام يقول انت امن منى অর্থাৎ সালাম কি বস্তু, তুমি জান ? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত।

মোট কথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা—(১) এতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র (২) আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেওয়া (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং (৫) মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ অর্থাৎ যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, সে-ই প্রকৃত মুসলমান।

আফসোসের বিষয়, মুসলমানরা যদি এ বাক্যটিকে একটি সাধারণ প্রথা মনে না করে এর প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে ব্যবহার করত, তবে সম্ভবত জাতির সংশোধনের পক্ষে এটিই যথেষ্ট

হতো। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচলন করার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে সর্বোত্তম কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি সালামের অনেক ফযীলত, বরকত ও সওয়াব বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন ঃ

"তোমরা মু'মিন না হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরস্পরে একে অন্যকে মহব্বত না করে তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা যদি এটি বাস্তবায়ন কর, তবে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। তা এই যে, পরস্পরের মধ্যে সালামের রীতিকে ব্যাপকতর কর। অর্থাৎ প্রত্যেক পরিচিত ও অপরিচিত মুসলমানকে সালাম কর।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ ইসলামের কোন্ কাজটি সর্বোত্তম ? তিনি বললেন ঃ তুমি মানুষকে আহার করাও এবং পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত, সবাইকে সালাম কর।— (বুখারী ও মুসলিম)

মসনদে-আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে-ই আল্লাহ্র অধিক নিকটবর্তী।

মসনদে বাযযার ও মু'জামে-কবীর তিবরানীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নাম, যা তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই তোমরা পরস্পরকে ব্যাপকভাবে সালাম কর। কেননা, মুসলমান যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হয়ে সালাম করে, তখন সে আল্লাহ্র কাছে একটি উচ্চ মর্তবা লাভ করে। কারণ, সে সবাইকে সালাম অর্থাৎ আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মজলিসের লোকেরা যদি তার সালামের জওয়াব না দেয়, তবে তাদের চাইতে উত্তম ব্যক্তিরা তার জওয়াব দেবে অর্থাৎ আল্লাহ্র ফেরেশতারা।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সালাম দিতে কৃপণতা করে, সে-ই বড় কৃপণ। (তিবরানী, মু'জামে কবীর)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এসব উক্তি সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে যে কিরূপ অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে, একটি রেওয়ায়েত থেকে তা অনুমান করা যায়। বর্ণিত আছে, সালাম করে ইবাদতের সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যেই হযরত ইবনে উমর (রা) অধিকাংশ সময় বাজারে যেতেন—কোন কিছু বেচাকেনা করা উদ্দেশ্য থাকত না।—(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদেরকে সালাম করা হলে তোমরা তার জওয়াব আরও উত্তম ভাষায় দাও, কিংবা কমপক্ষে তদনুরূপ বাক্যই বলে দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ

السلام عليك يارسول الله তিনি উত্তরে একটি শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ وعليكم السلام ورحمة الله---এরপর এক ব্যক্তি এসে সালাম করল ঃ السلام عليكم يارسول الله ورحمة الله তিনি

জওয়াবে আরও একটি শব্দ যোগ করে বললেন ঃ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته অতঃপর এক ব্যক্তি এসে উপরোক্ত তিনটি শব্দ সহযোগে বলল ঃ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته। তিনি উত্তরে শুধু একটি শব্দ অর্থাৎ وعليك বললেন। লোকটির মনে প্রশ্ন দেখা দিল। সে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ--প্রথমে যারা এসেছিল, তাদের উত্তরে আপনি কয়েকটি দোয়ার শব্দ বলেছেন। আমি সবগুলো শব্দ সহযোগে সালাম করলে আপনি শুধু وعليك বললেন কেন ? তিনি বললেন ঃ তুমি আমার জন্য জওয়াবে বাড়াবার মত কোন শব্দই রাখনি। তুমি সবগুলো শব্দ সালামে ব্যবহার করে ফেলেছ। তাই আমি কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী 'অনুরূপ শব্দ' দ্বারা জওয়াব দিয়েছি। এ রেওয়ায়েতটি ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম বিভিন্ন সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, আয়াতে সালামের জওয়াব আরও উত্তম ভাষায় দেওয়ার যে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ এই যে, সালামকারীর ব্যবহৃত শব্দ বাড়িয়ে জওয়াব দেওয়া। উদাহরণত সে যদি السلام عليكم বলে তবে আপনি জওয়াবে وعليكم السلام ورحمة الله বলুন। সে যদি السلام عليكم ورحمة الله বলে, তবে আপনি وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বলুন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, তিনটি শব্দ পর্যন্ত বাড়ানোই সুন্নত। এর চাইতে আরও বেশি বাড়ানো সুন্নত নয়। এর কারণ এই যে, সালামের স্থান সংক্ষিপ্ত বাক্য চায়। এখানে এত দীর্ঘ বাক্য সমীচীন নয়, যা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কিংবা শ্রোতার কাছে ভারী মনে হয়। তাই জনৈক ব্যক্তি যখন প্রথম সালামেই তিনটি শব্দ ব্যবহার করে ফেলে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাক্যকে আরও বাড়ানো থেকে বিরত থাকেন। এর আরও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) তিনের চাইতে অধিক শব্দ প্রয়োগকারীকে বাধা দিয়ে বলেন ঃ ان السلام قد انتهى الى البركة। অর্থাৎ 'বরকত' শব্দে পৌঁছে সালাম শেষ হয়ে যায়। এর বেশি বলা সুন্নত নয়।

তৃতীয়ত জানা গেল যে, সালামে 'তিন' শব্দ উচ্চারণকারীর জওয়াবে যদি 'এক' শব্দই বলে দেওয়া হয়, তবে তাও অনুরূপ শব্দ দ্বারা জওয়াব দেওয়ার মতই এবং কোরআনের নির্দেশ اَوْ رُدُّوْهَا পালনের পক্ষে যথেষ্ট ; যেমন, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটিমাত্র শব্দই উচ্চারণ করেছেন।—(মাযহারী)

আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু হলো এই যে, কোন মুসলমানকে সালাম করা হলে তার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জওয়াব না দিলে সে গোনাহ্গার হবে। তবে জওয়াবে ইচ্ছা করলে যে বাক্যে সালাম করা হয়, তার চাইতে উত্তম বাক্যে জওয়াব দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে হুবহু সে বাক্যেও জওয়াব দিতে পারে।

এ আয়াতে সালামের জওয়াব দেওয়া যে ওয়াজিব, তা তো স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ; কিন্তু প্রথমাবস্থায় সালাম করা ওয়াজিব কি না তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়নি। তবে اِذَا حُيِّيْتُمْ

বাক্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটিকে مجهول এবং কর্তা নির্দিষ্ট না করে উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, সব মুসলমানই অভ্যাসগতভাবে সালাম করে।

মসনদে-আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক নৈকট্যশীল।

পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে সালামের প্রতি জোর তাকীদ ও সালামের ফযীলত আপনি শুনেছেন। এগুলো থেকে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, প্রথমাবস্থায় সালাম করাও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ থেকে কম নয়। তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলিমের মতে প্রাথমিক সালাম সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : السلام تطوع والرد فريضة অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় সালাম করা ইচ্ছাগত ব্যাপার, কিন্তু সালামের জওয়াব দেওয়া ফরয।

কোরআনী নির্দেশের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম ও সালামের জওয়াব সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ দান করেছেন, সংক্ষেপে সেগুলোও শুনে নিন। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি যানবাহনে সওয়ার, তার উচিত পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে সালাম করা। যে চলমান, সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে এবং যারা কম সংখ্যক তারা বেশি সংখ্যকের কাছ দিয়ে গেলে প্রথমে তাদেরকে সালাম করবে।

তিরমিযীর এক হাদীসে আছে, যখন কেউ বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন বাটীস্থ লোকদেরকে সালাম করা উচিত। এতে উভয় পক্ষের জন্য বরকত হবে।

আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, কোন মুসলমানের সাথে বারবার দেখা হলে প্রত্যেক বার সালাম করা উচিত। সাক্ষাতের প্রথমে সালাম করা যেমন সুন্নত তেমনি বিদায় মুহূর্তে সালাম করাও সুন্নত এবং সওয়াবের কাজ। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব ; কিন্তু এতে কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। নামাযরত ব্যক্তিকে কেউ সালাম করলে জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়। বরং জওয়াব দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি খুতবা দেয় বা কোরআন তিলাওয়াত করে কিংবা আযান, ইকামত বলে, ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ায় কিংবা মানবিক প্রয়োজনে প্রস্রাব ইত্যাদিতে রত, তাকে সালাম করাও জায়েয নয় এবং তার পক্ষে জওয়াব দেওয়াও ওয়াজিব নয়।

বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে : اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নেবেন। মানুষ এবং ইসলামী অধিকার ; যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোরও হিসাব নেবেন।

এরপর বলা হয়েছে :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজ কর, তাঁর ইবাদতের নিয়তে কর। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্র করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য। وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا কেননা, এ সংবাদ আল্লাহ্র দেয়া। আল্লাহ্র চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে ?

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۚ أَتُرِيْدُوْنَ
أَنْ تَهْدُوْا مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ ۖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾
وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
أَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا
نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ
أَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ أَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۚ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا
قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ
وَيُلْقُوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۚ وَأُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেছে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। (৮৯) তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাও—যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে

তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না ; (৯০) কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি। (৯১) এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনটি বিভিন্ন দল ও তার বিধি ঃ (তোমরা ধর্মত্যাগী প্রথম দলের অবস্থা দেখে নিয়েছ) অতঃপর তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা (মতবিরোধ করে) দু'দল হয়ে গেলে ? (একদল তাদেরকে এখনও মুসলমান বলে) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (তাদের প্রকাশ্য কুফরীর দিকে) ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের (মন্দ) কর্মের কারণে। (এ মন্দ কর্ম হচ্ছে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিমুখ হয়ে দারুল-ইসলাম তথা ইসলামী দেশকে ত্যাগ করা। এটি তখন ইসলামের স্বীকারোক্তি বর্জন করার মতই কুফরীর লক্ষণ ছিল। বাস্তবে তারা পূর্বেও মুসলমান ছিল না। তাই তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে)। তোমরা কি (ঐসব লোক, যারা দারুল-ইসলাম ত্যাগ করা যে কুফরীর লক্ষণ, তা জানে না) তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা (পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করার কারণে) পথভ্রষ্টতায় ফেলে রেখেছেন ? (আল্লাহ্ তা'আলার রীতি এই যে, কেউ কোন কাজ করতে দৃঢ়সংকল্প হলে, আল্লাহ্ সে কাজ সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, অমু'মিন পথভ্রষ্টকে পথপ্রাপ্ত মু'মিন বলা-তোমাদের জন্য বৈধ নয়)। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার (মু'মিন হওয়ার) জন্য কোন পথ পাবে না। (অতএব তাদেরকে মু'মিন বলা উচিত নয়। তারা মু'মিন হবে কি রূপে ? কুফরে বাড়াবাড়িতে তাদের অবস্থা এই যে,) তাদের বাসনা এই যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও (আল্লাহ্ না করুন) তেমনি কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব (তাদের অবস্থা যখন এই, তখন) তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, (অর্থাৎ কারও সাথে মুসলমানের মত ব্যবহার করো না। কেননা, বন্ধুত্ব বৈধ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত)। যে পর্যন্ত না তারা পূর্ণরূপে মুসলমান হওয়ার জন্য হিজরত করে। কেনন, এখন কালেমায়ে শাহাদাত স্বীকার করা যেমন জরুরী, তখন হিজরত করাও তেমনি জরুরী ছিল।

'পূর্ণরূপে মুসলমান হওয়ার জন্য' কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, শুধু দারুল ইসলামে আগমন করাই যথেষ্ট নয়। ব্যবসায়ী কাফিররাও দারুল ইসলামে আগমন করে। বরং ইসলামী মর্যাদা সহকারে আগমন করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান হওয়াও প্রকাশ করতে হবে যাতে স্বীকারোক্তি ও হিজরত উভয়ই অর্জিত হয়। আন্তরিক স্বীকারোক্তি আছে কি না, তা আল্লাহ্ তা'আলারই জানার বিষয়। এটি খোঁজাখোঁজি করার প্রয়োজন মুসলমানদের নেই)। অতঃপর যদি তারা (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (এবং কাফিরই থেকে যায়) তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর (এ পাকড়াও করা হয় হত্যার জন্য, না হয় ক্রীতদাস করার জন্য)। এবং তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। উদ্দেশ্য এই যে, কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রেখো না; শান্তিকালে বন্ধুত্ব রেখো না এবং যুদ্ধকালে সাহায্য চেয়ো না ; বরং পৃথক থাক।

দ্বিতীয় দল ঃ কিন্তু (কাফিরদের মধ্যে) যারা (তোমাদের সাথে সন্ধিবদ্ধ থাকতে চায়, যার পন্থা দু'টি ঃ এক. সন্ধির মাধ্যমে হবে অর্থাৎ) এমন লোকদের সাথে মিলিত হয় (অর্থাৎ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়) যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে (সন্ধি) চুক্তি রয়েছে ; (যথা, বনী মুদলাজ। তাদের সাথে সন্ধি হওয়ার ফলে তাদের মিত্ররাও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতএব বনী মুদলাজ আরও নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমভুক্ত)। অথবা (দ্বিতীয় পন্থা এই যে, সন্ধির মাধ্যম ছাড়াই হবে—এভাবে যে,) স্বয়ং তোমাদের কাছে এভাবে আসবে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হবে। (তাই স্বজাতির পক্ষ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তোমাদের পক্ষ হয়েও স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; বরং উভয় পক্ষের সাথে শান্তির সম্পর্ক রাখবে। অতএব, উল্লিখিত উভয় পন্থার মধ্যে যে কোন পন্থায় কেউ তোমাদের সাথে সন্ধিবদ্ধ থাকতে চাইবে, সে উল্লিখিত 'পাকড়াও ও হত্যার' আদেশের আওতা-বহির্ভূত থাকবে)। এবং (তারা যে সন্ধির আবেদন করে, এজন্য তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্বীকার কর। কারণ, তিনি তাদের অন্তরে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। নতুবা) যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল (ও নির্ভীক) করে দিতেন ; তাহলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত (কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ ভোগান্তি থেকে রক্ষা করেছেন)। অতঃপর (সন্ধি করে) যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে নিরাপত্তার সম্পর্ক বজায় রাখে, (এসব বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের সাথে শান্তিতে থাকে। তাকীদের জন্য একাধিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে) তবে (এ শান্তিকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে (হত্যা, বন্দী ইত্যাদি করার) কোন পথ দেননি (অর্থাৎ অনুমতি দেননি)।

তৃতীয় দল ঃ তোমরা কতক এরূপও অবশ্যই পাবে (অর্থাৎ তাদের এ অবস্থা জানা যাবে) যে, (প্রতারণাপূর্বক) তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায় (এবং এর সাথে সাথেই) যখন তাদেরকে (প্রকাশ্য শত্রুদের পক্ষ থেকে) দুষ্টামির (ও হাঙ্গামার) প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা (তৎক্ষণাৎ) তাতে (অর্থাৎ দুষ্টামিতে) নিপতিত হয়

(অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে যায় এবং প্রতারণাপূর্ণ সন্ধি ভঙ্গ করে)। অতএব, তারা যদি (সন্ধি ভঙ্গ করে এবং) তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয় এবং তোমাদের সাথে নিরাপত্তা বজায় না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে (তোমাদের মুকাবিলা থেকে) বিরত না রাখে (এসব কথার অর্থ আগের মত এক ; অর্থাৎ যদি সন্ধি ভঙ্গ করে) তবে তোমরা(-ও) তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও, হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি। (তদ্দ্বারা তাদের হত্যার বৈধতা সুস্পষ্ট। তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই হচ্ছে এর যুক্তি-প্রমাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়ায়েত ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান ; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল ঃ এরা কাফির আর কেউ কেউ বলল, এরা মু'মিন। আল্লাহ্ তা'আলা فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ আয়াতে এদের কাফির হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন ঃ এদেরকে এ অর্থে মুনাফিক বলা হয়েছে যে, যখন এরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করছিল, তখনও অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে মুনাফিকই ছিল। মুনাফিকরা যতক্ষণ কুফর গোপন রাখত, ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা করা হতো না। এদের কুফর প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে যারা এদেরকে মুসলমান বলেছিল, তারা সম্ভবত সু-ধারণার বশবর্তী হয়ে বলে থাকবে এবং এদের কুফরের প্রমাণাদির কোন সদর্থ করে থাকবে। কিন্তু তাদের সদর্থের ভিত্তি হয়তো ব্যক্তিগত মতামত ছিল এবং কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের সমর্থন এর পেছনে ছিল না। তাই তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়েনি।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ঃ ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হযরত খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কুরায়শরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার।

এর পরিপ্রেক্ষিতে اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ থেকে وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় রেওয়ায়েত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ... سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলত, আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি।

যাহ্‌হাক, হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বনি আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত রূহুল-মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মা'আলেমে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত থানভী (র) বলেন ঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতই হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়ায়েত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফিরদের অনুরূপ। অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সন্ধিচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সেমতে প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ গ্রেফতার করা ও হত্যা করার নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ শান্তিচুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের শান্তিচুক্তি উল্লিখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় فَاِنِ اعْتَزَلُوْ ... ... كُمْ বলে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ سَتَجِدُوْنَ ... اٰخَرِيْنَ-তে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। (বয়ানুল-কোরআন)

মোট কথা, এখানে তিনদল লোকের কথা উল্লিখিত হয়েছে ঃ

১. মুসলমান হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল-হরবে চলে যায়।

২. যারা বরং মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে।

৩. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করে। অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফিরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধর-পাকড়ের আওতা-বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লিখিত হয়েছে ; অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি না থাকাকালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান ঃ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফিরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ছিল।[১] এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন ঃ لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল-ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়। (বুখারী) এটা ছিল তখনকার কথা যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হতো না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة অর্থাৎ যতদিন তওবা কবূল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকি থাকবে। (বুখারী)

এ হিজরত সম্পর্কে বুখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেন ঃ

ان المراد بالهجرة الباقية هى هجر السيئات অর্থাৎ স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে। (মিরকাত, প্রথম খণ্ড)

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দু' অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) ধর্মের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা ; যেমন সাহাবায়ে কিরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা।

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ الخبيث لا حاجة لنا بهم অর্থাৎ এরা দুরাচারী জাতি। আমাদের তাদের প্রয়োজন নেই। (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

১. হিজরত সম্পর্কিত আলোচনার জন্য সূরা নিসার ১০০তম আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য।

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا

وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

(৯২) মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে ; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং খুনের বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদের ; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে খুনের বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহ্র কাছ থেকে গোনাহ্ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৩) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন ঈমানদারের উচিত নয় যে, কোন মু'মিনকে (প্রথমত) হত্যা করে ; কিন্তু ভ্রমবশত (হয়ে গেলে তা ভিন্ন কথা) এবং যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে ভ্রমবশত হত্যা করে, তার উপর (শরীয়তের আইনে) একজন মুসলমান ক্রীতদাস কিংবা দাসীকে মুক্ত করা (ওয়াজিব) এবং রক্ত-বিনিময় (-ও ওয়াজিব), যা তার (নিহত ব্যক্তির) স্বজনদেরকে (অর্থাৎ যারা ওয়ারিস, তাদেরকে ওয়ারিসীর অংশ অনুযায়ী) সমর্পণ করবে। (যার কোন ওয়ারিস নেই ; তার রক্ত-বিনিময় সরকারী ধনাগারে জমা হবে।) তবে যদি তারা (এ রক্ত-বিনিময়) ক্ষমা করে দেয় (সম্পূর্ণ ক্ষমা করুক কিংবা আংশিক—যতটুকু ক্ষমা করবে, ততটুকুই ক্ষমা হবে।) এবং যদি সে (ভ্রমবশত নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রুসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। (অর্থাৎ দারুল-হরবের বাসিন্দা এবং কোন কারণে তাদের মধ্যে বসবাসকারী হয়) এবং সে নিজে বিশ্বাসী হয়, তবে (শুধু) একজন মুসলমান ক্রীতদাস ও বাঁদী মুক্ত করা জরুরী হবে। (রক্ত বিনিময় দিতে হবে না। এ ক্ষেত্রে রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব না হওয়ার কারণ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা মুসলমান হলে তারা ইসলামী সরকারের অধীনে বসবাস না করার কারণে রক্ত-বিনিময়ের হকদার নয়।

পক্ষান্তরে ওয়ারিসরা কাফির হলে রক্ত-বিনিময় সরকারী ধনাগারের প্রাপ্য হতো। কিন্তু কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি দারুল-হরব থেকে দারুল-ইসলামের ধনাগারে স্থানান্তর করা হয় না।) আর যদি সে (ভুলবশত নিহত ব্যক্তি) এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (শান্তির কিংবা যিম্মী হওয়ার) চুক্তি আছে, (অর্থাৎ সে যদি যিম্মী কিংবা শান্তি চুক্তিবদ্ধ ও অভয় প্রাপ্ত হয়।) তবে তার রক্ত-বিনিময় (-ও ওয়াজিব), যা তার (নিহতের) স্বজনদেরকে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ওয়ারিস, তাদেরকে) সমর্পণ করা হবে। (কেননা, কাফির কাফিরের ওয়ারিস হয়—) এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস কিংবা বাঁদী মুক্ত করা (জরুরী হবে)। অতঃপর (যে ক্ষেত্রে ক্রীতদাস কিংবা বাঁদী মুক্ত করা ওয়াজিব।) যে ব্যক্তি (ক্রীতদাস কিংবা বাঁদী) না পায় (এবং ক্রয় করার ক্ষমতাও না থাকে) তবে (তার দায়িত্বমুক্ত করার পরিবর্তে) একাদিক্রমে (অর্থাৎ উপর্যুপরি) দুই মাস রোযা রাখবে। (এ দাসমুক্তি এবং তা সম্ভব না হলে ক্রমাগত ২ মাসের রোযা রাখা) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তওবা হিসাবে (অর্থাৎ এ পন্থা আইনসিদ্ধ হয়েছে)। এবং আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপযোগিতা অনুসারে বিধান নির্ধারণ করেছেন ; যদিও সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে বান্দার জানা নেই।) আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার (আসল) শাস্তি (তো) জাহান্নাম, (অর্থাৎ জাহান্নামে এভাবে থাকা যে,) চিরকাল তথায় বাস করবে (কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় এ আসল শাস্তি কার্যকরী হবে না; বরং ঈমানের কল্যাণে অবশেষে মুক্তি পাবে) এবং তার প্রতি (নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত) আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে স্বীয় (বিশেষ) রহমত থেকে দূরে রাখবেন এবং তার জন্য বিরাট শাস্তি (অর্থাৎ দোযখের শাস্তি) প্রস্তুত করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। প্রাথমিক হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিম্মী, না হয় চুক্তিবদ্ধ অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফির হবে! এ চার অবস্থার কোন-না-কোন একটি হবেই। হত্যা দুই প্রকার ঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশত। অতএব, মোট প্রকার হলো আটটি ঃ এক. মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, দুই. মুসলমানকে ভ্রমবশত হত্যা, তিন. যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, চার. যিম্মীকে ভ্রমবশত হত্যা, পাঁচ. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, ছয়. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশত হত্যা, সাত. হরবী কাফিরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং আট. হরবী কাফিরকে ভ্রমবশত হত্যা।

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ কিসাস ওয়াজেব হওয়া সম্পর্কে সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াতে وَمَنْ يَقْتُلْ -এ বর্ণিত হবে। দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ থেকে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান দারে-কুত্‌নীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যিম্মী হত্যার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানের কাছ থেকে কিসাস নিয়েছেন। (তাখরীজে-হেদায়া) চতুর্থ প্রকার وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ আয়াতে উল্লিখিত হবে।

পঞ্চম প্রকারের বিধান পূর্ববর্তী রুকূর فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, ميثاق তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মী ও অভয়প্রাপ্ত উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। দুর্‌রে-মুখতার গ্রন্থের 'দিয়্যাত' অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত কাফিরের রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাস'আলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাস'আলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল-হরবের কাফিরদের ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করা হয়। অতএব, ভ্রমবশত হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে। (বয়ানুল-কোরআন)

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান ঃ প্রথম প্রকার عمد অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই ঃ বাহ্যত ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মত ; যথা ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার شبه عمد অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই ঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা. কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্দারা অঙ্গছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার خَطَاءٌ অর্থাৎ ভ্রমবশত হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের কাফির মনে করে গুলী করা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া ; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো ভ্রমবশত হত্যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময় ভিন্ন প্রকার। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পঁচিশটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্ বেশি এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে। (হেদায়া) ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজিব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকার হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হলো, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহ্‌র দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

০ রক্ত-বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। (হেদায়া)

০ মুসলমান ও যিম্মীর রক্ত-বিনিময় সমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ دية كل ذى عهد فى عهده الف دينار (হেদায়া, আবূ দাঊদ)

০ কাফ্ফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজিব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয় ? তারা তো নিরপরাধ! এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃংখল কাজকর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।

০ কাফ্ফারায় বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। رقبة শব্দে উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।

০ নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কোন ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সেই পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে ; সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।

০ যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই, তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল-মাল তথা সরকারী ধনাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।—(বয়ানুল-কোরআন)

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিম্মী অথবা অভয়প্রাপ্ত)-এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হয়, বাহ্যত তা তখনই হয়, যখন যিম্মী কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা, না থাকারই শামিল—এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিম্মী হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিম্মী বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। (দুররে মুখতার) নিহত ব্যক্তি যিম্মী না হলে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না।—(বয়ানুল-কোরআন)

০ কাফ্ফারার রোযায় যদি রোগ-ব্যাধির কারণে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হয় তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোযা ভাঙতে হয় তাতে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হবে না।

০ ওযরবশত রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।

০ ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই—তওবা করা উচিত।—(বয়ানুল কোরআন)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ
إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ
كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ

الْمُجٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ عَلَى الْقٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ

وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

(৯৪) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমাদের পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত আল্লাহ্র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন। (৯৫) গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান—যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে—সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। (৯৬) এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে (জিহাদের জন্য) সফর কর, তখন প্রত্যেকটি কাজ (হত্যা কিংবা অন্য কিছু) খুব যাচাই করে করবে এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে আনুগত্য (অর্থাৎ আনুগত্যের লক্ষণ) প্রকাশ করে, (যেমন, কলেমা পাঠ করে অথবা মুসলমানদের নিয়মে সালাম করে) তাকে বলো না যে, তুমি (আন্তরিকভাবে) মুসলমান নও (শুধু জীবন রক্ষার জন্যই মিছামিছি ইসলাম জাহির করছ)। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করছ। বস্তুত আল্লাহ্র কাছে (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও সামর্থ্যের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আছে (যা তোমরা বৈধ পন্থায় লাভ করবে। মনে রেখ) পূর্বে (এক সময়) তোমরাও এমনি ছিলে (তোমাদের ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা একমাত্র তোমাদের দাবির উপরই নির্ভরশীল ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (অর্থাৎ বাহ্যিক ইসমালকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং আন্তরিক বিষয় অনুসন্ধানের উপর ইসলামকে নির্ভরশীল রাখা

হয়নি) অতএব (কিছু) চিন্তা (তো) কর! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন (যে, এ নির্দেশের পর কে তা পালন করে এবং কে করে না। যে মুসলমান বিনা ওযরে জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় জানমাল দ্বারা (অর্থাৎ মাল ব্যয় করে এবং জানকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করে) জিহাদ করে, তারা সমান নয় ; (বরং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পদমর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছেন, যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, ঐসব লোকের চাইতে, যারা ঘরে বসে থাকে। অবশ্য (ফরযে-আইন না হওয়ার কারণে গৃহে উপবিষ্টদেরও গুনাহ নেই' বরং ঈমান ও অন্যান্য ফরযে আইন পালন করার কারণে) সবার সাথে (অর্থাৎ জিহাদকারীদের সাথেও এবং উপবিষ্টদের সাথেও) আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম গৃহের (অর্থাৎ পরকালে জান্নাতের) ওয়াদা করেছেন। (জিহাদকারীদের পদমর্যাদা বেশি'—পূর্বোল্লিখিত এ কথার তাৎপর্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (পূর্বোল্লিখিত) জিহাদকারীদের উপবিষ্টদের তুলনায় মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন। (সে পদমর্যাদা হচ্ছে মহান প্রতিদান। এখন এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে) অর্থাৎ (মুজাহিদকৃত অনেক কাজকর্মের কারণে সওয়াবের) অনেক মর্যাদা, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাবে এবং (পাপের) ক্ষমা ও করুণা—(এগুলো হচ্ছে পদমর্যাদার বিবরণ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঈমানদার ব্যক্তির হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হচ্ছে যে, শরীয়তের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ইসলামই বিশ্বাসী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যে কেউ ইসলাম প্রকাশ করে, তাকে হত্যা করা থেকে নিবৃত থাকা ওয়াজিব। শুধু সন্দেহবশত আন্তরিক অবস্থা যাচাই করা এবং ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণের অপেক্ষা করা বৈধ নয়। উদাহরণত কয়েকটি যুদ্ধে কোন কোন সাহাবী থেকে এ জাতীয় ভুল সংঘটিত হয়েছে। মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী ইসলামী লক্ষণাদিকে মিথ্যা মনে করে পরিচয়দানকারীকে হত্যা করেছেন এবং তার অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা এ ভ্রান্ত পদ্ধতির দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সাহাবীরা তখন পর্যন্ত এ মাসআলাটি পরিষ্কাররূপে জানতেন না। তাই শুধু আদেশদানকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং এ কর্মের জন্য তাদের প্রতি কোনরূপ শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়নি। —(বয়ানুল-কোরআন)

মুসলমান মনে করার জন্য ইসলামী লক্ষণাদিই যথেষ্ট ঃ উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

তিরমিযী ও মসনদে-আহমদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলায়মের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ

সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যত অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলমান। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলেন যে, সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তারা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদকে যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিও না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রেওয়ায়েতটি বুখারী সংক্ষেপে এবং বায্‌যার বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদও ছিলেন। মুজাহিদ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে প্রতিপক্ষের সবাই পলায়ন করল। শুধু এক ব্যক্তি থেকে গেল। তার কাছে অনেক ধন-সম্পদ ছিল। সে মুজাহিদ দলকে দেখে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ করল। কিন্তু হযরত মিকদাদ মনে করলেন, সে প্রাণ ও ধন-সম্পদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কালেমা পাঠ করছে। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করলেন। অপর একজন মুজাহিদ বললেন ঃ আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্যায় করেছেন। মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি মিকদাদকে ডেকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবে, তখন তুমি কি জওয়াব দেবে ? এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দু'টি ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে।

اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ এতে سلام শব্দ দ্বারা পারিভাষিক 'সালাম' বোঝানো হলে প্রথমোক্ত ঘটনাটি আয়াতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল হয়। পক্ষান্তরে سلام-এর শাব্দিক অর্থ শান্তি ও আনুগত্য নেওয়া হলে সব ঘটনার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে সালামের অর্থ করেছেন আনুগত্য।

ঘটনা তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয় ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে ঃ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا —অর্থাৎ তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সফরে সংঘটিত হয়েছিল

বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণত সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণত জানা থাকে। নতুবা আসল নির্দেশটি ব্যাপক ; অর্থাৎ সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ভেবে-চিন্তে কাজ করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। (বাহরে মুহীত)

জাগতিক ধন-সম্পদ তথা গনীমতের মাল অর্জনের কল্পনা মুসলমানদের উপরোক্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয়ত تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বাক্যে এ রোগেরই প্রতিকার করা হয়েছে। এরপর আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ অনেক ধন-সম্পদ অবধারিত করে রেখেছেন। অতএব, তোমরা ধন-সম্পদের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ো না। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হয়েছে, তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, তোমাদের অনেকেই পূর্বে মক্কায় স্বীয় ঈমান ও ইসলাম প্রকাশ করতে পারতে না। এরপর আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক তোমাদের কাফিরদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ফলে তোমরা ইসলাম প্রকাশ করতে পেরেছ। অতএব, এটা কি সম্ভব নয় যে, মুসলিম যোদ্ধাদের দেখে যে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে, সে পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিল, কিন্তু কাফিরদের ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করতে পারছিল না; এখন ইসলামী বাহিনী দেখে ইসলাম প্রকাশ করেছে ? অথবা শুরুতে যখন তোমরা কলেমা পাঠ করে নিজেকে মুসলমান বলেছিলে, তখন তো শরীয়ত এ নির্দেশ দেয়নি যে, তোমাদের অন্তরের অবস্থা খুঁজে দেখতে হবে, অন্তরে ইসলামের প্রমাণ পাওয়া গেলেই তোমাদের মুসলমান সাব্যস্ত করা হবে। বরং তখন কলেমা পাঠ করাকেই তোমাদের মুসলমান সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে কলেমা পাঠ করে, তাকে মুসলমান মনে কর।

কিবলার অনুসারীকে কাফির না বলার তাৎপর্য ঃ এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কলেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা নামায, আযান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলমানের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রকাশ করেছে, এ কথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।

এ ছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরোক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে কর, সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফিরের মত ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই। এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ لانكفر اهل القبلة بذنب — অর্থাৎ আমরা কেবলার অনুসারীকে কোন পাপকার্যের কারণে কাফির সাব্যস্ত করি না। কোন কোন হাদীসেও এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহ্‌গার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফির বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফির বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কলেমা ও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফিরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে ; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফির আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের تَبَيَّنُوا শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদী ও খৃস্টান সবাই নিজেকে মু'মিন-মুসলমান বলত। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কলেমার স্বীকারোক্তিই নয় ইসলামী বৈশিষ্ট্য, যথা নামায, আযান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্-ও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবি করত, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্ম-ত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে-কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হলো এই যে, প্রত্যেক কলেমা উচ্চারণকারী কিবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে তা খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই। অন্তরের বিষয় আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান-বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুর্তাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান-বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ নেই।

এতে আরও জানা গেল যে, 'কলেমা উচ্চারণকারী' ও 'কিবলার অনুসারী' এগুলো পারিভাষিক শব্দ। এগুলোর অর্থ ঐ ব্যক্তি, যে ইসলাম দাবি করার পর কোন কাফিরসুলভ কথা ও কাজে লিপ্ত হয়নি।

জিহাদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান ঃ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ —দ্বিতীয় এ আয়াতে জিহাদের কতিপয় বিধান বর্ণিত হয়েছে। যারা কোনরূপ ওযর ব্যতিরেকে জিহাদে অংশগ্রহণ করে না, তারা সেসব লোকের সমান হতে পারে না, যারা আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদদের অমুজাহিদদের উপর পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদ ও অমুজাহিদ--উভয় পক্ষের কাছে উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। জান্নাত ও মাগফিরাত উভয় পক্ষই লাভ করবে। তবে পদমর্যাদার পার্থক্য থাকবে।

তফসীরবিদরা বলেন ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সাধারণ অবস্থায় জিহাদ করা ফরযে-কিফায়া। কিছু লোক এ ফরয আদায় করলে অবশিষ্ট সমস্ত মুসলমান দায়িত্বমুক্ত হয়ে

যায়। তবে শর্ত এই যে, যারা জিহাদে লিপ্ত আছে, তারা সে জিহাদের জন্য যথেষ্ট হতে হবে। যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর তাদের সাহায্য করা ফরযে-আইন হয়ে যাবে।

ফরযে-কিফায়ার সংজ্ঞা ঃ শরীয়তের পরিভাষায় এমন ফরযকে ফরযে-কিফায়া বলা হয়, যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী নয় ; বরং কিছু মুসলমান আদায় করলেই যথেষ্ট। সাধারণত জাতীয় ও সংঘবদ্ধ কর্তব্যসমূহ এ পর্যায়ভুক্ত। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাদান ও প্রচার এমনি একটি ফরয। কিছু সংখ্যক মুসলমান এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে এবং তারা যথেষ্ট বিবেচিত হলে অন্যান্য মুসলমান দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আত্মনিয়োগ না করলে সবাই গোনাহ্গার হবে।

জানাযা এবং কাফন পরানোও একটি জাতীয় দায়িত্ব। এতে এক ভাই অপর মুসলমান ভাইয়ের হক আদায় করে। মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করা এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ করাও ফরযে-কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। কিছু সংখ্যক লোক এসব কাজে আত্মনিয়োগ করলে অবশিষ্টরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

সাধারণত যেসব বিধান দলীয় ও জাতীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত, শরীয়ত সেগুলোকে ফরযে-কিফায়াই সাব্যস্ত করেছে—যাতে কর্ম বন্টন পদ্ধতিতে সকল কর্তব্য সমাধা হতে পারে। কিছু লোক জিহাদের কর্তব্য পালন করবে, কিছু শিক্ষা ও প্রচার কাজ করবে এবং কিছু অন্যান্য ইসলামী ও মানবিক প্রয়োজনাদি সম্পাদন করবে।

আয়াতে كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলে যারা জিহাদ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকে, তাদেরকেও আশ্বস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ বিধান সাধারণ অবস্থার জন্য ; যখন কিছু সংখ্যক লোকের জিহাদ শত্রুদেরকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়। যদি তাদের জিহাদ যথেষ্ট না হয়, সাহায্যকারী সৈন্যের প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে-আইনে পরিণত হয়ে যায়। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর ফরযে-আইন হয়ে যায়। যদি তারাও যথেষ্ট না হয়, তবে অন্যান্য মুসলমান এমন কি, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে-আইন হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতেও শ্রেষ্ঠত্বের স্তর বর্ণিত হয়েছে, যা মুজাহিদরা অমুজাহিদদের উপর লাভ করেন।

খোঁড়া, পঙ্গু, অন্ধ, রোগী এবং যাদের শরীয়তসম্মত ওযর রয়েছে, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ

كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ

اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۚ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَسَآءَتْ
مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى
اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۚ
وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

(৯৭) যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলে ঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে ? অতএব এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (৯৯) অতএব আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই ফেরেশতারা এমন লোকদের প্রাণ হরণ করেন, যারা (হিজরতের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত বর্জন করে) নিজেদেরকে গোনাহ্‌গার করেছিল। (তখন) তারা (ফেরেশতারা) তাদেরকে বলে ঃ তোমরা (ধর্মের) কি (কি) কাজে (নিয়োজিত) ছিলে ? (অর্থাৎ ধর্মের কি কি জরুরী কাজ করছিলে ?) তারা (উত্তরে) বলে ঃ আমরা নিজেদের (বসবাসের) দেশে কেবল পরাভূত ছিলাম। (তাই ধর্মের অনেক জরুরী কাজ করতে পারতাম না। অর্থাৎ এসব ফরয কার্য না করার ব্যাপারে আমরা ক্ষমার যোগ্য ছিলাম।) তারা (ফেরেশতারা) বলে ঃ (যদি এখানে

করতে না পারতে, তবে) আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না ? তোমাদের দেশত্যাগ করে সেখানে (অর্থাৎ অন্য অংশে) চলে যাওয়া উচিত ছিল (সেখানে পৌঁছে ফরয কাজ করতে পারতে। এতে তারা নিরুত্তর হয়ে যাবে এবং তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে)। অতএব, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং সেটা নিকৃষ্ট স্থান ! কিন্তু যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু (বাস্তবপক্ষে হিজরত করতেও) সক্ষম নয়--তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না--তাদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। আর (যাদের জন্য হিজরত আইনসিদ্ধ, তাদের মধ্য থেকে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ ধর্মের জন্য) হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে চলাফেরার অনেক প্রশস্ত স্থান পাবে এবং (ধর্ম প্রকাশ করার) অনেক অবকাশ পাবে। (অতএব, এমন স্থানে পৌঁছে গেলে দুনিয়াতেও এ সফরের সাফল্য সুস্পষ্ট) আর (ঘটনাক্রমে যদি এ সাফল্য অর্জিত নাও হয়, তবু পরকালের সাফল্যে তো কোন সন্দেহ নেই। কেননা, আমার আইন এই যে,) যে ব্যক্তি গৃহ থেকে এ নিয়তে বের হয় যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের (ধর্ম প্রকাশ করতে পারার মত স্থানের) দিকে হিজরত করবে ; অতঃপর (লক্ষ্য অর্জনের পূর্বে) যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবুও তার সওয়াব (যা হিজরতের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে) সাব্যস্ত হয়ে যায়, (ওয়াদার কারণে তা যেন) আল্লাহ্‌র যিম্মায় (এ সফরকে যদিও তখন হিজরত বলা যায় না; কিন্তু শুধু উত্তম নিয়তের কারণে শুরু করতেই পূর্ণ প্রতিদান দান করা হয়) এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (এ অসম্পূর্ণ হিজরতের বরকতে অনেক গোনাহ্‌ও মাফ করবেন। যেমন, হাদীসে হিজরতের ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, হিজরতের কারণে পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তিনি) যথেষ্ট করুণাময় (ভাল নিয়তে কাজ আরম্ভ করতেই পূর্ণ কাজের সমান সওয়াব দান করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হিজরতের সংজ্ঞা ঃ আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি- বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে 'হিজরত' শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অসন্তুষ্টচিত্তে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত। —(রূহুল মা'আনী)

মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাতের শরায় বলেন ঃ ধর্মীয় কারণে কোন দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।—(মিরকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃঃ)

মুহাজির সাহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের কাফিররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

এ সংজ্ঞা থেকে জানা গেল, যেসব মুসলমান ভারতীয় 'দারুল-কুফরের' প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে অথবা অমুসলমানরা যাদেরকে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তারা সবাই শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির।

তবে যারা বাণিজ্যিক উন্নতি কিংবা চাকরির সুযোগ-সুবিধা লাভের নিয়তে দেশান্তরিত হয়েছে, তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিত্যাগ করে, সে মুহাজির।

অতএব এ হাদীসেরই প্রথম বাক্য থেকে এর মর্ম ফুটে ওঠে। বলা হয়েছে ঃ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده —অর্থাৎ যার মুখ ও হাতের কষ্ট থেকে সব মুসলমান নিরাপদ থাকে, সে মুসলমান।

এর উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপরকে কষ্ট দেয় না, সে-ই সাচ্চা ও পাক্কা মুসলমান। এমনিভাবে সাচ্চা ও সফল মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে শুধু দেশত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং শরীয়ত যেসব বিষয়কে হারাম ও অবৈধ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করে।

অর্থাৎ ইহরামের পোশাকের সাথে সাথে অন্তরও পরিবর্তন কর।

اپنے دل کو بھی بدل جامہ احرام کیسا تھ

হিজরতের ফযীলত ঃ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কোরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কোরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এক. হিজরতের ফযীলত দুই. হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং তিন. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

প্রথম বিষয়বস্তু হিজরতের ফযীলত সম্পর্কিত সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত—সূরা তওবায় আছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ،

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত—আলোচ্য সূরা নিসার ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে সর্প-দংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোট কথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহ দান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الهجرة تهدم ماكان قبلها। অর্থাৎ হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহ্কে নিঃশেষিত করে দেয়।

হিজরতের বরকত ঃ বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ، لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র জন্য হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝত!

সূরা নিসার উল্লিখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।

আয়াতে বর্ণিত مُـرَاغَمْ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مراغما বলে দেওয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য হিজরত করে, আল্লাহ্ তার জন্য দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের সওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

'উত্তম অবস্থানের' ব্যাখ্যা মুজাহিদ (র)-এর মতে হালাল রিযিক। হাসান বসরী (র)-এর মতে উত্তম গৃহ এবং অন্যান্য তফসীরবিদের মতে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য ও মর্যাদা লাভ। সত্যি বলতে কি, সবগুলো ব্যাখ্যাই আয়াতের মর্মভুক্ত। বিশ্ব-ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই কেউ আল্লাহ্র জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, আল্লাহ্ তাকে স্বদেশের অবস্থান অপেক্ষা উত্তম অবস্থান, স্বদেশের সম্মানের চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং স্বদেশের সুখের চাইতে উৎকৃষ্ট সুখ দান করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করলে আল্লাহ্ তাঁকে উপরোক্ত সব কিছুই দান করেন। হযরত মূসা (আ) ও বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্র জন্য মাতৃভূমি মিসর পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ তাঁকে আরও উত্তম দেশ সিরিয়া দান করেন এবং অবশেষে মিসরও তাঁরা লাভ করেন। আমাদের নয়নমণি শেষ নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহ্ ও

রাসূলের জন্য মক্কা ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁরা মক্কার চাইতে উত্তম ঠিকানা মদীনা প্রাপ্ত হন এবং সর্বপ্রকার মানসম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেন। হিজরতের প্রথম ভাগে ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট ধর্তব্য নয়। এ অন্তর্বর্তী দিনগুলোর পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁরা যে অগনিত নিয়ামত লাভ করেন এবং কয়েক পুরুষ পর্যন্ত যা অব্যাহত থাকে তাই ধর্তব্য হবে।

সাহাবায়ে-কিরামের দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্টতার যেসব ঘটনা ইতিহাসে খ্যাত সেগুলো সাধারণত হিজরতের প্রথম ভাগের অথবা এসব ঘটনা ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের। তাঁরা পার্থিব ধন-দৌলত পছন্দ করেননি। যা অর্জিত হয়েছিল তা তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেন। যেমন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের অবস্থাও তাই ছিল। তাঁর দারিদ্র্য ও অনাহার নিছক ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল। তিনি ধনাঢ্যতা অবলম্বন করেননি। এতদসত্ত্বেও ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর তাঁর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। খুলাফায়ে-রাশেদীনের অবস্থাও তদ্রূপই ছিল। মদীনায় পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে সবকিছু দান করেছিলেন। কিন্তু ইসলামী প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) গৃহের যথাসর্বস্ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করে দেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) যা ভাতা পেতেন তা ফকির-মিসকীনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিজে ফকিরের মত জীবন-যাপন করতেন। এ কারণেই তিনি 'উম্মুলমাসাকীন' তথা 'মিসকীনদের-জননী' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও যারা বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পত্তি রেখে জান, তাঁদের সংখ্যাও সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে কম ছিল না। অনেক সাহাবী স্বদেশ মক্কায় দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলেন। হিজরতের পর আল্লাহ্ তাঁদেরকে অনেক ধন-সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এক প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর অত্যন্ত উপভোগ্য ভঙ্গিতে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের চিত্র অঙ্কন করতেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে করে বলতেন ঃ তুমি তো ঐ আবূ হুরায়রাই, যে অমুক গোত্রের বিনা বেতনের চাকর ছিলে। তারা সফরে গেলে পায়ে হেঁটে তাদের সাথে চলা ছিল তোমার কাজ। তারা কোন মনযিলে অবতরণ করলে তুমি তাদের জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনতে। আজ ইসলামের দৌলতে তুমি কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছ। তোমাকে ইমাম ও 'আমিরুল-মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করা হয়।

মোট কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে মুহাজিরদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ অর্থাৎ হিজরত আল্লাহ্‌র পথে হওয়া উচিত। হিজরতে যেন পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় না হয়। বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্যই হয় অর্থাৎ এটি বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময় ঐ বস্তুই, যার জন্য সে হিজরত করে।"

আজকাল কিছু সংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তর্বর্তীকালে অবস্থান করছে অর্থাৎ হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পারবে।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ
كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿১০১﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضٰى
أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا ﴿১০২﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَقُعُودًا
وَعَلٰى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَوْقُوتًا ﴿১০৩﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ
الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿১০৪﴾

(১০১) যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে কাফিররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফিররা চায় যে, তোমরা কোনরূপ অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (১০৪) তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহ্র কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তোমরা দেশের বুকে সফর কর (এবং তার দূরত্বের পরিমাণ হয় তিন মনযিল) তখন এ ব্যাপারে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না (বরং জরুরী হবে) যে, (তোমরা যোহর, আসর ও এশার ফরয) নামায (এর রাকআতসমূহ)-কে সংক্ষেপ করে দেবে (অর্থাৎ চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত পড়বে,) যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে (এবং এ আশংকায় এক জায়গায় বেশিক্ষণ অবস্থান করা অসমীচীন মনে করা হয়। কেননা,) কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এবং যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন (এমনিভাবে আপনার অবর্তমানে যখন ইমাম তাদের মধ্যে থাকবে) অতঃপর আপনি তাদেরকে নামায পড়াতে চান, (আশংকা থাকে যে, সবাই একত্রে নামাযে রত হলে শত্রুরা সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করে বসবে) তখন (এমতাবস্থায়) যেন (গোটা দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর) তাদের একভাগ আপনার সাথে (নামাযে) দণ্ডায়মান হয় (এবং অপর ভাগ পাহারা দেওয়ার জন্য শত্রুদের বিপরীতে দণ্ডায়মান থাকে, যাতে শত্রুদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে পারে) এবং তারা (যারা আপনার সাথে নামাযরত, অল্প-স্বল্প) হাতিয়ার নিয়ে নেয় (অর্থাৎ নামাযের পূর্বে হাতিয়ার নিয়ে সঙ্গে রাখে, যাতে সংঘর্ষে প্রয়োজন দেখা দিলে অস্ত্র ধারণ করতে বিলম্ব না ঘটে। তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে যদিও সংঘর্ষের কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু গোনাহ্ হবে না।) অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে (অর্থাৎ এক রাক'আত পূর্ণ

করে নেয়) তখন তারা (পাহারা দেওয়ার জন্য) যেন তোমাদের পিছনে চলে যায় (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ও অন্য দলের, যারা এখন নামাযে শামিল হবে পরে তাদের বর্ণনা আসছে এ প্রথম ভাগ যেন তাদের সবার পেছনে চলে যায়) এবং অপর ভাগ যারা এখনও নামায পড়েনি (অর্থাৎ শুরুও করেনি, তারা প্রথম ভাগের জায়গায় ইমামের কাছে) যেন আসে এবং আপনার সাথে নামায (এর অবশিষ্ট এক রাকআত) পড়ে নেয় এবং তারাও যেন আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও স্ব স্ব অস্ত্র নিয়ে নেয়। (সরঞ্জাম ও অস্ত্র সঙ্গে নেওয়ার নির্দেশ দানের কারণ এই যে) কাফিররা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম থেকে (সামান্য) অসতর্ক হয়ে গেলে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে (সুতরাং এমত পরিস্থিতিতে সাবধানতা অপরিহার্য)। এবং যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের (অস্ত্র নিয়ে চলতে) কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও (এ কারণে অস্ত্রসজ্জিত হতে না পার) তবে এ ব্যাপারে (ও) কোন গোনাহ্ নেই যে, অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং (এর পরও) স্বীয় আত্মরক্ষার অস্ত্র (অবশ্যই) নিয়ে নাও। (এরূপ ধারণা করো না যে, কাফিরদের শত্রুতার প্রতিকার শুধু ইহকালেই করা হয়েছে বরং পরকালে এর প্রতিকার আরও বেশি হবে। কেননা,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অনন্তর যখন তোমরা (খওফের অর্থাৎ আতঙ্কজনক অবস্থায়) নামায সম্পন্ন কর, তখন (নিয়মিত) আল্লাহ্র স্মরণে লেগে যাও দণ্ডায়মান অবস্থায়ও, উপবিষ্ট অবস্থায়ও এবং শায়িত অবস্থায়ও (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। এমন কি যুদ্ধরত অবস্থায়ও আল্লাহ্র স্মরণ অব্যাহত রাখ অন্তর দ্বারাও এবং আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করেও। বিধান অনুসরণ করাও স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধে শরীয়তবিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত থাক। মোটকথা, নামায শেষ হলেও স্মরণ শেষ হয় না। সফর কিংবা আতঙ্কাবস্থার কারণে নামায তো হালকা হয়ে যায় ; কিন্তু স্মরণ পূর্বাবস্থায়ই থাকে।) অতঃপর তোমরা যখন আশঙ্কামুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ সফর শেষ করে স্বগৃহে অবস্থানকারী হয়ে যাও, এমনিভাবে আতঙ্কাবস্থা দূর হওয়ার পর শঙ্কামুক্ত হয়ে যাও) তখন নামায (নির্ধারিত) নিয়মানুযায়ী পড়তে থাক। (অর্থাৎ 'কসর' এবং নামাযের অবস্থায় চলাফেরা পরিহার করে। কেননা, সাময়িক কারণে তা জায়েয করা হয়েছিল।) নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয এবং তার সময় সীমাবদ্ধ। (সুতরাং ফরয হওয়ার কারণে আদায় করা অপরিহার্য এবং সময় সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে সময়ের মধ্যেই আদায় করা জরুরী। এ কারণে এর আকার- আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে ; নতুবা আসল আকার-আকৃতিই নামাযের উদ্দিষ্ট আকার-আকৃতি। অতএব, কারণ দূর হয়ে যাওয়ার পর নামাযের আসল আকার-আকৃতি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।) এবং সেই সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে সাহস হারিও না (যখন এর প্রয়োজন হয়)। যদি তোমরা (যখমের কারণে) কষ্টে থাক তবে (তাতে কি হলো ?) তারাও তো জর্জরিত, যেমন তোমরা ব্যথায় জর্জরিত (সুতরাং তারা তোমাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী নয়। কাজেই ভয় কিসের ?) এবং (তোমাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয় এই যে,) তোমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে এমন বিষয়ের ভরসা রাখ যে, তারা (তার) ভরসা রাখে না। (অর্থাৎ সওয়াব। অতএব মনের শক্তিতে তোমরা বেশি এবং দৈহিক দুর্বলতায় তোমরা তাদের অনুরূপ। কাজেই তোমাদের কর্মঠ হওয়া উচিত) আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী, (কাফিররা যে দুর্বলমনা ও দুর্বলদেহ, তা তিনি জানেন), প্রজ্ঞাময়। (তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বিষয়ের কোন নির্দেশ দেননি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্বে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও হিজরতের জন্য সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ লঘুতা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

সফর ও কসরের বিধান ঃ তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামায পড়া হয়।

০ সফর শেষ করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর যদি সেখানে পনর দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনর দিন অথবা তদূর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা 'সাময়িক বাসস্থান' হিসাবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় স্থায়ী বাসস্থানের মতই কসর পড়তে হবে না—পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

০ কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বেতরের নামাযে কসর নেই।

০ পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধ হয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরীয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্ হয় না ; বরং সওয়াব পাওয়া যায়।

০ আয়াতে وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ বলা হয়েছে (অর্থাৎ আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন) এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল-খওফ'-এর বিধান নেই। কেননা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর এখন যিনি ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল-খওফ' পড়াবেন। সব ফিকহ্বিদের মতে সালাতুল-খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে—রহিত হয়নি।

০ মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশংকার কারণে 'সালাতুল-খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয় তাহলে তখনও 'সালাতুল-খওফ' পড়া জায়েয।

০ আয়াতে উভয় দলের এক এক রাক'আত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাক'আতের নিয়ম হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'রাক'আতের পর সালাম ফিরিয়েছেন (বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে দ্রষ্টব্য)।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا

تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿۱۰۵﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۰۶﴾

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝١٠٧ ۚ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ
مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝١٠٨ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ
عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝١٠٩ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ
يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝١١٠ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى
نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١١١ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ
يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝١١٢ ع وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ
اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝١١٣

(১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। (১০৬) এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৭) যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে, তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত এবং আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ্ সম্মত হন। তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন। (১০৯) শুনছ ? তোমরা তাদের পক্ষ

থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্র সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে ? (১১০) যে গোনাহ্ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। (১১১) যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১১২) যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ্ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ্। (১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্র করুণা অসীম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আপনার কাছে এ গ্রন্থ প্রেরণ করেছি, (যদ্দ্বারা) আপনি বাস্তব সত্য অনুযায়ী ঐ ফয়সালা করবেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) আপনাকে (প্রকৃত অবস্থা) বলে দিয়েছেন (ওহী এই যে, বাস্তবে বশীর চোর এবং তার সমর্থক বনী উবায়রাক গোত্র মিথ্যাবাদী)। এবং (যখন প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে গেছে, তখন) আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতিত্বের কথা বলবেন না। [যেমন বনী উবায়রাকের আসল বাসনা তাই ছিল। পরবর্তী রুকূতে একথা আসছে لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা করেননি। স্বয়ং এ বাক্য থেকেই তাঁর এ কাজ না করাও বোঝা যায়। কেননা এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র কৃপা আপনাকে এ ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছে। এতে বোঝা যায় যে, আপনার পক্ষ থেকে কোন ভ্রান্তি হয়নি। নিষেধ করা দ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, অতীতে এ কাজ হয়ে গেছে ; বরং নিষেধের আসল উপকারিতা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে ভবিষ্যতের জন্য তা করা থেকে বিরত রাখা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা এবং নিষেধাজ্ঞা উভয়টির সারমর্ম হবে এই যে, যেমন এ যাবত তিনি পক্ষপাতিত্ব করেননি, ভবিষ্যতেও করবেন না। এ ব্যবস্থা পয়গম্বরকে নিষ্পাপ রাখার জন্য। আয়াতে সবাইকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে। অথচ বিশ্বাসঘাতক সবাই ছিল না। তবে, যারা বিশ্বাসঘাতক ছিল না, তারাও বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য করছিল। কাজেই তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছে] এবং [মানুষের বলাবলির কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী উবায়রাককে ধর্মপ্রাণ মনে করেছিলেন। এরূপ মনে করা গোনাহ্ নয় ; কিন্তু তাঁর এতটুকু বলে দেওয়ার কারণে হকদারদের হক ছেড়ে দেওয়ার আশংকা ছিল। বাস্তবে তাই হয়েছে। হযরত রেফাআ (রা) দাবির ব্যাপারে চুপ হয়ে যান। কাজেই এ কাজটি অসমীচীন হয়েছে। এ জন্য এ থেকে] আপনি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন (কেননা, আপনার মর্যাদা মহান। এতটুকু বিষয়ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাযোগ্য) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় এবং আপনি তাদের পক্ষ

হয়ে কোন বিবাদ করবেন না (যেমন তারা তা কামনা করে) যারা (মানুষের বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষতি করে তারা পাপ ও শাস্তির দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে) নিজেদেরই ক্ষতি করছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক (যেমন অল্প বিশ্বাসঘাতককেও পছন্দ করেন না। এখানে বশীর যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক, তাই ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। তাই مبالغة -এর পদ ব্যবহার করা হয়েছে)। তারা (স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতাকে) মানুষের কাছ থেকে তো (লজ্জিত হয়ে) গোপন করে এবং আল্লাহ্র কাছে লজ্জিত হয় না, অথচ তিনি (প্রত্যেক সময়ের মত) তখন (ও) তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা আল্লাহ্র অপ্রিয় কথাবার্তায় সলাপরামর্শ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সব কাজকর্মকে নিজের (জ্ঞানমত) বেষ্টনীর মধ্যে রাখেন। (বশীর প্রমুখের সমর্থনে মহল্লার যারা যারা একত্রিত হয়ে এসেছিল, তারা নিছক যে,) তোমরা পার্থিব জীবনে তো তাদের পক্ষ থেকে বিবাদ করেছ। অতএব (বল যে,) কে আল্লাহ্র সামনে কিয়ামতের দিনও তাদের পক্ষ থেকে বিবাদ করবে ? অথবা কে ঐ ব্যক্তি, যে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে ? (অর্থাৎ কেউ মৌখিক বিতর্কও করতে পারবে না এবং কেউ মোকদ্দমা কার্যত ঠিকও করতে পারবে না)। এবং (এ বিশ্বাসঘাতকরা যদি এখনও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তওবা করে নিত, তবে ক্ষমা পেতে পারত। কেননা, আমার আইন এই যে,) যে ব্যক্তি কোন (সংক্রামক) দুষ্কর্ম করে অথবা (শুধু) স্বীয় জীবনের ক্ষতি করে (অর্থাৎ এমন গোনাহ্ করে না, যার প্রভাব অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে এবং) অতঃপর আল্লাহ্র কাছে (শরীয়তের নিয়মানুযায়ী) ক্ষমাপ্রার্থী হয়, (বান্দার প্রাপ্য পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়াও এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত) সে আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় (হিসেবে) পাবে এবং (গোনাহ্গারদের অবশ্যই এ জন্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা,) যে ব্যক্তি কিছু গোনাহ্র কাজ করে, বস্তুত সে নিজেরই জন্য করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী (সবার গোনাহ্ তিনি জানেন), প্রজ্ঞাময় (উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেন) এবং (এ হচ্ছে নিজে গোনাহ্ করার পরিণাম। আর যে অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার অবস্থা শোন,) যে ব্যক্তি কোন ছোট গোনাহ্ করে অথবা বড় গোনাহ্ অতঃপর (নিজে তওবা করার পরিবর্তে) তার (অর্থাৎ গোনাহ্র) অপবাদ কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে নিজের (মাথার) উপর জঘন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করে (যেমন, বশীর করেছে। নিজে চুরি করে জনৈক সৎ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করেছে) এবং যদি (এ মোকদ্দমায়) আপনার প্রতি (হে পয়গম্বর) আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, (যার ছায়াতলে আপনি সর্বদাই থাকেন), তবে (এ ধূর্ত লোকদের মধ্যে) একদল তো আপনাকে পথভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে ফেলেছিল (কিন্তু আল্লাহ্র কৃপায় আপনার উপর তাদের চাতুর্যপূর্ণ কথাবার্তার কোন প্রভাব পড়েনি এবং ভবিষ্যতেও পড়বে না। তাই আল্লাহ্ বলেন) এবং তারা (কখনও আপনাকে) পথভ্রান্ত করতে পারে না, কিন্তু (উপরোক্ত ইচ্ছা দ্বারা) নিজেদেরকে (গোনাহে লিপ্ত ও আযাবের যোগ্য করে নিচ্ছে)। এবং বিন্দুমাত্রও আপনার এ ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না। আর (ভুলক্রমে আপনার ক্ষতি করা কিরূপে সম্ভব যখন) আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি গ্রন্থ ও জ্ঞানের কথাবার্তা অবতীর্ণ করেছেন (যার এক অংশে এ ঘটনার সংবাদও দিয়েছেন) এবং আপনাকে এমন এমন (উপকারী ও উচ্চ) বিষয়াদি শিক্ষা

দিয়েছেন, যা আপনি (পূর্ব থেকে) জানতেন না। বস্তুত আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্বে প্রকাশ্য কাফিরদের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েক জায়গায় মুনাফিকদের সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। কেননা, কুফর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। আলোচ্য আয়াতসমূহেও কোন কোন মুনাফিকের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কিত ঘটনাবলী সম্পর্কে বর্ণিত হচ্ছে। (বয়ানুল-কোরআন)

আয়াতের শানে নযুল ঃ আলোচ্য সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কোরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় ; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য ব্যাপক। এ ছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

প্রথমে ঘটনাটি জেনে নিন। এরপর এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ও মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। ঘটনাটি এই ঃ মদীনায় বনী-উবায়রাক নামে একটি গোত্র বাস করত। তাদের এক ব্যক্তির নাম তিরমিযী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে বশীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বগভী ও ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতে তো'মা উল্লেখ করা হয়েছে। সে লোকটি একবার সাহাবী কাতাদাহ্ ইবনে নোমানের চাচা রেফাআ (রা)-এর গৃহে সিঁধ কেটে চুরি করে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, এ লোকটি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল। মদীনায় বসবাস করেও সে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে অবমাননাসূচক কবিতা রচনা করে অপরের নামে প্রচার করত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্য কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। হযরত রেফাআ (রা) এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিঁধ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআ ব্যাপার দেখে ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদাহ্র কাছে গেলেন এবং ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, অদ্য রাতে আমরা বনী উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবায়রাক নিজেরাই এসে হাযির হলো এবং বলল এটা লাবিদ ইবনে সহলের কাজ। আমরা তো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লাবিদ তরবারি কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

বনী-উবায়রাক আস্তে বলল ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয় না। আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনে জরীরের রেওয়ায়েতে এ স্থলে বলা হয়েছে যে, বনী-উবায়রাক জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশত তারা আটার বস্তা সামান্য ছিঁড়ে ফেলে। ফলে রেফাআর গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ বর্মও ইহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হলো। ইহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনে-উবায়রাক আমাকে লৌহ-বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত ও বগভীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না, তখন ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যা হোক এখন বিষয়টি বনী-উবায়রাক ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হযরত কাতাদাহ ও রেফাআর প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী-উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী-উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী-উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে রেফাআ ও কাতাদাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন, তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদীর। বনী-উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি, তিনি ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে কাতাদাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদাহ্ (রা) খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআ (রা)-কেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআও ধৈর্য ধারণ করলেন এবং বললেন ঃ والله المستعان। আল্লাহ্ সহায়।

বেশিদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কোরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকূ অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঘটনার বাস্তব রূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

কোরআন পাক বনী-উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে দিল এবং ইহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী-উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেফাআ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন। এদিকে বনী-উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে-উবায়রাক মদীনা

থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফিরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফিক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফির এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেরে তাকে বহিষ্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ পর্যন্ত ছিল ঘটনার বিবরণ ; এবার এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য শুনুন।

প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন ও ওহী এজন্য অবতরণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ্‌-প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ বনী-উবায়রাকের পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন গোনাহ্‌ ছিল না, কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই দ্বিতীয় আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পয়গম্বরগণের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তৃতীয় (অর্থাৎ ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকীদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে কোন বিতর্ক করবেন না। কেননা আল্লাহ্‌ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

চতুর্থ (অর্থাৎ ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় না, যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করছেন ; বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে রেফাআ ও কাতাদাহ্‌র বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাঁকে অনুরোধ কর তিনি যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সমর্থন করেন।

পঞ্চম (অর্থাৎ ১০৯) আয়াতে বনী-উবায়রাকের সমর্থকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে ; কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কিয়ামতে যখন আল্লাহ্‌র আদালতে মোকদ্দমার শুনানি হবে, তখন কে সমর্থন করবে ? এ আয়াতে তাদেরকে একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ (অর্থাৎ ১১০) আয়াতে কোরআন পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে যে, ছোট গোনাহ্‌ হোক বা বড় গোনাহ্‌, গোনাহ্‌গার ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতে করে উপরোক্ত গোনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনও সময় আছে ফিরে এস। খাঁটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ্‌ তা'আলা মাফ করবেন!

সপ্তম (অর্থাৎ ১১১) আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনও যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহ্র রাসূল কিংবা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না বরং এই পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অষ্টম (অর্থাৎ ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লাবিদ অথবা ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহ্র বোঝা নিজে বহন করে।

নবম (অর্থাৎ ১১৩) আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না ; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতরণ করেছেন, যা আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইজতিহাদ করার অধিকার ঃ اِنَّا اَنۡزَلۡنَا اِلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যেসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন পাকে কোন স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই, সেগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরী বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন।

(দুই) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

(তিন) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মত ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ফয়সালা করতেন, তাতে কোন ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোন হুঁশিয়ারি অবতীর্ণ না হতো, তবে তাতে প্রতিভাত হতো যে, ফয়সালাটি আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে।

(চার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন থেকে যা কিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ্ তা'আলারই বুঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলিম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বুঝেন সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে بِمَآ اَرٰىکَ اللّٰهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فَاحۡکُمۡ بِمَآ اَرٰىکَ اللّٰهُ (অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।) তখন তিনি তাকে শাসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর, অন্য কারও নয়।

(পাঁচ) মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা দাবির তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম।

তওবার তাৎপর্য ঃ ১১০তম আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ্ ও অসংক্রামক গোনাহ্, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্র হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্ই তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও ইস্তগফারের স্বরূপ জানা জরুরী। শুধু মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' ওয়া 'আতুবুইলাইহি' বলার নাম তওবা ও ইস্তিগফার নয়। তাই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেজন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে শুধু মুখে মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী ঃ (এক) অতীত গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ্ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহ্র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে দেওয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেওয়া তওবার অন্যতম শর্ত।

নিজের গোনাহ্র দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ ঃ ১১২তম আয়াতে অর্থাৎ ... ... وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْاِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ ... থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্কে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহ্র শাস্তি, দ্বিতীয়ত অপবাদের কঠোর শাস্তি।

কোরআন ও সুন্নাহ্র তাৎপর্য ঃ ... وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ বাক্যে 'কিতাব'-এর সাথে 'হিকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ ও শিক্ষার নাম যে হিকমত, তাও আল্লাহ্ তা'আলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহ্র শব্দাবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহ্ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব।

এ থেকে কোন কোন ফিকহ্বিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার ঃ (এক) متلو যা তিলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غير متلو যা তিলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কোরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ্। এর শব্দাবলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং মর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জীবের চাইতে বেশি ঃ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মত সর্বব্যাপী ছিল না ; যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। বরং আল্লাহ্ যতটুকু দান করতেন, তিনি

তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্ট জীবের জ্ঞানের চাইতে বহুগুণে বেশি।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

(১১৪) তাদের অধিকাংশ সলাপরামর্শ ভাল নয় ; কিন্তু যে সলাপরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কল্পে করত তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব। (১১৫) যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সাধারণ লোকদের অধিকাংশ সলাপরামর্শে মঙ্গল (অর্থাৎ সওয়াব ও বরকত) নেই ; কিন্তু যারা দান-খয়রাত কিংবা কোন সৎকাজের অথবা মানুষের পারস্পরিক সংশোধনের প্রতি উৎসাহ দান করে (এবং এ শিক্ষা ও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করার জন্য গোপনে সলাপরামর্শ করে অথবা নিজেই অপরকে দান-খয়রাতের প্রতি গোপনে উৎসাহিত করে। কেননা, মাঝে মাঝে গোপনে বলাই অধিকতর উপযোগী হয়ে থাকে। এরূপ লোকদের সলাপরামর্শে অবশ্য মঙ্গল অর্থাৎ সওয়াব ও বরকত রয়েছে) এবং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে (অর্থাৎ এসব কাজের প্রতি উৎসাহ দেবে) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য (নামযশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়) আমি অতি সত্বর তাকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করব এবং যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের (ধর্মীয়) পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুগামী হবে [যেমন বশীর ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে ; অথচ ইসলামের সত্যতা এবং এ চুরির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালার সত্যতা তার জানা ছিল ; তবুও দুর্ভাগ্য তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে] আমি তাকে (দুনিয়াতে) যা সে করতে চায়, তাই করতে দেব এবং (পরকালে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সেটা নিকৃষ্টতর জায়গা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পারস্পরিক সলাপরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা ঃ বলা হয়েছে ঃ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ অর্থাৎ মানুষের যেসব পারস্পরিক সলাপরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত এবং শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোন মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে ঃ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ এসব সলাপরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোন কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহ্‌র যিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সব কথাবার্তাই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوف এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তে প্রশংসিত এবং যা শরীয়তপন্থীদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে مُنْكَر ঐ কাজ, যা শরীয়তে অপছন্দনীয় এবং শরীয়তপন্থীদের কাছে অপরিচিত।

যে কোন সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহদান 'আমর বিল-মারূফের' অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতের সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেওয়া, পথভ্রান্তকে পথ বলে দেওয়া ইত্যাদি সৎকাজও 'আমর বিল-মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পরস্পরে শান্তি স্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহু লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এ ছাড়া এ দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যাপ্ত করে। (এক) সৃষ্ট জীবের উপকার করা, (দুই) মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্ট জীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজিব সদকা, যাকাত, নফল সদকা এবং যে কোন উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

সন্ধি স্থাপনের ফযীলত ঃ মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ দূর করা এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণী রয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ করব না, যা রোযা, নামায ও সদকার মধ্যে সর্বোত্তম? সাহাবীরা আরয করলেন ঃ অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন ঃ "এ কাজ হচ্ছে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন ঃ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ মুণ্ডনকারী বিষয়। অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ এ বিবাদ মাথা মুণ্ডন করে না, বরং মানুষের ধর্মকে মুণ্ডন করে দেয়।

আয়াতের শেষভাগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে যে, সদকা, সৎকাজে আদেশ দান এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন—এসব সৎকাজ তখনই ধর্তব্য ও গ্রহণীয় হতে পারে, যখন এগুলো খাঁটিভাবে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হবে—কোন আত্মস্বার্থ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উম্মতের ইজমা শরীয়তের দলীল ঃ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দু'টি বিষয় বিরাট অপরাধ এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঃ (এক) রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। এটা সুস্পষ্ট যে, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কুফর ও বিরাট গোনাহ্। (দুই) যে কাজে সব মুসলমান একমত, তা পরিত্যাগ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অবলম্বন করা। এতে বোঝা গেল যে, উম্মতের ইজমা একটি দলীল। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত বিধি-বিধান পালন করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি উম্মত যে বিষয়ে একমত হয়ে যায়, তা পালন করাও ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করা বিরাট গোনাহ্। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ يد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত ইমাম শাফেয়ীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ উম্মতের ঐকমত্য যে দলীল, এর প্রমাণ কোরআন পাকে আছে কি ? তিনি প্রমাণ জানার জন্য উপর্যুপরি তিনদিন কোরআন তিলাওয়াত করলেন। প্রত্যহ দিনে তিনবার এবং রাতে তিনবার সম্পূর্ণ খতম করতেন। অবশেষে আলোচ্য আয়াতটি তাঁর চিন্তায় জাগ্রত হয়। আলিমদের সামনে এ আয়াত বর্ণনা করলে সবাই স্বীকার করলেন যে, উম্মতের ইজমা দলীল হওয়ার জন্য এ প্রমাণ যথেষ্ট।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ

الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (১১৭) তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে, (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশগ্রহণ করব, (১১৯) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব ; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়। (১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয় (শাস্তি দিয়েও) ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করা হবে (বরং চিরস্থায়ী শাস্তিতে পতিত রাখবেন) এবং এ ছাড়া আর যত গোনাহ্ আছে (সগীরা হোক কিংবা কবীরা) যাকে ইচ্ছা, (শাস্তি ছাড়াই) ক্ষমা করবেন। (তবে মুশরিক মুসলমান হয়ে গেলে সে মুশরিকই থাকে না। কাজেই চিরস্থায়ীও থাকবে না।) এবং (শিরক ক্ষমা না করার কারণ এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে (কাউকে) শরীক করে, সে (সত্য বিষয় থেকে) অনেক দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সত্য বিষয় হচ্ছে তওহীদ। এটি যুক্তির দিক দিয়েও ওয়াজিব। প্রকৃত মালিক—মাওলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তওহীদের মৌলিক শিক্ষা। সুতরাং যে শিরক করে, সে মালিক ও স্রষ্টার অবমাননা করে। তাই এহেন কাজ শাস্তিযোগ্য হবে। অন্যান্য গোনাহ্ এরূপ নয়। সেগুলো পথভ্রষ্টতা ঠিক, কিন্তু তওহীদের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে দূরবর্তী নয়। তাই সেগুলোকে ক্ষমাযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকার কুফরও শিরকের মত ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, তাতেও স্রষ্টার উক্তিসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি থাকে। সুতরাং কাফির স্রষ্টার সততা গুণ অস্বীকার করে। কোন কোন কাফির স্বয়ং স্রষ্টার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে, কেউ কেউ কোন গুণকে অস্বীকার করে! আবার কেউ কেউ অস্তিত্ব ও গুণ উভয়টিকেই অস্বীকার করে। তন্মধ্যে যে-কোনটিই অস্বীকার করা হোক তা তওহীদকে অস্বীকার করার শামিল এবং তওহীদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার নামান্তর। সুতরাং কুফর ও শিরক উভয়টিই ক্ষমাযোগ্য নয়। এরপর মুশরিকদের ধর্মীয় পন্থায় তাদের নির্বুদ্ধিতা

বর্ণিত হচ্ছে যে,) এরা (মুশরিকরা) আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে (একে তো) শুধু কতিপয় নারী প্রতিমার আরাধনা করে এবং (এক) শুধু শয়তানের পূজা করে, যে (আল্লাহ্র) নির্দেশের বাইরে (এবং) যাকে (নির্দেশ অমান্য করার কারণে) আল্লাহ্ স্বীয় বিশেষ রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন এবং যে (বিশেষ রহমত থেকে দূরবর্তী হওয়ার সময়) বলেছিল ঃ (এতে তার শত্রুতা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল) আমি (পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা রাখি যে) অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটা অংশ স্বীয় আনুগত্যের জন্য গ্রহণ করব এবং (এ অংশের বিবরণ এই যে,) আমি তাদেরকে (ধর্মীয় বিশ্বাসে) পথভ্রান্ত করব এবং আমি তাদেরকে (কল্পনায়) বৃথা আশ্বাস প্রদান করব (যদ্দরুন তারা গোনাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং গোনাহের ক্ষতি দৃষ্টিতে থাকবে না) এবং আমি তাদেরকে (মন্দ কাজ করার) শিক্ষা দেব। ফলে তারা (প্রতিমাদের নামে) পশুর কর্ণ ছেদন করবে (এটা কুফরী কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত) এবং আমি তাদেরকে (আরও) শিক্ষা দেব। ফলে তারা আল্লাহ্র সৃজিত বস্তুসমূহের আকৃতি বিকৃত করবে (এটা পাপাচারভুক্ত কাজ। যেমন, দাড়ি মুণ্ডন করা, উল্কী করা ইত্যাদি) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য করে না) সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হবে (এ ক্ষতি হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া)। শয়তান যাদেরকে (ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে মিথ্যা) ওয়াদা দেয় (যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, হিসাব-কিতাবের ঝঞ্ঝাট কোথাও নেই—) এবং কল্পনায় তাদেরকে আশ্বাস দেয় (যে, অমুক গোনাহ্র মধ্যে এমন মজা আছে, অমুক হারাম পন্থায় এমন অর্থাগম হয়। শয়তানী কাজকর্মের অস্তিত্ব, অসারতা এবং ক্ষতি আপনা-আপনি প্রকাশমান) এবং শয়তান তাদের সাথে শুধু মিথ্যা (প্রতারণাপূর্ণ) ওয়াদা করে। (কেননা বাস্তবে হিসাব-কিতাব সত্য। শয়তানের আশ্বাস যে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়, তা প্রকাশ পেতে দেরি হয় না।) তাদের (যারা শয়তানের পথে চলে) বাসস্থান জাহান্নাম (এটিই প্রকাশ্য ক্ষতি) এবং এ (জাহান্নাম) থেকে কোথাও তারা নিষ্কৃতির স্থান পাবে না (যে, সেখানে আশ্রয় নেবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী জিহাদের আলোচনায় যদিও সব ইসলাম-বিরোধী সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অবস্থা বর্ণনায় এ পর্যন্ত ইহুদী ও মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে। বিরোধীদের মধ্যে একদল বরং সর্ববৃহৎ দল মুশরিকদের ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের ধর্মবিশ্বাসের নিন্দা ও শাস্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। এ স্থলে এ আলোচনাটি আরও বেশি উপযুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, পূর্ববর্ণিত চুরির ঘটনায় এ কথাও বলা হয়েছিল যে, সে চোরটি ছিল মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ব্যক্তি। সুতরাং এ আলোচনা দ্বারা চিরস্থায়ী শাস্তিও জানা হয়ে যায়।—(বয়ানুল কোরআন)

প্রথম আয়াত অর্থাৎ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ সূরা নিসার শুরুতে এসব শব্দেই উল্লিখিত হয়েছে। পার্থক্য এই যে, সেখানে আয়াতের শেষভাগে وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا বর্ণিত হয়েছে এবং এখানে وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا

بَعِيْدًا বলা হয়েছে। তফসীরকারদের বর্ণনা অনুযায়ী পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথমোক্ত আয়াতে সরাসরি আহলে-কিতাব ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল। তারা তওরাতের মাধ্যমে তওহীদের সত্যতা, শিরকের অসত্যতা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে অবগত ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়। অতএব, তারা স্বীয় কার্য দ্বারা যেন একথা প্রকাশ করছে যে, এটাই তওরাতের শিক্ষা। তাদের এ আচরণ নিছক মিথ্যা প্রচারণা ও অপবাদ। তাই আয়াতের শেষে فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে সরাসরি মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে ইতিপূর্বে কোন ঐশী গ্রন্থও ছিল না এবং পয়গম্বরও ছিলেন না। কিন্তু তওহীদের যুক্তিগত প্রমাণাদি সুস্পষ্ট ছিল। এছাড়া স্বহস্ত নির্মিত প্রস্তরসমূহকে উপাস্য স্থির করা স্থূলবুদ্ধি লোকদের কাছেও অযৌক্তিক, মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতা ছিল। তাই এখানে আয়াতের শেষভাগে فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا বলা হয়েছে।

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া ঃ এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণ শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরিক ও কাফিররা যে শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। অতএব, এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন ? উত্তর এই যে, কাফির ও মুশরিকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না ; বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার ঃ প্রথম প্রকার জুলুম আল্লাহ্ তা'আলা কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্র হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা।—(ইবনে-কাসীর)

শিরকের তাৎপর্য ঃ শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুকে ইবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, কোরআন পাক তা উদ্ধৃত করেছে ঃ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ- اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ —অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরিকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে এদেরকে ইবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে।—(ফাতহুল-মুলহিম) জানা গেল যে, স্রষ্টা, রিযিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করাই শিরক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ
اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ
الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾
وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾
وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾

(১২২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহ্র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে ? (১২৩) তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (১২৫) যে আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে—যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার ? আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূ-মণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্টি-বলয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে অতিসত্বর এমন উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা

তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্ এ ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ্র চাইতে অধিক কার কথা সত্য হবে ? তোমাদের বাসনায় কাজ হয় না এবং আহলে-কিতাবদের বাসনায়ও না (যে, শুধু মুখে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে ; বরং আনুগত্যের উপর সবকিছু নির্ভরশীল। সুতরাং) যে ব্যক্তি (আনুগত্যে ত্রুটি করবে এবং) অসৎ কাজ করবে (বিশ্বাস সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত) সে তার শাস্তি প্রাপ্ত হবে (অসৎ কাজটি কুফরী ও বিশ্বাস সম্পর্কিত হলে শাস্তি চিরস্থায়ী ও নিশ্চিত হবে এবং এর চাইতে কম হলে চিরস্থায়ী শাস্তি হবে না।) এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া না কোন বন্ধু পাবে, না কোন সাহায্যকারী (যে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দেবে)। এবং যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, বিশ্বাসী হলে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা বিন্দু পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না (যে, তাদের কোন নেকী নষ্ট করে দেওয়া হবে)। এবং (পূর্বে যে বিশ্বাসী হওয়ার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, এটা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং এরা শুধু ঐ সম্প্রদায় যাদের ধর্ম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে সর্বোত্তম। বলা বাহুল্য, একমাত্র মুসলমানরাই এরূপ সম্প্রদায়। এর প্রমাণ এই যে, তাদের মধ্যে পূর্ণ আনুগত্য, আন্তরিকতা, ইবরাহিমী মিল্লাতের অনুসরণ ইত্যাদি গুণ রয়েছে।) এবং এ ব্যক্তি (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ধর্ম) অপেক্ষা কার ধর্ম উত্তম হবে, যে স্বীয় মস্তক আল্লাহ্র প্রতি ঝুঁকিয়ে দেয় (অর্থাৎ আনুগত্য অবলম্বন করে—শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান করে না) বরং ইবরাহীমের ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) অনুসরণ করে—যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই এবং (ইবরাহীমের ধর্ম অবশ্যই অনুসরণযোগ্য। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। (সুতরাং বন্ধুর ধর্মমত অনুসরণকারীও প্রিয় ও গ্রহণীয় হবে। অতএব, ইসলামী ধর্মমতই গ্রহণীয় এবং ইসলামপন্থীরাই বিশ্বাসী উপাধির প্রতীক সাব্যস্ত হলো। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইবরাহীমের অনুসরণ ত্যাগ করেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই একমাত্র মুসলমানরাই শুধু বাসনার উপর ভরসা করে না, বরং আনুগত্য করে। কার্যোদ্ধার তাদেরই হবে।) এবং (আল্লাহ্ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য অবশ্যই জরুরী। কেননা, তাঁর আধিপত্য, শক্তি এবং সর্বব্যাপী জ্ঞান উভয়ই পরিপূর্ণ। এগুলোই আনুগত্য জরুরী হওয়ার ভিত্তি। সেমতে) আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূ-মণ্ডলে আছে। (এ হচ্ছে আধিপত্যের পরিপূর্ণতা) এবং আল্লাহ্ সবকিছুকে (স্বীয় জ্ঞানের পরিধিতে) বেষ্টন করে আছেন (এ হচ্ছে জ্ঞানগত পরিপূর্ণতা)।

মুসলমান ও আহলে-কিতাবের মধ্যে একটি গর্বসূচক কথোপকথন : لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ আয়াতে প্রথমে মুসলমান ও আহলে কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লিখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়েতের পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনও ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন ঃ একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহলে কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহলে-কিতাবরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ অর্থাৎ এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবি দ্বারা কেউ কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজকর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে-কিরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهٖ (অর্থাৎ যে কেউ কোন অসৎ কাজ করবে, সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।) আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা খুব দুঃখিত,—চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লিখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে-কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি, যদি কারো পায়ে কাঁটা ফোটে, তাও গোনাহ্র কাফ্ফারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও তফসীরে ইবনে-জরীর হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁদেরকে وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهٖ আয়াতটি শোনালেন, তখন তাদের যেন কোমর ভেঙে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ কাজ করেনি ? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন ঃ আপনি কি অসুস্থ হন না ? আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন ঃ নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ব্যস, এটাই আপনাদের সৎকাজের প্রতিফল।

আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমন কি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহ্র কাফফারা হয়ে যায়।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াত মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবি ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না, বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী—শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا۔

অর্থাৎ যে পুরুষ কিংবা মহিলা সৎকর্ম করে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সৎকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি পাবে। এতে সামান্যও ত্রুটি হবে না। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঈমানদার হতে হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহলে-কিতাব ও অন্য অমুসলিমরা যদি সৎকর্ম করেও, তবে তাদের ঈমান বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে তাদের সৎকর্ম আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। যেহেতু মুসলমানদের ঈমানও বিশুদ্ধ এবং কর্মও সৎ, তাই তারা সফলকাম এবং অন্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি ঃ তৃতীয় আয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি মাপকাঠি বর্ণিত আছে। এ মাপকাঠি অনুযায়ী কে গ্রহণীয় এবং কে প্রত্যাখ্যাত তার নির্ভুল ফয়সালা হতে পারে। এ মাপকাঠির দু'টি অংশ। তন্মধ্যে যে কোন একটিতে ত্রুটি হলে যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রই ব্যর্থ হয়ে যায়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, দুনিয়াতে যে কোন রকম পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ততা আছে, তা এ দু' অংশের যে কোন একটিতে ত্রুটির কারণেই সৃষ্টি হয়। মুসলমান ও অমুসলমানদেরকে কিংবা স্বয়ং মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এ দুটি কেন্দ্রবিন্দুর মধ্য থেকে যে কোন একটি থেকে বিচ্যুতিই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا۔

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম পথ কারো হতে পারে না, যার মধ্যে দুটি বিষয় পাওয়া যায় ঃ (এক) اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করে। লোক দেখানো কিংবা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়; বরং খাঁটিভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে।

(দুই) "وَهُوَ مُحْسِنٌ" অর্থাৎ যে কাজও সঠিক পন্থায় করে। ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : সঠিক পন্থায় কাজ করার অর্থ এই যে, তার কাজ নিছক স্বচিন্তিত পদ্ধতিতে নয়, বরং শরীয়ত-বর্ণিত পন্থায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর শিক্ষা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়।

এতে বোঝা গেল যে, কোন কাজ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য দু'টিই শর্ত : (এক) ইখলাস অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহ্র জন্য করা। (দুই) কাজটি হবে সঠিক। অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী হবে। প্রথম শর্ত ইখলাসের সম্পর্কে মানুষের অন্তরের সাথে এবং দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ শরীয়তানুযায়ী কাজ করার সম্পর্ক মানুষের বাহ্যিক অবস্থার সাথে। কেউ এতদুভয় শর্ত পূরণ করতে পারলে তার অন্তর ও বাহ্যিক অবস্থা ঠিক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত হলে কাজটি বিনষ্ট হয়ে যায়। ইখলাস না থাকলে মানুষ কার্যত মুনাফিকে পরিণত হয়। আর শরীয়তের অনুবর্তিতা না থাকলে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

ইখলাস কিংবা বিশুদ্ধ কাজের অনুপস্থিতিই জাতিসমূহের পথভ্রষ্টতার কারণ : বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, দুনিয়াতে যতগুলো পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ও জাতি রয়েছে, তাদের কারও মধ্যে হয়তো ইখলাস নেই কিংবা কারও কাজ সঠিক নয়। সূরা ফাতেহায় 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতদের প্রসঙ্গে এ দু' সম্প্রদায়ের কথাই مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ এবং ضَالِّيْنَ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলে ঐ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, ইখলাস নেই এবং ضَالِّيْنَ ঐ সম্প্রদায়, যাদের কাজ সঠিক নয়। প্রথম দল কু-প্রবৃত্তির শিকার এবং দ্বিতীয় দল সংশয় সন্দেহের শিকার।

প্রথম শর্ত অর্থাৎ ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা ও তার অনুপস্থিতিতে কাজ ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি প্রায় সবাই জানে ও বুঝে। কিন্তু কাজের সঠিকতা অর্থাৎ শরীয়তানুযায়ী হওয়ার শর্তটির প্রতি অনেক মুসলমানও ভ্রূক্ষেপ করেন না। তারা মনে করে যে, সৎকাজ যেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই হলো। অথচ কোরআন ও সুন্নাহ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেছে যে, কর্মের সঠিকতা একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা ও তরীকা অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। এ শিক্ষা থেকে কম করা যেমন অপরাধ, এর চাইতে বেশি করাও তেমনি অপরাধ। যোহরের চার রাক'আতের স্থলে তিন রাক'আত পড়া যেমন অন্যায়, পাঁচ রাকআত পড়াও তেমনি গোনাহ। কোন ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা) যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে কোন শর্ত বাড়ানো কিংবা তাঁদের বর্ণিত আকার থেকে ভিন্ন আকার অবলম্বন করা না-জায়েয ও কর্মের সঠিকতার পরিপন্থী, যদিও কর্মটি দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাবতীয় বিদ'আতকে পথভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছেন এবং এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে জোর তাকীদ করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলো এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। মূর্খরা এ কাজ খাঁটিভাবে আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি এবং ইবাদত ও সওয়াব মনে করে সম্পাদন করে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের এ কাজ পণ্ডশ্রম বরং গোনাহ্র কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই কোরআন পাক বারবার কর্মের সঠিকতা অর্থাৎ সুন্নত অনুসারে করতে তাকীদ করছে। সূরা মুলকে আছে لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً এখানে اَحْسَنُ عَمَلاً বলা হয়েছে اَكْثَرُ عَمَلاً বলা হয়নি। অর্থাৎ বেশি কাজ করার

কথা না বলে ভাল কাজ করার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভাল কাজ তাই, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত অনুযায়ী হয়।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে কর্মের সঠিকতা ও সুন্নাহ্র অনুসরণকে ব্যক্ত করে বলা হয়েছে: وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا অর্থাৎ তাদের চেষ্টা ও কর্ম আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয়, যারা পরকালের খাঁটি নিয়ত রাখে এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টাও করে। 'যথোপযুক্ত চেষ্টা' বলতে সে চেষ্টাকেই বোঝায়, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এ থেকে সরে গিয়ে কম অথবা বেশি যে চেষ্টাই করা হোক, তা 'যথোপযুক্ত চেষ্টা' নয়। যথোপযুক্ত চেষ্টারই অপর নাম কর্মের সঠিকতা, যা আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

মোট কথা, আল্লাহ্র কাছে কোন কর্ম গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত দু'টি। ইখলাস ও কর্মের সঠিকতা। এরই অপর নাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। তাই যারা ইখলাসসহ সঠিক কর্ম করে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কাজ করার পূর্বে জেনে নেওয়া যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কাজটি কিভাবে করেছেন এবং এ সম্পর্কে কি কি নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের যে কাজ সুন্নাহ্র তরিকা থেকে বিচ্যুত হবে, তা গ্রহণীয় হবে না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত, যিকির, দরূদ ও সালাম সবগুলোতেই এদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে এগুলো করেছেন এবং কিভাবে করতে বলেছেন। আয়াতের শেষে ইখলাস ও কর্মের সঠিকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর কথা উল্লেখ করে তাঁকে অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ উচ্চ পদমর্যাদার কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তিনি যেমন উচ্চস্তরের ইখলাসবিশিষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁর কর্মও আল্লাহ্র ইঙ্গিতে বিশুদ্ধ ও সঠিক ছিল।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ ۙ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا
أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۖ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۖ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا
يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

(১২৭) তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাঠ করে শোনানো হয়, তা ঐ সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, ইয়াতীমদের জন্য ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ্ জানেন। (১২৮) যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ্ নেই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৩০) যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।

যোগসূত্র ঃ সূরার প্রারম্ভে ইয়াতীম ও মহিলাদের বিশেষ বিধান এবং তাদের অধিকার আদায় করার অপরিহার্যতার উল্লেখ ছিল। কেননা, জাহিলিয়াত যুগে কেউ কেউ তাদেরকে উত্তরাধিকারই দিত না, কেউ কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন প্রকারে তারা যা পেত, তা বেমালুম হজম করে ফেলত এবং কেউ কেউ তাদেরকে বিয়ে করে পূর্ণ মোহরানা দিত না। পূর্বে এসব গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এতে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়। কেউ কেউ ধারণা করতে থাকে যে, নারী ও শিশুরা আসলে উত্তরাধিকারের যোগ্য নয়। কোন সাময়িক কারণে কিছুসংখ্যক লোককে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, তা রহিত হয়ে যাবে। কেউ কেউ রহিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। অবশেষে যখন রহিত হলো না, তখন পরামর্শক্রমে স্থির হলো যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা উচিত। সেমতে তারা উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল। ইবনে-জরীর ও ইবনুল-মুনযিরের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রশ্নই

হচ্ছে আয়াত অবতরণের কারণ। এর পরবর্তী আয়াতসমূহে নারীদের সম্পর্কে আরও কতিপয় মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা আপনাকে নারীদের (উত্তরাধিকার ও মোহরানার) বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে (সেই পূর্বের) নির্দেশই দিচ্ছেন এবং ঐসব আয়াত ও (তোমাদের নির্দেশ দেয়) যা (ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং) কোরআনে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয় (কেননা কোরআন তিলাওয়াতের সময় এসব আয়াতের তিলাওয়াত তো হয়েই যায়) পিতৃহীনা নারীদের সম্পর্কে যাদের (সাথে তোমাদের ব্যবহার এই যে, তারা অর্থশালিনী হলে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর, কিন্তু তাদের)-কে (শরীয়ত) নির্ধারিত অধিকার (উত্তরাধিকার ও মোহরানা) প্রদান কর না এবং (যদি সৌন্দর্যশালিনী না হয়ে শুধু অর্থশালিনী হয়, তবে) তাদেরকে (রূপশালিনী না হওয়ার কারণে) বিয়ে করতে ঘৃণা কর (কিন্তু অর্থশালিনী হওয়ার কারণে অর্থ অন্যত্র চলে যাওয়ার আশংকায় অন্য কাউকেও বিয়ে করতে দাও না) এবং (যেসব আয়াত) অসমর্থ শিশুদের সম্পর্কে (রয়েছে) এবং (যেসব আয়াত) এ সম্পর্কে (রয়েছে) যে, ইয়াতীমদের (সব) কার্যব্যবস্থা (মোহরানা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হোক কিংবা অন্য কিছু) ইনসাফের সাথে কর (এ পর্যন্ত পূর্বে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু পূর্ণ বর্ণিত হলো। এ সব আয়াত স্বীয় নির্দেশ এখনও তোমাদের প্রতি ওয়াজিব করছে এবং সেসব নির্দেশ হুবহু কার্যকর রয়েছে। তোমরা এসব নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর) এবং তোমরা যে সৎকাজ করবে (নারী ও ইয়াতীমদের সম্পর্কে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব জানেন (তোমাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর তিনি সেসব বিষয়েও অবগত যা অকল্যাণকর। কিন্তু এখানে সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দান উদ্দেশ্য; তাই বিশেষভাবে সৎকাজ উল্লেখ করা হয়েছে) এবং যদি কোন নারী (লক্ষণাদির দ্বারা) স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ (ও রূঢ়তা) কিংবা উপেক্ষার (ও বিমুখতার) প্রবল আশংকা করে, তবে এমতাবস্থায় তারা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে কোন বিশেষ সুমীমাংসা করে নিলে তাদের কোন গোনাহ নেই (অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করতে না চায় এবং অধিকারের কারণে তাকে ত্যাগ করতে চায়, তবে স্ত্রীর জন্য কিছু অধিকার ছেড়ে দেওয়া, যেমন ভরণ-পোষণ মাফ করে দেওয়া কিংবা হ্রাস করে দেওয়া কিংবা রাত্রি যাপনে স্বীয় পালা মাফ করে দেওয়া জায়েয—যাতে স্বামী তাকে ত্যাগ না করে এমনিভাবে স্ত্রীর এ ত্যাগ গ্রহণ করা স্বামীর জন্যও জায়েয) এবং (ঝগড়া-বিবাদ কিংবা বিচ্ছেদের চাইতে তো) মীমাংসা (ই) উত্তম। (এরূপ মীমাংসা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা) মানব মন (স্বভাবত) প্রলোভনের সাথে সংযুক্ত (ও মিলিত) আছে। (লোভ পূর্ণ হয়ে গেলে সে রাযী হয়ে যায়। স্বামী যখন দেখবে যে, তার আর্থিক ও আত্মিক স্বাধীনতা—যার প্রতি তার স্বভাবজাত লোভ আছে—মোটেই ক্ষুণ্ন হয় না, অথচ বিনা মাশুলে স্ত্রী পাওয়া যায়, তখন সম্ভবত সে তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে সম্মত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে স্ত্রীর লোভই হলো মীমাংসার আসল কারণ, তা

যে কারণেই হোক। অতএব উভয় পক্ষের বিশেষ বিশেষ লোভ এ মীমাংসার পথকে প্রশস্ত করে দেবে।) এবং (হে পুরুষকুল) যদি তোমরা (স্বয়ং নারীদের সাথে) সদ্ব্যবহার কর (এবং তাদের কাছ থেকে অধিকার মাফ করাতে ইচ্ছুক না হও) এবং তাদের সাথে (রূঢ় ও উপেক্ষামূলক ব্যবহার থেকে) সংযমী হও, তবে (তোমরা অনেক সওয়াব পাবে। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজ-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন (এবং সৎকর্মের জন্য সওয়াব দান করেন)। আর স্বভাবত তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে (সর্বপ্রকারে) সমান ব্যবহার করতে পারবে না। (এমন কি আন্তরিক আগ্রহের ক্ষেত্রে) যদিও তোমরা (এ সমান আচরণের যতই না) আকাঙ্ক্ষী হও (এবং এ ব্যাপারে যতই না চেষ্টিত হও। কিন্তু মনের টান ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। তাই এর উপর জোর চলে না। কোথাও যদি সমান আচরণ হয়েই যায়, তবে আয়াতে তার অস্বীকার উদ্দেশ্য নয়। মোট কথা, যখন ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়, তখন তোমরা এজন্য আদিষ্ট নও। কিন্তু আচরণ ইচ্ছাধীন না হওয়াতে এটা জরুরী হয় না যে, বাহ্যিক অধিকারও ইচ্ছাধীন হবে না ; বরং বাহ্যিক অধিকার প্রদান ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এটা যখন ইচ্ছাধীন ব্যাপার), অতএব (তোমাদের অবশ্য করণীয় এই যে,) তোমরা (সম্পূর্ণরূপে অর্থ এই যে, অন্তর দ্বারাও—যাতে তোমরা স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ শরীয়তসম্মত অধিকারে তাদের প্রতি অসদাচরণ ও উপেক্ষা করো না) যাতে তাকে (নির্যাতিতাকে) এমন করে দাও, যেমন কেউ এদিকেও না, সেদিকেও না—(অর্থাৎ মধ্যস্থলে) দোদুল্যমান। (অর্থাৎ তাকে অধিকারও প্রদান করা হয় না যে, তাকে বিবাহিতা মনে করা যায় এবং তালাকও দেওয়া হয় না যে, স্বামীবিহীন মনে করা যায় এবং অন্যকে বিবাহ করতে পারে, বরং স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনে রাখলে ভালরূপে রাখ) এবং (রাখলে অতীতে তার সাথে যে অপ্রিয় ব্যবহার করা হয়েছে) যদি (এসব ব্যবহার এই মহূর্তে) সংশোধন করে নাও এবং (ভবিষ্যতে এরূপ ব্যবহার করা থেকে) সংযমী হও, তবে (অতীত বিষয়াদি ক্ষমা করা হবে। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। (বান্দা ক্ষমা করলে বান্দার হক সম্পর্কিত গোনাহর সংশোধন হয়। সুতরাং এ ক্ষমা সংশোধন করার মধ্যেই এসে গেছে। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে তওবা বৈধ হবে এবং গ্রহণীয়ও হবে) এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (অর্থাৎ কোনরূপে বনিবনাও না হয় এবং খুলা কিংবা তালাক হয়ে যায়), তবে তাদের মধ্যে কেউ—স্বামীর অন্যায় থাকলে স্বামী এবং স্ত্রীর ত্রুটি থাকলে স্ত্রী যেন মনে না করে যে, তাকে ছাড়া অপরপক্ষে কার্যোদ্ধার হবে না। কেননা) আল্লাহ্ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা (উভয়ের মধ্য থেকে) প্রত্যেককে (অপরের) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। (অর্থাৎ প্রত্যেকের অবধারিত কাজ অপর পক্ষকে ছাড়াই উদ্ধার হবে) এবং আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময় (প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত পথ বের করে দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ ঃ وَإِنِ امْرَأَةٌ...وَاسِعًا حَكِيمًا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথ নির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন

হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিষহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কোরআন পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক জীবন-ব্যবস্থা বাতলে দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতে শানেনযুল প্রসঙ্গে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তফসীরে-মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোরআন পাকের সাধারণ নীতি فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোরপোশের ন্যায্য দাবি আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়-দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়তো এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কোরআন-করীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথনির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ অর্থাৎ "প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" কাজেই স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিষহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়তো মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহবন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি ? অতএব এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে। সাথে সাথে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا .

"যদি কোন নারী নিজ স্বামীর পক্ষ হতে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশংকা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোন গোনাহ্ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। এখানে গোনাহ্ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মত মনে হয়। কারণ স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবি হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বস্তুত এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং উভয় পক্ষের কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব এটা সম্পূর্ণ জায়েয।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় ঃ তফসীরে-মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে। এখানে بَيْنَهُمَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না, বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাজনক ও স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا .

অর্থাৎ আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।" এখানে বোঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণবশত স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েয। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান প্রদান করবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন" বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এর প্রতিদান হবে কল্পনার ঊর্ধ্বে, ধারণার অতীত।

আলোচ্য আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এই যে, স্বামী যদি দেখে যে, অনিবার্য কারণবশত স্ত্রীর সাথে তার মনের মিল হচ্ছে না এবং স্ত্রীও তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তবে স্ত্রীর আয়ত্তাধীন বিষয়ে যতটুকু সম্ভব তাকে সংশোধনের চেষ্টা করবে। মৌখিক সতর্কীকরণ, সাময়িক অনাসক্তি ভাব প্রদর্শন এবং প্রয়োজনবোধে সাধারণ মারধর পর্যন্ত করবে, যেমন সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সংশোধনের আশা না থাকে অথবা সমস্যার মূল কারণ দূর করা স্ত্রীর সাধ্যাতীত হয়, তবে অযথা ঝগড়া-বিবাদ না বাড়িয়ে স্ত্রীকে ভদ্রভাবে বিদায় করার শরীয়তসম্মত অধিকার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম অবলম্বন করে স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করেও স্ত্রীর দাবি-দাওয়া পূরণ করে, তবে তা তার জন্য অতি উত্তম প্রশংসনীয় ও বিপুল সওয়াবের বিষয় হবে। পক্ষান্তরে ঘটনা যদি বিপরীত হয় অর্থাৎ যদি স্বামী অযথাই স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হয় এবং তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত রেখে কষ্ট দেয়, ফলে বাধ্য হয়ে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করে। এমতাবস্থায় স্বামীও যদি তাকে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত হয়, তা হলে সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আর যদি স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে অসম্মত হয়, তবে শরীয়তী আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা দায়ের করে স্বামীর অবহেলা নিপীড়ন হতে নিষ্কৃতি লাভ করার অধিকার স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্ত্রী যদি ধৈর্য ধারণ করে স্বামীর সাথে প্রীত-সৌহার্দ্য বজায় রাখে, স্বীয় অধিকার উৎসর্গ করে সর্বতোভাবে স্বামীসেবায় আত্মনিয়োগ করে, তবে তার জন্য তা কল্যাণকর এবং বিপুল সওয়াবের বিষয় হবে।

মোট কথা, কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকা উচিত, উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিরোধের সমঝোতার ব্যাপারে উপনীত হওয়াকে জায়েয করা হয়েছে। আয়াতের শেষ দিকে সমঝোতা না হলেও উভয় পক্ষকে ধৈর্য ও সবর অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে সমঝোতাকে শ্রেয়তর, কল্যাণকর ও পছন্দনীয় বিষয় বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ "اَلصُّلْحُ خَيْرٌ" অর্থাৎ "সমঝোতা করা অতি উত্তম।" বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে এর আওতায় স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ তথা দুনিয়ার যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধই এসে গেছে অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আপোস ও সমঝোতার পন্থাই সর্বোত্তম।

সারকথা এই যে, দুনিয়ার যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের নিজ নিজ স্বার্থ ও দাবির উপর অটল থাকার পরিবর্তে আংশিক ক্ষতি স্বীকার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতা স্থাপন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। হযরত রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

كل صلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما اوحرم حلا لا والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا- (رواه حاكم عن كثير بن عبد الله، تفسير مظهرى)

অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক যে কোন সমঝোতা ও সন্ধিচুক্তি বৈধ। তবে কোন হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করার চুক্তি বৈধ নয়। স্বীকৃত শর্তের উপর স্থির থাকা মুসলমানদের কর্তব্য। তবে কেন হালালকে হারাম করার শর্ত পালন করা যাবে না। —(তফসীরে মাযহারী)

যেমন, কোন স্ত্রীর সাথে তার ভগ্নিকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার শর্তে আপোস করা হলে তা বৈধ হবে না। কারণ দু'বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হারাম। অনুরূপভাবে স্ত্রীর কোন ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ না করার শর্তে সন্ধি করা অবৈধ। কেননা এর ফলে হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপক অর্থের উপর ভিত্তি করে হযরত ইমাম আজম (র) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সর্বপ্রকার আদান-প্রদান জায়েয আছে—তা দাবিদারের দাবি স্বীকার করে হোক বা অস্বীকার করে হোক অথবা নীরবতা অবলম্বন করে হোক। যেমন, বাদী বিবাদীর কাছে এক হাজার টাকা দাবি করল। বিবাদীও তার সত্যতা স্বীকার করে বলল যে, বাদীকে এক হাজার টাকা পরিশোধ করা তার কর্তব্য। কিন্তু নগদ এক হাজার টাকা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। এমতাবস্থায় বাদী কর্তৃক কিছু টাকা ক্ষমা করে বা টাকার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করে আপোস করা জায়েয অথবা বিবাদী কর্তৃক বাদীর দাবি স্পষ্টত স্বীকার বা অস্বীকার না করে নীরবতা অবলম্বন করা হলে কিংবা বাদীর দাবি স্পষ্টত অস্বীকার করেও যদি বলে যে, যা হোক তোমার সাথে আমি বিবাদ করতে চাই না, বরং এত টাকার বিনিময়ে তোমার সাথে আপোস করতে চাই। উপরোক্ত তিন প্রকার সন্ধিচুক্তিই বৈধ এবং অর্থের আদান-প্রদান জায়েয ও হালাল। তবে অস্বীকৃতি বা নীরবতার সাথে সন্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

পরিশেষে অত্র আয়াতে উল্লিখিত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আপোস-নিষ্পত্তি সম্পর্কিত একটি মাসআলা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোন মহিলা তার কোন ন্যায্য দাবি প্রত্যাহার করে স্বামীর সাথে আপোস করে যা স্বামীর দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল--তা চুক্তির শর্ত অনুসারে চিরতরে মওকুফ হয়ে যাবে ; পরবর্তীকালে তা দাবি করার কোন অধিকার তার থাকবে না। পক্ষান্তরে তার যেসব পাওনা তখনই পরিশোধ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব ছিল না ; যেমন ভবিষ্যতকালের খোরপোশ ও রাত যাপনের অধিকার—যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব নয়, বরং আগামীতে ক্রমান্বয়ে ওয়াজিব হবে। এ ধরনের দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে সমঝোতা করা হলেও তা চিরতরে রহিত হবে না, বরং যে কোন সময় স্ত্রী বলতে পারবে, এতদিন আমি অধিকার ছেড়ে দিয়েছি, এখন আর ছাড়তে রাজী নই। আগামীতে আমার ন্যায্য

অধিকার আমাকে দিতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামীও আবার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকার ফিরে পাবে।—(তফসীরে-মাযহারী)

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۔

অর্থাৎ আর যদি স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করে দেবেন। এই আয়াতে উভয় পক্ষকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, সংশোধন ও সমঝোতার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে যদি বিচ্ছেদ হয়েই যায়, তবে হতাশ ও বিহবল হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করে দেবেন। মহিলার জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, পুরুষের জন্যও অন্য স্ত্রী অবশ্যই জুটবে। আল্লাহ্‌র কুদরত অপার। অতএব, হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিবাহ-পূর্ব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে তারা বুঝতে পারবে যে, এক সময় তারা একে অপরকে হয়তো চিনতও না। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে একত্র করেছিলেন। অতএব, পুনরায় তিনি অন্যের সাথেও জোড় মেলাতে পারেন।

আয়াতের শেষে وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা সচ্ছলতা দানকারী, সুব্যবস্থাপক" বলে এ বিশ্বাসকে আরো জোরদার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সব কাজই যুক্তিসঙ্গত ও হিকমতপূর্ণ যদিও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। কাজেই এ বিচ্ছেদের মধ্যে তাদের স্বার্থ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি নিহিত থাকতে পারে। বিচ্ছেদের পরে হয়তো তারা এমন সাথী লাভ করবে যার সাহচর্যে তাদের জীবন সার্থক ও সুখময় হবে!

ইখতিয়ার-বহির্ভূত ব্যাপারে কোন জবাবদিহি করতে হবে না ঃ দাম্পত্য জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুখময় করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দান প্রসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۔

অর্থাৎ "যতই চাও না কেন, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না।" ইতিপূর্বে সূরা নিসার প্রথম দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা ও ন্যায় নীতি বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য। যার ধারণা হবে, এ কর্তব্য আমি পালন করতে পারবো না, তার একাধিক বিয়ে করা উচিত নয়। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ۔

অর্থাৎ "আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে একজন স্ত্রীই যথেষ্ট।"

হযরত রাসূলে করীম (সা) কথা ও কাজে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তা লংঘন করার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়-নীতি ও সমদর্শিতা বজায় রাখার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আরয করতেন ঃ

اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ্! যতদূর আমার ইখতিয়ারভুক্ত তার মধ্যে আমি সমবণ্টন ও সমব্যবহার করলাম। অতএব যা আমার ইখতিয়ার-বহির্ভূত কিন্তু তোমার ইখতিয়ারভুক্ত (অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণ ও ভালবাসা) সে ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করো না।"

রাসূলে করীম (সা)-এর চেয়ে অধিক সংযমী ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর কে হতে পারে? কিন্তু তিনিও মনের আকর্ষণকে ইখতিয়ার-বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে ওজর পেশ করেছেন।

সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতে বোঝা গিয়েছিল যে, স্ত্রীদের মধ্যে সর্বতোভাবে সমতা বজায় রাখা ফরজ যার ফলে আকর্ষণ ও ভালবাসার ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা ফরয সাব্যস্ত হচ্ছিল। অথচ এটা স্বামীর ইচ্ছাধীন নয়। তাই এখানে মূল বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ফরয নয়, বরং খোরপোশ, আচার-ব্যবহার, রাত যাপন প্রভৃতি তোমাদের ইখতিয়ারভুক্ত ব্যাপারেই সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ উপদেশটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে কোন রুচিবোধসম্পন্ন মানুষ তা মানতে বাধ্য। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ .

অর্থাৎ "যতই চাও না কেন, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, এমনভাবে একদিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না, যাতে তাদের একজন মাঝপথে ঝুলে থাকে।"

এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দুজন স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখার যতই চেষ্টা করো না কেন, মনের আকর্ষণ ও ভালবাসার দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এটা তোমাদের ইচ্ছাধীন নয়। তবে হ্যাঁ, তোমরা এক দিকে ঝুঁকে পড়ো না ; মনের আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে আদান-প্রদানের ব্যাপারেও তাকে অগ্রাধিকার দিও না যার ফলে অন্য স্ত্রী মাঝপথে ঝুলে থাকে। বেচারীকে অধিকারও দেবে না আর বিদায়ও করবে না, এমন যেন না হয়।

এই আয়াতে সমতা রক্ষা করাকে সাধ্যাতীত বলা হয়েছে। বস্তুত এটা আকর্ষণ ও অনুরাগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতঃপর فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ "একদিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না"—বাক্য দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে যে, আন্তরিক আকর্ষণ ও অনুরাগ তোমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব করে তোমাদের আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রেও তাকে প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নয়। এভাবে এ আয়াত সূরা নিসার প্রথম আয়াতের এই ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে, উক্ত আয়াত দ্বারা স্থূল দৃষ্টিতে আকর্ষণ ও অনুরাগে সমতা রক্ষা করা ফরয বোঝা গিয়েছিল। অতঃপর এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, এটা ক্ষমতা- বহির্ভূত হওয়ার কারণে ফরয নয়। শুধু আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রেই সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখা ফরয।

বহু বিবাহের বিপক্ষে দলির পেশ করা ভুল ঃ উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সেই সব লোকের ভ্রান্ত ধারণাও পরিষ্কার হয়ে গেল, যারা এ দু'টি আয়াতকে একত্র করে সিদ্ধান্ত নিতে চান যে, ইসলামে একাধিক বিবাহ জায়েয নয়। কারণ সূরা নিসার এক আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে অপারক হও, তবে আর বিয়ে করো না বরং এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাক।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যতই চেষ্টা করো না কেন, তোমরা কখনও একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না।" অতএব, একাধিক বিয়ে করাই জায়েয নয়।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এহেন ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের উপকরণ যে অত্র আয়াতদ্বয়ের মধ্যেই নিহিত রেখেছেন, তা এঁদের নজরে পড়ে না। দ্বিতীয় আয়াতে فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে অন্য স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হবে—বলা হয়েছে অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী রাখা জায়েয আছে, তবে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার করা জায়েয নয়। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً এখানে শর্ত আরোপ করে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা আশংকা বোধ করো যে, সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীই যথেষ্ট।" এখানে "যদি তোমরা আশংকা বোধ করো" শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমতা রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বা সাধ্যাতীত নয় এবং একাধিক বিবাহও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়নি। অন্যথায় দু'টি আয়াত ও দীর্ঘ ইবারতের কোন প্রয়োজন ছিল না বরং حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ আয়াতে যেমন ঐসব নারীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাদের সাথে বিয়ে হারাম এবং অন্য আয়াতে وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ বলে দু'বোনকে এক সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হারাম করা হয়েছে ; তদ্রূপ এক সাথে একাধিক বিয়েকে সরাসরি হারাম বলা হতো। এমতাবস্থায় 'দু'বোন'কে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখতে নিষেধ করার পরিবর্তে 'দু'নারীকে' এক সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে সরাসরি নিষেধ করাই সমীচীন হতো। এতদ্ব্যতীত 'দু'বোন'কে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে নিষেধ করায় বোঝা যায় যে, পরস্পর বোন না হলে একাধিক বিয়ে জায়েয।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا

النَّاسَ وَيَأْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

(১৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্র। বস্তুত আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহ্কে ; যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সেসব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবহীন, প্রশংসিত। (১৩২) আর আল্লাহ্রই জন্য সে সব কিছু, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আল্লাহ্ই যথেষ্ট, কর্মবিধায়ক। (১৩৩) হে মানবকুল, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তুত আল্লাহ্র সে ক্ষমতা রয়েছে। (১৩৪) যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়ার কল্যাণ আল্লাহ্রই কাছে রয়েছে। আর আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, দেখেন।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে নারী ও ইয়াতীম সম্পর্কিত হুকুম-আহ্কাম বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এখানে কোরআনের বর্ণনারীতি অনুসারে আশ্বাস ও ভীতির বাণী বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে সবই (একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলার (জন্য ; অতএব, এহেন পরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের নির্দেশ পালন করা একান্ত কর্তব্য)। আর (আনুগত্য স্বীকার করার এ নির্দেশ শুধু তোমাদেরকেই বিশেষভাবে দেওয়া হয়নি বরং) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহুদী নাসারাগণ) এবং তোমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। (যাকে তাকওয়া বলা হয় এবং সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ মান্য করা যার অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য এ সূরায় اتَّقُوا। "তাক্ওয়া অবলম্বন কর" বলে এরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আর তাদেরকে ও তোমাদেরকে এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,) যদি তোমরা অবাধ্য হও, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ লংঘন কর, তবে তাঁর কোনই ক্ষতি হবে না, বরং তোমাদেরই সর্বনাশ হবে। কারণ) আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র মালিকানাধীন। (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের অবাধ্যতার এত বড় পরাক্রমশালী প্রভুর কি ক্ষতি হবে ? অবশ্য যে কেউ এত বড় শাহানশাহের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারই চরম সর্বনাশ হবে) আর আল্লাহ্ তা'আলা কারও (আনুগত্যের) মুখাপেক্ষী নন। (বরং আল্লাহ্ স্বীয় সত্তায়) প্রশংসিত ও (সর্বগুণে গুণান্বিত।

কাজেই কারও অবাধ্যতা বা বিরোধিতার কারণে তাঁর মহিমার কোন হানি হয় না।) আর আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র মালিকানাধীন। আর (যেহেতু তিনি অনন্যনির্ভর পরম পরাক্রমশালী, অতএব, স্বীয় অনুগত বান্দাদের) কার্য নির্বাহের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। (তাঁর সহায়তা ভিন্ন তাঁর অনুগত বান্দাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে—এমন কোন শক্তিই নেই। অতএব, অন্য কাউকে ভয় করা বা কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও অন্যায়। আর) হে মানবকুল (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যথায়) তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে অন্যদের নিয়ে আসতে পারেন (এবং তাদের দ্বারা স্বীয় ইবাদত করাতে পারেন) আল্লাহ্ তা'আলার এমন ক্ষমতা রয়েছে।

(যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ। অর্থাৎ যদি তোমরা অবাধ্য হও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা তোমাদের মত অবাধ্য হবে না। আল্লাহ্ ত'আলা তা অনায়াসে করতে পারেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তোমাদের সংশোধনের সুযোগ দান করেছেন। এটা তাঁর নিছক অনুগ্রহ। অতএব, একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার কর এবং সৌভাগ্য অর্জন কর। আর) পার্থিব প্রতিদান যদি কেউ কামনা করে করুক ; (কিন্তু মনে রেখো—দীনী কাজের সত্যিকার প্রতিদান আখিরাতেই লাভ হয়। ইহজীবনে কোন সৌভাগ্য বা সুফল পাওয়া না গেলে দুঃখ বা দুশ্চিন্তা করো না, বরং) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (অর্থাৎ তাঁর অসীম ক্ষমতার আয়ত্তাধীন রয়েছে) দুনিয়া ও আখিরাতের (যাবতীয়) প্রতিদান। (উচ্চ ও নিম্নমানের যাবতীয় প্রতিদান যখন তাঁর ক্ষমতাধীন, তখন তাঁর কাছে উচ্চমানের প্রতিদানই প্রত্যাশা করা বাঞ্ছনীয়।) আর আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু শ্রবণ করেন ও লক্ষ্য রাখেন। (সবার আবেদনই তিনি শোনেন ; তা দুনিয়ার জন্য হোক বা আখিরাতের জন্যই হোক। সবার মনোভাব তিনি লক্ষ্য রাখেন। আখিরাত কামনাকারীদের তিনি আখিরাতে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং দুনিয়াতেও আংশিক দান করেন। পক্ষান্তরে দুনিয়া প্রার্থীদেরকে আখিরাতে বঞ্চিত করবেন। সুতরাং কোন ইবাদতের মধ্যে পার্থিব লাভের উদ্দেশ্য নিহিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে পার্থিব প্রয়োজনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্র কাছে চাওয়া দূষণীয় নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্ তা'আলার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্ পাকের অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন এবং অনায়াসে তা সুসম্পন্ন করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনন্যনির্ভরতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

---

(১৩৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! (প্রাপ্য পরিশোধের সময়, বিচার-মীমাংসাকালে ও যাবতীয় লেন-দেনের মধ্যে) ন্যায়-নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। (স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য দানকালে) আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য (সত্য) সাক্ষ্য দান করো, যদিও (উক্ত সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তি তোমাদের) নিজেদের বা পিতা-মাতার অথবা আত্মীয়-স্বজনের (স্বার্থের) পরিপন্থী হয়। (আর সাক্ষ্যদানের সময় এরূপ খেয়াল করো না যে, যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে) সে যদি ধনী ব্যক্তি হয় (তবে তার সাথে সৌহার্দ্য বিনষ্ট করা কিংবা শত্রুতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।) অথবা সে যদি দরিদ্র হয়, তার ক্ষতি করা অনুচিত। (তোমাদের সাক্ষ্য দানকালে কোন পক্ষের প্রাচুর্য বা দারিদ্র্যের প্রতি বা ক্ষতি বা লাভের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করো না। কারণ যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হবে) সে ধনী বা দরিদ্র যা-ই হোক, তাদের সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক (তোমাদের চেয়ে) নিকটতর। (কেননা তোমাদের সম্পর্ক খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু খোদার সম্পর্ক কারো প্রদত্ত নয়।

শক্তিশালী সম্পর্ক সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কল্যাণার্থে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সাক্ষ্য দানকালে অকপটে সত্য কথা বলতে হবে, যদি তাতে সাময়িকভাবে কোন পক্ষের ক্ষতিও হয়। এমতাবস্থায় তোমাদের দুর্বল সম্পর্কের বাহানা দিয়ে কারো সাময়িক উপকারার্থে সত্য সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ হবে। অতএব,) তোমরা (সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনরূপ) প্রবৃত্তির দাসত্ব করো না। (আর) যদি তোমরা সাক্ষ্য বিকৃত করো কিংবা সাক্ষ্যদানে বিমুখ হও, তবে (স্মরণ রাখবে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমুদয় কীর্তিকলাপ সম্পর্কেই অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

'সূরা-নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্য দান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা- সমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমন কি শব্দাবলীও প্রায় অভিন্ন। সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আ)-কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক সহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসিহত, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

সূরা হাদীদের ২৫তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি স্বীয় রাসূলদের প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মাপকাঠি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি যার ভেতরে রয়েছে বিপুল ক্ষতি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ ও সুফল।

এতদ্দ্বারা বোঝা গেল যে, নবী ও রাসূলদের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করার বিরাট আয়োজন প্রধানত ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির খাতিরেই করা হয়েছে। পরিশেষে লৌহ অবতীর্ণ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকল মানুষকে ন্যায়-নীতির উপর স্থির রাখার জন্য শুধু উপদেশ ও নীতিবাক্যই যথেষ্ট হবে না, বরং কিছু দুষ্ট লোক এমনও

থাকবে যাদেরকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এবং লৌহাস্ত্রের ভীতি প্রদর্শন করে সৎপথে আনতে হবে।

ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিগত দায়িত্বও বটে

সূরা মায়েদার ৮ম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا-اِعْدِلُوْا هُوَاَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায্য সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে যাও, কোন গোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়নীতি হতে বিচ্যুত না করে। এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

সূরা নিসা, সূরা হাদীদ ও সূরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়নীতির ধার ধারবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে না ; তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব। এ ব্যাপারে জনগণের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবি করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ-প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য এসেম্বলী রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর

নির্বাচিত সদস্যরা দেশবাসীর মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করে থাকেন। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের অসংখ্য প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে ওঠে, যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তাঁরা সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্র-মন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে,

نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے-
مری نظروں میں پھیك رنگ محفل ھوتا جاتا ھے-

—সবাই দেখছে ক্রমে উজ্জ্বলতা ও উন্নতি বাড়ছে
অথচ আমি দেখছি বিশ্বের দুর্গতি ও অবনতিই কেবল বাড়ছে।

আজ থেকে একশ বছর আগেকার অবস্থা তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করুন। তথ্য ও পরিসংখ্যান সংরক্ষিত রয়েছে। তা স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, আইন-কানূনের বেড়াজাল যত বিস্তৃত হয়েছে, আইনের মধ্যে মানবীয় চাহিদার যতই প্রতিফলন ঘটেছে, আইন প্রয়োগ করার জন্য প্রশাসন যন্ত্রের পরিধি যতই বিস্তৃত হয়েছে, এক প্রকার পুলিশের স্থলে বিভিন্ন প্রকার পুলিশের যতই উদ্ভব হয়েছে, দিন দিন ততই অপরাধের খতিয়ানও দীর্ঘ হয়েছে, মানুষ ন্যায়নীতি হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং একই গতিতে পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেয়ে চলছে।

আল্লাহ্-ভীতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি ঃ সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাসূলে-আরাবী (সা)-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না, একমাত্র আল্লাহ্‌ভীতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে, যার ফলে রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে ও তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কোরআন-মজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতের শেষে আছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। সূরায়ে মায়েদার শেষে আছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন তোমাদের কার্যকলাপ

সম্পর্কে।" সূরায়ে হাদীদের আয়াতের শেষে আছে ঃ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ। 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।"

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল-অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষদিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহাবিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, তাঁর সম্মুখে উপস্থিতি ও জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে একশ বছর পূর্ববর্তী অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোন অধ্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোন গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রাসূলে-আরাবী (সা)-এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, আল্লাহ্-ভীতি ও আখিরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। ইরশাদ হয়েছে ঃ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ।—অর্থাৎ মনে রেখো, একমাত্র আল্লাহ্র স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু چے سود چوں دل دانا وچشم بینا نیست—অনুভূতিশীল অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি ফায়দা।

কোরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে—যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, জুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখিরাতে বেহেশ্ত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্মুখে জবাবদিহির জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভয় রাখে, তার জন্য দু'টি বেহেশ্ত রয়েছে)।

এ আয়াতের এক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিরা দু'টি জান্নাত লাভ করবে। তন্মধ্যে একটি পরকালে, অপরটি ইহজীবনেই নগদ দেখতে পাবে। এটা কোন কষ্ট-কল্পিত ধারণা বা কথার কথা নয়, বরং এ পয়গাম বহনকারী মহান রাসূল (সা) একে বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছেন।

পরবর্তী খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং সুন্নতের অনুসারী অন্যান্য মুসলিম সুলতানের আমলেও 'বাঘে-বকরীতে এক ঘাটে পানি পান করা'র প্রবাদটি একটি বাস্তব সত্যরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। আমীর-গরীব, বদশাহ্-ফকীর ও শ্রমিক-মালিকের বৈষম্য সম্পূর্ণ মিটে গেছে। তখন আঁধার রাতে নিজ গৃহের নির্জন কামরার ভেতরেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকে প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। এটা কোন অলীক কাহিনী নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্য, যার সত্যতা বিধর্মীরাও অকপটে স্বীকার করেছে এবং উদার, নিরপেক্ষ ও বিবেকসম্পন্ন যে কোন অমুসলমানও তা স্বীকার করতে বাধ্য।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু জানার পর বিস্তারিত তফসীর পাঠ করুন।

আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ - قسط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও নিষ্ঠা অর্থাৎ প্রত্যেককে তার যোগ্য মর্যাদা ও পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্‌র হক ও সর্বপ্রকার মানবীয় অধিকারই এর আওতাভুক্ত। অতএব, ন্যায়নিষ্ঠার অর্থ কারো প্রতি অবিচার ও অন্যায় আচরণ না করা, অত্যাচারীকে বাধা দান করা, মজলুমের সাহায্য করা, প্রয়োজন হলে তার পক্ষে সাক্ষ্যদানে পশ্চাদপদ না হওয়া, কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি হলেও সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে সত্য ঘটনাকে বিকৃত না করা বা চাপা না দেওয়া, ক্ষমতাসীন প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন মোকদ্দমা দায়ের হলে ফরিয়াদী ও আসামী পক্ষকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা, কোন দিকে পক্ষপাতিত্ব না করা, সাক্ষীদের জবানবন্দী মনোযোগসহকারে শ্রবণ করা, সত্য উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চানালো এবং পরিশেষে পূর্ণ ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা ইত্যাদি সবই 'কিসত'-এর আওতাভুক্ত।

ন্যায়নীতির পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতদ্বয় যদিও ভিন্ন ভিন্ন সূরার অংশ, কিন্তু উভয়ের বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানত দু'টি কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথমত কারো সাথে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যার ফলে সাক্ষীর অন্তরে একথা উদয় হয় যে, তাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দান করা বাঞ্ছনীয়, যাতে তাদের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, বরং তারা যেন উপকৃত হয়। জজ বা বিচারকদের অন্তরে এরূপ ভাবের উদয় হয় যে, তাদের সপক্ষেই রায় দান করা উচিত। দ্বিতীয়ত, কারো সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যা সাক্ষী ও জজকে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য ও রায় দানে প্ররোচিত করে থাকে। মোট কথা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা মানুষকে ন্যায়নীতির পথ থেকে বিচ্যুত করে অন্যায়-অবিচারের পথে পরিচালিত করতে পারে। সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতদ্বয়ে এ দুটি প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে ভালবাসা ও আত্মীয়তাজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ নিজেদের পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়দের ক্ষতি হলেও সেদিকে লক্ষ্য না করে সত্য সাক্ষ্য দান করো। সূরা মায়েদার আয়াতে বিদ্বেষ ও শত্রুতাজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى অর্থাৎ "কোন গোষ্ঠী

বিশেষের প্রতি শত্রুতার কারণে তোমরা ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিও না, বরং ন্যায়নিষ্ঠ হও।" শত্রুতাবশত কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য বা রায় দান করা অনুচিত।

উভয় আয়াতের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে ইরশাদ হয়েছে قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ আর সূরা মায়েদার আয়াতে قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে। (প্রথম) কিয়াম, বিল কিস্ত। (দ্বিতীয়) শাহাদাত, লিল্লাহ্। অন্য আয়াতেও এ দু'টি কথাই বলা হয়েছে। তবে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'কিয়াম-লিল্লাহ্' ও 'শাহাদাত-বিল কিস্ত' বলা হয়েছে।

অধিকাংশ মুফাস্সিরে কিরামের মতে এভাবে শিরোনাম পরিবর্তিত হলেও ভাবার্থ একই রয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ শুধু اقسطوا শব্দ দ্বারাও দেওয়া যেত, কিন্তু তার পরিবর্তে كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ অন্যত্র كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে দু'চারটি ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বজায় রাখলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। কেননা, যে কোন স্বার্থপর নিষ্ঠুর ব্যক্তিও ক্ষেত্র বিশেষে ইনসাফ করে থাকে। কাজেই এটা একান্তই সাধারণ ব্যাপার, বরং এক্ষেত্রে قـوامـيـن শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সর্বাবস্থায়, সব সময় শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে ন্যায়নীতির উপর কায়েম থাকবে।

এ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিশ্ববাসীকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার যে অপূর্ব মূলনীতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, তা কোরআনে আজীমের একক বৈশিষ্ট্য। একে তো কোরআন পাকে শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম এবং শেষ বিচারের ভীতি প্রদর্শন করে সবাইকে এরই জন্য তৈরি করা হয়েছে যে, জনগণ নিজেরাও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং যারা আইনের সমালোচনার দায়িত্বে নিয়োজিত কিংবা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, তারাও আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের ভয় অন্তরে রেখে মানুষের সেবা ও কল্যাণের চেষ্টা করবে, আইনকে বিশ্বশান্তি ও মানুষের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যম বানাবে। মানুষের হয়রানি বৃদ্ধি করে কিংবা আদালতী চক্করে ফেলে মজলুমদের প্রতি জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করবে না। নিজেদের হীন স্বার্থে বা অর্থের বিনিময়ে আইনকে বিক্রি করবে না, বরং নিঃস্বার্থতা ও আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সাধ্যানুযায়ী ন্যায়নীতি অবলম্বন করবে।

দ্বিতীয়ত, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুসলমান তথা সব মানুষেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সমগ্র মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা হাদীদে لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ বলে ইনসাফ কায়েম করার দায়িত্ব সমগ্র মানব জাতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, শুধু অন্যের কাছেই যেন ইনসাফের দাবি করা না হয়, বরং নিজের থেকেও ইনসাফ আদায় করতে হবে। নিজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হলে কখনো সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কোন কথা বলবে না, যদিও তার ক্ষতিটা

নিজেকেই ভোগ করতে হয়। কারণ পার্থিব ক্ষতি নগণ্য ও সাময়িক। পক্ষান্তরে এখানে মিথ্যা ভাষণ দিয়ে স্বার্থোদ্ধার করা হলে তার বিনিময়ে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ﴿١٣٧﴾

(১৩৬) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। (১৩৭) যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফির হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে ইসলামী অনুশাসনের কতিপয় শাখা-প্রশাখার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঈমান ও কুফর সম্পর্কেও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা শুরু করে সূরার প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছান হয়েছে। প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ঈমান সম্পর্কে। অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, (অর্থাৎ যারা মোটামুটিভাবে ঈমান এনে মু'মিনদের দলভুক্ত হয়েছে) তোমরা (আবশ্যকীয় আকায়েদ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা শোন) আল্লাহ্ তা'আলার (সত্তা ও গুণাবলীর) প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর (রিসালতের) প্রতি এবং সে কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) প্রতি, যা তিনি স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং ঐসব কিতাবের (সত্যতার) প্রতি যা তিনি [রাসূল (সা)-এর পূর্ববর্তী

(রাসূল)-দের উপর নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে অন্যান্য নবী, ফেরেশতা ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।] আর যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা বা গুণাবলীকে অস্বীকার করে এবং অনুরূপভাবে যে আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশ্‌তাদের (স্বীকার করে না) আর (যে) তাঁর রাসূলদের [যাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)ও রয়েছেন] অবিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে না, নিশ্চয় সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে পতিত হয়েছে। নিশ্চয় যারা (প্রথমে একবার) ঈমান এনেছে, (কিন্তু ঈমানের উপর স্থির থাকেনি, বরং) আবার কাফির হয়েছে, পুনরায় ঈমান এনেছে (কিন্তু) এবারও ঈমানের উপর অটল থাকেনি (তাহলে তাদের প্রথমবারের মূর্তাদ হওয়ার অপরাধ ক্ষমা করা হতো।) বরং তারা আবার কাফির হয়েছে। অতঃপর আর ঈমান আনেনি। (যদি পুনরায় ঈমান আনত, তবে আবার তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হতো।) এবং তারা কুফরীর দিকেই অগ্রসর হয়েছে (অর্থাৎ অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরীর উপরই স্থির ছিল)। আল্লাহ্ তা'আলা এহেন লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে চির আকাঙ্ক্ষিত বেহেশ্‌তের পথও দেখাবেন না (কেননা, ক্ষমা ও বেহেশ্‌ত লাভ করার জন্য অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মু'মিন থাকা শর্ত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا। কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে তারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর গো-বৎসের পূজা করে কাফির হয়েছিল, অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করে কুফরীর চরমে উপনীত হয়েছে।—(তফসীরে রূহুল মা'আনী)

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বারবার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফির বা মূর্তাদই হোক, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বারবার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ

اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ

لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهٖٓ ۖ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِينَ وَالْكٰفِرِينَ فِي

جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ

قَالُوٓا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِينَ نَصِيبٌ ۙ قَالُوٓا أَلَمْ

نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

(১৩৮) সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব— (১৩৯) যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদের নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধু আল্লাহ্রই জন্য। (১৪০) আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফিরদের একই জায়গায় সমবেত করবেন। (১৪১) এরা এমনি মুনাফিক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁত পেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? পক্ষান্তরে কাফিরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদের ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি ? সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফিরদের মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, নিশ্চয় তাদের জন্য (পরকালে) অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত ও প্রস্তুত) রয়েছে। (তারা অন্তরের আকীদা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো ঈমানদারদের মত ছিলই না, অধিকন্তু বাহ্যিক চাল-চলনও মুসলমানদের ন্যায় বজায় রাখতে পারেনি। তাই) মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা ওদের কাছে (গিয়ে) কি সম্মান লাভ করতে চায় ? তবে (তাদের জানা উচিত যে,) নিশ্চয় সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্র (ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন।

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যদি ওদেরকে এবং তারা যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদেরকে সম্মান দান না করেন, তবে তারা কিভাবে সম্মান লাভ করবে ? হে ঈমানদারগণ ! তোমরা মুনাফিকদের মত কাফিরদের সাথে কোন অবস্থাতেই, বিশেষ করে, তারা যখন কুফরী কথাবার্তা বলে তখন বন্ধুত্ব করো না। যেমন,) কোরআন পাকের (অত্র মাদানী সূরার পূর্বে মক্কী সূরা আন'আমের) মাধ্যমে (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেছেন যে, যখন (কোন মজলিসে) আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার ও উপহাস (-মূলক কথাবার্তা ও) আলোচনা শুনতে পাও, তখন তারা অন্য কথায় মগ্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বসো না। (এহেন বিদ্রূপকারী মক্কায় ছিল কাফির ও মুশরিকরা আর মদীনায় প্রকাশ্যে গোপনে ইহুদীরা দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমানদের সম্মুখে মুনাফিকরা, অতএব, মক্কায় মুশরিকদের মজলিসে অংশগ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তদ্রূপ সর্বত্র ইহুদী ও মুনাফিকদের মজলিসে যোগদান করাও নিষিদ্ধ। কেননা,) এমতাবস্থায় তোমরাও তাদের মত (গোনাহ্গার সাব্যস্ত হবে।) যদিও উভয়ের অপরাধের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে যে, একটি কুফরী, অপরটি ফাসিকী। কাফির ও মুনাফিকদের মজলিসে উপবেশন করা সমভাবে নিষিদ্ধ। কেননা কুফরী কথাবার্তা বলা কুফরী কার্যকলাপে মগ্ন হওয়ারই মূল উৎস। (অর্থাৎ কুফরী ভাবধারার দিক দিয়ে উভয় দল একই সমান। অতএব, কুফরীর শাস্তি ভোগ করা অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার ব্যাপারেও তারা উভয়ে একই বরাবর হবে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের সবাইকে জাহান্নামের (মধ্যে একই স্থানে) একত্র করবেন। (ঐসব মুনাফিক) যারা তোমাদের (উপর বিপদের) প্রতীক্ষায় রয়েছে, (এবং আকাঙ্ক্ষা করছে) অতঃপর আল্লাহ্র তরফ হতে যদি তোমাদের বিজয় হয়, (তবে তোমাদের কাছে এসে বলে), আমরা কি তোমাদের সাথে (জিহাদে শরীক) ছিলাম না ? (কেননা গনীমতের মালে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে শুধু নাম কা ওয়াস্তে মুসলমানদের দলভুক্ত থাকত)। আর যদি কাফিরদের কিছুটা (বিজয়ের) ভাগ্য হতো (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে তারা যদি জয়লাভ করত) তবে (তাদের কাছে গিয়ে) বলত , আমরা কি তোমাদের উপর জয়যুক্ত হচ্ছিলাম না ? (পরে তোমাদেরকে জয়যুক্ত করার মানসে মুসলমানদের সহযোগিতা করা হতে বিরত রয়েছি, এমন কি যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করার কৌশল করেছি)। আর (তোমরা যখন পরাস্ত হচ্ছিলে, তখন) আমরা কি তোমাদের মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করিনি ? (কাজেই আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং যা কিছু তোমাদের হস্তগত হয়েছে, তার কিছু অংশ আমাদেরও দান কর। এভাবে দুদিকেই তারা হাত পেতে থাকে। যা হোক, দুনিয়ায় তারা বাহ্যিক ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।) অতঃপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ও তাদের মধ্যে (বাস্তব) ফয়সালা দান করবেন এবং (উক্ত ফয়সালার মাধ্যমে) আল্লাহ্ তা'আলা কিছুতেই কাফিরদের মুসলমানদের উপর (আধিপত্যের) পথ দেবেন না। (বরং কাফির ও মুনাফিকরা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে চিরতরে জাহান্নামী হবে, আর মুসলমানরা সত্যের অনুসারী হিসাবে চিরন্তন বেহেশতে প্রবেশ করবে। এটাই যথার্থ ফয়সালা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফিকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بشارت অর্থাৎ 'সুসংবাদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন সুসংবাদ শোনার জন্য প্রত্যেকেই উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এ ছাড়া আর কোন সংবাদ নেই, বরং তাদের জন্য সুসংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় ঃ দ্বিতীয় আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করত একেও অযথা-অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا -অর্থাৎ "তারা কি ওদের কাছে গিয়ে মর্যাদা লাভ করতে চায় ? মর্যাদা তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারাধীন।"

কাফির ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলামেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মানমর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, অরা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকার কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। অতএব, মানমর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে মর্যাদা লাভ করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামি।

এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের 'সূরায়ে মুনাফিকুন"-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং তদীয় রাসূলের জন্য এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হযরত রাসূল (সা) ও মু'মিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফির ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

من اعتزبا لعبيد اذله الله (جصاص)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বান্দাদের (মখলুকের) সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

- মুস্তাদরাকে হাকেম-এর ৮২ পৃষ্ঠায় আছে যে, হযরত উমর (রা) সিরিয়ার প্রশাসক হযরত ইবৃ উবায়দা (রা)-কে বলেন ঃ

كنتم اقل الناس فكثركم الله بالاسلام- وكنتم اذل الناس فاعزكم الله بالاسلام- مهما تطلبوا العزة بغير الله يذلكم الله-

অর্থাৎ "হে আবূ উবায়দা ! তোমরা সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য ছিলে, ইসলামের দৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তোমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদাহীন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দৌলতে তোমাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। অতএব, মনে রাখবে—আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে যদি তোমরা সম্মান অর্জন করতে চাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।"

হযরত আবূ বকর জাস্সাস (র) 'আহকামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন—আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফির, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয়নি। কেননা সূরা মুনাফিকুনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা) ও মু'মিনদের ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখিরাতের চিরস্থায়ী মান-মর্যাদা হয়, তবে তা আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাঁর রাসূল (সা) ও মু'মিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ আখিরাতের আরাম-আয়েশ, মান-মর্যাদা কোন কাফির বা মুশরিক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মু'মিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ত থাকবে। অবশ্য তাঁদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফিলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্য বিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হতমান হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ) ও ইমাম মাহ্দীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ—এই আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে, আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাযিল করেছিলাম যে, কাফির ও বদকারের ধারেকাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কপটাচারী মুনাফিকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের মালিক-মোখতার মনে করেছে।

সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন্'আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্র হয়ে আল্লাহ্

তা'আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম। অধিকন্তু সূরায়ে আন্'আমের আয়াতে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ- وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ-

অর্থাৎ আর যখন তুমি দেখবে ঐ সব লোককে, যারা আমার আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করে, তবে তাদের থেকে দূরে থাক, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে বসবে না।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করার কথা বলা হয়েছে। কোরআন পাকের কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, অর্থ বিকৃত করা অর্থাৎ হযরত রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ব্যাখ্যার পরিপন্থী বা ইজমায়ে-উম্মতের বরখেলাফ, মনগড়া বা কল্পনাপ্রসূত তফসীর বয়ান করাও এরই আওতাভুক্ত। তফসীরে মাযহারী, দ্বিতীয় জিলদ, ২৬৩ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

دخل فى هذه الاية كل محدث فى الدين وكل مبتدع الى يوم القيامة. (مظهرى، ص ٢٦٣ ج ٢)

অর্থাৎ 'কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের অপব্যাখ্যকারী, দীনকে বিকৃতকারী, বিদআত প্রবর্তনকারী ও তার সমর্থনকারীগণ এই আয়াতের আওতাভুক্ত।'

মনগড়া তফসীরবিদদের মজলিসে বসা জায়েয নয় ঃ এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা কোরআন পাকের দরস ও তফসীরের মধ্যে সলফে-সালেহীনের (পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাগণের) অনুসরণ করে না, তাঁদের তাফসীরের পরিপন্থী নিজেদের মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা প্রদান করে, তাদের দরস বা তফসীরের মজলিসে বসা কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে নাজায়েয ও গোনাহ্। বাহ্রে-মুহীত নামক তফসীরে আবূ হাইয়্যান (র) বলেন, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুখে যে কথা বলা জায়েয নয়, তা স্বেচ্ছায় কানে শোনাও নাজায়েয এবং গোনাহ্। জনৈক আরবী কবি বলেছেন ঃ

وسمعك من عن سماع القبيح - كصون اللسان عن النطق به-

অর্থাৎ "খারাপ বাক্য শ্রবণ করা থেকে স্বীয় কর্ণকেও নিয়ন্ত্রণ কর, যেমন কুবাক্য উচ্চারণ করা থেকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।"

সূরায়ে আন'আমের আয়াতে আরো একটি কথা বলা হয়েছে যে, কোন সময় ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশত যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অবাঞ্ছিত কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তবে স্মরণ হওয়া

মাত্র তৎক্ষণাৎ উক্ত মজলিস থেকে সরে যাওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় চরম অন্যায় ও অপরাধ হবে।

সূরায়ে নিসা ও আন'আমের আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ তারা অবাঞ্ছিত আলোচনায় লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বসাও হারাম। মাস'আলার আর একটি দিক হলো এই যে, যখন তারা উক্ত গর্হিত কথাবার্তা ক্ষান্ত করে অন্য কোন প্রসঙ্গে আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তাদের মজলিসে যোগদান ও অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে কি না ? যেহেতু কোরআন করীম এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু প্রকাশ করেনি, তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

কারো মতে—আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতকে অবজ্ঞা, অস্বীকার, বিকৃত ও বিদ্রূপ করার কারণেই তাদের কাছে বসতে নিষেধ করা হয়েছিল। যখন তারা গর্হিত কথাবার্তা ক্ষান্ত করে অন্য কোন আলোচনা শুরু করবে, তখন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। অতএব, তখন তাদের মজলিসে অংশগ্রহণ করা অন্যায় বা গোনাহ্ নয়। আর কারো মতে এহেন পাপাত্মা কাফির, মুশরিক, দুরাচারদের সংসর্গ অন্য সময়ও জায়েয নয়। হযরত হাসান বসরী (র)-ও এই অভিমতই সমর্থন করেছেন এবং এর সপক্ষে সূরা আন'আমের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ—

অর্থাৎ "স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে বসবে না।" একথা সুস্পষ্ট যে, দুরাচাররা তাদের অবাঞ্ছিত কতাবার্তা সমাপ্ত করার পরও দুরাচারই থেকে যায়। কাজেই স্বেচ্ছায় তাদের সাথে ওঠাবসা সর্বদাই পরিত্যাজ্য।—(জাস্সাস)

তফসীরে মাযহারীতে উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলা হয়েছে যে, যখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতের বিকৃতি, বিদ্রূপ বা অবজ্ঞামূলক কথাবার্তা বন্ধ করে অন্য আলাপে মশগুল হয়, তখন একান্ত প্রয়োজন হলে তাদের কাছে বসা জায়েয কিন্তু একান্ত আবশ্যক ছাড়া তখনও তাদের মজলিসে উপস্থিতি হারাম।

আহ্কামুল কুরআনের ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র) লিখেছেন ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন মজলিসে যখন কোন গোনাহ্র কাজ হতে থাকে, তখন "নাহী আনিল মুনকার" অর্থাৎ অন্যায় কাজে বাধাদান করার বিধান অনুসারে মুসলমানদের কর্তব্য ও দায়িত্ব যে, তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য থাকলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়কে প্রতিহত করবে। যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তবে মৌখিক প্রতিবাদ ও বিরাগ প্রকাশ করবে। তাও যদি সম্ভবপর না হয়, তবে অন্তত উক্ত মজলিস বর্জন করবে। কথিত আছে, একদা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মদ্যপানের অপরাধে কতিপয় লোককে গ্রেফতার করেন। তন্মধ্যে একজন সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সে রোযাদার ছিল এবং মদ্যপান করেনি। তবে মদ্যপানের আসরে বসা ছিল। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মদ্যপানের আসরে বসে থাকার অপরাধে তাকেও শাস্তি দিয়েছিলেন।—(বাহ্রে-মুহীত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫)

এখানে তফসীরে ইবনে কাসীরের প্রথম জিল্দ ৫৬৭ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر - (ابن كثير، ص ٥٦٧ ج ١)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে ব্যক্তি এমন দস্তরখানে বা খানার মজলিসে বসবে না, যেখানে মদ্যপান কিংবা পরিবেশন করা হয়।

ইতিপূর্বে অবাঞ্ছিত লোকদের সাহচর্য পরিত্যাগ ও মজলিস বর্জন করতে বলা হয়েছে যে, মজলিস বর্জন করার ফলে যেন শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্য কোন গোনাহ্ না হয়। যেমন মসজিদে নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়া আবশ্যক। কোন মসজিদে যদি শরীয়ত বিরোধী কোন আলোচনা হতে থাকে এবং তার প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার সামর্থ্য না থাকে, এমতাবস্থায় জামা'আতের সাথে নামায পড়া ত্যাগ করবে না। বরং শুধু অন্তরে তাদের অন্যায় কাজের প্রতি বিরাগ ও অসন্তোষ পোষণ করাই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে শরীয়তসম্মত প্রয়োজনবশত যদি কোন বৈঠকে উপস্থিত থাকা জরুরী সাব্যস্ত হয় আর সেখানে কতিপয় লোক শরীয়তবিরোধী মন্তব্য করতে থাকে, তবে অন্যদের অন্যায়কারী ও গোনাহ্গার হওয়ার কারণে উক্ত মজলিস পরিত্যাগ করে নিজে গোনাহ্গার হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও জায়েয নয়। তাই হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন—আমরা অন্যদের গোনাহ্র কারণে যদি নিজেদের কর্তব্য পরিত্যাগ করি, তবে তা প্রকারান্তরে সুন্নত ও শরীয়তকে মিটাবার জন্য ফাসিক-ফাজিল ও বদকার দুরাচারদের জন্য পথ সুগম করার সমর্থক হবে।

মোটকথা, বাতিল পন্থীদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথম, তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়, গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটাও অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসিকী। তৃতীয়, পার্থিব প্রয়োজনবশত বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থ, জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ। পঞ্চম, তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী ঃ আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ– অর্থাৎ এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্র অংশীদার হবে অর্থাৎ আল্লাহ্ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথাবার্তা মনেপ্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুত তোমরাও কাফির হয়ে যাবে। কেননা, কুফরী পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে ওঠাবসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ! নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক।

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

(১৪২) অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্র সাথে,অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোকদেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহ্কে অল্পই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত ; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত যাকে আল্লাহ্ গোমরাহ্ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও। (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদের বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্র প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দেবে ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা (ঈমানদারী জাহির করে) আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে। (যদিও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতারণা করার অভিপ্রায় তাদের ছিল না, বরং নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা এহেন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তাদের আচরণ দৃষ্টে মনে হয় যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে চালবাজি করতে চেয়েছিল। তাদের দুরভিসন্ধি অন্যের কাছে গোপন থাকলেও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপন নয়) এবং তিনিও তাদের এর প্রতিফল দেবেন (অর্থাৎ তাদের প্রতারণামূলক আচরণের সমুচিত প্রতিফল দান করবেন। আর তাদের অন্তর ঈমানশূন্য হওয়ার কারণে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকেও তারা ফরয মনে করে না এবং এজন্য কোন সওয়াবের আশা বা বিশ্বাস করে না। কাজেই) তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। (কারণ বিশ্বাস ও আশা না থাকার কারণে আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টি হয় না। বরং) মানুষকে (নিজেদের মুসলমানিত্ব ও মুসল্লিয়ানা) দেখায় (যেন তাদেরকে মুসলমান ও মুসল্লি মনে করে) এবং তারা (যেহেতু লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাযের ভান করে, কাজেই নামাযের মধ্যে মৌখিকভাবে) আল্লাহ্র যিকির করে না। তবে কিঞ্চিৎ মাত্র (অর্থাৎ তারা শুধু নামাযের মিথ্যা অভিনয় করে থাকে। হয়তো শুধু ওঠা-বসাই করে। কেননা সরবে কিরাত পাঠ করা শুধু ইমামের জন্য তিন ওয়াক্তে প্রয়োজন হয়। ইমামতি করার

সৌভাগ্য তাদের হয় না। মোক্তাদি অবস্থায় কোন কিছু না পড়ে শুধু জিহ্বা নাড়াচাড়া করলে অন্যরা তা কিভাবে জানবে ? এহেন ভাওতাবাজ লোকদের পক্ষে এটাও সম্ভব যে, জিহ্বা নাড়াচাড়া করবে না অথবা দোয়া-কালামের পরিবর্তে অন্য কিছু আওড়াবে। বস্তুত তারা) দোদুল্যমান রয়েছে (মু'মিন ও কাফির) উভয়ের মাঝে। (তারা পুরোপুরি) এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। (কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মু'মিন ব্যক্তি কাফিরদের থেকে ভিন্ন এবং অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ব্যক্তি মু'মিন থেকে পৃথক। প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, (দৃঢ় সংকল্প হওয়ার পর সামর্থ্য দান করার বিধান অনুসারে পথভ্রষ্ট হওয়ার সামর্থ্য দান করেন) এহেন লোকের (ঈমানদার হওয়ার) জন্য আপনি কোন পথ (খুঁজে) পাবেন না। (অতএব ঐসব কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সুপথে আগমনের আশা পোষণ করবেন না। এখানে মুনাফিকদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে এবং মু'মিনদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের অপকর্ম ও দুর্ভাগ্যের জন্য চিন্তিত বা দুঃখিত হওয়ার মত নিষ্ফল কার্যে লিপ্ত হতে চাও ?) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে (মুনাফিক বা প্রকাশ্য) কাফিরদের সাথে (অন্তরংগ) বন্ধুত্ব করো না; (যেমন মুনাফিকদের স্বভাব, তাদের কুফরী ভাবধারা ও বৈরিতা তোমরা অবগত আছ)। তোমরা কি (তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে) নিজেদের বিপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অভিযোগ (স্পষ্ট দলিল) কায়েম করতে চাও (অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এরূপ বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ) ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَامُوْا كُسَالٰى —আল্লাহ্‌র বাণীতে যে শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিথিলতা। বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও আমলের মধ্যে যদি কোন শৈথিল্য থাকে, তবে তা অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু তখনও বিনা ওযরে শিথিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগ-কষ্ট, নিদ্রালুতা প্রভৃতি কোন অনিবার্য কারণবশত হলে ক্ষমার্হ। —(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

(১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্‌র ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুত আল্লাহ্ শীঘ্রই ঈমানদারদের মহাপুণ্য দান করবেন। (১৪৭) তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা সত্যের উপর থাক! অথচ আল্লাহ্ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে (প্রবেশ করবে।) এবং (হে শ্রোতা) তুমি কিছুতেই তাদের কোন সহায়-সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না (যারা তাদেরকে এহেন শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে)। তবে (তাদের মধ্য হতে) যারা (মুনাফিকী হতে) তওবা করেছে এবং (মুসলমানদের সাথে পীড়াদায়ক আচরণ হতে) আত্মসংশোধন করেছে, (অর্থাৎ পরবর্তীকালে আর কখনও এহেন আচরণ করেননি এবং কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল, তা পরিত্যাগ করত) আল্লাহ্ তা'আলাকে আঁকড়ে ধরেছে (আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা করেছে) এবং (লোক-দেখানো রিয়াকারী মনোবৃত্তি ত্যাগ করে) দীনকে (অর্থাৎ দীনী আমলসমূহ) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টি লাভ করার) জন্য করেছে ; (অর্থাৎ অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্‌র তাঁবেদারী করেছে, অর্থাৎ যারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, বাহ্যিক আচার-আচরণ, আধ্যাত্মিক নীতি, নৈতিকতা ও ধর্মীয় আমল-আখলাক পরিমার্জিত করবে,) ঐসব (তওবাকারী) ব্যক্তিরা (প্রথমাবধি পূর্ণ মুমিনদের সাথে বেহেশতবাসী) হবে এবং ঈমানদারদের আল্লাহ্ তা'আলা (আখিরাতে) মহান প্রতিদান দান করবেন। (কাজেই যারা মু'মিনদের সাথে থাকবে তারাও মহান প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। আর হে মুনাফিকগণ! আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে তোমাদেরকে যে সব নিয়ামত দান করেছেন) তোমরা যদি (তার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে (ঈমান আনয়ন করাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার একমাত্র অনুমোদিত ও পছন্দনীয় পন্থা), তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন ? (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজ আটকে পড়ে নেই যে, তোমাদেরকে শাস্তি না দিলে তা সমাধা হবে না, বরং তোমাদের কুফরী ও চরম অকৃতজ্ঞতাই তোমাদের শাস্তি ভোগের একমাত্র কারণ। অতএব তোমরা যদি কুফরী পরিত্যাগ করে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুধু করুণা ও অনুগ্রহই লাভ করবে)। আল্লাহ্ তা'আলা (তো আনুগত্য স্বীকারকারীদের) গুণগ্রাহী, (এবং তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞানী। (কাজেই যে ব্যক্তি আনুগত্য ও আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে অবশ্যই তাকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ—এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে একমাত্র ঐসব আমলই গৃহীত ও কবূল হয়, যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং

কোনরূপ রিয়াকারী বা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই। 'মুখলিস' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর-মাযহারীতে লিখিত আছে ঃ الذى يعمل لله لايحب ان يحمده الناس عليه মুখলিস সেই ব্যক্তিকে বলে, যে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং ঐ কাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ

بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ ﴿١٥٠﴾

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ

يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾ ع

(১৪৮) আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী বিজ্ঞ। (১৪৯) তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (১৫০) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক) খারাপ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না ; তবে মজলুম ব্যক্তি (তার উপর কৃত অত্যাচার-অবিচার সম্পর্কে অভিযোগ বর্ণনা করতে পারে)। এবং আল্লাহ্ তা'আলা (মজলুমের) সব কিছু (অভিযোগ) শোনেন (এবং জালিমের জুলুম সম্পর্কে) অবহিত রয়েছেন। (এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জালিমের জুলুম সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেওয়া জায়েয নয়। কারো জোর-জুলুম সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা জায়েয হলেও) যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা তা গোপন রাখ (অর্থাৎ নীরবে ক্ষমা করে দাও) অথবা (কারো বিশেষ কোন অপরাধ) মার্জনা কর, তবে (তা অতি উত্তম। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলাও অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (যদিও তিনি) সর্বশক্তিমানও বটেন। (অবাধ্য অপরাধী থেকে তিনি সর্বপ্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি মার্জনা করে থাকেন। অতএব, তোমরাও যদি তদ্রূপ অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দাও, একে তো তোমরা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হবে ; দ্বিতীয়ত এর ফলে আশা করা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করে (যেমন তাদের আকীদা ও কথাবার্তায় বোঝা যায়।) আর তাঁর রাসূলদের যারা অস্বীকার করে, [হযরত ঈসা (আ) বা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এবং অন্য নবীদেরও অস্বীকার করা হয়]। এবং (তারা ঈমান আনার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায় এবং (এহেন হীন মনোভাব মৌখিকভাবেও প্রকাশ করে) বলে যে, আমরা রাসূলদের মধ্যে কাউকে মানি না। (এই আকীদার ফলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে এবং অন্য নবীদেরও অমান্যই করা হয়। কারণ তাঁরা সবাই সব নবীর নবুয়তের সততার সাক্ষ্য দান করেছেন। অতএব, যখন কোন একজন নবীকে অস্বীকার করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর সমস্ত নবীরও অবিশ্বাস করা হয়েছে, যা স্পষ্টত ঈমানের পরিপন্থী)। আর তারা এর মাঝামাঝি পথ আবিষ্কার করতে চায়। (অর্থাৎ মুসলমানদের ন্যায় সব পয়গম্বরের প্রতি ঈমানও আনবে না এবং কাফিরদের মত সবাইকে অস্বীকারও করবে না। যা হোক) এরাও সত্যিকার কাফির সন্দেহ নেই। (কেননা, ঈমান ও কুফরীর মাঝে কোন স্তর নেই, বরং আংশিক কুফরও কুফরী। পুরোপুরি ঈমান না আনা পর্যন্ত কুফরী হবে। এবং কাফিরদের জন্য আমি লাঞ্ছনাকর আযাব প্রস্তুত রেখেছি। এরাও তাই ভোগ করবে) আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলদের প্রতিও (ঈমান রাখে) এবং (ঈমান আনার দিক দিয়ে) তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই তাদেরকে প্রতিদান প্রদান করবেন। এবং (যেহেতু) আল্লাহ্ পাক অতি ক্ষমাপরায়ণ, (সুতরাং পূর্ণ ঈমান আনয়নের পূর্বে যত অন্যায় হয়েছে সব ক্ষমা করে দেবেন) আর (যেহেতু তিনি) অতি মেহেরবান। কাজেই ঈমান আনয়নের কারণে তাদের পরবর্তী সৎকার্যসমূহের কয়েক গুণ বেশি সওয়াব দান করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-জুলুমের অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব রচিত শাসকসুলভ আইনের মত নয়, বরং ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস দানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। অপরদিকে সূরায়ে নহল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ -

অর্থাৎ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না, বরং ইনসাফের গণ্ডির মধ্যে থাকবে, অন্যথায় তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

এ আয়াতে করীমার দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায় তবে তা শেকায়েত ও হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ জালিম নিজেই মজলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ দিয়েছে ও বাধ্য করেছে।

সারকথা, কোরআন পাক একদিকে মজলুমকে তার প্রতি জুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা, ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْتَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا -

অর্থাৎ 'যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর বা তা গোপনে কর অথবা কারো কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমতাবান।'

এই আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট

সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে।

আয়াতের শেষে فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন, যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত। একদিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কোরআন করীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-

অর্থাৎ তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।

আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে, যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোরআন করীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কোরআন পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অথবা কোন পয়গম্বরকে মান্য করে, আর কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে সে ঈমানদার নয়, প্রকাশ্য কাফির, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই।

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই ঃ কোরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পাদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যাগ্র। যারা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্য ধর্মানুসারীদেরকে বোঝাতে চায় যে, 'মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খৃস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত কোন কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে, যার ফলে তাদের কাফির ও জাহান্নামী হওয়ার কথা এই আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও ইহসান বা হিত কামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীরবিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে, যা আমরা যে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ

করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমত সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কুপ্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে, ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কোরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। হযরত রাসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। —(নাউযুবিল্লাহে মিন যালেকা)

সূরা বাকারার ৬২তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়তো সন্দেহে পতিত হতে পারেন, যেখানে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃষ্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

এই আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তারা সামান্য পড়াশোনা করে কোরআন উপলব্ধি করতে চায়। তারা এই আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট; নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কোরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয়, যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথায় শুধু আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কোরআন করীমের ভাষায় শুনুন ঃ

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ- فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (بقرة اية ١٣٦)

অর্থাৎ তাদের ঈমান ঐ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে, যখন তারা তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মত পুরোপুরি ঈমান আনবে, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবীদের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে চিনে রাখো যে, তারা আল্লাহ্ ও রাসূলদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন।'

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে প্রকাশ্য কাফির, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত। রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না।

শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখিরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐ সব লোকের জন্যই সংরক্ষিত, যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রাসূলদের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে।

হযরত রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان القرآن يفسر بعضه بعضا

অর্থাৎ 'নিশ্চয় কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তফসীর করে।' অতএব, কোরআনী তফসীরের পরিপন্থী কোন তফসীর বর্ণনা করা কারো জন্য জায়েয নয়।

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسٰىٓ أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوسٰى سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثٰقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

(১৫৩) আপনার নিকট আহ্‌লে কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুত এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহ্‌কে

দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন। অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল ; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আরো বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালঙ্ঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহে তাদের আরো কিছু নিন্দনীয় কার্যকলাপের দীর্ঘ তালিকা পেশ করে তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তি ও আযাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে এই প্রসঙ্গ বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)!] আহ্‌লে কিতাবরা (ইহুদীরা) তাদের প্রতি একখানি (লিপিবদ্ধ) কিতাব আসমান থেকে নামিয়ে আনার জন্য আপনার কাছে দাবি করছে। (যা হোক, তাদের এহেন অসঙ্গত আচরণে আপনি বিস্মিত হবেন না। কারণ) তারা (এমন হঠকারী লোকদের বংশধর, যাদের পূর্বসূরিরা) হযরত মূসা (আ)-এর কাছে এর চেয়েও বড় কিছুর আবদার করেছিল এবং বলেছিল, আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাও (পর্দার আড়াল থেকে নয়), প্রকাশ্যভাবে চোখের সামনে; (তাই তাদের ধৃষ্টতার কারণে) তাদের উপর বজ্রাঘাত হলো। (সত্য-মিথ্যা যাচাই করার) বহু নিদর্শন [অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযাসমূহ] প্রত্যক্ষ করার পরও (আবার) তারা পূজার জন্য গো-বৎস তৈরি করেছিল, এর পরেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম এবং (হযরত) মূসা (আ)-কে প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম (কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা আমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কারণেও কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়নি, আর কোন প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় ইহুদী দলপতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান হতে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করেনি। বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রাসূলদেরও উত্ত্যক্ত করতো, আল্লাহ্‌দ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসতো। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা

(আ)-এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদীরা অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ ও ফেরআউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ্ তা'আলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (আ)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়তো তারা শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নিচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস্য শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো লংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখিরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا
قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا
قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ
شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ
عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

(১৫৫) অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রাসূলদের হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, "আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন।" অবশ্য তা নয়, বরং কুফুরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক। (১৫৬) আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করার কারণে। (১৫৭) আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, 'আমরা মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহ্কে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে আর না শূলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ। (১৫৯) আর আহ্লে কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের দৌরাত্ম্য এবং তজ্জন্য তাদের নিন্দা ও শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তাদের কতিপয় অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যথা, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের মিথ্যা দাবি ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করা বা শূলে চড়ানোর ব্যাপারে তারা যে দাবি করছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। তারা যাকে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তি ঈসা (আ) নয় বরং তার সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে তাদের নির্যাতন ও হস্তক্ষেপ হতে উদ্ধার করে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিরাপদে আসমানে উত্তোলন করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বস্তুত আমি (তাদের সহিত গর্হিত আচরণের দরুন লা'নত, গযব, লাঞ্ছনা ও বিকৃতি প্রভৃতি) শাস্তিতে নিপতিত করেছি। (অর্থাৎ) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ঐশী বিধি-বিধানের প্রতি (অস্বীকৃতি ও) কুফরীর কারণে এবং (অন্যায় বলে জানা থাকা সত্ত্বেও) নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার দরুন এবং তাদের সে কথার কারণে যে, আমাদের অন্তরাত্মা (এমনই) সংরক্ষিত (যে, তাতে বিপরীত ধর্ম ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারে না। আমরা ধর্মের ব্যাপারে একান্তই পরিণত। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডন করেছেন যে, এটা পরিপক্কতা বা সুদৃঢ়তা নয়) বরং তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ তা'আলা বাঁধন এঁটে দিয়েছেন। (ফলে ন্যায় ও সত্য কথার কোন প্রভাব তাতে হয় না)। কাজেই যৎসামান্য ঈমান ব্যতীত তাদের ঈমান নেই। (আর যৎসামান্য ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই তারা সম্পূর্ণতই কাফির)। আর (আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি) তাদের (একটি বিশেষ কুফরীর কারণে এবং

তার অর্থ হলো হযরত) মরিয়ম (আ)-এর প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করার কারণে। [যার ফলে হযরত ঈসা (আ)-কে অবিশ্বাস করা হয়। কারণ, তিনি শিশুকালে মু'জিযার মাধ্যমে নিজের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন]। এবং (স্পর্ধার সাথে) একথা বলার কারণে (যে) আমরা আল্লাহ্র রাসূল মরিয়ম-পুত্র (ঈসা) মসীহ্কে হত্যা করেছি। (তাদের এ কথাটি নবীদের প্রতি শত্রুতারই প্রমাণ। আর নবীদের সাথে, শত্রুতা পোষণ করা কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু এখানে আল্লাহ্র নবীকে হত্যা করার দাবি করা হয়েছে। নবীকে হত্যা করা এবং কুফরী কার্যের দাবি করাও কুফরী। অথচ কুফরী হওয়া ছাড়াও তাদের এ দাবি মিথ্যা ছিল। কেননা, আসলে) তারা (ইহুদীরা) তাঁকে [হযরত ঈসা (আ)-কে কতলও করেনি, শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদের জন্য অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং (আহলে-কিতাবদের মধ্যে) যারা তাঁর [হযরত ঈসা (আ)] সম্পর্কে নানা কথা বলে তারা (নিজেরাই) এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত (রয়েছে) তাদের কাছে এ সম্পর্কে (সঠিক) কোন প্রমাণ নেই। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে চলছে এবং ওরা তাঁকে হত্যা করেনি (একথা) সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে (আসমানে) উত্তোলন করেছেন। আর সাদৃশ্য করে দিয়েছেন যাকে ধরে শূলে চড়ানো হয়েছে। (এ কারণেই তাদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে) আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাই স্বীয় অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ)-কে শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করে অক্ষত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। এবং অন্য এক ব্যক্তিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেওয়ার ফলে ইহুদীরা আসল ব্যাপার টের করতে পারল না। ঈসা (আ)-এর নবুয়তকে অস্বীকার ও তাঁকে হত্যা করার দাবি অচিরে দুনিয়াতেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। কেননা অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কালে আহলে-কিতাব (অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে এমন) কোন (গোষ্ঠী বা) ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, কিন্তু সে তার মৃত্যুর (কিছু) পূর্বে [যখন আলমে-বরযখের দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হবে তখন তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর নবুয়তের] প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে বাধ্য হবে। (যদিও তখনকার ঈমান ফলপ্রসূ হবে না। বরং তাতে শুধু তাদের বাতুলতাই প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে এখনই যদি তাঁর নবুয়তের সত্যতা স্বীকার করে নিত, তবে তা কল্যাণকর হতো) আর (ইহজগত ও আলমে বরযখের সমাপ্তির পর) কিয়ামতের দিন তিনি [হযরত ঈসা (আ)] তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আলে-ইমরানের يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ—আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দুশমন ইহুদীদের দুরভিসন্ধি বানচাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ)-কে হেফাযত করা প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাঁকে হত্যা করার কোন সুযোগ ইহুদীদেরকে দেওয়া হবে না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের দুষ্কর্মের বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহ্র ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা

উল্লেখ করে হযরত ঈসা (সা)-এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদীদের মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ অর্থাৎ ওরা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল।

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ? وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে তফসীর হযরত যাহ্হাক (র) বলেন—ইহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তাঁর ভক্ত সহচরবৃন্দ একস্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আ)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলিস তখন রক্তপিপাসু ইহুদী ঘাতকদের হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদী দুরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন হযরত ঈসা (আ) স্বীয় ভক্ত-অনুচরদের সম্বোধন করে বললেন—তোমাদের মধ্যে কেউ এই গৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে ও নিহত হতে এবং পরকালে বেহেশতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি ? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা (আ) নিজের জামা ও পাগড়ি তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ঈসা (আ)-এর সদৃশ করে দেওয়া হলো। যখন তিনি গৃহ হতে বহির্গত হলেন, তখন ইহুদীরা ঈসা (আ) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন।—(তফসীরে কুরতুবী)

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদীরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আ)-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ হতে বেরিয়ে এল তখন অন্য ইহুদীরা তাকেই ঈসা (আ) মনে করে পাকড়াও করলো এবং শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো।—(তফসীরে মাযহারী)

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কোরআন করীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত সত্য ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অবশ্য কোরআন পাকের আয়াত ও তার তফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়েত সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদী ও খৃস্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, শুধু অনুমান করে তারা বিভিন্ন উক্তি ও দাবি করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا-

অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে, তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন সত্য-নির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে

কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।'

কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরাতো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ঈসা (আ)-এর মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আ) হয় তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায় ? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আ)-ই বা গেলেন কোথায় ?

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا– অর্থাৎ 'আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু অতি পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে কতল করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর হিফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে ? আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আ)-কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ مَوْتِهٖ—অর্থাৎ ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল!

এই আয়াতের مَوْتِهٖ অর্থাৎ 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দের একটি ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে তফসীরের সার-সংক্ষেপের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে এখানে ইহুদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না ; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরআউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তফসীরে যা সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীদের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো مَوْتِهٖ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তফসীর হলো ঃ আহলে কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদীরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে

ভূষিত করতো (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেকা)। অপরদিকে খৃষ্টানরা যদিও ঈসা মসীহ্ (আ)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবিদার ; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা (আ)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেকদল অতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কোরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না; বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনবে। খৃষ্টানরা মুসলমানদের মত সহীহ্ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ হরবে। তখন সমগ্র দুনিয়া হতে সর্ব প্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليقتلن الدجال وليقتلن الخنزير وليكسرن الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين - ثم قال ابو هريرة رض واقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته-

قال ابو هريرة رضى قبل موت عيسى يعيدها ثلاث مرات- (قرطبى)

অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দজ্জালকে কতল করবেন, শূকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার, যাতে বলা হয়েছে—'আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এর অর্থ "হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে।" এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।—(তফসীরে কুরতুবী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত অত্র তফসীর বিশ্বস্ত সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অত্র আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

উপরোক্ত তফসীরের ভিত্তিতে অত্র আয়াত স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, অদ্যাবধি হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু হয়নি। বরং কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে তিনি আবার যখন আসমান থেকে সশরীরে অবতরণ করবেন এবং তাঁর অবতরণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব নিগূঢ় রহস্য

জড়িত রয়েছে, তা যখন পূর্ণ হবে এবং তাঁর দায়িত্ব সুসম্পন্ন হবে, তখন এ পৃথিবীর বুকেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর কবরের স্থানও নির্ধারিত রয়েছে।

সূরায়ে 'যুখরুফ'-এর ৬১তম আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় ঃ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ অর্থাৎ "হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব, তোমরা কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মান্য কর।" অধিকাংশ তফসীরকারের মতে انه। 'নিশ্চয় তিনি' শব্দ দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। অন্য আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর আগমনকেই কিয়ামতের নিদর্শন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আয়াতের অন্য কেরাআত لَعَلَمٌ রেওয়ায়েত করা হয়েছে, যার অর্থ আলামত বা লক্ষণ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

عن ابن عباس رضى فى قوله تعالىٰ وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة- (تفسير ابن كثير)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) وانه لعلم للساعة আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব কিয়ামতের অন্যতম আলামত। —(ইবনে কাসীর)

মোদ্দা কথা, উপরোক্ত আয়াতের উভয় কেরাআত অনুসারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস ও তফসীর সমন্বয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর অদ্যাবধি জীবিত থাকা, কিয়ামতের পূর্বে পুনরাগমন ও ইহুদীদের উপর পূর্ণ বিজয়ী হওয়া প্রতীয়মান হচ্ছে।

ইমামে তফসীর আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اما ما عدلاً- (ابن كثير)

অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে মোতাওয়াতের রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তিনি কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন।

এ ধরনের মোতাওয়াতের রেওয়ায়েতসমূহ আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) একত্র করেছেন। এ অধম সেটি আরবী ভাষায় সংকলন করেছে। তিনি তার নামকরণ করেছেন ঃ التصريح بما تواتر فى نزول المسيح। 'আত-তাসরীহ্ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযুলিল মসীহ্', যা তৎকালেই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি হলব শহরের জনৈক প্রখ্যাত আলিম আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ্ বর্ধিত ব্যাখ্যা ও টিকাসহ উহা বৈরুত থেকে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের আকীদা অপরিহার্য, ইহা অস্বীকারকারী কাফির ঃ আলোচ্য আয়াত এ বিষয়ে একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তা ছাড়া সূরা আলে-ইমরানের তফসীরেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান যুগের কোন কোন নাস্তিক যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে, তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

(১৬০) বস্তুত ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূতঃপবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল—তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন। (১৬১) আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের অপকীর্তি ও তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহেও তাদের কতিপয় অপকর্মের বর্ণনা এবং অন্য এক ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো আখিরাতে তো তাদের নির্ধারিত শাস্তি হবেই। তদুপরি তাদের গোমরাহীর কারণে ইহজগতেই অনেক পবিত্র বস্তু যা ইতিপূর্বে হালাল ছিল, শাস্তিস্বরূপ তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুতরাং (ইতিপূর্বে সূরায়ে বাকারায় বর্ণিত) ইহুদীদের মারাত্মক অপরাধসমূহের কারণে আমি (অনেক হালাল সুস্বাদু উপাদেয়) পবিত্র দ্রব্য যা (পূর্বে) তাদের জন্য হালাল ছিল, [যেমন সূরায়ে আলে-ইমরানে كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ—অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য সর্বপ্রকার খাদ্য হালাল ছিল—আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। মূসা (আ)-এর শরীয়তে] তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছি। (সূরা আন'আমের وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, তাদের গোনাহ্ ও অবাধ্যতার কারণেই এসব পবিত্র হালাল দ্রব্যকে তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতার কারণেই তাদেরকে এরূপ সাজা দিয়েছি) এবং হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়তে সব সময়ই সেগুলো হারাম ছিল (তন্মধ্যে একটিও হালাল হয়নি)। এ

কারণে যে (পরবর্তীকালেও তারা অপরাধমূলক তৎপরতা থেকে বিরত হয়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীকে গোপন বা বিকৃত করে) তারা বহু লোককে আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ সত্য দীন গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো। কেননা আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করা ও সন্দেহের অবসান করা যদিও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তাদের বিভ্রান্তিকর উক্তি ও আচরণের ফলে বহু লোক বিপথগামী হয়ে সত্য দীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।) আর তাদের সুদ গ্রহণ করার কারণে, অথচ (তওরাতে) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছিল এবং (এ কারণে যে,) তারা (শরীয়তসম্মত বিধান লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ) অবৈধভাবে লোকের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করতো।

(মোট কথা, দীনের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, সুদ গ্রহণ করা, অবৈধভাবে অপরের মাল কুক্ষিগত করা প্রভৃতি অপরাধমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখার কারণে হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়তে শেষ অবধি কোনরূপ সহজীকরণ করা হয়নি তবে হযরত ঈসা (আ)-এর নতুন শরীয়তে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। যেমন কোরআনের আয়াতে وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ। 'আর তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু হালাল করার জন্য' আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। ইসলামী শরীয়তে আরো সহজ করে বলা হয়েছে, يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ। অর্থাৎ 'মুসলমানদের জন্য সব পবিত্র দ্রব্য হালাল।' যা হোক, এতক্ষণ গেল ইহুদীদের প্রতি একটি বিশেষ পার্থিব শাস্তির কথা। আর (আখিরাতে) আমি তন্মধ্যে যারা কাফির (অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে) তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (অবশ্য) যারা পুরোপুরি যথাবিধি ঈমান আনয়ন করবে, তাদের পূর্ববর্তী সমুদয় অন্যায় অপরাধ মার্জনা করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামী শরীয়তেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

(১৬২) কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ব ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে

অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ঐসব ইহুদীর উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কুফরী আকীদার উপর অনড় ছিল এবং বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত ছিল। এখন ঐসব মহান ব্যক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে, যারা আহলে-কিতাব ছিলেন সত্য কিন্তু যখন নবীয়ে আখেরী যামান (সা)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তাঁর সম্পর্কে তাদের কিতাব (লিখিত) নিদর্শন ও লক্ষণাদি দেখে ঈমান এনেছিলেন। যেমন—হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে ঐ সব লক্ষণ পুরোপুরি পরিদৃষ্ট হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, হযরত উসাইদ, হযরত সা'লাবা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। এই আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিন্তু তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) মধ্যে যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে পরিপক্ক (অর্থাৎ তদনুযায়ী কাজ করতে কৃতসংকল্প এবং এ সংকল্পই তাদের সম্মুখে সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে, দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যকে গ্রহণ করার শক্তি যুগিয়েছে। যার বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এবং (তাদের মধ্যে যারা) ঈমানদার, তারা ঐ কিতাবও মানে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং ঐসব কিতাবের প্রতিও (ঈমান এনেছে) যা আপনার পূর্বে (অন্য রাসূলদের প্রতি) অবতীর্ণ হয়েছে এবং (তাদের মধ্যে) যারা (সুষ্ঠুভাবে) নামায কায়েম রাখে এবং (যারা) যাকাত প্রদান করে আর (যারা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে আমি (পরকালে) উত্তম প্রতিফল দান করব সন্দেহ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। অন্যথায় শুধু জরুরী আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ

إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ

وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا

قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ

وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾
لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ
وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ ظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ
اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

(১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সেসব নবী-রাসূলের প্রতি, যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (১৬৪) এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাঁদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। (১৬৫) সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলদের প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলদের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ। (১৬৬) আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা স্বজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেও সাক্ষী। এবং ফেরেশতারাও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। (১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ্ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। (১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

যোগসূত্র : يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ—এ আয়াতে ইহুদীদের একটি নির্বোধ প্রশ্নের উল্লেখ করে সবিস্তারে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে উক্ত প্রশ্নটির অন্যভাবে জবাব দেওয়া হচ্ছে। বলা

হচ্ছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য আসমান থেকে লিপিবদ্ধ কিতাব নিয়ে আসার শর্ত আরোপ করছ। কোরআন পাকে পূর্ববর্তী যেসব নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরাও তাঁদেরকে মান্য কর। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে তোমরা এ ধরনের আবদার উত্থাপন কর না কেন ? শুধু অলৌকিক ঘটনাবলীর কারণে যদি তাঁদেরকে মানতে পার, তবে মুহাম্মদ (সা)-কেও মানতে হবে। কেননা, তাঁর থেকেও বহু মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো—তাদের এ আবদার সত্যকে জানার জন্য ছিল না, বরং বিদ্বেষপ্রসূত ছিল।

অতঃপর পয়গম্বর প্রেরণের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি আপনার সত্যতা স্বীকার না করে, তবে তাদেরই পরিণতি শোচনীয় হবে ; আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতারা আপনার নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনাকেই (নবীরূপে নতুন পাঠাইনি। বরং) আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। যেমন (ইতিপূর্বে) ওহী পাঠিয়েছিলাম (হযরত) নূহ (আ)-এর প্রতি এবং তাঁর পরবর্তী (অন্যান্য) নবীদের প্রতি ; এবং (তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম জানিয়ে দিচ্ছি যে,) আমি (হযরত) ইবরাহীম (আ) ও (হযরত) ইসমাঈল (আ) ও (হযরত) ইসহাক (আ) ও (হযরত) ইয়াকুব (আ) ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে যত নবী অতীত হয়েছেন, (হযরত) ঈসা (আ) ও (হযরত) আইউব (আ) ও ইউনুস (আ) ও (হযরত) হারুন (আ) ও (হযরত) সুলায়মান (আ)-এর প্রতি এবং (অনুরূপভাবে) আমি (ওহী নাযিল করেছিলাম হযরত) দাউদ (আ)-এর প্রতি (এবং) তাঁকে যবুর (কিতাব) দান করেছিলাম এবং (এতদ্ব্যতীত) আরো অনেক পয়গম্বরকেও (ওহীর অধিকারী করেছি) যাঁদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে (সূরায়ে আন'আম ও অন্যান্য মক্কী সূরায়) আপনাকে শুনিয়েছি। আর এমন সব পয়গম্বরের প্রতি (ওহী নাযিল করেছি) যাঁদের বৃত্তান্ত (এখন পর্যন্ত) আপনার কাছে বলিনি এবং (হযরত) মূসা (আ)-এর (প্রতিও) আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করেছেন। এবং (তাঁর) সাথে বিশেষভাবে কথোপকথন করেছেন। (তাঁরা) সবাই পয়গম্বর (রূপে প্রেরিত হয়েছেন। ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য তাঁরা পরকালে পরিত্রাণ ও বেহেশত লাভের) সুসংবাদদাতা এবং (অবাধ্য কাফিরদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাবের) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে। যেন মানুষের জন্য (কোন অজুহাত বা) আল্লাহ্র উপর কোন অভিযোগ (অবশিষ্ট) না থাকে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যেন একথা বলতে না পারে যে, অনেক কাজের ভাল-মন্দ আমরা বিবেক দ্বারা উপলব্ধি করতে পারিনি, তাই ভুল করেছি। সঠিক জানতে পারলে শুধু ভাল কাজই করতাম, অতএব আমরা নিরপরাধ। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী সর্বশক্তিমান, পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি নবীদের প্রেরণ না করেও যদি শাস্তি দান করতেন, তবে তা অবিচার বা জুলুম হতো না। কেননা, তিনিই সবকিছুর সার্বভৌম মালিক ও স্বত্বাধিকারী। যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে। এতে কারো কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করার অধিকার

নেই। তবে যেহেতু তিনি অতি প্রজ্ঞাময় (সুবিবেচক, তাই স্বীয় সুবিবেচনা অনুসারে নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন যেন কারো কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ না থাকে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে নবী প্রেরণের নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে নবুয়তে-মুহাম্মদী (সা) প্রমাণ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে যে, ওদের সন্দেহ ভঞ্জনের পরেও যদি ওরা ঈমান না আনে, তবে আপনি বিস্মিত ও চিন্তিত হবেন না। কারণ, বাস্তবে আপনার নবুয়ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এবং আপনার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ চিরভাস্বর রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্যদান করেছেন কিতাবের মাধ্যমে, যা তিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করছেন স্বীয় পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে। [ফলে এ মহান কিতাব আল-কোরআনই এক চিরস্থায়ী মু'জিযা স্বরূপ আপনার নবুয়তের সত্যতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এহেন বিস্ময়কর কিতাবের মাধ্যমে আপনার নবুয়তের সাক্ষ্যদান করছেন। অর্থাৎ অকাট্য দলীল এবং অনস্বীকার্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি পবিত্র কোরআনকে নজীরবিহীন বিস্ময়কর ভাষায় নাযিল করেছেন। অতএব, দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর নবুয়তকে স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু হঠকারিতা ও জিদের বা স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনেকে তাঁর নবুয়তকে স্বীকার করে না। আর তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি] ফেরেশতা (আপনার নবুয়তকে স্বীকার করছে। এবং মু'মিন-মুসলমানদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য তো সুস্পষ্ট। অতএব, মুষ্টিমেয় কতিপয় আহাম্মকের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতায় আপনার কি ক্ষতি হবে ?) আর আসল কথা হলো, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য (অর্থাৎ প্রমাণাদি উপস্থাপনই) যথেষ্ট। আপনি কারো স্বীকৃতি বা সমর্থনের মুখাপেক্ষী নন। এত সব অকাট্য-অনস্বীকার্য প্রমাণাদি সত্ত্বেও যারা (আপনার নবুয়তকে) অস্বীকার করে এবং (আরো বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তারা অন্যদেরও) আল্লাহ্র পথে (চলতে) বাধাদান করে, তারা (সত্য হতে বিচ্যুত হয়ে) বহু দূরে (পতিত হয়েছে। এ হলো ইহকালে তাদের ধর্ম-কর্মের অবস্থা। আর আখিরাতে কর্মফল এই যে,) নিশ্চয় যারা (সত্যকে) অস্বীকার করেছে এবং (সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে) অন্যের ক্ষতি সাধন করছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ (অর্থাৎ বেহেশতের পথ তাদেরকে) দেখাবেন না। তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ শাস্তি অতি সহজ। এজন্য বিশেষ কোন আয়োজন উপকরণের প্রয়োজন হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ٠

—এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবীদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহ্র খোদায়ী ওহী নাযিল হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবীদের যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর

যারা তাঁকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্য সব নবীকে এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ) ও তৎপরবর্তী নবীদের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়তো এই যে, হযরত আদম (আ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আ)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত আদম (আ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং হযরত নূহ (আ)-এর আমলে পূর্ণতা লাভ করে পরীক্ষা গ্রহণের স্তরে পৌঁছেছিল এবং পরীক্ষা শুরু হলো। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করলো তাদের জন্য আযাবের ব্যবস্থা করা হলো। অতএব, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওহীপ্রাপ্ত নবীগণের আগমন হযরত নূহ (আ) হতেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকারকারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আযাবও হযরত নূহ (আ)-এর কালেই আরম্ভ হয়।

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে আল্লাহ্র ওহীর অবাধ্য ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোন ব্যাপক আযাব বা গযব আপতিত হতো না। বরং তাদেরকে মা'জুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেওয়া হতো, বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আ)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হতে থাকে। হযরত নূহ (আ)-এর যামানার সর্বনাশা মহাপ্লাবনই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক আযাব। পরবর্তীকালে হযরত হুদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত শোয়ায়েব (আ) প্রমুখ পয়গম্বরের আমলেও তাঁদেরকে অমান্যকারী নাফরমান কাফিরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আযাব ও গযব আপতিত হয়েছে। অতএব, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ) ও তৎপরবর্তীদের ওহীর সাথে তুলনা করে মক্কার মুশরিক ও আহলে কিতাব ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ কোরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়বে।—(ফাওয়ায়েদে ওসমানী)

হযরত নূহ (আ)-এর অস্তিত্বই ছিল এক অনন্য মু'জিযা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি, একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন।—(তফসীরে-মাযহারী)

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ—"এবং আরো বহু রাসূল যাঁদের ইতিবৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি।" এ আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর পরে যেসব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, এরা সবাই আল্লাহ্র

পয়গম্বর এবং নবীগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে ওহী এসেছে আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। সারকথা, যে কোন পন্থায় ওহী পৌঁছুক না কেন, তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদীদের এরূপ আবদার করা যে তাওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো অন্যথায় নয়—সম্পূর্ণ আহাম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—আল্লাহ্ তা'আলা একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল তিনশ তেরজন।—(তফসীরে কুরতুবী)

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ—"পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী" আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফির, বেঈমান ও দুরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কিয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ্! কোন্ কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে বিরাগ হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিক মু'জিযাসহ নবীদের প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার মোকাবিলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কোরআন পাক এমন এক অকাট্য দলীল যার সম্মুখে কোন অপযুক্তি টিকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও তদবীরের ইহা এক কল্পনাতীত নিদর্শন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—একদা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে একদল ইহুদী উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। তারা অস্বীকার করলো। তখনই ওহী নাযিল হলো ঃ لكن الله يشهد بما انزل اليك অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কিতাবের (আল-কোরআনের) মাধ্যমে যা তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন, আপনার নবুয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি আপনাকে ঐ কিতাবের যোগ্য জেনেই কিতাব নাযিল করেছেন। আর ফেরেশতারাও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

মহানবী (সা) ও কোরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—এখনও যারা কোরআন মজীদ ও রাসূলে করীম (সা)-কে অস্বীকার করে এবং তাওরাতে রাসূল

(সা)-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এক কথায় অন্য কথা লোকের কাছে প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সত্য দীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন চরম অপরাধীদের কস্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইহুদীদের সব ধ্যান-ধারণা, ধর্মকর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

(১৭০) হে মানবকুল! তোমাদের পালকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রাসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও, তাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে ইহুদীদের একটি অন্যায়-আবদারের জবাব দিয়ে নবুয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এবার সমগ্র মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের প্রতি আস্থা ও ঈমান এবং তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করা সম্ভব, অন্য কোন পন্থায় নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে (সারা বিশ্বের) সমগ্র মানব (জাতি)! তোমাদের কাছে (এ) মহান রাসূল (সা) আগমন করেছেন, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে সত্য বাণী (অর্থাৎ সত্য বাণী ও সঠিক দলীল-প্রমাণ) নিয়ে। অতএব, (অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দাবির চাহিদা মোতাবেক) তোমরা (তাঁর প্রতি এবং তিনি যখন যা বলেন সে সবের প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর। (যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছো তারা ঈমানের উপর দৃঢ় থাক, আর যারা এখনও ঈমান আনয়ন করনি তারা সত্বর ঈমান আনয়ন কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। কেননা এভাবেই জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ ও বেহেশতের নিয়ামতসমূহ লাভ করতে পারবে)। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, (তবে তোমাদেরই ক্ষতি হবে)। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আসমানে ও যমীনে যা কিছু (আছে) সবই আল্লাহ্ তা'আলার

মালিকানাধীন। (কাজেই এতবড় পরাক্রমশালী মালিকের কি ক্ষতি হবে ? এখনও সময় আছে, নিজের কল্যাণের চেষ্টা কর)। আর আল্লাহ্ তা'আলা (সকলের ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে) সবই জানেন (কিন্তু তিনি দুনিয়ায় পূর্ণ শাস্তি দান করেন না। কারণ, তিনি) সুবিবেচক (ও বটে। তাই তার প্রজ্ঞার চাহিদা অনুসারে দুনিয়াতে পূর্ণ শাস্তি দান করেন না)।

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ﴿١٧١﴾

(১৭১) হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ ঈসা আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ্—তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রাসূলদের মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, একথা পরিহার কর ; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের সম্বোধন করে তাদের গোমরাহীর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবারে খৃস্টানদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও হযরত ঈসা মসীহ্ (আ) সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদাসমূহ খণ্ডন করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহলে-কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জীল কিতাবের অধিকারী নাসারা খৃস্টানগণ) ! তোমরা নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে (সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের উপর) বাড়াবাড়ি করো না, এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে ভুল কথা বলো না (যে, তাঁর পরিবার-পরিজন রয়েছে—নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)। যেমন কেউ কেউ বলতো اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ। (অর্থাৎ উপাস্য তিনজন) তন্মধ্যে আল্লাহ্ অন্যতম; অবশিষ্ট দু'জন অংশীদারের একজন হযরত মসীহ (আ) ও অপরজন সম্পর্কে কেউ বলতো—হযরত জিবরাঈল (আ) যার উপাধি ছিল রূহুল কুদ্স বা পবিত্রাত্মা। وَلَا الْمَلٰئِكَةُ

الْمُقَرَّبُوْنَ। আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। আর কেউ মনে করতো, হযরত মরিয়ম (আ)। যেমন اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ। আয়াতে তাদের ভ্রান্ত আকীদা বাতিল করা হয়েছে। অন্য একটি উপদল হযরত ঈসা (আ)-কে স্বয়ং আল্লাহ্ মনে করতো। যেমন اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি আকীদা অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন ও বাতিল। (বস্তুত) আর কিছুই নয় (বরং হযরত ঈসা) মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ) নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর (সৃষ্টির) কলেমা, (বা অপার নিদর্শন)। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা [হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত] মরিয়ম (আ)-এর কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং (তিনি) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক রূহ (বিশিষ্ট মখলুক মাত্র। যা হযরত জিব্রাঈল [আ]-এর ফুৎকারের মাধ্যমে হযরত মরিয়মের দেহাভ্যন্তরে পৌঁছান হয়েছিল। সুতরাং তিনি খোদা বা খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা ছিলেন না। অতএব, এসব বাতিল আকীদা ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা হতে তওবা কর) এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও তাঁর (সব) রাসূলদের প্রতি (তাঁদের শিক্ষা অনুসারে) পুরোপুরি ঈমান আন। (আর ঈমানের ভিত্তি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই একত্ববাদকে বিশ্বাস কর), এবং (এমন কথা) বলো না যে, আল্লাহ্ তিনজন। (উদ্দেশ্য, শির্ক হতে বিরত রাখা। কেননা, নাসারাদের প্রত্যেকটি উপদল শিরকের মধ্যে সমানভাবে লিপ্ত ছিল। অতএব, তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ হচ্ছে—সর্বপ্রকার শির্ক হতে) বিরত থাক, তোমাদেরই মঙ্গল হবে, (এবং আল্লাহ্র একত্ববাদকে স্বীকার কর, কেননা) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অদ্বিতীয় মা'বুদ—এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্তানাদি হতে তিনি পবিত্র ; আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন। (সন্তানাদি হতে পবিত্র হওয়া ও সবকিছুর মালিক হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের একটি প্রমাণ। এবং আরেকটি প্রমাণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (একাই যে কোন) কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট (পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য সবাই নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষিত কার্য সম্পাদনের জন্য অসম্পূর্ণ ও পরমুখাপেক্ষী। এমনকি এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে অপারকও হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার অনন্য-নির্ভরতাই তাঁর গুণাবলীর পরিপূর্ণতার প্রমাণ। পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী হওয়া মা'বুদ এর জন্য অপরিহার্য শর্ত। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে যখন তখন তা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কেউ মা'বুদও হতে পারে না। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদই সপ্রমাণিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَلِمَتُهٗ শব্দে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র কালেমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(এক) হযরত ইমাম গায্যালী (র) বলেন ঃ কোন শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো—নারী পুরুষের বীর্যের সম্মিলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার كُنْ (হও) নির্দেশ দেওয়া ; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে

থাকে। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মলাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে কালেমাতুল্লাহ্ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধু আল্লাহ্ তা'আলার كن (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। এমতাবস্থায় القاها الى مريم বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কালেমাটি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের কাছে পৌছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে উহা কার্যকরী ও বাস্তবায়িত হলো।

(দুই) কারো মতে 'কালেমাতুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র সু-সংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আ)-কে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যে সু-সংবাদ দান করেছিলেন, সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ এবং ফেরেশতারা বললো—হে মরিয়ম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে সু-সংবাদ দিতেছেন 'কালেমা' সম্পর্কে।

(তিন) কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا

وَرُوْحٌ مِّنْهُ—এ শব্দের দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত হযরত ঈসা (আ)-কে 'রূহ্' বলার তাৎপর্য কি ? দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি ?

এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে—(এক) কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা, প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি 'রূহ' বলা হয়। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এবং كن নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি অতি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ্' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন মসজিদের সম্মানার্থে তাকে 'আল্লাহ্র মসজিদ' বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ঘর বলা হয় ; অথবা কোন একান্ত অনুগত বান্দাকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করে আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র বান্দা বলা হয়। যেমন সূরা বনী-ইসরাঈলের اسرى بعبده আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'আল্লাহ্র বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ্ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ্' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কোরআনকেও 'রূহ্' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কেননা, কোরআন পাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

(তিন) কেউ বলেন—'রূহ্' শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আ)-এর নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ্' বলা হয়।

(চার) কারো অভিমতে—এখানে একটি ذو শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে ছিল ذُوْرُوْحٍ مِّنْهُ—অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হতে রূহ্ বিশিষ্ট। প্রাণবিশিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে সব প্রাণীই সমান। তাই হযরত ঈসা (আ)-এর মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

(পাঁচ) আরেকটি অভিমত এই যে, روح (রূহ্) শব্দ ফুঁ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিব্রাঈর (আ) হযরত মরিয়ম (আ)-এর গলাবন্ধে ফুঁ দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আ) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে 'রূহুল্লাহ্' খেতাব দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُوْحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহ্ই ঈসা (আ)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—এমন অর্থ করা বা ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা ঃ আল্লামা আলুসী (র) লিখেছেন যে, একদিন খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খৃস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হলো। সে বলল—তোমাদের কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র অংশ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ সে কোরআনের روح منه শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআন পাকের অন্য আয়াত وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ পাঠ করলেন। এখানে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যার অর্থ আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পক্ষ হতে। অতএব روح منه শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্র অংশ, তবে جميعا منه শব্দের অর্থ করতে হবে আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র অংশ (নাউযুবিল্লাহে মিন্ যালিকা)। অতএব, হযরত ঈসা (আ)-এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খৃস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ—কোরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো—মসীহ্ই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো—মসীহ্ খোদার পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে

পিতা, পুত্র ও মরিয়ম—এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে, হযরত মরিয়ম (আ)-এর পরিবর্তে রূহুল কুদ্স পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্ (আ)-কে তিনের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে প্রতিটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো হযরত ঈসা মসীহ্ (আ), তার মাতা হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত যা কিছু বলা বা ধারণা পোষণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃস্টানদের মত অতিভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী ও খৃস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হযরত ঈসা (আ)-এর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তির দু'টি পরস্পরবিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খৃস্টানদের বিভিন্ন উপদলের ভ্রান্ত আকীদার ভিন্ন দিক ও তার মোকাবিলায় ইসলামী আকীদার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সবিস্তারে জানার জন্য মরহুম হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানুভী সাহেব কর্তৃক সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'এজহারুল হক' অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বইটি মূল আরবী হতে উর্দু তরজমায় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যাসহ সম্প্রতি করাচী দারুল উলূম হতে তিন জিলদে প্রকাশিত হয়েছে।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا.

অর্থাৎ আসমানে ও যমীনে উপর হতে নিচে পর্যন্ত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা একাই সর্ব কার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেক বর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম ঃ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ—আয়াতে ইহুদী- নাসারাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غلو শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাস্সাস 'আহকামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন ঃ

الغلوفي الدين هو مجاوزة حد الحق فيه

অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে غلو (বাড়াবাড়ি) করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা!

আহ্‌লে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান—উভয় জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে স্বীকার করেনি, বরং তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম (আ)-এর উপর (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিকা) মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দা করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বারবার প্রত্যক্ষ হয়েছে, তাই হযরত রাসূলে করীম (সা) তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মসনদে আহমদে হযরত ফারূকে আযম (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لاتطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله-

অর্থাৎ 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর ব্যাপারে করেছে। খুব স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।' বোখারী ও ইবনে মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন।

সারকথা, আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসাবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিশেষণে বিভূষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদী-নাসারাদের মত বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুত ইহুদী-খৃষ্টানরা শুধু নবীদের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবীদের সহচর অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল, পাদ্রী-পুরোহিতদেরও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করাও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবীদের অনুগত এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারী, না শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পণ্ডিত-পুরোহিতরূপে পরিগণিত হন। ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী-পুরোহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্মকর্মের নামে তারা অধর্ম অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কোরআন পাক ঘোষণা করছে ঃ

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ—অর্থাৎ "তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল।" রাসূলকে তো খোদা বানিয়েছিলই, রাসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবীদেরও পূজা করা শুরু করেছিল।

এর থেকে বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী (সা) স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্জের সময় রমীয়ে জামারাহ্ অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে কংকর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারি আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন ঃ بمثلهن بمثلهن অর্থাৎ এ ধরনের মাঝারি আকারের কংকর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দু'বার বললেন। অতঃপর আরো বললেন ঃ

اياكم والغلو فى الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو فى دينهم-

অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থেকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমত হজ্জের সময় যে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারি আকারের হওয়াই সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থী। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা। সেটা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়ত যে কোন কাজে সুন্নতসম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের সীমা ঃ পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কোরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রাসূলে করীম (সা) স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিয়ে করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন। বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে 'ফরিযাতুন বা'দাল ফরিযা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনটাই

দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুয়তের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে রাষ্ট্রের এলাকা বহু দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মোহ ছিল না। এতদ্দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদী ও খৃস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুধাবন করতে অপারক হওয়ায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا-

অর্থাৎ তারা নিজেদের পক্ষ হতে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করছে যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা ঃ ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলে পাক (সা) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রকার বিদ'আতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار অর্থাৎ প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রাসূলে মকবুল (সা)-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করাই বিদ'আত।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহ্লভী (র) লিখেছেন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে চরম অপরাধ এজন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্ববর্তী উম্মতদেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রাসূলদের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা কি কি বর্ধিত করেছে আর আসল রূপরেখা কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না।

দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনও গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামী শরীয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলভী (র) তদীয় 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ঃ উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবীয়ে-করীম (সা)-এর কঠোর হুঁশিয়ারি এবং শরীয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি

ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করেছে যে, ধর্মীয় আলিম-উলামা, পীর-বুযুর্গানের কোন প্রয়োজনই নেই। আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। এ মনোভাবাপন্ন কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবী ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কোরআনের হাকীকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়া সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করেই নিজেকে কোরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনাপ্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো তবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহ্‌র কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের বই-পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারেনি। প্রকৌশলবিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শোনা যায় না। এমন কি দর্জি-বিদ্যা বা পাক-প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোন সুদক্ষ দর্জি বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না, বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কোরআন-হাদীসকে এত হালকা মনে করেছে যে, এগুলো বোঝার জন্য কোন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যি পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক এমন গড্ডলিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, তাদের ধারণা, কোরআন পাক বোঝার জন্য তর্জমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষীদের তফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপর দিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত। যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি ইল্‌ম-আমল, ইসলাহ্ ও পরহিযগারীর মাপকাঠিতে টেকেন কিনা ? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক কিনা ? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়তের পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র কিতাব আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের চিনতে হবে অর্থাৎ প্রথমে কোরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চিনে নাও। অতঃপর দেখ, তাঁরা কোরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও কোরআন-হাদীসের রঙে রঞ্জিত কিনা। অতঃপর কোরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ
وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُ
هُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾

(১৭২) মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হবেন, তাতে তাঁর কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত যারা আল্লাহ্‌র দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। (১৭৩) অতঃপর যাঁরা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহ্‌কে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[খৃস্টানরা অনর্থক হযরত ঈসা (আ)-কে খোদা বা খোদার অংশ বলে চালাতে চায়, অথচ হযরত ঈসা মসীহ্ (আ) পৃথিবীতে অবস্থানকালে নিজেকে আল্লাহ্‌র বান্দা বলে প্রচার করেছেন যার ফলে তাঁর খোদা বা খোদার অংশ হওয়ার মতবাদ ভ্রান্ত ও বাতিল প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু ধরাপৃষ্ঠে অবস্থানের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের এবং উচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক বর্তমানে আসমানে অবস্থানকালে তথা কিয়ামত পর্যন্ত তিনি যখন যেখানেই থাকেন না কেন, কোন অবস্থাতেই তিনি] আল্লাহ্‌র বান্দা হতে লজ্জাবোধ করেন না এবং নিকটবর্তী ফেরেশতারাও (কখনও) অপমানবোধ করেন না, [যাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ)ও রয়েছেন যাকে তারা তিনের এক খোদা মনে করে]। আর (তাঁরা আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করতেই পারেন না। কারণ) যারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করতে লজ্জাবোধ করবে অথবা অহংকার করবে, (তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে (হিসাব-নিকাশের জন্য কিয়ামতের ময়দানে) নিজের সামনে সমবেত করবেন। অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দা হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেছে) তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন (যেমন ঈমান ও আমলের জন্য আশ্বাস দেওয়া হয়েছে)। আর (তাছাড়া) স্বীয় কৃপায় তাদেরকে আরো অধিক (ও অতিরিক্ত নিয়ামত) দান করবেন। (যার বিবরণ বা পরিমাণ

বর্ণনা করা হয়নি।) পক্ষান্তরে যারা (গোলামি স্বীকার করতে) লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে, তিনি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তিদান করবেন এবং তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন দরদী বা সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র বান্দা হওয়া সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় ঃ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ—অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহ্র বান্দা হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ আল্লাহ্র দাসত্ব ও গোলামি করা, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত ঈসা মসীহ্ (আ) ও হযরত জিবরাঈল (আ) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশতা এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্ (আ)-কে ঈশ্বর-পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে ঈশ্বর-দুহিতা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরি করে পূজা-অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে।— (ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

---

(১৭৪) হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতএব, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে (সমগ্র) মানব (জাতি)! নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক (যথার্থ) সনদ [অর্থাৎ রাসূলে পাক (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্ব] এসে পৌঁছেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি এক উজ্জ্বল নূর [বা আলোকবর্তিকা, আর তা হলো—পবিত্র কোরআন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা

দেওয়া হয়, তা সবই সত্য ও সঠিক, যার মধ্যে ইতিপূর্বে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে]। অতএব, যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে, (অর্থাৎ একত্ববাদ ও সন্তানাদি হতে পবিত্র হওয়া স্বীকার করেছে) এবং তাকে (অর্থাৎ তাঁর, মনোনীত দীন ইসলামকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে, [অর্থাৎ কোরআনের শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে ও অনুসরণ করেছে] তাদেরকে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) অচিরেই স্বীয় রহমতের মধ্যে (বেহেশতে) দাখিল করাবেন এবং স্বীয় ফযল বা অনুগ্রহে (আরো বহু বিশিষ্ট নিয়ামত দান করবেন), তন্মধ্যে আল্লাহ্র দিদার বা সরাসরি দর্শন অন্যতম এবং তাঁর কাছে পৌঁছার সরল পথ প্রদর্শন করবেন অর্থাৎ পার্থিব জীবনে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও ন্যায়ের পথে স্থির ও অবিচল রাখবেন। এতদ্দ্বারা ঈমান ও সৎকার্য বর্জনকারীদের অবস্থাও জানা গেল যে, তারা এসব সুফল ও সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ—'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে। —(তফসীরে রূহুল-মা'আনী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মু'জিযাসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রিসালতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার পরে আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতে نور (নূর) শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল-মা'আনী) যেমন সূরায়ে মায়েদার আয়াত ঃ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ—অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল আলো এসেছে, আর তা হচ্ছে এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ কোরআন।—(বয়ানুল-কোরআন)

এই আয়াতে যাকে 'কিতাবুম-মুবীন' বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে তাকেই 'নূরুম মুবীন' বলা হয়েছে।

আবার নূর অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং কিতাব অর্থ আল-কোরআনও হতে পারে। (রূহুল-মা'আনী) তবে তার অর্থ এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানবীয় দৈহিকতা হতে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ

وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا

وَلَدٌ ؕ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَإِنْ كَانُوْٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

(১৭৬) মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়—অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদের 'কালালাহ্-এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন পুত্র-সন্তান না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ্ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

যোগসূত্র ঃ সূরায়ে নিসা শুরু করার অব্যবহিত পরেই মীরাসের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর প্রায় এক পারা পরে মীরাসের মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরিশেষে সূরার উপসংহারে আবার একবার মীরাসের মাসায়েলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে মীরাস বণ্টনে অত্যন্ত অবিচার করা হতো। তাই সুষ্ঠুভাবে তা বণ্টন করার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য সূরার শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে—তিনবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মীরাসের মাসায়েল তিন স্থানে বিভক্ত করার হয়তো এটাই রহস্য ও তাৎপর্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

লোকে আপনার কাছে ('কালালাহ্র মীরাস' সম্পর্কে অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির পিতামাতা ও সন্তানাদি নেই, কিন্তু ভাই-বোন রয়েছে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে) নির্দেশ জানতে চায় ; (তদুত্তরে) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের 'কালালাহ্' সম্পর্কে এই ফায়সালা দিচ্ছেন (যে,) যদি কোন ব্যক্তি মারা যায়, যার (পিতামাতা ও) সন্তানাদি নেই এবং তার শুধু একজন (সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী) বোন থাকে তবে উক্ত বোন তার পরিত্যক্ত (সমুদয়) সম্পদের অর্ধেক পাবে, (অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হকসমূহ আদায় করার পরে। অবশিষ্ট অর্ধেক আসাবাদের দেওয়া হবে যদি কেউ থাকে। অন্যথায় তাও উক্ত বোনকে দেওয়া হবে)। আর উক্ত ব্যক্তি (জীবিত থাকলে) তার বোনের সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে, যদি (সে মারা যায় এবং) তার সন্তানাদি না থাকে ; (এবং পিতা-মাতাও না থাকে)। আর যদি (মৃত ব্যক্তির) দু'জন

(বা ততোধিক) বোন থাকে, (তবে তারা সমুদয়) পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসাবাদের জন্য এবং আসাবাদের অবর্তমানে পুনরায় বোনেরা পাবে। আর যদি (পুত্র-কন্যা, পিতামাতাহীন) কোন পুরুষ বা নারী মৃত ব্যক্তির (একই সম্পর্কের) কয়েকজন নারী-পুরুষ (অর্থাৎ ভাই-বোন) ওয়ারিস থাকে, তবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম এই যে,) প্রত্যেক পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমপরিমাণ অর্থাৎ ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ। তবে সহোদর ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বাদ পড়বে আর সহোদর বোন থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন তখন তাদের অংশ কম করে পাবে (এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল ফারায়েযের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য (ধর্মীয় বিধি-বিধান) স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিপথগামী না হও (এটা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী ও সতর্কবাণী)। আর আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সম্পর্কে অতি জ্ঞানবান। (অতএব, বিধি-বিধানের উপকারিতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যাবতীয় হুকুম-আহকাম দান করেন)।

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ — ওখানে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং 'কালালাহ্'র হুকুম বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল।

প্রথমত وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ বলার পর দৃষ্টান্তস্বরূপ আহলে-কিতাবের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রূপ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ —আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যাতে করে ওহী হতে যারা পরাঙ্মুখ তাদের পথভ্রষ্টতা ও সর্বনাশ এবং ওহীর আনুগত্য ও অনুসরণকারীদের সত্যনিষ্ঠা এবং সততা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, আহলে-কিতাবরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য অংশীদার ও পুত্র সাব্যস্ত করার মত হীন মানসিকতাকে নিজেদের ঈমানের অঙ্গ বানিয়েছে। হঠকারিতার সাথে আল্লাহ্র ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবায়ে-কিরামের ধর্মীয় মূলনীতি ও ইবাদত তো দূরের কথা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-শাদী এমন কি মীরাস বন্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং সব ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। যদি এ একবারে সান্ত্বনা না পেতেন তবে আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে হাযির হয়ে জানতে চাইতেন।

তৃতীয়ত আরো বোঝা গেল যে, হযরত সাইয়্যেদুল মুরসালীন (সা) ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ জারি করতেন না। যদি কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ওহী না থাকতো, তবে তিনি ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহলে-কিতাবদের আবদার অনুসারে ওহী এক সাথে নাযিল না হয়ে যথাসময়ে অল্প অল্প নাযিল হওয়া

অতি উত্তম। কারণ এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করার সুযোগ পায় এবং ওহীর মাধ্যমে জবাব জানতে পারে। যেমন এই আয়াতে এবং কোরআন মজীদের আরো বহু আয়াতে তার নজীর দেখতে পাওয়া যায়।

এ ব্যবস্থাটি অধিক উপকারী ও কার্যকরী। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ ও সম্বোধন করা বান্দার জন্য অতি সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়, যা পূর্ববর্তী উম্মতরা হাসিল করতে পারেনি। وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمُ

যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ বা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, উক্ত আয়াত তাকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে। আর মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী নাযিল হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে। যা হোক, 'কালালাহ্' সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। —(ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

ইফা-২০১০-২০১১-প্র/১৪৮৪(উ)-৫,০০০

তফসীরে
মা'আরেফুল
কোরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন